শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল—

উজ্জ্বলভারত

মাঘ—১৩৭১—পৌষ—১৩৭২

—অষ্টাদশ বর্ষ—

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদিকা
শ্রীরেণু মিত্র

নরনারায়ণ আশ্রম
গ্রাম বাগুইআটি
পোঃ অশ্বিনীনগর
২৪ পরগণা

বর্ষসূচী ঃ উজ্জ্বলভারত অষ্টাদশ বর্ষ ১৩৭১-৭২ (১৯৬৮)

অমৃতের আস্বাদে ২৪১
গোপেশচন্দ্র দত্ত

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৮১
অনিলকুমার সমাজদার

আধুনিক কবি মেসফিল্ড ২১১
রেজাউল করিম

আমাদের কথা ১
সম্পাদকীয়

উজ্জ্বলভারত ১৯৯
কুমুদরঞ্জন মল্লিক

একখানি পত্র ২৯০
চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়

একটি পত্র—মহাত্মাজীকে লিখিত ৭২
পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

কতটুকু ২১০
ভারতী

কৃষ্ণলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস ১৪৬
অরুণ গোস্বামী

জাতীয়তাবোধের প্রেরণা ২২০
নলিনীকিশোর গুহ

জীবন বিমুখ তুমি ? ১৭৯
মৃত্যুঞ্জয় বক্সী

টি এস এলিয়ট ১৭৬
মধুসূদন দাশ

ট্রয়ের আলবার্ট সোয়াইৎসার ২০৭
নারায়ণ চৌধুরী

তমদোহা ১৪৮
ভারতী

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ১৩৭, ১৬৪, ১৮৯, ২৪২, ২৭৪, ৩০৩
পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

দাস রঘুনাথ ৬
ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নবীনকালের দূত আসে ওই ৯০
পশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

নিত্যগোপাল ৩৯
প্রতিভা রায়

প্রাচীন সাহিত্যপাঠের মূল্যায়ণ ১০
শঙ্করনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রার্থনা ১৯৫
নিত্যগোপাল

প্রার্থনাকালীন ভাষণ ৩, ৪১, ৬১, ৯৩, ১১৯, ১৪৩,
পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ১৭৩, ২০০, ২৬২, ২৮১

পৃথিবী ও মানুষ ৭৬
ভারতী

ফরাসী সাহিত্যের ভূমিকা ৬৪
মীরা রায়

বন্ধুবরেষু ২১
সুগত

বিচিত্রা ২১৬
সন্তোষকুমার দে

ভগবান শ্রীনিত্যগোপাল ও তাঁহার চিন্তাধারা ৩৫
বিকুণ্ঠদেব রায়

ভয়ের পরিবর্তে প্রেম ১০০
মৃত্যুঞ্জয় বক্সী

ভাগবত সাধনা ৯৬
প্রতিভা রায়

ভারতবর্ষ ও আমি ২২
রঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় দর্শন-প্রস্থান বনাম পুরুষোত্তম-জীবনবেদ ২৪৯
চুনীলাল মিত্র

ভারতের মা ১৯৬
পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত
ভুবন ভরিয়া রহিয়াছ তুমি ২৮৮
হরহরেন বন্দ্যোতীর্থ
মহাকাব্যের কবি সেক্সপীয়ার ২৮৪
প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাকাশের পথে ২৮৬
বাবিকানাথ শেঠ
মানবিক অধিকার-বোধ ও বিদ্যাসাগর ২১৪
সন্তোষকুমার অধিকারী
মায়ের পূজা ২২৬
রেণু মিত্র
মুণ্ডকোপনিষৎ ২৪, ৫২, ৭৭, ১০২
অবধূতরাম
মৃত্যু
ভাস্কর দাশগুপ্ত
শ্রীনিতাগোপাল ৩১
রেণু মিত্র
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ২৫৩
রেণু মিত্র
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ২৫৯
রাধেশ্যাম মজুমদার
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী ১৩, ৪৪, ৮১, ১০৯, ১২৯, ১৫৬, ১৭৩, ১৮০, ২০৯, ২৩১, ২৩৫
সত্য যত সুন্দর ২২৩
মন্মথ রায়
সন্তুষ্ট হবার উপায় ১১৬
দেবাশীষ রায়
সর্ববাদ বিষয় প্রতিক্রমশীল ১৭১
পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত
সাতশো বছর আগের কবি ২০৩
নিখিলরঞ্জন রায়
সান্ত্বনা ৯৯
সন্তোষকুমার অধিকারী
সাময়িকী
আনন্দ সংবাদ ২৪০
সরস্বতী পূজা
নরনারায়ণ সেবন শিক্ষা কেন্দ্র
নরনারায়ণ মিলন সভা ৫০
নূতন বৎসর ৯০
ভগবান বুদ্ধ ১১
হিন্দুর ধর্মান্তর গ্রহণ ১৪
দৈনন্দিন জীবন ১৬০
নরনারায়ণ আশ্রম সঙ্ঘ সংবাদ ১৯
ভারত-পাকিস্তান সংবাদ ২৪০
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-জন্মোৎসব ২৭০
সিদ্ধান্তদর্শন ২৩, ৪৯, ৮৯, ১০৮, ১৪৮, ১৫১, ১৭৬, ২১৮, ২৬৫, ২৮০
স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ ২৪০
সুনীতি চক্রবর্তী
সিনেমা ১২
মীরা রায়
সিনেমা পাপ কেন ১২
পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত
স্মৃতি মন্থন ২৫
বিকুণ্ঠ রায়
যোগ সমন্বয় ২০
কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
লোক সঙ্গীত ও বাঙালীর সঙ্গীত সাধনা ২০৭
আশুতোষ ভট্টাচার্য
হিন্দুধর্ম সমীক্ষা ২৯
রহিদাস সাহা

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
[illegible] হইতে মুদ্রিত।

UJJWAL BHARAT

FORM IV

(See Rule 8)

1.	Place of Publication	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
2.	Periodicity of its publication	...	Monthly.
3.	Printer's Name	...	RENU MITRA M. A.
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
4.	Publisher's Name	...	RENU MITRA M. A.
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
5.	Editor's Name	...	RENU MITRA M. A.
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
6.	Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital	...	RENU MITRA M. A. Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.

I, RENU MITRA, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

—Dated 7th February, 1966.

Sd. RENU MITRA,
Signature of the Publisher.

7563
102(1)

UNIVERSITY

উদ্বোধন

মাঘ, ১৮৮৬ শকাব্দ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ

১৮শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

আমাদের কথা

মাঘ ১৩৭১, ১৮৮৬, জানুয়ারী ১৯৬৫ হইতে উদ্বোধন-ভারত মাসিক পত্রিকার অষ্টাদশ বর্ষ আরম্ভ হইল। সপ্তদশ বর্ষটিতে আমাদের নানা দুর্যোগ গিয়াছে বাইতেছে, যাহা বিগত ১৬ বৎসরের মধ্যে হয় নাই। চলার পথে এরকম বিপর্যয় আসিবেই। আমরা ভরসা রাখি এবং তাহা দৃঢ়ভাবেই রাখি যে আমরা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইব না, আমরা শ্রীনিত্যগোপাল-শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের প্রদীপশিখা জ্বালাইয়া রাখিতে পারিব। এ ভরসা কিসের? এ ভরসা ধনের নয়, জনের নয়, শক্তির নয়, বিদ্যাবুদ্ধির নয় —কিছুরই নয়। এ ভরসা এইজন্য যে উদ্বোধনভারতের চলা কোন ব্যক্তিবিশেষের চলা নয়—ইহা একটা চিন্তাধারার চলা। শ্রীনিত্যগোপাল-শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ সেই চিন্তা-ধারার ধারক ও বাহক—বর্তমান কালের মানুষের তাহাতে প্রয়োজন আছে—সে সমাজেরই হউক বা সমাজ বাহিরেরই হউক। এইজন্যই উদ্বোধনভারত এতদিন চলিয়াছে এবং বর্তমানের বিপর্যয়কেও কাটাইয়া উঠিতেছে। আমরা একদিকে শ্রীনিত্যগোপাল-শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের সহিত সর্বাঙ্গীণ একাত্মতা ধ্যান করিতেছি, অপর দিকে সর্বভূত-চিত্তের সহিত নিজেদিগকে সর্বতোভাবে যুক্ত করিতেছি। শক্তির এক উৎস তাঁহারা, অপর উৎস জনচিত্ত। এই দুই দিকের সঙ্গে নিজেদিগকে একাত্ম করিয়া রাখিলে, আকাশ আর মাটি উভয়-দিকেই নিজেদিগকে সংযুক্ত রাখিতে পারিলে, ভূমিতে দাঁড়াইয়া ভূমার দিকে নিজেদিগকে প্রসারিত করিয়া দিতে পারিলে কিছুতেই আমাদের ভয় নাই। আমরা নির্ভয়। আমাদের সাধনা উভয় দিকে বিস্তৃত। শ্রীনিত্যগোপাল-শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ও 'আমি বিশ্বনাগরিক' বাণী জীবনে নিয়া আমরা জনচিত্তের কাছে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য সতত সচেষ্ট থাকিব। তাহা হইলেই সকল বিপর্যয়ের মধ্যেও আমরা আসক্তি বিদ্বেষের বন্দীত্ব না হইয়া প্রেমে অধিষ্ঠিত থাকিয়া একদিকে আনন্দ আস্বাদন অপর দিকে সর্বভূত সেবা করিয়া যাইতে পারিব। নূতন বছরে বাক্যারম্ভ-কালে আমরা পুনঃ পুনঃ এই সংকল্প ও সাধন ধ্যান করিতেছি, শ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীপুরুষোত্তমানন্দে প্রতি আমাদের প্রণতি জানাইতেছি, জনচিত্তের সঙ্গে আমাদের সংযোগ জমাইয়া তুলিতেছি। এইসঙ্গে প্রণতি নিবেদন করি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে, নবীন যুগের ঋষি-কবি-দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে—স্মরণ করি তাঁহাদের বাণীকে। গান্ধীজী বলিলেন, 'জীবন চাও? মৃত্যুকে বরণ করো। প্রাণের প্রাবন আসে মৃত্যু থেকে' রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'পুরনো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে ও বেচাকেনা আর চলিবে না', 'নূতন সমুদ্র-তীরে তরী নিতে হবে পাড়ি'। সে প্রাণের প্লাবন সৃষ্টি করিব কেমন করিয়া? সে নূতন সমুদ্র-তীর কোথায়? বিশ্ব তথা ভারতবর্ষ আজ চরম বিপদের সম্মুখীন। বিশ্বের বিপদ শক্তিমানের হাতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার, আর ভারতবর্ষের বিপদ বাহির হইতে অন্নের বটে—কিন্তু আসল বিপদটা চরিত্রের। চরিত্র-ভ্রষ্টতার একদিক আত্মপ্রকাশ করিয়াছে দুর্নীতির প্রাবল্যে, অপর দিক রহিয়াছে কর্ম-কুণ্ঠতায়, উপযুক্ত পরিশ্রম না করিয়া ফাঁকি দিয়া কাজ হাসিল করিবার মনোবৃত্তিতে। জাতির যদি চরিত্র ভ্রষ্ট না হইত তাহা হইলে এই অন্নের বিপদ এই রকম উৎক

আকারে আজ দেখা দিত না। চরিত্র নষ্ট হইয়াছে নানা কারণে। ভারতবর্ষে আমাদের জীবনের খুঁটি ছিল কী? বাস্তব জীবনকে আমরা মায়া মোহ বলিয়া জানিতাম, আমাদের ভগবান থাকিতেন গোলোক বৈকুণ্ঠে—তাই বাস্তব জীবনটাকে—বাস্তব জীবনের ভিত্তি অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্যকে—সুন্দর ও শক্ত করিয়া সৃষ্টি করিবার দিকে আমাদের দৃষ্টি ছিল না, আমাদের জলবায়ুমাটির দাক্ষিণ্যে সহজে আহারাদি মিলিত বলিয়া জীবনে কঠিন সংগ্রামকে আমরা কোনদিন প্রত্যক্ষ করি নাই, মানিয়া লই নাই, উচ্চ জীবনের পক্ষে উহা বৈষয়িকতা বলিয়া এড়াইয়া গিয়া নিজেকে পৃথক রাখিয়াছি—এক কথায় আমাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে উচ্চ জীবনের কোন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ছিল না, সম্বন্ধ ছিল না রাজনীতির বা রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে অধ্যাত্মনীতির। কিন্তু মুসলমান আমলে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর অন্যায় অপমান সহ্য না করা, বাস্তব জীবনকে শ্রীভগবানের সহিত ভক্তি সাধনায় যুক্ত করিয়া সুন্দর করিয়া তোলা, মানুষে মানুষে বিদ্বেষের প্রাচীর প্রেমের স্নিগ্ধহাস্য ভাসিয়া দেওয়া—এই সকল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা বিপ্লবী গৌরসুন্দরকে আমাদের মতই করিয়া লইয়া তাঁহাকে ভক্তিতত্ত্বে আবৃত করিয়া মন্দিরে বসাইয়া রাখিয়াছিলাম—তাঁহার জীবনবাদকে আমাদের বাস্তব জীবনে গ্রহণ করি নাই। তাহার পর ইংরেজ আসিল—পাশ্চাত্ত্য জীবন-চেতনার ধাক্কায় ভারতবর্ষ বেসামাল হইয়া উঠিল। সে ধাক্কার প্রাথমিক বেগ সামলাইলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, স্বামী দয়ানন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ বহু বহু মহাপুরুষ। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের প্লাবন সর্বতোগ্রাসী, আজ ইহা কোন ঐকদেশীয় আন্দোলন মাত্র নয়। আজ সমগ্র বিশ্বের খাওয়াপরা চলা-ফেরার মধ্যে সমস্ত আসিয়া গিয়াছে। এত অল্প সময়ে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের দৃষ্টিভঙ্গি এত বেশী বদল করিতে হইয়াছে, বা বলা যায় যেন খানিকটা আপনা আপনি বদলাইয়া গিয়াছে যে, কি ভাবে কেমন করিয়া যে এত বড় বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হইল তাহা ভাবিয়া দেখিবার, বুঝিয়া লইবার অবকাশ বা শিক্ষা অনেকেরই হইল না। যেন হঠাৎই দেখা গেল আমরা সব অন্য রকম হইয়া গিয়াছি—এক দিকে চিন্তাধারা অপর দিকে বাস্তব জীবনের এক বিরাট অরাজকতার মধ্যে আমরা বাস করিতেছি। কিন্তু ইহা যে হইবেই এজন্য জাতিকে বিশ্বকে প্রস্তুত করিবার জন্যই একশত দশ বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হইয়া শ্রীনিত্যগোপাল এই বিরাট পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত দার্শনিক চিন্তাকে পরিস্ফুট করিবার জন্য লিখিয়া গেলেন, 'পূর্ণ জ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান। পূর্ণ জ্ঞানের এক শাখা আত্ম জ্ঞান। সর্ব জড় ও অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই পূর্ণ জ্ঞান'। আর লিখিলেন তাঁহার সর্ব সময়ে—বিশ্বচৈতন্যের সময়ে—যে বাস্তব সত্যের বৈজ্ঞানিকতা তাহারই কথা যেখানের বাস্তব প্রতিদিনের আসক্তিবিদ্বেষ-জর্জরিত গ্লানির ক্লেদ-জড়িত বাস্তব নয়, যাহা প্রেমের ঔদার্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া ভূমিকে ভূমার সঙ্গে সমন্বিত করিয়াছে, সীমাকে সীমাতীতের পর্যায়ে তুলিয়া ধরিয়াছে। এখানে কেহ—বস্তু বা ভাব, জড় বা চেতন—ছোট নয়, বড় নয়; এখানের বিশ্বে প্রত্যেকে তাহার নিজস্ব স্থানটিতে অনন্য হইয়া আছে অথচ অপরের সঙ্গে সে অঙ্গাঙ্গী জীবন-চেতনায় বিধৃত। এই চিন্তাধারাটি—বস্তু বা ভাব, জড় বা চেতন, জ্ঞান কর্ম বা ভক্তি, ইহলোক বা গোলোক বা যা কিছু সকলের পারস্পরিক অঙ্গাঙ্গী-ভাবনার এই চিন্তাধারাটি মানুষের মধ্যে সঞ্জীব করিয়া তুলিতে পারিলেই শুধু আজিকার সমস্যার একটা সমাধান পাওয়া যাইতে পারে। সমস্ত রোগের চিকিৎসা প্রথমটা রহিয়াছে চিন্তাধারার বৈজ্ঞ ঘুর করার মধ্যে, পরবর্তীটুকু রহিয়াছে নূতন চিন্তাকে রূপ দেওয়ার মধ্যে। আমরা উদ্বোধনের নূতন বৎসরের যাত্রারম্ভ দিনে শ্রীনিত্যগোপাল পুরুষোত্তমানন্দের এই সামগ্রিক চিন্তাধারাটি স্মরণ করি, মানুষের মধ্যে ইহাকে পৌঁছাইয়া দিবার, মানুষের মধ্যে ইহাকে গোড়া হইতে রূপ দিবার সংকল্পকে গ্রহণ করি। আমরা গোড়া হইতে হইয়া উঠিব, আমরা সকলের অঙ্গাঙ্গী ভাবনার এই বিরাট ব্যাপক গভীর জীবন-চেতনাকে জীবনের ভিত্তি ভূমি—অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য—তে প্রয়োগ করিব, আমরা আসক্তি বিদ্বেষের বাহিরে থাকিয়া প্রাণের

জয়যাত্রাকে বহন করিয়া চলিব। যাহাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে এবং যাহাদের সঙ্গে নাই সকলকেই আমরা এই যাত্রাপথে আহ্বান করিতেছি—ভারতবর্ষ ও বিশ্ব-সমাজ রক্ষাকল্পে, শ্রীনিত্যগোপালের একসঙ্গে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ও 'আমি বিশ্বনাগরিক' মন্ত্র আচরণ ও প্রচার করে সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি। আমরা আমাদের ভালমন্দ, ভুল-ত্রুটি, যোগ্যতা-অযোগ্যতা লইয়া একত্র বাঁচিব, একত্র মরিব, একত্র অগ্রসর হইব, সমস্ত সমাজকে সঙ্গে লইয়া চলিব। বিশ্বে শুধু একটি মাত্র কথা আছে—মানুষের জয় হউক। কিন্তু সে মানুষ কোন্ মানুষ তাহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। মানুষ তো তরু-গুল্মলতা, পশুপাখী বাদ দিয়া নিজেকে কল্পনা করিতে পারিবে না—তাই মানুষের জয় হউক মানে এই সকলেরই জয় হউক। মানুষ বলিতে কোন সঙ্কীর্ণ মানুষ নয়—যে মানুষ বিশ্ব-মানুষ, বিশ্ব-নাগরিক তাহারই জয় হইবে। আজিকার দিনের ইহাই কথা। উজ্জয়িনীস্থিত তাহার সকল শক্তিধারা এই কথা বলিবার চেষ্টা করিবে। অষ্টাদশবর্ষের প্রারম্ভে সে আবারও সকলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছে।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৪৩)

২৭. ১. ৪৬। *(প্রথমে শ্রীনিত্যগোপালের আবাহন পঠিত হয়।) সংসারের সাধনা আর সন্ন্যাসের সাধনা উল্টো। সংসারে মানুষ আমিকে কেন্দ্র করে চলে—সন্ন্যাসে অর্থাৎ উচ্চ জীবনে ভগবানকে কেন্দ্র করে...। সংসারে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ আমির জন্য থেকে চাওয়া হয়—ভগবান তার সহায়ক। এখানে আমাকে কেন্দ্র করেই সাধনা—আমারই জন্য ধর্ম বা মোক্ষ প্রয়োজন। কিন্তু যে সন্ন্যাসের কথা আমি বারবার বলছি সেখানে 'আমি'-র প্রয়োজনে কিছুর প্রয়োজন নাই,—ভগবানকে চাই, তাঁর সেবা করতে চাই—তাঁর প্রয়োজনই আমার প্রয়োজন।...নিত্যগোপাল বলেছেন, সুন্দর বৃক্ষ যদি লাভ হয়, তবে তার ফল তো পাবেই।...রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ঘোমটা করে যদি একবার রাজার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তবে আর চাইতে কিছু হবে না।...একান্ত হলে কোন কিছুরই চাইবার দরকার নাই...। জৈমিনীর কর্ম-মীমাংসা মতে ঈশ্বরে ফিরে আমার ধর্ম মোক্ষ পাইবার নেই—তিনি আমার অঙ্গ, কর্মের অঙ্গ।...নিত্যগোপাল বলেছেন, তিনি ধর্ম, তাহলে তাঁকে পেলে কি আর ধর্ম পেতে আটকাবে ...সংসার ছেড়ে আজ অনেক দূর এসে গেছি,...নিত্য গোপাল, তুমি মূল...তুমি মূর্তিমান ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ' তস্মিন্ জ্ঞাতে সর্বমেবম্ জ্ঞাতম্, যৎ লব্ধা নাপরম্ তোমার নামরূপের সাগরে পুরুষোত্তমানন্দের নামরূপ ডুবে যাক...। আমার ছোট আমির ধর্ম অর্থ বুদ্ধি বিচার নিয়ে আমি ক্লান্ত—আমি তোমায়।...আমিকে কেন্দ্র ক আমার সব কিছু ভুল, আমি তোমার বিচারে বিচারিত হব—আমার মন তুমি লও, আমার বুদ্ধি তুমি লও। সন্ন্যাসের প্রথম স্বভাব সে দেখবে নিজের ভুল—দুনিয়ার ভুল সে দেখবে না।...আমি যে কেবল, আমি মানুষ, আমি শরণাগত; নিত্যগোপাল, পুরুষোত্তমানন্দ তোমার ছায়া।...কৃষ্ণ ছায়া-স্বরূপিণী ব্রজগোপীদের সঙ্গে যে করেছিলেন—নিত্যগোপাল, আমি তোমার ছায়া হব। জয়রাম, জয়রাম—ফিরে আসুক ঐ—ঐ সামনে—ঐ

তো ছিল না—তোমার আমাকে নিবেদন করার জন্য আছি—মাথা নত করে রাখ হে তোমার চরণধূলার পরে···।

২৯. ১. ৪৬।···শ্রীনিত্যগোপাল পরম ভগবান (এই আত্মধ্যান পঠিত হয়)···এই লেখাটি যার—তিনিই নয়নাভিরাম আশ্রমের দেবতা—তিনি আমার গুরু ও ইষ্ট। ···আজ এই সন্ধ্যায় আশ্রমেতে একজন উপস্থিত হয়েছে, তার নাম নারায়ণ শৈল (হরিপালেরবাসী একজন উদ্বাস্তু —১১ নং)—আশ্রমের পক্ষ থেকে তাকে আমি স্বাগত জানাই।···৪৫০ বছর আগের মহাপ্রভু আবার নিত্যগোপালরূপে আবির্ভূত হয়েছেন···ভবিষ্যিষ্কির বাঞ্ছিত ধনকে সোনা ভগতে ঢেলে দিয়ে গেছেন।··· যাদের ধর্মে অধিকার ছিল না, পুরোহিতদের মারফত যাদের ভগবান পেতে হত, মহাপ্রভু সেই তাদের ঘরে আপামরে ভগবানকে বিলিয়ে দিয়ে গেলেন; ব্রহ্মকে যেমন দিলেন, পণ্ডিতকে যেমন দিলেন, তেমনি হরিভক্তে দিলেন, পতিতকে দিলেন।···গৌর ব্রহ্মলোকের ঠাকুর নয়—তিনি হরিনাম দিয়া ভুবন গোধিলেন—হরিনাম নিলাম অথচ আমার জীবন শুদ্ধ হ'ল না, আমার জীবনে বিন্দু শ্রদ্ধা জাগ্রত হল না—আমার কথা আমার ব্যবহার মানুষকে পীড়ন করে·· তাহলে তো চিত্ত শুদ্ধ হল না···ভগবানকে যত ভালবাসব, ভগবান ততই আমার বুকে নেমে আসবেন, হরির সঙ্গে লেগে থেকে তোমরা হরি বলে যেয়ো—হরির সঙ্গে যেন তোমাদের বনিবনা হয়···কৃষ্ণ-কীর্তনের ফলে যেন তোমাদের সকল সত্তা স্নান করে ওঠে···শুচি শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে, শুচি শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে।।····· ব্রাহ্মণ বলেই আজ কেউ বড় নয়—চরিত্রদ্বারা বড় হতে হবে—জীবনের আচরণ দিয়ে তাঁর পূজা করতে হবে, মুখে নয়···। নিত্যগোপাল, আমি শরণাগত, শরণাগত···। আমার সকল বৃত্তি দিয়ে আমি তোমায় বরণ করব···তুমি আসিবে আমার জীবনে, আমি যাইব তোমার জীবনে···। আজ শোষিত মানুষ তোমায় চায়।···নিত্যগোপাল সকলের জন্য এসেছেন···। নিত্যগোপাল ব্রজগোপাল, হরিগোপাল, কৃষ্ণগোপাল, গৌরগোপাল। নিত্যগোপাল তোমার জয় হউক···সর্বত্র তোমার জয় হউক।

১. ১০. ৪৬।···শ্রীনিত্যগোপালের যে আত্মধ্যান পড়া হল তাতে তিনি নিজের পরিচয় নিজে দিয়ে গেছেন। ভক্তরা ভগবানের ধ্যান লেখে—কিন্তু নিত্যগোপাল নিজের ধ্যান নিজে দিলেন।···এতকাল ভক্ত ভগবানের ধ্যান করেছে বলে হয়ত সত্যিকারের পূজা হয় নি, তাই বুঝি নিজের পরিচয় তিনি নিজে রেখে গেলেন। নিজেকে তিনি নিজে প্রকাশ না করলে সাধ্য কি মানুষ তাঁকে প্রকাশ করে? (আত্মধ্যানখানি আবার পাঠ করা হয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করেন, সেগুলি আর লেখা হয় না।)

২. ১০. ৪৫।···যে যাকে ভালবাসে তার রূপগুণ এবং কর্ম তাতে দ্যোতিত হয়। এই হল ভালবাসার পরীক্ষা। নিত্যগোপাল আসার পর থেকে সাধন-পথ বদলে গেছে। এ সংসারে যাই করি না কেন—ভগড়াই করি, হিংসাই করি—নাম জপ করলেই ভগবদ্‌লাভ ছিল এতদিনকার কথা। নিত্যগোপাল বললেন, নাম জপের সঙ্গে প্রকৃতি বদলাতে হবে।···তিনি তো শুধু রূপে সুন্দর নন—চালচলনে, ব্যবহারে, কথায় বার্তায় সবটাতে সুন্দর।·· নিত্যগোপাল আর কৃষ্ণ সবটাতে সুন্দর—কায়মনবাক্য পুরুষোত্তম ছাঁচে গড়ে তুলতে হবে।···আমার এখানে এসে যদি মনে করে থাক যে তোমার প্রকৃতি বদলাবে না, তবে এখান থেকে চলে যাওয়া ভাল।···তিনি শৃঙ্খলা, তিনি সামঞ্জস্য। আজকালকার শিশুদের বইতে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম, পরিবেশন করার ধরন, বাজার করার রকম—এ সব লেখা আছে; কেন? এত ছোট কাজও যে ব্রহ্মকাজ—সেইটাই ওর তাৎপর্যের কথা। তাই নিত্যগোপালের পথে এলে বদলাতেই হবে।···কালো বাজারের হিসাব মেলাতে পারেনি বলে নিত্যগোপাল তাকে হারামজাদা বলে গাল দিয়ে বলেছিলেন, ঠকবি কেন? হিসেব কেন মিলবে না—জান করে আসতিস আসতিস—কিন্তু হিসেব কেন মিলবে না?···জামাই আসলে ঘর গোছানো হয়, গোবিন্দ আসবেন, ঘরবাড়ী নিজের চরিত্র প্রকৃতি স্বভাব গুছাবে না? সংসার পাঠশালা জানত বলে এক ব্যক্তির মত গুছানোর কথা বলেছিল, কিন্তু যেখানে অনন্তকাল থাকব,

দেখানে কত গুছানো দরকার ?···বদলাও বদলাও—কথা বদলাও, ব্যবহার বদলাও, স্বভাব বদলাও, চালচলন বদলাও।···পরের দোষ দেখবে না এই মস্ত বড় সাধনা গ্রহণ কর।···নিতাগোপাল নূতন ধরণের সাধুত্বের স্বপ্ন শুনিয়েছেন। বিরাট জগতে একটা নূতন পরিবর্তন আসবে, সেই কথা জানাতে তোমাদের ডেকেছিলাম।··· জীবনে আর হয়তো আমার দ্বারা কিছু হবে না···মরবে হবে—নিতাগোপালের কাজ হবে।···নিতাগোপাল, তুমি যেমন করে চাইতে, আমি তেমন করে চাইব, তুমি যেমন করে খেতে আমি তেমন করে খাব। সুন্দর তুমি···আমার সব সুন্দর হোক—তুমি মধুর, তুমি মধুর—আমার সব মধুর হোক···। প্রমত্ত হয়ে অসতর্ক হয়ে জীবন-সাধনা ব্যর্থ করো না।···মানুষ তো এল না—একলাই হয়তো যেতে হবে··· তুমি সঙ্গী, তুমি সঙ্গী ··রাধারাণীর যেমন কানু ছাড়া গতি নাই, আমার তুমি ছাড়া গতি নাই ··তোরা তত নিজ পতি যায় দেবা মনে লয়···।

৩. ১০. ৪৬।···ভাগবত লিখেছেন যে একমনা না হলে ভক্তি লাভ হয় না। এক দিকে মন—দিগন্ত অনবলোকনম্। বাজারে যেতে এখানে দশ মিনিট, ওখানে পাঁচ মিনিট —এতে একমনা হয় না। কোন কাজ ছোট কাজ নয়—প্রত্যেক কর্ম ব্রহ্ম কর্ম। যতদিন সংসার ছিল মিথ্যা, কর্ম ছিল মিথ্যা, ততদিন যেন তেন প্রকারেণ কাজ করলেই হত। কিন্তু যারা এই সংসারকেই ব্রহ্মধাম ব্রহ্মধাম করতে চায়, তাদের খুব সাবধান হয়ে চলতে হবে। নরনারায়ণ আশ্রম কোন ক্ষুদ্র কল্পনা নিয়ে এখানে আসে নি—আমরা শাক্ত শৈব বৈষ্ণব, আমরা মুসলমান খ্রীষ্টান···। দাদরানি চাঁদ বলে যে ছেলে মুখস্ত করে বেড়িয়েছিল সে মার্বেল খেলে আর ঘুড়ি উড়িয়ে তার উদ্দেশ্য ভুলে গেছে। বাজার করা রান্না করা সবই প্রথমে তাঁর কাজ জ্ঞান করে করতে হবে।···দরিদ্র আমরা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও আমাদেরকেই করতে হবে।···তার কি প্রয়োজন···। নিজেদের আদর্শ, নিজেদের অবস্থা সব দিকে খেয়াল রেখে চলতে হবে··· তিনি গোঁজামিল দিতেন না, তিনি গল্প চড়াতেন, গল্পই চড়াতেন।···প্রত্যেক কাজের পিছনে ভগবানের সেবাই উদ্দেশ্য, না তোমার ইচ্ছা বা প্রয়োজন রূপ যান উদ্দেশ্য—দেখো। মানুষ সাধারণতঃ কিছু ভাবে না—কোনমতে দায় সারে ··নাম করছে, জপ করছে, কিন্তু মানুষের প্রতি এতটুকু ভালবাসা জমে না, মানুষের প্রতি বিদ্বেষ বিরক্তি অভিযোগ দূর হয় না···। এই তো নাম জপের অভিনয়···কিন্তু আমি কোনদিন অভিনয় করি নি—জীবনে যে কাজ করেছি সমস্ত প্রাণ দিয়ে করেছি,··· শ্রদ্ধা নিয়ে · একমনা হয়ে, কর্মকে ধ্যানের মধ্যে এনে করেছি ··· জপতপ তোমরা কর কিনা জানি না···কোন উৎসাহ নেই, উদ্দীপনা নেই—এরকম জীবন যাপন করতে নিতাগোপালকে রাখবে কেমন করে ?···নিতাগোপালকে বিশ্বসমাজকে নূতন করে গড়ে তোলা যায় কি করে সেই নিয়ে দিন রাত্রি আমার যে কী বেদনায় দিন যাচ্ছে—কি কৈফিয়ত নিতাগোপালের কাছে দেব···। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষ কাটিয়ে দেব, উচ্চবর্ণ নিম্ন বর্ণের মিলন ঘটাব··· নরনারায়ণ আশ্রম এই আদর্শ নিয়ে চলবে।···তোমাদের মধ্যে জ্বালার কোন লক্ষণ দেখছি না···মন্দ (dull), ঢিমে তিমে করে চলছে তোমাদের জীবন।···আমার নিতাগোপালের কথা ছাড়া কিছু ভাল লাগে না—কোন কথা ভাল লাগে না, খাওয়া ভাল লাগে না, কিছু ভাল লাগে না—তোমাদের নিয়েছিলাম তোমরাও বাঁচবে, তাঁকে বাঁচাবে।···বাঙ্গলাদেশে জন্মেছিলেন আর একটি মানুষ—তাঁর খাইতে সোয়াস্তি নাই, নিদ নাই চোখে···। সকলে উন্মাদ—পাগলা গৌর, পাগলা যীশু—যারা কিছু বলতে এসেছেন তাঁরাই পাগল ··। নিজের খাওয়া পরার ব্যবস্থা নিয়ে বেশ আছ যারা তারা চলে যাও—আমি যেন নেই নিতাগোপালকে—নিতাগোপাল-তত্ত্বকে নিজের জীবনে ও সংসারে প্রতিষ্ঠিত করব—এই আমার জীবন-সাধনা।··· আমি অভিনয় করতে আসি নি—বাস্তব জ্ঞান, বাস্তব কর্ম বাস্তব ভক্তি আমি প্রতিষ্ঠা করতে এসেছি··· এত দুঃখ কিসের—এর মধ্যে যদি জীবন জাগ্রত না হয়ে ওঠে তবে আর কবে হবে, কিসে হবে ?··· ক্রমশ

দাস রঘুনাথ

॥ অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

বৈষ্ণব সমাজে যে ছয়জন গোস্বামীর পবিত্র নাম অতি পরিচিত তাঁরা হলেন—শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট এবং শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী। শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রবর্তিত প্রেমধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এঁরাই করেছিলেন। শুধু বৈষ্ণব সমাজ নয় হিন্দু মাত্রেই তাই ছয় গোস্বামীকে অতি ভক্তির সহিত স্মরণ করে। এঁরা সকলেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগুরু, তাই তিনি লিখলেন—

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
তাঁ সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার॥

ব্রজ ভাবের সাধন-ভজন প্রণালীতে এঁদের অসাধারণ প্রভাব। তাই আজও নামসংকীর্তনের সময় শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের নিম্ন-লিখিত পদ গীত হয়।

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোঁসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাঁহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥
তাঁদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ॥
এই ছয় গোঁসাঞি যবে ব্রজে কৈল বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদে করি আশ।
নাম সংকীর্তন করে নরোত্তম দাস॥

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী চরণকে যথাশক্তি স্মরণ করলাম।

শ্রীরঘুনাথ দাসের আবির্ভাব স্থান সপ্তগ্রাম, হুগলি জেলায় ত্রিবেণীর নিকট। তৎকালীন বঙ্গদেশে সপ্তগ্রাম ছিল সমগ্র ভারতের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এই সপ্তগ্রামের প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস। সপ্তগ্রাম চাকলা (এলাকা) বহু বিস্তৃত এই বিশাল জমিদারীর আয় তখনকার দিনে বার লক্ষ টাকা। হিরণ্যদাসের কোন সন্তান ছিল না। গোবর্দ্ধন দাসের একমাত্র সন্তান রঘুনাথ দাস এই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী।

বিষয়সেবীদের গৃহে আবির্ভূত হলেন কৃষ্ণমুখী শ্রীরঘুনাথ, সুতরাং বাল্যাবধি তিনি বিষয়ে অনাসক্ত। শ্রীচৈতন্যদেবের অপূর্ব ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মহিমা রঘুনাথের কিশোর হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছিল, ফলে এই হ'লো যে তিনি কিছুতেই সংসারে মন দিতে পারলেন না, ভাবলেন সংসারমুক্ত স্বাধীন বিহঙ্গের কী আনন্দ। পিতা-জ্যেঠা তাঁদের একমাত্র বংশপ্রদীপ রঘুনাথের বিবাহ দিলেন, কিন্তু কোন ফল হ'ল না। অতুল ঐশ্বর্য, পিতা-মাতার অপরিসীম স্নেহ, সুন্দরী বধূর ভালবাসা প্রবল বৈরাগ্যের জোয়ারের মুখে তৃচ্ছ তৃণের মত ভেসে গেল। প্রভুর চরণে আশ্রয় নিবার জন্য গোপনে গৃহত্যাগ করলেন বহুবার কিন্তু জমিদারের কর্মচারিগণ তাঁকে ধরে আনল।

সন্ন্যাসের পর শ্রীমন্ মহাপ্রভু দুবার শান্তিপুর অদ্বৈতাচার্যের গৃহে এসেছিলেন। প্রথমবার দেখা হলে রঘুনাথ প্রাণের কথা প্রভুর চরণে নিবেদন করলেন। তাঁকে অনেক বুঝিয়ে গৌরসুন্দর বললেন—গৃহে ফিরে যাও, সংসারে অনাসক্ত হয়ে পিতামাতার সেবা কর আর অন্তরে অন্তরে ভগবানকে ডাক, সময় হলে তিনিই উপায় করে দেবেন। গৃহে ফিরলেও শ্রীচৈতন্য-চরণে রঘুনাথের মন পড়ে রইল।

এইভাবে কিছুকাল গত হলে তীব্র বৈরাগ্যের প্রেরণায় রঘুনাথ একদিন গোপনে আবার গৃহত্যাগ করলেন এবং প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য নীলাচলের পথে চলতে লাগলেন। বহু অনুসন্ধানের পর জমিদারের পাইক-পেয়াদারা রঘুনাথকে গৃহে নিয়ে এল। পিতামাতা আত্মীয়স্বজন তাঁকে অনেক বুঝালেন কিন্তু বিশেষ কোন ফল হ'ল না। বংশের একমাত্র সন্তান—অবশেষে তাঁকে প্রহরী বেষ্টিত করে রাখা হ'লো।

কানাইর নাটশালা (রাজমহল) হতে ফিরে প্রভু দ্বিতীয়বার শান্তিপুর এসেছেন। সেখানে প্রেমের বাজার বসেছে, নিত্য আনন্দোৎসব চলছে—এ সংবাদ রঘুনাথের কানে গেল। চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য তাঁর কাতর প্রার্থনায় পিতা প্রহরী সঙ্গে দিয়ে রঘুনাথকে শান্তিপুর আচার্যের গৃহে পাঠালেন। বিশিষ্ট ভক্তগণের সঙ্গে সেখানে রঘুনাথের পরিচয় হ'লো। তাঁদের প্রেম-ভক্তি, বিষয়ে বিতৃষ্ণা, দেহে দেহে অনাসক্তি দেখে রঘুনাথের বড় আনন্দ হ'লো। সুযোগ পেয়ে একদিন রঘুনাথ প্রভুর চরণে লুণ্ঠিত হয়ে আবার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করলেন। রঘুনাথের বিষয়-বৈরাগ্য দেখে শ্রীচৈতন্যদেব প্রসন্ন হলেও উপস্থিত গৃহত্যাগ করতে তাঁকে নিষেধ করলেন এবং বললেন—

স্থির হইয়া ঘরে যাও না হইও বাউল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল॥
মর্কট বৈরাগ্য না করিও লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥
অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনে রঘুনাথের মন অনেকটা শান্ত হ'লো। বিদায় বেলায় প্রভু তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন—আগামী বৎসর বৃন্দাবন হতে নীলাচল ফিরলে তুমি দেখা করো। ভক্তগণের সাথে প্রভুর চরণধূলি মাথায় নিয়ে রঘুনাথ সাশ্রুনয়নে ফিরে এলেন।

বিষয়ে অনাসক্ত হয়ে রঘুনাথ গৃহধর্ম পালন করতে লাগলেন। তাঁর ভাবান্তর দেখে পিতামাতার বড় আনন্দ হ'ল। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে রঘুনাথের আর কোন বাধা রইল না। বাহ্যতঃ বিষয় কর্মে লিপ্ত হলেও রঘুনাথের মন কিন্তু প্রভুর চরণ ধ্যান করতে লাগলেন।

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মসু
তমেবাস্বদয়ত্যন্তঃ পরাদঙ্গ রসায়নম্॥

অসতী নারী স্বামীর গৃহে কাজকর্মে ব্যাপৃতা থেকেও অন্তরে নিরন্তর উপপতির সঙ্গসুখের রস আস্বাদন করে, সেইরূপ সংসারের কাজ কর্মের মধ্যে ভগবানের দিকে সর্বদা মন ফেলে রাখা প্রয়োজন। এই উপদেশ শ্রীমৎ মহাপ্রভু একদিন পত্রদ্বারা নবাব সরকারের উচ্চ কর্মচারী সনাতনকে লিখেছিলেন।

ঠিক এই সময় প্রভুর আদেশে দয়াল নিতাই বঙ্গদেশে আচণ্ডালে হরিনাম বিতরণ ও ভক্তিধর্ম প্রচার করেছিলেন। এই ভাবে প্রেমধর্ম প্রচার জন্য তিনি পানিহাটির বিশিষ্ট ভক্ত রাঘব পণ্ডিতের গৃহে এসেছেন। হরিনাম সংকীর্তনে পানিহাটি মুখর—দেশ দেশান্তর হতে শত শত ভক্ত পরম দয়াল নিতাই চাঁদের প্রেমের বাজারে জড় হয়েছেন সংবাদ পেয়ে রঘুনাথ নিত্যানন্দ দর্শনে ব্যাকুল হলেন। পিতামাতার অনুমতিক্রমে একদিন রঘুনাথ পানিহাটির গঙ্গাতীরে বিশাল বটবৃক্ষ মূলে আসীন পরমপ্রেমিক নিত্যানন্দের চরণ-প্রান্তে পতিত হলেন। দয়াল নিতাই তাঁকে প্রেমালিঙ্গন দিয়ে স্নেহমধুর কণ্ঠে বললেন—চোর তুমি বার বার গৃহত্যাগ করে পালিয়ে যাও আর ভক্ত সঙ্গে প্রেমাস্বাদ কর, সেজন্য আজ তোমাকে দণ্ড দিব। কৃতাঞ্জলি হয়ে রঘুনাথ দণ্ড প্রার্থনা করলেন। নিত্যানন্দ বললেন—

নিকটে না আইল মোর ভাগে দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছি, দণ্ডিব তোমারে॥
দধি চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনিয়া আনন্দ হইল রঘুনাথ-মনে॥

এই দধি চিঁড়া মহোৎসবের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। নমুনাস্বরূপ একটু উদ্ধৃত করছি। রঘুনাথ ধনীর সন্তান—জনবল-ধনবলের কোন

অভাব ছিল না।

সেই ক্ষণে নিজ লোক পাঠাইল গ্রামে।
ভক্তশ্রেষ্ঠ লোক সব গ্রাম হইতে আনে॥
চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা।
সব দ্রব্য আনাইয়া চৌদিকে ধরিলা॥
মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
আসিতে লাগিলা লোক অসংখ্য-গণন॥
আর গ্রামান্তর হৈতে সামগ্রী আনিল।
শত দুই চারি ডোলনা আনাইল॥
* * *
এক ঠাঞি শুদ্ধ দুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া।
অর্দ্ধেক ছানিল দধি চিনি কলা দিয়া॥
অর্দ্ধেক ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধেতে ছানিল।
চাঁপা কলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল॥

নির্দিষ্ট দিনে সেই বটবৃক্ষ মূলে মহোৎসব আরম্ভ হ'ল, পবিত্র হরিনামে গঙ্গাতীর কম্পিত, পানিহাটি পল্লী পবিত্র হ'ল। দই-চিড়ার বিরাট ভোগ শ্রীভগবানকে নিবেদিত হ'লে প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হ'ল। গঙ্গাতীরে অপূর্ব দৃশ্য—বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পুলিন ভোজন লীলার কথা ভক্তগণের মনে উদয় হ'ল।

হরি হরি বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন।
পুলিন ভোজন-লীলা হইলা স্মরণ॥

মেলায় যারা মিষ্টান্নাদির দোকান পেতেছিল, তাদের সমস্ত পসরা রঘুনাথ উপযুক্ত মূল্যে কিনে নিয়ে পথাগতগণকে তৃপ্তি করে প্রসাদ খাওয়ালেন। উৎসবান্তে রঘুনাথ সমাগত সাধু সজ্জন ভক্তগণকে যথাযোগ্য প্রণামী দিয়ে সম্মানিত করলেন, রাঘব পণ্ডিতকে শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য বহু অর্থ দিলেন। পরম দয়াল নিতাইচাঁদ রঘুনাথকে আশীর্বাদ করে বললেন—

তুমি করাইলে এই পুলিন ভোজন।
তোমার কৃপা গৌর কৈল আস্বাদন॥
* * *
নিশ্চিন্ত হইয়া যাও আপন ভবন।
অচিরে নির্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য-চরণ॥

এই মহোৎসবে ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, উচ্চ-নীচ, দীনদুঃখী অনাথ-আতুরে কোন ভেদ ছিল না। দয়াল নিতাই সকলকেই প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করলেন। কলি-কালের মহাযজ্ঞ নাম সংকীর্তন এই ভাবে সমাপ্ত হলো। রঘুনাথকে দণ্ড দিবার জন্য নিতাইচাঁদ এই দই-চিড়া মহোৎসবের আয়োজন করিয়েছিলেন। সেই পুণ্যস্মৃতি বহন করে আজও প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে পানিহাটিতে দণ্ডমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

পানিহাটির মহোৎসব হতে রঘুনাথ গৃহে ফিরলেন বটে কিন্তু তাঁর বৈরাগ্য তীব্র হতে তীব্রতর হ'ল। শয়নের জন্য অন্দর মহলে যাওয়া বন্ধ হ'ল, বাহির মহলে চণ্ডী-মণ্ডপে আশ্রয় নিলেন। বিষয় কর্মে উদাসীন রঘুনাথ সর্বদাই ঈশ্বর চিন্তাতে মগ্ন। পুত্রের ভাবান্তর দেখে ঔদ্বিগ্ন জননীকে পিতা বললেন—

ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য স্ত্রী অপ্সরা সম।
এসব বান্ধিতে নারিলেক যার মন॥
ষড়িপু বন্ধনে তারে রাখিব কেমতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডিতে॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হয়েছে ইহারে।
চৈতন্য প্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে॥

সপ্তগ্রামের বিশাল জমিদারী নিয়ে নবাবের সঙ্গে বিষয় বিরোধ উপস্থিত হ'ল হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের। গ্রেপ্তারের ভয়ে দুই ভাই ফেরার। নবাবের সৈন্য রঘুনাথকে বেঁধে নিয়ে গেল। বিষয়-নিস্পৃহ রঘুনাথ বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। শেষ পর্যন্ত রঘুনাথের চেষ্টায় উভয় পক্ষের বিবাদের একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হ'ল, বাপ জ্যেঠা সপ্তগ্রামের জমিদারিতে বহাল হলেন। এই ঘটনার পর রঘুনাথের উপর পিতামাতা জ্যেঠা-জেঠীর স্নেহ আরও প্রগাঢ় হ'ল।

এদিকে বৃন্দাবন হতে প্রভু নীলাচলে এসেছেন। রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তগণ পুরী যাবেন—তার প্রস্তুতি চলছে। প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য রঘুনাথ গভীর নিশীথে গৃহত্যাগ করলেন। রাজৈশ্বর্যে পালিত যুবক ঈশ্বর লাভের ব্যাকুলতায় সর্বস্ব ত্যাগ করে নীলাচলের পথে অগ্রসর হলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণের সাথে নয়, ভিন্ন

পথে, গোবর্দ্ধনের হতে দূর পথে চলতে লাগলেন।

বার দিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিন দিন মাত্র করিলা ভোজন।

অনশনে অর্দ্ধাশনে পুরী পৌঁছেই রঘুনাথ শ্রীচৈতন্য-দেবের চরণে দণ্ডবৎ পতিত হ'লেন, রঘুনাথের জীবন ধন্য হ'ল।

রঘুনাথকে পেয়ে প্রভুর আনন্দের সীমা নেই কিন্তু পথশ্রমে অনাহারে তার ক্ষীণ দুর্বল দেহ দেখে বড় দুঃখ হ'ল।

রঘুনাথের ক্ষীণতা মলিন দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহে কৃপা-আর্দ্রচিত্ত হইয়া॥
এই রঘুনাথ আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্র-ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥

প্রভুর আদেশ স্বরূপ দামোদর মাথা পেতে নিলেন। সেদিন থেকে রঘুনাথের নাম হ'ল 'স্বরূপের রঘু'। তারপর সেবক গোবিন্দকে প্রভু বললেন—পথশ্রমে এবং উপবাসে রঘুনাথের দেহ ক্ষীণ, শীঘ্র যাতে এর দেহ সুস্থ হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখ।

পথে ইহঁ করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন।
কতদিন কর ইহায় ভাল সন্তর্পণ॥

প্রভুর নির্দেশ মত গোবিন্দ রঘুনাথের কয় মাস উপবাসের জন্য তার আহারের দিকে মনোযোগ দিলেন। কিন্তু পাঁচদিন পর গোবিন্দ প্রভুকে জানালেন—রঘুনাথ আর আমার কাছে আহার করেন না। সমস্ত দিন আপন কুটীরে সাধন-ভজন করেন। রাত্রে শ্রীজগন্নাথের রাজ সেবা পুষ্পাঞ্জলি দেখে সিংহদ্বারের পাশে নীরবে নাম জপ করেন, কেহ কিছু ভিক্ষা দিলে তা দিয়ে জীবন ধারণ করেন। রঘুনাথের কঠোর বৈরাগ্যের সংবাদ শুনে প্রভু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন—

বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য সিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
* * *
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

প্রভুর সঙ্গে কথা কইতে রঘুনাথের সাহস হ'ত না অথচ নিজের সাধন ভজন সম্বন্ধে শ্রীমুখের কিছু উপদেশ লাভের জন্য তার অদম্য পিপাসা। রঘুনাথের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা স্বরূপ জানতেন, তাই একদিন সুযোগ বুঝে রঘুনাথের প্রাণের কথা প্রভুকে জানালেন। মৃদুহাস্যে প্রভু বললেন—রঘুনাথ, সাধ্য-সাধন তত্ত্ব আমি বিশেষ কিছু জানি না, আমাপেক্ষা স্বরূপ বেশী জানেন, তুমি তাঁর কাছে শিক্ষা কর, ক্রমশঃ সবই জানতে পারবে।

সাধ্য-সাধন তত্ত্ব শিখ ইঁহার স্থানে।
আমি ত নাহি জানি ইঁহা তত জানে॥

স্বরূপের ইঙ্গিতে রঘুনাথের সাহস হ'ল, করজোড়ে মিনতি করে বললেন—আপনার নিকট কিছু উপদেশ শুনতে ইচ্ছা করে। তখন ধীরে ধীরে শ্রীমুখ হতে উচ্চারিত হ'ল বৈষ্ণব ধর্মের মর্মকথা।

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণ নাম লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন দেহে-গেহে আত্মবুদ্ধি, যশ-মান-প্রতিষ্ঠা—সাধারণ মানুষ এই সব নিয়ে সংসার জীবন যাপন করে। এই সব আলোচনায় যোগদান ইষ্ট লাভের পথে প্রবল অন্তরায়। ভাল খাওয়া-পরার দিকে মন দিলে অহঙ্কার বৃদ্ধি পায়, কামক্রোধাদির বেগ প্রবল। আমি দীনহীন, তৃণগুচ্ছ হতেও তুচ্ছ—কিন্তু নাম ব্যক্তিকেও সম্মান দিতে হবে।

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয়॥

বিপুল বৈভবের মধ্যে পালিত যুবক রঘুনাথের শুরু বৈরাগ্য, সাধন-ভজনে একান্ত নিষ্ঠার তুলনা মিলল। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী লিখলেন—

অদ্ভুত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥

* * *

বৈরাগ্যের কথা তাঁর অকথ্য কথন।

আজন্ম না ছিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন।

শেষ জীবনে রঘুনাথ ও কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডে এক সঙ্গে বাস করেছিলেন। প্রভুর অন্তরঙ্গলীলার নিগূঢ় রহস্য স্বরূপ দামোদর তাঁর প্রিয়তম রঘুনাথকে আস্বাদন করিয়েছিলেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী রঘুনাথের কৃপাতেই গম্ভীরালীলার রহস্যময় কথা জেনেছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাই তিনি বার বার দাস রঘুনাথের চরণে প্রণাম নিবেদন করেছেন।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

প্রাচীন সাহিত্য পাঠের মূল্যায়ন

শ্রীশঙ্কর নাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন সাহিত্য বলিতে আমরা বুঝি বেশ কয়েক শত বৎসর পূর্বের সাহিত্যকে। প্রাচীন পিতামহের সহিত পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত পৌত্রের যেরূপ আকৃতিগত পার্থক্য থাকে, তদ্রূপ আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের সহিত বিংশ শতাব্দীর আধুনিক সাহিত্যের রূপগত দুস্তর ব্যবধান বিদ্যমান। রূপের সহিত সাদৃশ্য না থাকিলেও বৃদ্ধ পিতামহকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করা যেরূপ মানবকর্তব্য, ঠিক সেইরূপ আদিযুগের ও তৎপরবর্তী যুগের সাহিত্যকে যথাযথ মর্যাদাদান করা সাহিত্য-রস-পিপাসুদের একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় আমরা যদি প্রাচীন সাহিত্যকে দূরে সরাইয়া রাখি, তবে আমাদের আধুনিক সাহিত্যের পূর্ণতর উন্নতি সাধিত হইবে না। কারণ, কোন দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্যক্‌রূপে জানা না থাকিলে ও পড়া না থাকিলে ঐ দেশের অধিবাসীগণ আপনাদের সমষ্টিগত উন্নতি সাধনে অকৃতকার্য হন। প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য সুচারুরূপে জ্ঞাত হইলেই তবে সেই ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে স্বতঃপ্রয়াসী হওয়া যায়। পূর্বের ঐতিহ্যের সহিত বর্তমানের নব-নবায়মান সুকীর্তি, জ্ঞানসীমার পরিধিবৃদ্ধি, কুসংস্কারমুক্ত মনন, যৌক্তিক ভক্তিবাদ প্রভৃতি যুক্ত হইলেই তবে উন্নতি সম্ভবে। ধন-সম্পত্তির কথা ছাড়িয়া বলি। নিজ পিতামহের গচ্ছিত ধনৈশ্বর্য আমরা কেহই অবজ্ঞা করিয়া ফেলিয়া রাখি না। সকলেই চেষ্টা করিয়া থাকি কী করিয়া সেই পৈতৃক সম্পত্তিকে আরও বৃদ্ধি করা যায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমাদের কর্তব্য আমাদের পূর্বপুরুষগণ আমাদের জন্য যে মহামূল্যবান রচনাসম্ভার রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা শান্ত মস্তিষ্কে, উদার মনোভাব লইয়া বিচার করিয়া দেখা। সেই বিচার করিতে হইলে তৎপূর্বে প্রাচীন সাহিত্য পাঠ-জনিত ক্লান্তিটুকু অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, এতদ্ব্যতীত 'নাস্ত্যন্যথা'।

পৃথিবীর সকল দেশেই মূলতঃ ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া সকল প্রকার সাহিত্যের সৃষ্টি। আমাদের দেশেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। প্রাচীন সাহিত্য হিসাবে যে নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা 'চর্যাপদ'। কেহ কেহ বলেন, 'আশ্চর্য চর্যাচয়' বা চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। চর্যাপদ লিখিত হইয়াছিল বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণকর্তৃক। প্রায় দশম শতাব্দী এই পদগুলির রচনাকাল। বাঙ্গালা ভাষার তখন শৈশব-কাল। তবুও এই সময়ে যে পদগুলি বিভিন্ন সিদ্ধাচার্যগণ রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে সাহিত্যের মূল সুরটি ধ্বনিত হইয়াছিল। তাহা বাস্তব জীবনের সুখ বীণার সুর। আর সেইদিন এই সুরেই বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ দেবতার বন্দনা গান গাহিয়াছিলেন, জানাইয়াছিলেন প্রাণের আকুতি।...

প্রাচীন সাহিত্য পাঠের মূলতঃ কয়েকটি প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে—প্রথমতঃ জ্ঞানলাভ, দ্বিতীয়তঃ আধুনিক

সাহিত্যের উন্নতি বিধান, তৃতীয়তঃ সাহিত্যের মূল সূত্র নির্ধারণ ও ব্যাকরণ অনুসরণ, সর্বশেষ দেশের গৌরব ও ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখা। কেহ কেহ প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করেন নিছক জ্ঞানলাভ, কৌতূহল নিবৃত্তি ও আনন্দের জন্যে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বয়োবৃদ্ধগণই এই কারণে প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করেন। আধুনিক সাহিত্য হয় তাঁহারা পছন্দ করেন না, আর না হয়তো তাহা তাঁহাদের জ্ঞান-সাগরে অবগাহন করিতে সাহায্য করে না। অনেক প্রাচীন-প্রাচীনা মনের ধর্মের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করেন, এবং পাঠ করিয়া শুনান। এই ক্ষেত্রে জ্ঞানলাভের প্রশ্ন উঠে না। মনের ধর্মভাব নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে যেটুকু জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকে অতিরিক্ত প্রাপ্তি বলা যাইতে পারে। তবে এমন পাঠকেরও কতকগুলি সুফল পাওয়া যায়। পরিবারের বয়োবৃদ্ধদের নিকট হইতে অপরাপর সকলেই কিছু কিছু পুরানো দিনের কাহিনী শুনিতে পায় ও জানিতে পারে। আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করিতেও অনেককে দেখা যায়—জ্ঞানলাভ ও প্রয়োজনের তাগিদই এখানে বড় কথা। ইহাতে উভয়ের পার্থক্য সহজেই অনুমেয় হইয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ আধুনিক সাহিত্যের উন্নতি বিধানের জন্য মনঃসংযোগ সহকারে প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করা অত্যাবশ্যক। আমরা যদি আপন আপন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে চাই, তবে আমাদের বংশের ও পিতৃ-পিতামহের সম্যক্ পরিচয় অবগত হইতে হইবে। কি বংশে, কি পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহা যদি আমরা না জানিলাম, তবে উন্নতির কথা চিন্তা করিব কীরূপে? বংশ পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঐতিহ্য সম্বন্ধেও সুবিদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পিতৃ-পিতামহের পরিচয় না থাকিলে যেমন কাহারও সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনই জাতির ঐতিহ্য না থাকিলে তাহার মর্যাদা হানি ঘটে। ব্যষ্টিগত ভাবে ইহা যেমন প্রযোজ্য, সমষ্টিগত ভাবেও ইহার সেরূপ বিশেষ গুরুত্ব আছে। কোন ব্যক্তি যদি জাতীয়তাবোধ-শূন্য হন, তাহা হইলে তাঁহাকে আত্মমর্যাদার জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। এই বিষয়ে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের মতটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—'A people that could feel no pride in the past, in its history... had lost the mainstay of its national character'। জাতির ঐতিহ্য জানিতে হইলে তাহাকে তাহার প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করিতে হইবে। সাহিত্য বাস্তব জীবনের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। সাহিত্যকে জানিতে পারিলে তৎকালীন সমাজের জীবনযাত্রার বিষয়ও জানা যাইবে। বর্তমান সাহিত্যের অর্থাৎ আধুনিক সাহিত্যের উন্নতি বিধানের জন্য প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করিতে হইবে। প্রাচীন সাহিত্যের বিবিধ গ্রন্থীয় গুণগুলি, আঙ্গিকগুলি ও গভীর অন্তর্মুখী চিন্তাগুলি যদি আধুনিক সাহিত্যে গ্রহণ করা যায় তবে আধুনিক সাহিত্য অল্পকালের মধ্যে অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করিবে। আবার প্রাচীন সাহিত্যের বিভিন্ন ধরণের দোষ ত্রুটিগুলি যদি আধুনিক সাহিত্যে স্থান দেওয়া না হয়, তাহা হইলেও আধুনিক সাহিত্য সর্বদিকে উন্নত হইবে—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই সকল দোষ ত্রুটি ও গুণাবলীর বিচারের পূর্বে প্রাচীন সাহিত্য মনোনিবেশ পূর্বক পাঠ করা প্রয়োজন। দিন চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন ধারণের উপায়ও বদলিয়া হইতেছে। রুচি পরিবর্তিত হইতেছে—সাহিত্যের রূপও পরিবর্তিত হইতেছে। আগের দিনে ধর্মভাবের যে কথা শুনিতে, পড়িতে ভাল লাগিত, আজ তাহা যদি কেহ সুন্দর সুন্দর যুক্তির দ্বারা, সহজ কথায়, অল্প সময়ে বুঝাইয়া বলেন বা লেখেন, তাহা পূর্বের ন্যায় পড়িতে শুনিতে ভাল লাগিবে। আবার প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করিয়া তাহার বিষয় বস্তুকে যদি আজিকার সহজ ভাষার সাহায্যে ছোট ছোট বাক্যে প্রকাশ করা যায়—তবে তাহা যে পাঠকের মনোরঞ্জন করিবে, একথা বিনাদ্বিধায় বলা যাইতে পারে। এতদ্ সত্ত্বেও আধুনিক কালের কেহ কেহ প্রাচীন সাহিত্যকে নিতান্তই অবজ্ঞা করিয়া দূরে সরাইয়া রাখেন—তবে তাহার বিচার নিষ্প্রয়োজন।

তৃতীয় প্রয়োজন মূল সূত্র আহরণ ও ব্যাকরণ অনুসরণ

প্রাচীন সাহিত্যে যে প্রকৃত জ্ঞান-গভীর ও অন্তর্মুখী আলোচনা আছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কোন দেশের কোন সাহিত্যই তৎপূর্বের সাহিত্যের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্নরূপে গণ্য হইতে পারে না। এক্ষেত্রে সকল যুগের সকল সাহিত্যই পূর্ববর্তী সাহিত্যের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। মহৎ সাহিত্য মাত্রেই তাহা যুগোত্তীর্ণ। তাহার আবেদন সকল যুগে, সকল কালে। আজিকার আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে প্রাচীন সাহিত্যের অবস্থানকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। প্রাচীন সাহিত্যের মূল সূত্রগুলি আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে আজ অনুসৃত হইতেছে। ভাষার ও ভাবের সরলীকরণের দ্বারা বিষয়-বস্তুর রুচিসম্মত রূপদান করিয়া আধুনিক সাহিত্য পাঠকের মনোরঞ্জন করিতেছে সত্য, কিন্তু তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে প্রাচীন সাহিত্যের সুস্পষ্ট ধারণা, চিরন্তন আবেদন ও চিন্তাশক্তির মূর্ত বিকাশ। প্রাচীন সাহিত্য পাঠব্যতিরেকে সেই সকল বিষয়ের সূত্র নির্ধারণ সম্ভবপর নহে। ব্যাকরণের সূত্রগুলি জানিতেও প্রাচীন সাহিত্য পাঠের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। আজিকার ব্যস্ততার দিনে সেই দুর্বোধ্য ব্যাকরণকে সরল করিয়া আধুনিক সাহিত্যে গ্রহণ করা হইতেছে। পূর্বের সূত্রগুলি না জানিলে সেইগুলিকে সহজ করাও যাইবে না।

সবশেষে বলা যাইতে পারে যে, দেশের অতীত গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে ও প্রাচীন ঐতিহ্যকে অম্লান রাখিতেও প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। সমগ্র দেশকে যদি বর্তমানের চিন্তাধারা, কীর্তিকলাপ ও বর্তমান সাহিত্য দিয়া বিচার করা হয়, তবে তাহাতে দেশের প্রাচীন গৌরব ও ঐতিহ্য অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হইবে। তৎকালীন সামগ্রিক চিন্তাধারার গভীরতা, কীর্তিকলাপ, সামাজিক ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলির সমন্বিতরূপ দেখা যাইবে প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে। অতীতকে বাদ দিয়া বর্তমান এবং বর্তমানকে বাদ দিয়া ভবিষ্যৎ কোনোটিকেই পূর্ণাঙ্গরূপে দেখা যায় না। ইহারা পরস্পর আপেক্ষিক। সাহিত্য যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। যুগ-রুচি অনুযায়ী পরিবর্তিত হইলেও পূর্বের সাহিত্যের সহিত পরবর্তী কালে রচিত সাহিত্যের একটি বিশেষ সামঞ্জস্য থাকে—তাহাকে অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক সাহিত্যে যাহা পাই—তাহা যে 'অভিনব' একথা বলা যুক্তি-যুক্ত নহে, কারণ, ইহা প্রাচীন সাহিত্যেরই সংস্কার সাধিত, মার্জিত, সরলীকৃত রূপ। আর সেই সংস্কার সাধন চিন্তার ক্ষেত্রে, প্রকাশের ক্ষেত্রে ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে। আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যকে, অতীত গৌরবকে যাহাতে সাহিত্যে সর্বপ্রকারে সযত্নে বজায় রাখা যায়, আমরা তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিব। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্য পাঠ না করিয়া কীরূপে সেই ঐতিহ্যকে, সেই গৌরবকে জানিতে পারিব? পিতামহী-মাতামহীর মুখে দেশের প্রাচীন সাহিত্যের গল্প শুনিয়া তাহা যথার্থ পূর্ণাঙ্গরূপে জানা যায় না। আধুনিক সাহিত্য পাঠ করিতে করিতে ও ইহা রচনা করিতে করিতে কি সেই সুমহান্ আদর্শ মণ্ডিত, পূর্বসূরীদের রচিত বিশাল ভাবগভীর সাহিত্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিব? যিনি যথার্থ সাহিত্যরস-পিপাসু তিনি কদাচ এরূপ বিরূপ মনোভাব পোষণ করিবেন না। প্রাচীন ঐতিহ্যকে জানিয়া কি ভাবে সেই ঐতিহ্যকে সাহিত্যে বজায় রাখা যায়, আমাদের সেই চেষ্টা করিতে হইবে। ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে আমাদের শ্রম স্বীকার করিতেই হইবে—কারণ,—'Tradition cannot be inherited, and if you want it, you must obtion it by great labour'। উক্তিটি টি, এস, এলিয়টের। ইহা যে প্রণিধানযোগ্য তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

প্রাচীন সাহিত্য পাঠের বিভিন্ন মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোচনার উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেই হউক বা বাস্তব ক্ষেত্রেই হউক আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব লইয়া চলা। 'কাল যাহা পাইয়াছি তাহা মন্দ ও আজ যাহা পাইতেছি তাহাই সুন্দর'—আমাদের এরূপ মনোভাব ত্যাগ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, 'New is silver and old is gold'। আধুনিক সাহিত্যের খাতে প্রাচীন সাহিত্যের পবিত্র বিপুল জলরাশিকে প্রবাহিত করিতে পারিলে, সমগ্র জগৎবাসী তাহাদের সাহিত্যরস-পিপাসা দূর করিতে

পারিবে ও তাহাতে তাহাদের শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর হইবে। আজ আমাদের প্রধান কর্তব্য প্রাচীন সাহিত্য পর্যালোচনা করতঃ আধুনিক সাহিত্যের সহিত তাহার সমন্বয় সাধন করা। এই সমন্বয় যুগে যুগে হইয়া আসিতেছে। ইহা ব্যতিরেকে সামগ্রিক উন্নতির দ্বিতীয় পন্থা নাই। আজ মনে রাখিতে হইবে সেই একটি আদর্শ-মন্ত্র—'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৩—

(৪৪)

ওগো প্রাণ, মহাপ্রাণ, বিশ্বপ্রাণ, মাতরিশ্বা, তুমি static ব্রহ্মে অপঃ (রস) আধান কর, তাই ব্রহ্ম হন পুরুষোত্তম, সর্বরসকদম্বমূর্ত্তি। তোমার মাঝে সর্বেন্দ্রিয় সহিত মন তাহাদের সম্পদ উপহার দিয়া কৃতার্থ। তুমি জ্যেষ্ঠ, তুমিই শ্রেষ্ঠ। তুমিই ভাব ও রসের মধ্যে দখাবন্ধন আঁকিয়া দিয়াছ, জীব ঈশ্বর তোমার মাঝেই পরস্পরের সখা। তুমিই মনের মহানির্বাণ, সর্বেন্দ্রিয়ের মহানির্বাণ। আমার জীবনে প্রাণবন্যা রাধারাণী মথিত হইয়া আত্ম-প্রকাশ করুন। তাঁহার পরাশক্তির স্পর্শে আমার বিশ্বে অপরা প্রকৃতি জীবন্ত প্রকৃতিতে গড়িয়া উঠুক,···। রেণু দশটায় খাইয়া বাহির হইয়া যায়—ক্যালক্যাটা কেমিক্যাল, টীকা দিবার অফিস, বাটা, বেঙ্গল কেমিক্যাল, বার্মাশেল, ওয়াল্টার টম্পসন, গ্র্যাণ্টস্, হ্যানিম্যান প্রভৃতিতে যায়।··· আজ বারবার মনে হইতেছিল মামুদের হস্তে গোবিন্দ-সিংএর নিজ মারণাস্ত্র দিবার ঘটনাটি। প্রথম যাহা-দিগকে গোবিন্দসিং দীক্ষিত করেন, দীক্ষিত করার পর গোবিন্দসিং তাঁহাদের দ্বারা পুনরায় নিজে দীক্ষিত হইবার জন্য আহ্বান জানান। সারা জীবন তো আমি ইহাই চাহিয়াছি। আমা হইতে আমার আশ্রিতেরা বড় হইবে, আমার জীবনকে তাহারা আরও বাড়াইয়া তুলিবে ইহাই ত আমার ধ্যান। আমি ত কাহাকেও পঙ্গু করিয়া রাখিতে চাহি নাই। বর্ত্তমানে ইহার মূল্য দিতে কেহ না পারিলেও ইহার দ্বারা ভবিষ্যতের সকল সম্পর্ক সহজ হইবে, মধুর হইবে। আমি ঠেলাঠেলি করিয়া যেলাম। আজ উষাঙ্গিনীর সঙ্গে প্রতিজ্ঞার কথা হইতেছিল যেন আমার কাছে লোক থাকে না। আমি বোঝা ঠকাইয়া যাইতে পারিব না বলিয়াই লোক আসিল না। যাহারা 'মানুষ' হইতে আসিবে, তাহারাই আমার সঙ্গে থাকিতে পারিবে। খেয়াল আমার এখানে চলিবে না। আমি দাসদাসী চাই না, আমি চাই খাঁটি মানুষ, যাহারা সকল বুদ্ধি লইয়া আমাকে ভালবাসিতে পারিবে। আমিও তেমন জীবন যাপন করিবার জন্য প্রাণপণ করিব, যাহাতে তাহারা বুদ্ধিপূর্বক আমার জীবনে জীবন মিলাইতে পারে। আমি কাহাকেও ফাঁকি দিই নাই, ফাঁকি দিব না। ইহাতে কেহ থাকে ভাল না থাকিলেও দরকার নাই। আমি একাই চলিব। পাঠ হয় 'অয়ে নর সুপথা'···।

৫ই জানুয়ারী

ঠাকুর, তুমি ছোটদের মর্যাদা দিলে, আস্তাকুড় হইতে তুলিয়া আনিয়া নিজ বক্ষে ধারণ করিয়াছিলে তাহার মর্যাদা আমরা বুঝি নাই। আমরা শুধু অনাদরই করিয়াছি। আমিও তো কোনদিন গুরুগিরি, বাবাগিরি, মাষ্টারিগিরি করি নাই। গুরু গোবিন্দসিং যেমন নিজ

মারণ-মন্ত্র মানুষের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন, আমিও কি তাহা দিই নাই? আমি ও শোষণ করিব না, অপরের ব্যক্তিত্ব না ফুটাইয়া, বোকা রাখিয়া কাহারও কাছ হইতে আমি তো কিছু নিতে পারিব না। বোকাকে বুদ্ধিমান করার পর সে যদি চলিয়া যায় বা অসম্মান করে আমি তাহা মাথা পাতিয়া লইব। গুরু গোবিন্দের মত শিষ্যকেও তো আমার গুরু বলিয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছি। গুরু-শিষ্য এক অদ্বৈত, রাজা-প্রজা এক অদ্বৈত, স্বামী-স্ত্রী এক অদ্বৈত—ইহাই তো বুঝিয়াছি। শিষ্যকে মর্যাদা দিলে সে যদি তাহা না বোঝে, তাহাকে লইয়া দল করিবার কী সার্থকতা আছে?···আমি প্রকৃতি পুরুষ দুইকেই আত্মা বলিয়া বুঝিয়া আসিয়াছি। এখানের আদর্শ বুঝিয়া লইবার জন্য মিসকে বলি, "সেবকের যদি ভুল হয় কি করিয়া সেবা হয়? এখানে যখন যাহা আসিবে, যাহার যাহা প্রয়োজন স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে তাহা প্রাণ খুলিয়া গ্রহণ করিবে। মেয়েদের ক্ষুধা নাই, লোভ নাই ইহা আমি মানি না। সেবক যদি নিজের ভার নিজে না বয়, তাহাকে যে অচিরাৎ অন্যের সেবা লইতে হইবে।···

৬ই জানুয়ারী

'যুযোধি অস্মৎ জুহুরাণম্ এনঃ'—হে পুরুষোত্তম-অগ্নি, বঞ্চনা করিবার পাপ হইতে মুক্ত কর আমাদিগকে। বঞ্চনা করিব না—ইহাই আমার জীবনব্রত। পুরুষ হইয়া নারীকে বঞ্চনা করি নাই, পিতা হইয়া পুত্রকে করি নাই, গুরু হইয়া শিষ্যকে করি নাই। বঞ্চনা না করিলে যদি লোক না আসে, দরকার নাই আমার সে লোকে। তোমার জীবন-ইতিহাস বঞ্চনা না করিবার ইতিহাস। প্রকৃতিকে বঞ্চনা করে যাহারা, তুমি তাহাদের কেহ নও। নারীর রমণীত্বকে বঞ্চনা না করিয়াছেন, এমন পুরুষ কেহ আছেন কি তুমি ছাড়া? নারীর রমণীত্বের মর্যাদা দিয়াই তুমি পুরুষোত্তম। আত্মা অপুরুষ, অপ্রকৃতি। পুরুষও আত্মা, প্রকৃতিও আত্মা। পুরুষ যে চক্ষে প্রকৃতিকে দেখে তাহাতে সে-ও যে আত্মা তাহা বুঝিবার কোন কারণ নাই। অনাত্মা প্রকৃতিকে তুমিই, নিতাগোপাল, আত্মা বলিয়াছ। তোমার জয় হউক।···আজ তামস রজন রায়ের বিবেকানন্দ পাঠ হয়।···

৭ই জানুয়ারী

ঠাকুর, তুমি সমন্বয়তত্ত্বের যে ব্যাপকতম, গভীরতম রূপ লইয়া আসিয়াছিলে, তাহা কায়মনোবাক্যে অঙ্গীকার না করিলে বর্তমান বিশ্ব কি করিয়া বাঁচিবে? শ্রীরামকৃষ্ণ তো সমন্বয়ের পূর্ণ আভাস লইয়া আসিয়া বিশ্বে দিয়া গেলেন; তুমি যাহা আনিয়াছ তাহার প্রয়োজন যে আজ কত বড় ছিল, অথচ তুমি আজও অপরিচিত রহিলে! জীবনে কে তোমায় পূজা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিল? জীবনের বাহিরেই ত সাধন ভজন রাখিয়া চলিতেছে। কলিকাতার অর্ধেক মানুষই কী কোন না কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়? তবুও কেন এ দুর্গতি? অথচ ধ্যান ধারণা, জপ তপ, পাঠ কীর্তনের অভাব নাই। তুমি আসিয়াছ জীবনের প্রতি স্পন্দনের মাঝে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে, অনাত্মার বুকে আত্মার প্রতিষ্ঠা দিতে। ঠাকুর, জাগো জাগো। ৬।৪টায় আমি ও রেণু বেহালার সত্যব্রতের ওখানে যাই।···আজ আমি সকলের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছি। ইহাদের নিয়াই তো এতদিন পথে দাঁড়াইয়াছিলাম। ইহারা ঘরে গেল, আমি আবার পথে দাঁড়াইলাম ভিক্ষার ঝুলি লইয়া। পথে দাঁড়াইয়াই মরিব। ঠাকুরের চরণে বিকাইয়াছি। মিসকে আজ ইব্রাহিম-ইসমাইলের কথা বলি। ভগবানকে বলি দিলেই তাহা থাকে। ব্রজগোপীগণ উদ্ধবের উপর দুধ জাল দেওয়া ফেলিয়াই বাহির হইয়াছিলেন। তিনি যে 'প্রেয়ঃ পুত্রাৎ' ইহা তো বুঝিতে হইবে। ভগবানকে পাইলে ভগবান ও বিশ্ব দুইই পাওয়া যায়। কিন্তু ভগবান বাদ দিয়া বিশ্ব চাহিলে বিশ্ব ও ভগবান কিছুই পাওয়া যায় না। সমন্বয়ের সুরেই আমি তুমি বিশ্ব বিশ্বেশ্বর সত্য।···আমার পুরুষোত্তম আসিয়া যাইতেছে, সকলেই যে যার ক্ষুদ্র প্রয়োজন লইয়া আসে।··· সেই দিনকার বিশ্ব সম্মেলনের যে ভদ্রলোকটি আসিতে চাহিয়াছিলেন তিনি আসেন, কিছু কথা হয়।···

৮ই জানুয়ারী

ঠাকুর, যে দুর্গমপথে একাকী আমি চলিয়াছি, তুমি

যদি সঙ্গীরূপে সংগে সংগে না থাকিতে কোথায় ধরায় ধূলিতে মিশিয়া যাইতাম। বাসনা ত্যাগের কথা সবাই বলে···সেখানে সকল বাসনার ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইবার দর্শন কতদিনে কি ভাবে চলিবে জানিনা···বাসনা ত্যাগ অর্থ পরিবারে সমাজে রাষ্ট্র বিশ্ব ত্যাগ। বর্ত্তমান যুগ কি তাহা চায়? বাসনার কোনও দিক কি নাই যে তাহা absolutely ত্যাগ করিতেই হইবে? ধরার বুকে তোমার অবতরণ যদি পারমার্থিক হয়, তবে বাসনার বুকে নির্ব্বাসনার অবতরণও কি পারমার্থিক নয়? তবে এই দর্শন ছড়াইয়া পড়িবে?···যে প্রকৃতির গর্ব্ব বাড়াইবার জন্য সারা জীবন প্রাণপণ করিলাম, সেই প্রকৃতির বিরাগ মেয়েরা কি আমার এই প্রাণের মূল্য দিবেন? প্রকৃতির পূজা কি আমার জীবনে শেষদিন পর্যন্ত অব্যাহত রাখিতে পারিব না? সংসারের সকল ভালবাসার চেয়েও কী আমি বেশি ভালবাসি না? আমি তো প্রত্যেকের সঙ্গে নিত্য সত্তার ক্ষেত্রে যোগস্থাপন করিয়া চলিয়াছি। সংসারের সম্পর্ক এই দেহের সঙ্গে সঙ্গে ফুরাইয়া যাইবে। কিন্তু আমার প্রেম? সংসারের ভালবাসা অনিত্য সত্য, আমার ভালবাসা নিত্য সত্য···বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতা রেণু আনে। ৭টায় বিবেকানন্দ পাঠ হয়।···

৯ই জানুয়ারী

জীবনঘন জীবন বল্লভ শ্রীনিত্যগোপাল আমার, তুমি শুধুই জীবন, মহাজীবন, বিশ্বজীবন, বিশ্বাতীত জীবন। তোমার অবতরণে বিশ্বময় জীবনের জয়যাত্রা সুরু হইয়াছে। তাই তোমার সর্ব্বসমন্বয়—চৈতন্য অচৈতন্য সমন্বয়। জীবন একান্ত চৈতন্য নয়, একান্ত অচৈতন্যও নয়। চৈতন্যের দাবী ও অচৈতন্যের দাবী জীবনে অতিক্রান্ত ও সমন্বিত। জীবন চিৎকে ডিঙাইয়া, অচিৎকে ডিঙাইয়া চিৎ অচিৎ-সমন্বয় জয়যাত্রা সুরু করিয়াছে। তাই একান্ত জড়ের রাজ্য ও একান্ত অজড়ের রাজ্য ভাঙিয়া চুরিয়া পড়িতেছে। আমরা এই ভাঙাচোরার মধ্যে পড়িয়াছি। একমাত্র জীবন-দর্শনের ভিতরই বিশ্ব বাঁচিতে পারে, আত্মা ফিরিয়া পাইতে পারে। ওগো জীবন, এস আমার সকল কর্ম্মে, জ্ঞানে, আনন্দে। তোমার অবতরণে অবিদ্যার ক্ষেত্র পর্যন্ত জীবনরসে সার্থক হইবে, সকল বাসনা কামনার ক্ষেত্রে বিদ্যার জড়িমা ঐশ্বর্য্য বাস্তব হইবে। তুমি বর্ত্তমান অবতারে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইই। প্রতি অংগের কান্না তাই তোমাতে সার্থক।··দুইটার পূর্ব্বে সতীশগুহ আসেন,···রাহতার নিতাই, সীতা ও আরও দুইটি ছেলে ··দীনেন বন্দ্যোপাধ্যায় আসে।···

১০ই জানুয়ারী

ওগো অনন্ত, জীবজগৎ তোমার অনন্ত রূপ অনন্ত রসকে পাইবার জন্য দেহ হইতে দেহান্তরে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল বিচরণ করিতেছে। তোমাকে পাইয়া কেহ সাধ মিটাইয়া পাইল না: তাই কি উন্মাদ সে তোমাকে আপনার করিবার জন্য: তুমি অনির্দ্দেশ্য, অনির্ব্বাচ্য, অথচ তোমাকেই সে চায়। কোনও সান্ত বস্তু দিয়া তাহার এই অনন্ত লালসা, অনন্ত পিপাসা মিটিবে না। না-পাওয়ার বেদনা তাহার অনন্ত বেদনার গানই বেদ। বেদনার বিদ্যাই বেদবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা। শ্রীরাধাই মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মবিদ্যা। বেদনার দেবী শ্রীরাধা। অনন্ত জীবন চলিয়াছে জীবন মরণের বুক চিরিয়া, কোথায় সে জুড়াইবে?·· ১২টার পর সুহৃৎবর কনকের সঙ্গে আসেন, বেশীক্ষণ থাকেন না। ৩টার পূর্ব্বে সতীশ গুহ আসেন।···। ৪।০টায় পাঠ আরম্ভ হয় সতীশগুহ, ডাক্তারবাবু, হরিনারায়ণ ও তাহার পিতা পুলিন, সন্তোষ বসু উপস্থিত ছিলেন। অন্ধকার পথে সৈনিক রঘুনাথ দাসের রামচন্দ্রের কৃপা পাওয়ার কথা আলোচিত হয়, যাহা বিবেকানন্দ তাঁহার দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার পথে উল্লেখ করিয়াছিলেন। 'রাম' 'রাম' বলিয়া ক্রন্দন করি।—র এখনও সেই অভিযোগের সুর আমি দক্ষিণেশ্বর যাই, তাহার ওখানে যাই না ইত্যাদি কোন কথা সে আমার কাছে বলে না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। আমি কি করিতে পারি! আমার সঙ্গে কোন আলোচনাই তো হইল না।··· —যদি আমাকে ফেলিয়া যাইতে পারে আমি আটকাইব না। আমি কাড়াকাড়ি করিতে পারিব না। আমার উপর চাপ দিয়া কোন ফল হইবে না। আমি সব কিছুর

জন্ত প্রস্তুত। নইলে এতখানি পথ আমি আসিতে পারিতাম না ····

১১ই জানুয়ারী

সখা, তুমি ও আমি চিৎ-অচিৎ, নিত্য-অনিত্য, জড়-অজড় দুই সোনার পাখা ছড়াইয়া অনন্ত শূন্যলোকের বুক চিরিয়া চলিয়াছি নূতন জগৎ সৃষ্টির কল্পনা বুকে লইয়া। প্রলয়পয়োধি জল ভেদ করিয়া ঐ যে মধুর আগিয়া উঠিতে চাহিতেছে নূতন পুরুষোত্তম-বিশ্ব। সকালে···বেড়াইতে যাই, ···যাইতে যাইতে ইব্রাহিম-ইসমাইলের কথা, রবীন্দ্রনাথের 'শেষ শিক্ষা'র আলোচনা, আমার জীবনের সঙ্গে পারমার্থিক দেহ বা সিদ্ধদেহের যোগ করিয়া ব্যবহারিক দেহধারণ সংস্কারের সঙ্গে যোগ রাখার কথা, আমার জীবনে সকল সম্পর্ক আস্বাদন করিবার কথা বলি। 'প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ঃ বিত্তাৎ প্রেয়ঃ সর্বস্মাৎ অন্যস্মাৎ'-এই মন্ত্রের বাস্তব তাৎপর্য আমার জীবনে আস্বাদনের কথা হয়।···মীনুর সঙ্গে অনেক কথা হয়। সংসারের ওপারে ভগবানকে পাওয়া এবং সংসারের মধ্যে ভগবানকে পাওয়ার সাধনা ও দর্শন সম্পূর্ণ পৃথক। বৈরাগ্যের রূপও তাই পৃথক। বাহিরের ছাড়া আজ আর বৈরাগ্য নয়। আজ এই বিশ্বের প্রতিটি বস্তুকে বাঁধিয়াই ছাড়িতে হইবে, বস্তুর সঙ্গে বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরের বাঁধন বাঁধিয়া বস্তুকে পাইতে হইবে। প্রতি বস্তুর মধ্যে তাই বস্তুর অতীত সত্তা ঘুমাইয়া রহিয়াছে। কোনও বস্তুই 'finished product' নয়। প্রতি বস্তু যে এই ভাবে নিজেকে ভিঙাইয়া অনন্তের পথে চলিয়াছে, তাহা সম্যক্ রূপে বুঝিতে পারিলে বস্তুজ্ঞান হইবে, পর বৈরাগ্য সিদ্ধ হইবে। ৭।৮টার পর 'বিবেকানন্দ' পাঠ হয়।···আমি ইঁহাদিগকে জীবনের সঙ্গে গাঁথিয়া রাখিয়াছি, অথচ নিকটে পাইলাম না। নিকটে থাকিলে কাজ হইত।

১২ই জানুয়ারী

ওগো নিরঞ্জন, তোমার স্পর্শে আমি নিরঞ্জন হইয়া 'পরম সাম্য' লাভ করিব—নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি। জীবত্বও একটী অঞ্জন, ঈশ্বরত্বও একটী অঞ্জন। এই দুই অঞ্জন যা কালিমা আমার ঘুচিয়া যাউক, কিম্বা এই দুই অঞ্জন পুরুষোত্তম জীবনকে রূপের ছটায় উদ্ভাসিত করুক। তুমি আমি 'দম'। বিশ্বের এই সমরসে আস্বাদন করিবার অধিকার আমায় দেও। এই সমতার উপরই তো বিশ্ব গড়িয়া উঠিয়াছে। নরের মূল্য, নারায়ণের মূল্য তোমার জীবনে সমভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। তুমি নর-নারায়ণ সমন্বিত পুরুষোত্তম। তুমিই নরকণী নারায়ণ কিম্বা নর-নারায়ণ একাধারে। আমার জীবনে তোমার জয় হউক। ··· দায়িত্ব তাহার নিজের, সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে তাহারা। আমি কেমন করিয়া তাহার সমাধান করিব? দায়িত্ব রাখিবে নিজেদের উপরে অথচ কৌশল পূর্বক তাহা চাপাইতে চায় আমার উপর। আমার অবস্থা বুঝিল না।···কেহই আমার কাছে থাকিতে থাকে না। কি আমি করিব?—কে যদি হাসপাতাল হইতে না আনিতাম, তাহা হইলে আজ অবস্থা অন্যরূপ হইত, আমি জড়াইয়া পড়িতাম না। তাড়াতাড়ি আমি—কে লইয়া করিব না। তাহার যাওয়া না-যাওয়ার সিদ্ধান্ত তাহার উপরই ছাড়িয়া দিলাম। একান্ত অসুস্থ হইলেই 'মামেকং শরণং ব্রজ' বলা চলে। নইলে পরমাত্ম স্তরে 'যদেচ্ছসি তথা কুরু' বলিতেই হইবে। একে একে সকলেই আমাকে ত্যাগ করিতেছে। আমি ঠাকুর, তোমার রাঙা চরণেই ধরার ধূলিতে পড়িয়া রহিব।···রামচরণের সর্পঘোনি প্রাপ্ত হওয়ার কাহিনী আমি উষাঙ্গিনী ও ইঁহাদের কাছে বলি। কতবার আমি মানুষের কানে কানে জিজ্ঞাসার মন্ত্র শুনাইলাম। কেহ কি শুনিল?

১৩ই জানুয়ারী

ওগো প্রকৃতি, তোমার সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী রূপের পূজার জন্ত মঙ্গলঘট স্থাপন করিয়াছিলাম, আমি তোমার পূজক, সেবক, ভক্ত। তোমার বরাভয়দায়িনী মূর্তির কৃপা তো আজও সম্পূর্ণরূপে পাইলাম না। প্রকৃতিকে আমি অবমাননা করি নাই, প্রাণ খুলিয়া মর্যাদা দিয়াছি, পুরুষ-নিরপেক্ষ তাহার স্বাধীন কর্তৃত্বা রূপ ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছি। পথ তো আজও তেমন খুলিল না। আমি জীবনভর কাঁদিয়াছি। মায়াবের মান বাড়াইবার জন্ত জীবনপাত করিয়াছি, তাহারা একে একে বিমুখ হইতেছে

—'যদি তে, নাহং তেষবস্থিতঃ'। আমি প্রকৃতির বুকে ব্রহ্মরূপে, কেবলরূপে স্থান খুঁজিয়াছিলাম, বিশ্বেশ্বরীরূপ রাধারাণী আমার, হৈ, আজও তো সেই আসিল না। ওগো নৈর্গুণী রাধারাণী, তোমার জয় হউক।···মেয়ের মর্যাদা যদি মেয়ে না রাখে, মেয়েরা যদি নিজের জীবন দিয়া প্রমাণ না করে যে তাহারা 'দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী' নয়, আমার প্রাণপণ প্রচেষ্টায় কি চরম ফল পাওয়া যাইবে? ব্রজেই সর্বপ্রথম নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। নিকুঞ্জকাননে রাসশ্রমে পরিশ্রান্ত রাধারাণীর পা পুরুষোত্তম টিপিয়া দিতেছেন, আরতির সময় মেয়েরা বসিয়া থাকে, পুরুষেরা দাঁড়াইয়া থাকে। 'রাই রাজা'ই চাহিয়াছিলাম। কিন্তু মেয়েরা বুঝিল কই? তাহারাও বর্ণাশ্রম আঁকড়াইয়া থাকিল, যাহার শাস্ত্রে নারী বন্ধন মাত্র। অথচ পুরুষোত্তম প্রমাণ করিলেন, মেয়েরা বিশ্বের dynamic force। মেয়ে যদি বিপ্লবী হয়, তবে সে সমাজ নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে। নারীর গুরু তাই শ্রীরাধা। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের কুলটার বক্তৃতা বাউল ধর্ম সম্বন্ধে বেশু পড়ে। আমি আগে আনন্দবাজারে পড়ি। বাউলের সব কিছু মানুষ-ব্রহ্ম; জীবন তাহাদের আগে, পরে সাধন। প্রাপ্তি আগে, পথ পশ্চাতে। মানুষ-ব্রহ্ম অন্তরে বাহিরে চিরন্তন, মানুষ-ব্রহ্ম সংখ্যার অতীত, কাজেই একও তিনি নন। বাউলদের কথা—পাতকীচরণবেণু-শোভিত ভগবানের অঙ্গ। কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি বলিলেন, আমি তাহার পাত্র, ভক্তরা সেখানে পাদপদ্ম। 'গুরু গোবিন্দ সিংহ' পাঠ আরম্ভ হয়।···দুই বৎসর পূর্বে দাদা এই দিন দেহ ত্যাগ করেন। আজ পৌষ সংক্রান্তি।

১৪ই জানুয়ারী

ওগো মাটির দেশে মানুষী শ্রীরাধারাণী আমার, তোমার একান্ত দেবী রূপ আমি চাই না। দেবী রূপের ঘনবিগ্রহ তোমার মানুষী তনুই আমার জীবনের পরম লক্ষ্য। বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে বেদনাময়ী তোমাকে খুঁজিয়াছি, জীব-প্রকৃতির প্রতিটি কায়ার ভিতর তোমারই কান্নার সুর আমি শুনিয়াছি। তাই সকল 'চাওয়ার' পরম ও চরম মূর্তিরূপ তোমাকে বুঝিয়াছি। অনন্ত 'চাওয়া' এবং অনন্ত না-পাওয়ার দ্বন্দ্বের মধ্যেই তো তোমার প্রকাশ। তাই তুমিই বিশ্বের সকল সমস্যার ঘনরূপ। যাহা একদৃষ্টিতে সমস্যা, তাহাই তো অপর দৃষ্টি কোণে সমাধান। তুমিই পরা শক্তি, পরা প্রকৃতি। তুমি সমাধানমূর্তি বলিয়াই না তোমার জীবনে অনন্ত সমস্যা জমিয়া উঠিতে পারিল? মাটির মানুষই অনন্ত সমস্যা-মূর্তি। তোমাকে মাটির মেয়েদের মাঝে পাইবার জন্য প্রাণপণ করিতেছি। তুমি কি প্রসন্না হইবে না? ধরা দিবে না ব্রহ্মময়ী?···দেবকী বোস ডিপ্রোডাকসান লি.-এর পক্ষ হইতে সুকুমার বসু আসিয়া কালিন্দীর ভগবান 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-র ফিল্ম্ লইবার উদ্যোগ দিবসের সভায় যোগদান করিবার অনুরোধ লইয়া মন্মথ রায়ও পত্র দেন। কাল তাহারা গাড়ী পাঠাইয়া দিবে।

১৫ই জানুয়ারী

ওগো শ্রীরাধা, সকল পরিচ্ছিন্নকে অপরিচ্ছিন্নে এবং সকল অপরিচ্ছিন্নকে পরিচ্ছিন্নে গড়িয়া তুলিবার সংগঠন শক্তি, সঙ্ঘ-শক্তি, পরাশক্তি আমার, আমার জীবনে প্রকাশিত হও। তোমার শক্তিতে প্রতি পতি গড়িয়া উঠুক বিশ্বপতিরূপে, এই বিশ্ব গড়িয়া উঠুক ব্রহ্মধামে বিশ্বের প্রতিটি কায়ার গূঢ় প্রয়োজন হইতেছে সত্য অনিত্যকে নিত্য সত্তা সম্পর্কে গড়িয়া তোলা। আমা দেখা দেও, দেখা দেও। 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে'—তোমার সঙ্ঘশক্তি প্রভাবে 'যাঁহা যাঁহা' বুক চিরিয়া কৃষ্ণ-স্ফুরণ গড়িয়া উঠুক। আমাকে দেখিতে দেও, গড়িয়া তুলিতে দেও যে বিশ্বের প্রতিটি কণা ব্রহ্মকণা। সব ধ্বস গড়িয়া উঠুক সর্বসমন্বয়ে, সর্বমৈথুনে ···যতদূর বুঝিতেছি—কে যাইতে হইবে। যেকর্ম নির্বিচারে ছেলে-মেয়েদের খেয়াল আমার সতর্কতা সত্ত্বেও পূরণ করিয়া আসিয়াছে, তাহার পরিণামে আমি হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া ছাড়া আর কি হইবে? উনি আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন, ভাবিতে বেদনা বোধ হয় ছেলেরা বিদায় দিয়াছে, মেয়ে সংসারের শেষ সকল আশা কাড়িয়া নিল। বেশ করিয়াছে ঠাকুর। দেবকী বসু ভ্রাতা সুকুমার বসু মোটর নিয়া ৯০ টায় আসে।...আমি

রেণু সহ 'রাধা কিনুম্'-এ যাই। ৩।৩০ টার পর সভার কাজ আরম্ভ হয়। ষোল করতালের বাদ্যের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের কিনুম্ নেওয়া হয়। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সভাপতি হন। আমাকে প্রথমে বলিতে বলা হয়। 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়া' ও 'শ্রীরাধায়া প্রণয়মহিমা' শ্লোকদ্বয় আবৃত্তি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ in terms of শ্রীরাধা, পুরুষ in terms of প্রকৃতি, ধনী in terms of নির্ধন, রাজা in terms of প্রজা, spirit in terms of matter is শ্রীগৌরাঙ্গ, 'পণ্ডিত কুলীন ধনীর বড় অভিমান', ভববিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে ধন গোরা জগতে ফেলিল চালি ইত্যাদি বলি। জীবনবল্লভের এই অন্তর্যামীর ধেয়কী বাবুর সাধনা অন্তর্যুক্ত হউক। সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী ও পরে সভাপতি বলেন।··· গুরু গোবিন্দ সিংহ আজ শেষ হয়।

১৬ই জানুয়ারী

ঠাকুর, কান্নাই আমার নিত্য সাথী, চোখের জল আমার নিত্য সঙ্গী, তুমি আমার নিত্য সঙ্গী। জীবনভরা বেদনাদ্বারা তোমায় পূজা করিয়া আসিয়াছি। সংসার আমাকে বিদায় দিয়াছে, আমি আজ সংসারের প্রান্ত-সীমায় দাঁড়াইয়া। তোমার সংসারকে প্রণাম। তর্ক বিচারের আবেশের মধ্যে আর থাকিতে পারি না। জীবের বাক্য মন তোমাকে তাহাদের পরিচ্ছিন্নতাদ্বারা নিজ আবেশের মধ্যে আনিতে পারিল না। আর কৈফিয়ত দিয়া সংসারে থাকিতে পারিব না। ঠাকুর, তুমি আমার আমি তোমার। তোমার দেহ আমার হউক, আমার দেহ তোমার হউক, তোমার প্রাণ-মন আমার হউক, আমার প্রাণ-মন তোমার হউক, তুমি আমি একাত্মা বনিয়া যাই। তুমিই আমার শরণ। আমি একাই খুব ভোরে বাহির হই···। পথ কর্দমাক্ত, রাত্রিতে বৃষ্টি হইয়াছে। টালিগঞ্জের রাস্তা! রেণু সকালে যাইয়া বাহির হইয়া যায়।···আগামী মঙ্গলবার সরস্বতী পূজার দিন পার্থ, গন্টু ও পল্লবীর 'হাতেখড়ি' আমাকে দিয়া দেওয়াইবার প্রস্তাব জানায়। আমি এখানে ঐদিন আসিতে বলি।... [illegible]কে হাতেখড়ি দিবার কথাও শুনিলাম। এখানের সমস্ত দায়িত্ব ও বক্তৃত্ব রেণু-প্রতিভার উপর পড়িয়াছে। একদিন সুরেশ গুপ্তদের লইয়া কংগ্রেস ছাড়িয়াছিলাম, উদ্বাস্তিনী ও পুত্রবক্ষাদের বুকে লইয়া স্বরাজ সেবকসঙ্ঘ ছাড়িয়াছিলাম, আজ রেণু-প্রতিভাকে আশ্রয় করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়াছি। ইহারা যদি ইহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন না থাকে, আমাকে প্রাণ দিয়া জাগাইয়া না রাখে, নির্বিচারে আমার প্রাণকে সঞ্জীবিত না রাখে, আমি কেমন করিয়া বাঁচিব? অতীতের সকলের সব স্নেহ যদি ইহাদের মধ্যে ঘন না হয়, আমি যে হাঁপাইয়া উঠিব। অতীত যদি ইহাদের ভিতর মূর্ত না হয়, আমি কেমন করিয়া আগাইব? কেন উপনিষৎ পাঠ আরম্ভ হয়।

১৭ই জানুয়ারী

সখা আমার, কোন্ অনাদি কাল হইতে তোমার আমার এক-হইয়া পাওয়াকে বুকে করিয়া এই অনিত্যের দেশের, না-পাওয়ার দেশের বুক চিরিয়া পাওয়াকে জমাইয়া তুলিবার জন্য কাঁদিয়া চলিয়াছি। এবার খুব কাঁদিলাম। এই পরিচ্ছিন্ন জগতের বুক নিংড়াইয়া তোমার অপরিচ্ছিন্ন সর্বরূপ সমন্বয় অরূপকে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ করিলাম। তোমার জীবনে আমি গড়িয়া উঠিব, আমার জীবনে তুমি গড়িয়া উঠিবে তবেই না তুমি আমি সত্য নিত্য সখা? তবে মাটির মানুষের জীবনে তোমার দিব্য রূপের ফুরণ দেখিব? আমি জীবন্ত মাটির পুতুল পূজা করিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম। ওগো জীবন্ত মাটির পুতুল শ্রীরাধা আমার, সারা প্রকৃতির মাঝে তোমার বাস্তব রূপ উদ্ভাসিত হউক। 'জয় রাধে জয় রাধে' —বিশ্বময় এই ধ্বনিই ফুটিয়া উঠিতেছে।···১০টার পর রেণু যেমন আফিসে গিয়া পুলিনের দরখাস্ত দিয়া আসে, ৩টার পর গিয়া ইন্‌স্পেক্টারের সঙ্গে দেখা করে। কালই দিবে, ইন্‌স্পেকসানের প্রয়োজন নাই, রেণু দিয়া আসিয়াছে বলিয়া। মানুষ যখন বিশ্বাসভাজন হয়, কত বিধিনিষেধ হইতে যে সে ছাড়া পায়, তাহার ঠিক নাই। 'নিস্ত্রৈগুণ্যো পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।' ব্রহ্ম-পথই নিস্ত্রৈগুণ্যের পথ।···৪-১৫তে পাঠ

আরম্ভ হয়, প্রথম অধ্যায় শেষ হয়।···অর্জুন মনের কান্নার কথা বলিতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রাণের ভাষায় জবাব দিলেন। ···কোন কাজেই যেন আর উৎসাহ নাই। মানুষ লইয়া কত উৎসব করিয়াছি—অন্নপ্রাশন, নবান্ন, শ্রাদ্ধ, বিবাহ। আমি সব ব্যাপারকে এমনভাবে মর্য্যাদোপূর্ণভাবে করিতাম যে ব্যাপারটী মনোজ্ঞ হইত। এমন একটী প্রাণস্পর্শ দিতাম। তখন বুকে বল ছিল। সব আমাকে এমন নির্ম্মম ভাবে পরিত্যাগ করিয়াছে যে আমি ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারিতাম। যোগমায়াসমাবৃত ছিলাম বলিয়া এত আঘাতেও আমি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ি নাই। আজিও চলিয়াছি। কিন্তু মানুষ তো আমার আঘাত তেমন করিয়া বুক পাতিয়া নিতে আসিল না। তাহা হইলে বাঁচিতাম, আজিও তো তাহা চাই।

১৩ই জানুয়ারী

ঠাকুর, বর্ত্তমান যুগ-প্রয়োজনবোধি তুমি নিত্য বেশ লইয়া আসিলে, নিত্য দীনরূপী তোমায় নমস্কার। তুমি নিত্য কূর্ম্ম, নিত্য শূকর, নিত্য নরহরি, নিত্য বামন, নিত্য পরশুরাম, নিত্য রাম, নিত্য হলধর, নিত্য বুদ্ধ ও ও নিত্য কল্কি। তোমার এই সৃষ্টিব্যাপারে আমি তোমার মনোবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলিব 'ছায়ের', তোমার চরিত্রের ছাঁচে আমার চরিত্র গড়িয়া তুলিব। নিত্য সখা আমার, নিত্যসঙ্গী আমার, নিত্যবন্ধু আমার, নিত্যশরণ আমার, নিত্য সুহৃৎ, নিত্য স্বামী আমার। আমার আর কি আছে, কে আছে যাহাকে কেন্দ্র করিয়া আমি চলিতে পারি? তুমি আমার ধ্যান-জ্ঞান, প্রাণ-মন, ধন-দৌলত। তুমি আমার গর্ব, আমার মান, আমার সব কিছু। তোমার আমিই আমার আমি। তুমিই আমার আমি।—বৃন্দাবনেও যাইবেন। বৃন্দাবনের তত্ত্ব ও আস্বাদন তো এখানেই পাইতে পারিতেন। বৃন্দাবনই তো বুকে করিয়া চলিয়াছি। ব্রজ-তত্ত্বই তো ছড়াইয়া দিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি। মানুষ 'সরস্বতী' পূজা লইয়া খুব ব্যস্ত। কিন্তু কোথায় সরস্বতী? কে তাহার পূজা করে? পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যার সমন্বয় মূর্ত্তিই ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী সরস্বতী। হট্টগোলের মাঝখান হইতে সরিয়া কত দূরে চলিয়া আসিয়াছি। একজন সকলের নাগালের বাহিরে।··· ব্রহ্মবিদ্যার উপাসনাই তো করিলাম! অযাচিত করুণায় ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশ ঐ উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য পাইয়াছি। তাহা লইয়াই তো ১৪ হাজারের বেশী ভাষ্য দিয়াছি। নয়ন জলে তোমার অভিষেক হউক। আমার বাথার পূজা গ্রহণ কর। গোপার জীবনে ব্রহ্মবিদ্যা তোমার রূপ ভরিয়া উঠুক। পুত্র-কন্যা, ভাবের সম্পদে যাহারা আজ আপন, তাহারা তোমার প্রকাশে ধন্য হউক।

১৪ই জানুয়ারী

শ্রীরাধা, ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী দিদিমণি আমার, তোমার আবির্ভাবে আমার জীবন কি এক উন্মাদ লালসায় ছুটিয়া চলিয়াছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ধরার বুকে তোমার আসন রচনা করিবার জন্য। মহা সরস্বতী আমার, রক্তমাংসের মানুষের মধ্যে কি তোমার দিব্য রূপ পড়িয়া তুলিতে পারিব না? তুমি শুধু আকাশের নহ। তুমি মৃন্ময়ী আমার। রক্তমাংসের পুতুল আমি পূজা করিতে চাহিয়াছিলাম। যে সব মেয়েদের সঙ্গে দেখা হইয়াছে, সকলকে তো তোমার ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছি কি পাগলামি আমাকে পাইয়া বসিয়াছে! তুমি আমার বাস্তব ব্রহ্মবিদ্যা। নয়নারায়ণ আশ্রম তোমারই চরণতলে গড়িয়া উঠিয়াছে, উজ্জলকারত তোমারই বাহন। মহা নগরীর প্রান্তে তোমাকে বুকে লইয়া ভিখারিণীর মত বসিয়া আছি। কে তোমায় নিবে? অবহেলিতা তুমি আমার বুকের ধন। তোমার জন্য আমার সব গিয়াছে তুমি নিত্যবিপ্রলব্ধা। তোমার জয় হউক। আজ আ তোরে বাহির হই না। ৯-৩৬-এর মধ্যে সরস্বতী পূজা ···৯টার পূর্বে প্রার্থনা করিয়া ও কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিয়া 'যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা' স্তোত্রাদি পড়িয়া প্রথমে ছুটিবে পরে পার্থ গদু পরমাণীকে উলুধ্বনির মধ্যে হাতেখড়ি দেওয়া হয়, পরে প্রসাদ দেওয়া হয়। ১০-টার পর আলোচনা হয়। প্রথমে রেণু 'নারীর আসন—সরস্বতী পূজা' পাঠ করে। মিঠু 'পরব্রহ্মরূপী গুরু' গানটী 'হাতে খড়ি' দিবার পূর্বে করে।···ভগবানের ঘরে—যেখানে ভক্ত

ভগবান হইবে এক, সেখানে 'মামেকং শরণং ব্রজ' বলা সার্থক, কিন্তু পরমাত্ম স্তরে যেখানে ভক্ত পৃথক, সেখানে 'তমেব শরণং গচ্ছ' এবং 'বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু' ছাড়া বলা যায় না। তাই আমাকে আজ সকলকেই স্বাধীনভাবে চলার কথা বলিতে হইতেছে। নির্বিচারে আমার হইয়া চলিবার কথা বলিবার সাহস কই ?...

২০শে জানুয়ারী

ঠাকুর, আমি তোমার 'ছায়া' হইয়া থাকিব, তোমার ভঙ্গিতে আমার ভঙ্গি হউক, আমাকে দেখিয়া বিশ্ব তোমায় চিনিবে, আমার জীবন দেখিয়া তোমার পরিচয় পাইবে এমনটি করিয়া দাও। আমার দেহে তোমার দেহ, আমার প্রাণে তোমার প্রাণ, আমার মনে তোমার মন, আমার আত্মায় তোমার আত্মা অবতরণ করুক, আমি তুমি বনিয়া যাই। 'কি ধন লইয়ে বল থাকিব হে আমি। আমার সব ধন অমূল্য রতন আমার হৃদয়ের-ধন তুমি।' তোমায় দর্শন ও জীবন উপলব্ধি করিবার জন্য আমার সারা জীবন ব্যাকুল। কবে মানুষ তোমার বৈশ্বরিক জীবনের টানে পড়িবে ? আমি যে বড় একা। নিত্যসঙ্গী আমার।...রাত্রি ৭।৮টার পর কেন উপনিষৎ পাঠ হয়—ব্রহ্মের যান্ত্রিকতা পরিহার করিয়া জীবনের ক্ষেত্রে পরমাত্মা-ভগবান-পুরুষোত্তম হওয়ার প্রশ্ন আলোচিত হয়। 'জ্যোতিরূপকং রূপং বিষ্ণুরূং শ্যামসুন্দরম্'। পুরুষোত্তম ব্রহ্মঘন, তাই ব্রহ্ম-পুরুষোত্তমের নাম জ্যোতিঃ। আকর্ষণ করাকে ঘিরিয়া আছে একটি নেতি নেতি। পুরুষোত্তম আকর্ষণ-মূর্তি ; কিন্তু এই আকর্ষণে যখন জীব সাড়া দেয় না, তখন তাহা তিনি অপ্রকাশিত রাখেন। এই আকর্ষণকে গোপন করার ফলে জীবের অন্তরে আত্মসমর্পণ করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। পুরুষোত্তম-স্তরে তিনি তো চানই, আমিও তাঁহাকে চাই ; তিনি তো আমার অপেক্ষা করেনই, আমিও তাঁহার অপেক্ষা করি। 'ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্'। ভগবানের স্তরে ভক্ত-ভগবান দুই-ই দুইয়ের জন্য ব্যাকুল। সকল ন-এর মুক্তি ব্রহ্ম। পরমাত্মা দ্রষ্টা ব্রহ্ম, ভগবান ভোক্তা ব্রহ্ম। ভগবানের স্তর দ্বৈত-তরঙ্গ। পুরুষোত্তম-স্তরে 'যেন' ব্রহ্ম নাই, আছে শুধু ভক্ত ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবানকে হৃদয় করিয়া পুরুষোত্তম জীবনঘন। সারা জীবন মানুষ ডাকিলাম। আজও তো ডাকি ; বাহিরের ডাকাডাকি বুঝি শেষ হইয়াছে, মানতি-প্রণতি আসে না, তবুও তো ডাকি। ঘুমুম থাকিল না, তবুও তো ডাকি। ডাকিয়া যাইব, আমার যে তাহা ছাড়া গতি নাই। তাহারা যাহা বলিয়াছিল, তাহার মর্যাদা তাহারা রাখে নাই। আমিও কি রাখিব না ?

২১শে জানুয়ারী

ঠাকুর, কবে জনের ভিতর দিয়া আমার জীবনে তোমার 'ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্' বাণী সফল হইবে, 'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ' এই তত্ত্ব জমিয়া উঠিবে ? যোগ হইতেছে 'ময়ি তে ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ'। ইহাই পরমাত্মার যোগ। ভাগবত যোগে তুমি আমাতেও। আমি আমার সকল দেহ-প্রাণ-মন দিয়া তোমার 'আমি'কে প্রমাণ করিব, প্রতিপন্ন করিব, আমি হইব তোমারই প্রতিমা, বিগ্রহ। এই অধিকার আমাকে দেও। আমার 'অহমস্মি' তোমার 'অহমস্মি'র মাঝে নির্বাণ লাভ করুক, আমার দেহ-প্রাণ-মনে তোমার দেহ-প্রাণ-মন ফুটিয়া উঠুক। তোমার ধ্যানে আমি তোমার সাধর্ম্য লাভ করি। তুমি আমি সখা।...কেন উপনিষদের ভূমিকা আজ সারা হয়। মানুষ তো স্বতঃসিদ্ধভাবে ভগবানকে পাইয়াই আছে, এই পাওয়াকে কর্মে জ্ঞানে আনন্দে পাওয়ায় জন্যই সাধনা। যাকে আবার কি পাইব ? মাতৃগর্ভে ছিলাম, মায়ের বক্ষ নিংড়াইয়াই জন্মিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে একই তো ছিলাম, নূতন করিয়া পাওয়ার প্রশ্নই তো উঠে না। কিন্তু সব পাওয়াকেই কি মানুষ বোঝে ? আমার সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা বুঝিয়া সুঝিয়া পাওয়াই দ্বিতীয়বার পাওয়া—আলো পাইয়াই আছি, মাতৃস্নেহ পাইয়াই আছি। দুয়ার খুলিয়া রাখিলেই বুঝিব যে আলো পাইয়া আছি।

ক্রমশঃ

বন্ধুবরেষু

॥ সুগত ॥

লিখতে বসে লেখার কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। কী লিখবো? অনেকদিন লিখিনি। লেখার তাগিদ আসে নানা দিক থেকে। অনেকেরই ভাল লেগেছে 'বন্ধুবরেষু'। তাই লেখা বন্ধ করার পর প্রায়ই আবার কলম ধরার জন্ত অনুরোধ আসছে। অনুরোধ রাখতে আবার কলম ধরেছি। কিন্তু কী লিখি?

পাশে বসেছিলেন এক সাহিত্যের ছাত্র। বললেন, কেন, লিখুন না—এই হিন্দীর জুলুম নিয়ে।

হিন্দী নিয়ে দীর্ঘ দিন আলাপ আলোচনা চলছে। সেই আলোচনা আজ বিতর্কে এসে দাঁড়িয়েছে। কেন এই অত্যাচার? শেখার আগ্রহে ভালবেসে একটি ভাষা শেখা এক, আর জোর করে ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া আর এক ভিন্ন জিনিষ।

আমাদের সমস্তা অনেক। খাদ্য সমস্তা, বেকার সমস্তা, শিক্ষা সমস্তা, বাস্তুহারা সমস্তা ···এমনি কত সমস্তা আমাদের সামনে। সমাধান কোনটারই হয়নি। আশু সম্ভাবনাও নেই। এর ওপর আর একটা সমস্তা যুক্ত হল। এর মীমাংসা কবে হবে কে জানে!

সূচনাতেই যে বেদনাদায়ক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, সেটা যে হতে পারে এ ধারণা কি কর্তৃপক্ষের ছিল না? আগেই বলেছি, ভালবেসে শেখা আর জোর করে শেখানোর মধ্যে পার্থক্য অনেকখানি।

হিন্দী শেখার প্রতি আগ্রহ মানুষের জেগেছিল। শেখা সুরুও হয়েছিল এদিকে ওদিকে। অহিন্দী-ভাষীরা হিন্দী আয়ত্ত করে নিয়ে নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছিলেন। যেমন আমাদের বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগী হয়ে বহু বিদেশী বাংলা শিখছেন।

এই শেখার মধ্যে রয়েছে অনুরাগ। এই অনুরাগই বিদেশীদের আকৃষ্ট করেছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শেখার প্রতি। এর মধ্যে কোন জুলুম নেই।

কিন্তু হিন্দীকে হঠাৎ এমন করে চাপিয়ে দিয়ে নতুন একটা সমস্তা সৃষ্টি করার কারণ কি?

যেখানে আমরা সহ-অবস্থানের কথা ভাবছি, এক বিশ্ব-সৃষ্টির কল্পনা করছি, সেখানে অকারণেই এই বিদ্বেষ সৃষ্টির কারণ সত্যিই খুঁজে পাওয়া যায় না।

এক শ্রেণীর আধিপত্য বিস্তারই কি এর কারণ?

রাজনীতি বুঝি না। তবু এই যদি কারণ হয়ে থাকে তো বলবো পথটা ভুল। বড় ভুল পথ। আজকের দিনে জোর করে আধিপত্য বিস্তার করা চলে না। ভাষার ক্ষেত্রে তো নয়ই।

অবশ্য একথাও সত্য যে হিন্দীকে প্রাধান্ত দেবার জন্ত বহুদিন থেকেই চেষ্টা হয়েছে, বহু অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, যে-অর্থ অন্ত কোন কাজে লাগালে অনেক বেশি সুফলপ্রসূ হতে পারতো। কিন্তু কেন জানি না ইংরাজীকে সরিয়ে এত তাড়াতাড়ি হিন্দীকে সেই স্থানে বসাবার এই অপ-প্রয়াস।

হিন্দী ভাষা দুর্বল। রাষ্ট্র ভাষা হবার যোগ্যতা তার নেই বটে, কিন্তু একেবারে অগ্রাহ্য করার মতো ভাষাও তো নয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক ভাষার চেয়ে সে সবল। তার সাহিত্যও আছে, যাতে অন্য ভাষা-ভাষী আকৃষ্ট হতে পারে।

কিন্তু এ কী কাণ্ড ঘটানো হলো? একটি ভাষার প্রতি এমন বিদ্বেষ জাগানো হল কেন?

আজ হিন্দী ভাষার প্রতি অহিন্দীভাষীদের যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হলো, সে বিদ্বেষ ভাষার প্রতি যত না, তার অনেক বেশি এই জোর করে চাপানোর বিরুদ্ধে। ধীরে ধীরে সেই বিদ্বেষ ভাষার ওপর এসে যাচ্ছে।

ইংরেজরা আমাদের দেশ শাসন করেছে প্রায় দু'শো বছর। এই দুশো বছরের ইতিহাস অত্যন্ত করুণ আমাদের অনেক কিছু তারা হরণ করেছে, যা পূরণ করতে সুদীর্ঘকাল সাপেক্ষ। তবুও আমরা ওদের ভাষাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছি কেন? এই আঁকড়ে থাকার মধ্যে কোন জোর জুলুম নেই, প্রয়োজন নেই আছে সেই ভাষার ব্যাপকতার প্রতি তথা সমৃদ্ধির প্রতি

অনুরাগ।

তাই বলছি, পথটা বড় ভুল হয়ে গেছে। যে-পথে সংহতি আনার চেষ্টা করছি, সে-পথই সংহতি বিনষ্টির পথ। পথ বদলাতে হবে। ইংরাজী ভাষা থাক না আরও কিছুদিন। ক্ষতি কি? চিরদিন তাকে রাখা চলবে না এবং উচিতও নয় সে তো সত্যি। কিন্তু যতদিন না অন্য কোন ভাষা তার স্থান অধিকার করার যোগ্যতা অর্জন করেছে, ততদিন সে থাকুকই না।

আর সমস্যা যখন আমাদের অসংখ্য তখন সমস্যা সৃষ্টি না করে সেই সমস্যাগুলোর সমাধানের দিকে আর একটু বেশি মনোযোগ দিলে ক্ষতিটা কি? কাগজে কলমে সমস্যার অনেক সমাধান হচ্ছে বটে, কিন্তু সত্যিকার সমাধান হচ্ছে কতটুকু?

চতুর্দিকের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও হতাশার ছবি যখন নজরে পড়ে, কানে যায় প্রতিদিন সাধারণ মানুষের নানা অভাব-অভিযোগের কথা, একটা বলিষ্ঠ জীবন-বোধের অভাব যখন সর্বত্রই পরিস্ফুট, তখন সত্যিই কেমন যেন নিজেও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ি। মনে হয়, কী লিখবো? লিখে কি হবে?

ভারতবর্ষ ও আমি

॥ শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

অর্ধ-নিমীলিত আঁখি বিচ্ছেদ কাতর
কান্নার সমুদ্র আজ অশান্ত উন্মাদ;
আঁকা বাঁকা কল্পনার রঙিন আলোকে
এলায়িতা তুমি পাশে একান্ত আপন।

তোমার উচ্ছল ঢেউ ফেনিল মদির
মায়াবী গভীর স্পর্শে সুখী পরস্পর:
নিঃসঙ্গ অধীর কাঁপা কোমল প্রদোষে
বাঁচার আনন্দে বাঁচি মাথা রাখি বুকে।

তখন ভাবিনি এত! আজ লজ্জা ঘ্যানে,—
এ সমুদ্র শুরু হবে জীবন সীমায়;
পীতার আলোকে আমি আজ চেয়ে দেখি
স্মৃতির কাঁপন-জাগা জীর্ণ ক্লান্ত মন!

আমরা-দু'জন পথে একান্ত তন্ময়ে,—
চেয়ে দেখি শূন্য মনে মিথ্যে কলরব।

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীনিত্যগোপাল ॥

[যোগাচার্য অবধূত শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব-প্রণীত 'সিদ্ধান্ত দর্শন' পুস্তকখানি চিন্তার জগতে একটী যুগান্তকারী রচনা। শ্রীনিত্যগোপালের সর্ব সমন্বয়ের সামগ্রিক জীবন-চেতনা বুঝিতে হইলে এই পুস্তক বিশেষ সাহায্য করিবে। আমরা এ চিন্তাটি অনেকের সামনে তুলিয়া ধরিবার জন্য 'উদ্ধারণভারতে' প্রতি মাসে একটি পৃষ্ঠায় ইহা প্রথম হইতে প্রকাশ করিয়া যাইব। পাঠক নিশ্চয়ই ইহা পাঠে আনন্দ পাইবেন।—সঃ, উদ্ধারণভারত]

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় বস্তুই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ- প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে, দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া, সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেইজন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আবৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়-নির্দেশিত "সর্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ত্রয়ীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনা-'খণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত'।"

শ্রীনিত্যগোপাল।

প্রথম ভাগ

প্রথম সিদ্ধান্ত

মিথ্যা যাহা, তাহা নাই। তোমার মতে মায়া মিথ্যা, সুতরাং তাহাও নাই। সুতরাং তাহা কাহারও ক্ষতি করিতে পারে না। ১।

যদি বল মায়া আছে, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই সত্য। মায়া সত্য স্বীকৃত হইলে, মায়ার প্রত্যেক কার্যও সত্য স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে মায়ার প্রত্যেক কার্যের ফলও স্বীকার করিতে হয় ২।

মায়া সত্য স্বীকার করিলে মায়াকে অনিত্যও বলা যায় না, কারণ সত্য কখনই অনিত্য হইতে পারে না। বেদান্ত এবং নানা উপনিষদে ব্রহ্মকে সত্য বলা হইয়াছে; সেইজন্য ঐ সকল গ্রন্থমতে ব্রহ্মও নিত্য। ব্রহ্মের নিত্যতার ন্যায় মায়ারও নিত্যতা স্বীকার করিলে, উভয়ের সমতাও স্বীকার করিতে হয়। ৩।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত

যে শক্তি প্রভাবে আমি আছি বোধ করা হয়, বেদান্ত এবং নানা বৈদান্তিক গ্রন্থে সেই শক্তিকেই অহঙ্কার বলা হইয়াছে। বেদান্ত এবং নানা বৈদান্তিক গ্রন্থানুসারে সেই শক্তি মায়িক। মায়িক যাহা, বেদান্ত এবং নানা বৈদান্তিক গ্রন্থে তাহাকেই অসত্য বলা হইয়াছে। বেদান্ত এবং নানা বৈদান্তিক গ্রন্থানুসারে অহঙ্কার মায়িক, সুতরাং তাহাও অসত্য বলা যাইতে পারে। ১।

বেদান্ত ও বেদান্তসম্বন্ধীয় নানা গ্রন্থানুসারে অহঙ্কার মায়িক তত্রাপি অহঙ্কার ব্যতীত নিজ অস্তিত্ব পর্যন্তও বোধ হয় না, এবং তাহা ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্ব বোধ হইবার নহে; সুতরাং আত্ম-জ্ঞানের অস্তিত্ব বোধও সেই অহঙ্কারের অস্তিত্ব বশতঃই হইয়া থাকে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অনিত্য-অসত্য দ্বারা নিত্য-সত্যের অস্তিত্ব-বোধ হয়, ইহা ভাবিতেও যে যুক্তিযুক্ত হইতে হয়। অন্ধকার দ্বারা আলোক দর্শন যেরূপ অসম্ভব, তদ্রূপ অসত্য দ্বারা নিত্য-সত্যকে জানা অসম্ভব। ২।

(ক্রমশঃ

মুণ্ডকোপনিষৎ

অবধূত ভাষ্য সমেত

দ্বিতীয় মুণ্ডক

প্রথম খণ্ড

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে। ৮

পুরুষোত্তম-জ্ঞানফল আলোচিত হইতেছে। ভিদ্যতে [ভিন্ন হইয়া যায়] হৃদয়গ্রন্থিঃ [হৃদয়ের গাঁট ; জীবনস্রোতে যাহা ছিল হৃদয়ে সংহত, অথচ সহজভাবেই দেহের সর্ব্বত্র অনাবিলভাবে অবাধে বিচরণ করিত, সেই জীবনস্রোত যখন কোনও অঙ্গবিশেষে, ইন্দ্রিয়বিশেষে বা বৃত্তিবিশেষে আটকাইয়া গিয়া তাহার স্বাভাবিক চলন-ধর্ম্ম পরিহার করিয়া গাঁটের সৃষ্টি করে , পুরুষোত্তম-জ্ঞানে সেই গাঁটগুলি সব নিজেদের মাঝের গোঁজামিলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আবার সহজভাবে সকলের সঙ্গে মিলিয়া যায়। প্রত্যেক মানুষের জীবনে যে কত গেরো (গ্রন্থি) আছে, যাহার জন্য সে আর আগাইতে পারে না, সেই সব গেরো গলিয়া পুরুষোত্তম-জীবনের পরশ পাইয়া] ছিদ্যন্তে [ছিন্ন হয়] সর্ব্ব সংশয়া [সংশয়সমূহ; সমানমানেক ধর্ম্মোপপত্তে বিপ্রতিপত্তেশ্চ উপলব্ধ্যনুপলব্ধ অব্যবস্থিতিঃ বিশেষাপেক্ষঃ বিমর্শঃ সংশয়ঃ—ন্যায়দর্শন। একই ধর্ম্মীকে আশ্রয় করিয়া যখন সমান অনেক ধর্ম্ম উপপন্ন হয়, এবং বিপ্রতিপন্নও হয়, বিপরীত ধর্ম্মেরও প্রতিপত্তি হয়, তখন ইহাদের মধ্যে উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির কোনও ব্যবস্থা না থাকায় জন্য কোনও বিশেষের অপেক্ষা করিয়া যে বিমর্ষ, তাহাই সংশয়। পুরুষোত্তমে যখন সমান অনেক ধর্ম্ম, সব বিজাতীয় ধর্ম্ম প্রতিপন্ন ও বিপ্রতিপন্ন, তাঁহার জীবনে যখন কখন কোন্ ধর্ম্ম উপলব্ধ হইবে এবং কখনই বা অনুপলব্ধ থাকিবে ইহার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা বিরাজ করিতেছে এবং প্রত্যেকের বিশেষত্ব যখন তাহার জীবনে রক্ষিতই হইতেছে, তখন আর সংশয়ের অবকাশ কোথায়? সামান্য প্রত্যক্ষাৎ বিশেষাপ্রত্যক্ষাৎ বিশেষস্মৃতেশ্চ সংশয়ঃ—বৈশেষিক। যখন সামান্য প্রত্যক্ষ, বিশেষ অপ্রত্যক্ষ অথচ বিশেষের স্মৃতি বর্ত্তমান, তখনই সংশয়ের সৃষ্টি। পুরুষোত্তম-জীবনে 'সামান্য বিশেষে একতা রতি' চণ্ডীদাস। তিনি ভাব রূপে সামান্য, রসরূপে বৈশিষ্ট্যের গৌরব দান করিয়া সকল সংশয়ের অবসান করিয়াছেন] ক্ষীয়ন্তে চ [এবং ক্ষয় পাইয়া যায়] অস্য [পুরুষোত্তম বিজ্ঞানী পুরুষের] কর্ম্মাণি [প্রাক্তন কর্ম্ম তো ক্ষয় হয়ই, প্রারব্ধ কর্ম্মও ক্ষয় হয় ; শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন ভক্তিতে প্রারব্ধও কাটে, তবে তীব্র সংবেগ না হইলে শিথিল ভক্তিতে প্রাক্তনই কাটে, প্রারব্ধ কাটে না। পুরুষোত্তম-বিজ্ঞানে প্রাক্তন প্রারব্ধ সব গলিয়া যায়। সব জন্মের সঙ্গেই পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং তা সে জন্মের পিছনে যত শক্তই প্রারব্ধ কর্ম্মের বীজ থাকুক না কেন। প্রতি জন্মের পশ্চাতে রহিয়াছেন পুরুষোত্তম অবিদ্যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া ; এই সৃষ্টি যখন আসে তখন পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল রূপ যে কর্ম্মের ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা পুরুষোত্তম-মূল হওয়ার ফলে পুরুষোত্তমরূপতা প্রাপ্ত হয়, পুরুষোত্তম-সেবাতেই সে ফলের উপযোগ হয়, যদিও বাহিরের রূপ যেমনটী পূর্ব্বে দেখিতে ছিল, ঠিক তেমনই থাকে। প্রারব্ধ কর্ম্মের 'বিষ' সব নীলকণ্ঠ পান করিয়া নিজে প্রারব্ধ স্থাপন করিয়া যেন। যে সাধনার আরম্ভ মূল হইতে, সেখানে কর্ম্মের আর জাতি-বিচার থাকে না। 'অজ্ঞানিজনযোগার্থং প্রারব্ধং বক্তি বৈ'—শ্রুতি। কর্ম্মের ও

কর্ম্ম ফলের একটা যোগসূত্র দুর্ব্বলমেধা পুরুষদের সামনে ধরাইবার জন্যই প্রারম্ভের গঠন হয় না বলিয়াছেন।] তস্মিন্ দৃষ্টে [তাঁহাকে-দৃষ্ট হইলে] পরাবরে [পর এবং অবর; যিনি জ্ঞানীদের কাছে পর-রূপে, কর্ম্মীদের কাছে অবর রূপে, তথাকথিত নিরক্ষরের উপাসক কোন্ হীন পুলিন্দ পুরুষদের কাছে অবর দেবতারূপে পূজিত, সেই পরদেবতা ও অবর দেবতার সমন্বয়-মূর্ত্তিই পরাবর পুরুষোত্তম]।

সেই পরাবর পুরুষোত্তম পুরুষ দৃষ্ট হইলে হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন হয়, প্রাক্তন প্রারব্ধ সব কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥ ৯

হিরণ্ময়ে [চক্ চকে, ঝক্ ঝকে আলোময়, জ্যোতিঃ-ঘন] পরে [পর] কোশে [কোশ অর্থ ধন, ভোগোপযোগের খাপ, কোশাগার ধনের ভাণ্ডার, রাজকোশ, আবরণ (কাঁঠালের কোঁয়া বা কোশ), জীবকোষ (cell); আবরণ হইতে আবৃতের সম্পূর্ণ পার্থক্য প্রমাণ করিতে হইলে "অসির খাপ"—অর্থই নিতে হয়; আবরণ ও আবৃত অভিন্ন প্রমাণ করিতে হইলে জীবকোষ অর্থই সর্ব্বাপেক্ষা সুসঙ্গত। বাস্তবিক আলোময়, স্বচ্ছ, সরল, জড়-চৈতন্যের অব্যবধান মিলনযুক্ত জীবকোষেই ব্রহ্মের পূর্ণ প্রতিষ্ঠান; Each cell must live for itself as well as for the organism। জীবকোষের মধ্যে জড়-চেতন, জীব-পরমাত্মা সমস্বার্থ, সমপরার্থ; স্বার্থ-পরার্থের মন কষাকষি জীবকোষে নাই] (সুতরাং) বিরজং [রজোরহিত; শক্তির কাড়াকাড়ি-রহিত, নির্ধন, অমানী-মানদ, নিজের মানদণ্ডে গৌড়ামীশূন্য এবং অন্যের মানদণ্ডের প্রতি মানদই বিরজ; দাবাইয়া রাখিবার মনোবৃত্তি রহিত] ব্রহ্ম [ব্রহ্ম] (-অবস্থিত) নিষ্কলম্ [সকল কলাকে, অংশকে পূর্ণ করিয়া, অবয়বে দিয়া, পরস্পরের সংক্রমণে সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিবার মত আকর্ষণ পরস্পরের যুক্তে সঞ্চারিত করিয়া যিনি সেখানে "ন" রূপে লুকাইয়া] তৎ [তিনি] শুভ্রং [ধবধবে] তৎ [তিনি] জ্যোতিষাং [তেজোময় অগ্নি প্রভৃতির] জ্যোতিঃ [জ্যোতিষ্মরূপ যিনি সকলের জ্যোতি যোগান] যৎ [যাহাকে আত্মবিদঃ [জীবাত্মা পরমাত্মার ভেদাভেদ-দর্শনশূন্য আত্মজ্ঞানীর দল] বিদুঃ [জানেন]

হিরণ্ময় পর কোশে বিরজ নিষ্কল ব্রহ্ম অবস্থিত তিনি শুভ্র, তিনি জ্যোতিষ্মানদের জ্যোতি, যাঁহাকে আত্মজ্ঞানীরা জানেন।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১০

তত্র [সেই আত্মবৃত ব্রহ্মে] সূর্য্যঃ [সর্ব্ব বস্তুর প্রকাশক সূর্য্য] ন ভাতি [প্রকাশ পায় না, সূর্য্যের লাগালের বাহির] ন চন্দ্রতারকম্ [চন্দ্র তারকা নয়] ন ইমা বিদ্যুতঃ [এই সব বিদ্যুৎ নয়] ভান্তি [প্রকাশ পায়] কুতঃ [কোথা হইতে] অয়ং অগ্নি [এই অগ্নি ইহা এব তমেব ভান্তম্ অনুভাতি [প্রকাশমান তাহার পিছনে পিছনে প্রকাশিত হয়] সর্ব্বম্ [সব কিছু] তস্য ভা [তাহার দীপ্তি দ্বারা] সর্ব্বম্ ইদম্ [এই সব] বিভা [বিবিধ রূপে প্রকাশশীল হয়। মন্ত্রটি পড়িলে মনে হইতে পারে যে, জড় পিণ্ড বলিয়া সূর্য্য-চন্দ্র-তারকা প্রভৃতি কোনও স্থান যেন ব্রহ্মে নাই এবং সূর্য্য-চন্দ্র-তারকা-বিদ্যুৎ যেন জ্যোতিঃহীন পদার্থই ছিল, ব্রহ্ম বাহির হইতে যে আলো যোগাইয়াই তাহাদিগকে প্রকাশশীল করিয়াছেন স্বতন্ত্র আলোময় ব্রহ্মের কাছ হইতে আলো ধার করিয়া যেন ইহারা আলোকিত করিবার যোগ্য হইয়াছে ব্যাপারটা বাস্তবিক তাহা নয়। আলো ও জড় পিণ্ডে এমন ব্যবধান কোনও দিন ছিল না, ব্রহ্মও অন্যনিরপেক্ষ পর হইয়া আলো ধার যেন নাই। কোনও দিনই এমন পার্থক্য ছিল না। ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা হইতেছে যে, সূ

আদি পূর্ণভাবে নিজের মধ্যে প্রকাশশীল হইয়াও নিজেদের বুকে তাহারই অতীত আলোর রাজ্য রহিয়াছে। সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি খণ্ড জ্যোতিঃ বলিয়াই অখণ্ড-জ্যোতিঃ পুরুষের সব খানি রহস্য প্রকাশ করিতে পারে না। উপাসক যখন সমগ্রের চাঁদে নিজ চক্ষু প্রভৃতি গড়িয়া তোলেন তখন সেই সমগ্র সূর্যদেবতা চক্ষু নিশ্চয়ই সেখানে প্রকাশিত হয়।

সেখানে সূর্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্রতারকাও নয়, এই বিদ্যুৎ সকলও নয়; অগ্নির আর কথা কি? প্রকাশমান তাঁহার অনুসরণ করিয়াই সব প্রকাশ পায়, তাহার দীপ্তিতেই এই সব প্রকাশিত হয়। ২।২।১০

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥১১

পুরুষোত্তম-তত্ত্বে দাঁড়াইয়া পুরুষোত্তমতন্ত্র হইলে দেখা যাইবে, যে জগৎ বস্তুতন্ত্রতার ফলে নিত্যাত্বে পরিণত হইয়াছিল, তাহাই যেন পুরুষোত্তমের মোহন মায়াময় দৃষ্টি-স্পর্শে দ্বিতীয়বার সৃষ্ট হইয়া পুরুষোত্তম স্বরূপে, পুরুষোত্তম-রূপেই উদ্ভাসিত হইতেছেন] ব্রহ্ম এব [ব্রহ্মই; শুধু স্বরূপে নয়, রূপেও] ইদম্ [এই যা-কিছু চোখের সামনে ভাসিতেছে] অমৃত [অমৃতের টুকরা] পুরস্তাৎ [সামনে] ব্রহ্ম, পশ্চাৎ [পিছনে] ব্রহ্ম দক্ষিণতঃ [দক্ষিণে] উত্তরতঃ চ [এবং উত্তর দিকে] অধঃ [অধোদিকে] ঊর্দ্ধং চ [এবং ঊর্দ্ধদিকে] প্রসৃতম্ [ছড়ানো] ব্রহ্ম এব [ব্রহ্মই] ইদং বিশ্বম্ [এই বিশ্ব] ইদং [ইনিই] বরিষ্ঠং [বরতম; বিশ্ব অখণ্ড রূপে তিনি; বিরাট হইলেও প্রতি খণ্ডের স্বগাদি-তুল্য বাহির তিনি, অন্তর্নিহিত সার তিনি, তাহার অতীতও তিনি। তিনি জীবের সবটুকু ঘিরিয়া, সব হইয়া, সবের বুকের মধ্যে থাকিয়া; অথচ বাহিরে দাঁড়াইয়া আবার লীলায় ভোল খাইয়া জীবের সবটুকুর মাঝে হৃদয় হইয়া, জীবের সার ধন নীলমণি হইয়া সবের অন্তরে বাহিরে মনোমোহন বেশে সব আমার, আমার সব, অথচ আমার কিছু না, তাঁহারও আমি বিনা, ইহার তাঁহার, জীবের, বিশ্বের পারমার্থিক সম্বন্ধ; সব 'না'-এর সম্বন্ধে, সব হাঁ-এর সম্বন্ধে সম্বন্ধ এই সব তিনি; শুধুই তিনি, শুধুই আমি, শুধুই আমি-তিনি, তিনি-আমি, বিশ্ব তিনি আমি।

এইসব ব্রহ্মই; তিনি সামনে, পশ্চাতে, তিনি দক্ষিণে, উত্তরে, অধঃ ও ঊর্দ্ধে ছড়ানো, ব্রহ্মই এই সব: ইনিই বরিষ্ঠ। ২।২।১১

দ্বিতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

তৃতীয় মুণ্ডক

প্রথম খণ্ড

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত-
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥১

(যে পন্থা বিদ্যাদ্বারা পুরুষোত্তম-বস্তু অধিগত হয়, তাহা বিবৃত হইয়াছে; পরাবিদ্যার ফল মায়াময় বিশ্ব-সৃষ্টিকে যোগমায়াবন পুরুষোত্তম-সৃষ্টিতে গড়িয়া তোলার কথা শুনানো হইয়াছে, পরাবিদ্যার সাধনা দক্ষরাদি মন্ত্র দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে; এখন দৃষ্টান্ত সহযোগে খুলিয়া দেখানো হইতেছে যে বিদ্যাসাধনার লক্ষ্য এই পুরুষোত্তম-বস্তু কি স্বরূপতঃ একান্ত অদ্বৈত, না দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বিত অদ্বৈত? এই সত্য নির্দ্ধারিত হওয়ার উপর নির্ভর করিতেছে সমস্ত মুখ্য ও সহকারী সাধনার মূল রহস্যজ্ঞান। জীব যদি স্বরূপতঃ 'মায়ি', তখন সর্ব সাধনা হইবে নিগ্রহ মূলক, সঙ্কোচনমূলক, বিনাশমূলক, যাহার ফলে জীবের সব-কিছু মায়া-প্রকাশ নিগৃহীত হইবে, সঙ্কুচিত হইবে, সর্বশেষে একেবারে মুছিয়া যাইবে। পক্ষান্তরে যদি জীবও তাহার মত সনাতন হয়, তবে সাধনাগুলিকে এমন কৌশলে পরিচালিত করিতে হইবে যাহাতে সব বন্ধন ভাঙা জীবত্ব থাকিয়াও পুরুষোত্তম-ভাবত্ব হইতে পারে অথচ নিগ্রহ-সঙ্কোচ-

বিনাশের ভিতর দিয়া যাহা চলিয়া হইয়াছিল তাহাও পরিপূর্ণ বজায় থাকে] দ্বা [দৌ, দুইটী] সুপর্ণা [সুপর্ণৌ শোভন পাখাবিশিষ্ট, স্বচ্ছন্দচলাদি হেতু পর্ণাদি —গীতা] সযুজা [সযুজৌ, সর্ব্বদা সহভাবে যুক্ত] সখায়া [সখায়ৌ ; সমান আখ্যাবিশিষ্ট, সমান অভিব্যক্তিযুক্ত 'সমপ্রাণ দুইটী সখা, 'সমপ্রাণঃ সখা মতঃ'] সমানং [একই] বৃক্ষম্ [বৃক্ষকে, শরীরকে] পরিষস্বজাতে [আলিঙ্গন করিয়া আছেন। এই বৃক্ষই ঊর্দ্ধমূল, পুরুষোত্তমমূল সংসারবৃক্ষ ; এই একই বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে জীব ও ঈশ্বর দুইটী শোভন পতনযুক্ত আত্মা, সমান ভাবে সংসার ফল ভোগ করিবার জন্য] তয়োঃ [তাহাদের মধ্যে] অন্যঃ [জীব] পিপ্পলং [ফল, সুখদুঃখলক্ষণ কর্ম্মফল] স্বাদু [বেশ রস লাগাইয়া] অত্তি [খাইতেছে] অনশ্নন্ [না খাইয়া] অন্যঃ [জীবের অন্য, ঈশ্বর] অভিচাকশীতি [দর্শন করেন। জীব-ঈশ্বর দুইটী পক্ষী সখাভাবে সম্যক্ যুক্ত থাকিলেও সমান বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া ফলভোগের বেলা দুই পৃথক-অন্ন হইয়াছেন ; একজন মজা করিয়া ফল ভোগ করিতেছেন, আর 'অন্য' দূরে দাঁড়াইয়া শুধুই দেখিতেছেন, অশনের অংশ তিনি পাইতেছেন না ; বা স্বেচ্ছায় লইতেছেন না। এক ঘরে ঘর করিয়া দুয়ের সঙ্গে এ ব্যবধান কেন আসিল, কোথা হইতে আসিল, ইহা লইয়া প্রচুর মাথা ঘামানো হইয়াছে। ঈশ্বরের এই না-খাওয়াটা (অনশ্নন্) কি তাঁহার পারমার্থিক, না জীব ফল অর্পণ করিল না বলিয়াই তাহার অশন সম্ভব হইল না? 'একাত্মনাপি দেহভেদং গতং তৌ, চৈতন্যাখ্যং প্রকটমুনা তত্তয়ং চৈক্যমাপ্তম্'—শ্রীরাধাকৃষ্ণ একাত্ম হইলেও যেমন বৃন্দাবনে দ্বাপর যুগে দেহভেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই দেহভেদ প্রাপ্ত দুই দেহ আবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে ঐক্য প্রাপ্ত হইয়াছে ; পুরুষোত্তমের লীলাশক্তি কখনও দুইকে দুই রাখিয়া দুইয়ের বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তোলেন, আবার পরক্ষণেই দুইকে এক করিয়া গলাইয়া তাদৈক্য প্রদর্শন করেন, আবার সেই একত্বে-দুই ভাগে ভাগ করিয়া পারমার্থিক রসলীলার বিস্তার করেন। বিশ্বব্যাপার মায়াশক্তি যাহার ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই, তাহাদের যোগমায়া লীলাশক্তি 'একোঽহং বহুস্যাম্ প্রজায়েয়' মন্ত্রকে যাচ্যার্থেই পারমার্থিক বলিতেছেন। মায়াশক্তি ব্যাপার জগৎ নাস্তি, ব্রহ্ম অস্তি ; লীলাশক্তির ব্যাপার জগৎ নাস্তি রূপে হল, সত্তা, পারমার্থিক negative ; ব্রহ্ম অস্তিরূপে ভান, সত্তা, পারমার্থিক positive। লীলাশক্তি তত্ত্বের 'অশন্' ও 'অনশন্'-এর সমন্বয় স্বীকার করেন দুইয়েরই তুল্য মূল্য দিয়া, অনশন্-কে নিরুপাধি বলিয়া গৌরবান্বিত করিয়া এবং অশনকে হেয়, উপাধি বলিয়া নয় ; পুরুষোত্তম সব চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা—গীতা বলিতেছেন—খাইয়া না-খাওয়াএবং না-খাইয়াও খাওয়ার সমন্বয় গীতা স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন—"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ"—কর্ম্ম ও অকর্ম্মের সামানাধিকরণ্যই আস্বাদন করাইবার জন্য কর্ম্ম ও অকর্ম্ম দুই-ই দুইয়ের অধিকরণ কারক এবং ইহার জন্য দুইবার বলা হইয়াছে। অকর্ম্মকে মুখ্য রাখিয়া কর্ম্মকে গৌণ করা শ্লোকের উপর ব্যাখ্যার জুলুম ছাড়া আর কিছু নয় ; জীবের সঙ্গে যেখানে ঈশ্বরের যখন লীলায় সম-ভোজন বা সম-অভোজন, তখন জীব জীব থাকেন না, জীব হন ভক্ত, ঈশ্বর হন ভগবান। ভক্ত-ভগবান মিলিতভাবই এক পুরুষোত্তম। 'এক' যখন লীলায়িত হইয়া দুই হন, এবং যখন দুই পরস্পরের বৈশিষ্ট্য রক্ষার ভিতর পরস্পর পরস্পর হইতে পৃথক হন, তখন তাহারা কার্য্যোপাধি জীব ও কারণোপাধি ঈশ্বররূপে পরিণত হন, মাঝখানে থাকে বিক্ষেপ-আবরণ শক্তিময়ী মায়াশক্তি ; মায়াশক্তি দুইকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দুনিয়ায় জীবকে ভ্রমণ করাইয়া, রস সংগ্রহ করাইয়া লীলার মধ্যে এক-বহু সমন্বিত এক করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রেরণা দিতেছেন। এক হইয়া যাহা গোপন-প্রেমে কণ্বমুনির আশ্রমে দুনিয়ার অন্তরালে দুষ্মন্ত শকুন্তলা মিলনের মত মিলিয়াছে, তাহাই ভেদের ক্ষেত্রে, সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়ের আলোছায়া যাচাই করিয়া বহু রূপে আস্বাদন করাইবার জন্য যোগমায়ার এই সংসার সৃষ্টি।　　ক্রমশঃ

সাময়িকী

আনন্দ সংবাদ : বর্তমানসময়ের দুর্যোগপূর্ণ দিনে আনন্দ-সংবাদে মানুষের খুব বেশী থাকে না—আমাদেরও নাই। কিন্তু নরনারায়ণ আশ্রমের শুভানুধ্যায়ীদের জন্য একটি আনন্দ-সংবাদ আছে—ঘটনাচক্রে যাহা তাঁহাদের জানাইতে আমাদের বেশ একটু দেরীই হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আশ্রমের বন্ধুজন জানেন যে আশ্রমে বিগত আগস্ট ১৯৬৪-তে ছোট শিশুদের জন্য একটি প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। আশ্রমে যে পরিমাণ জমি আছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় উপযুক্ত নয় বলিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাই যে আশ্রমের শুভানুধ্যায়ী ভক্টর মিসেস্ আভা সেঠ প্রদত্ত পাঁচ হাজার টাকা দানে ঐ শিশুদের বিদ্যালয়ের জন্য ৬ কাঠা মত জমি ক্রয় করা হইয়াছে বিগত ১৯৬৪-র এপ্রিল মাসে। এজন্য নরনারায়ণ আশ্রমের পক্ষ হইতে এবং বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতেও আমরা শ্রীযুক্তা সেঠকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার এই সহায়তায় বিদ্যালয়টির বিশেষ উপকার হইল। শ্রীযুক্তা সেঠ বিশ বৎসরেরও বেশি প্রথমে গণিতের লেকচারার এবং পরে রিডারের পদে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করিয়াছেন, তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্যাও ছিলেন। জনকল্যাণের কাজেও ভক্টর সেঠ চিরদিন উৎসাহী। তিনি সর্বদাই দরিদ্র, নিরক্ষর ও তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর লোকদের কল্যাণকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। পাটনাতে এই শ্রেণীর শিশুদের জন্য নার্সারী স্কুল, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সূচীশিল্পের শিক্ষাকেন্দ্র তিনি প্রায় বিশ বৎসর চালাইয়াছেন। ইহা ছাড়া অস্পৃশ্যতা প্রথা উচ্ছেদের দিকেও তাঁহার চিরদিন বিশেষ দৃষ্টি ও প্রয়াস আছে। ইনি উত্তর কলিকাতার 'দেশসেবক' স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেঠের পুত্রবধূ এবং চাকা জেলার স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ মিত্রের কন্যা। বর্তমানে ইনি তাঁহার স্বামী শ্রীবাসিকানাথ সেঠ আমেরিকায় আছেন। ভক্টর সেঠ সেখানকার নিউ অরলিয়েন্স সহরের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের এসোসিয়েটেড প্রফেসারের পদে যোগদান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি ও কল্যাণ কামনা করি।

সরস্বতীপূজা :—নরনারায়ণ আশ্রমে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির—প্রাক্ বুনিয়াদী, নিম্নবুনিয়াদী ও সীবনশিক্ষা-কেন্দ্রের—বিশেষ উদ্যোগে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পূজার পর আশ্রমের শ্রীপ্রতিভা রায় ছোটছোট ছেলে-মেয়েদের সরস্বতীপূজা সম্বন্ধে আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত যে ধারায় আলোচনা করিতেন, সেই ধারায় সহজ ভাষায় একটু বলেন. তিনি বলেন, আমরা আজ মা সরস্বতীর পূজা করিতেছি। কেন পূজা করিতেছি, এই পূজার অর্থ কি? এইসব না জানিয়া শুধু পূজা করিলে কোনই ফল হয় না। শুধু হৈ হৈ করিলে তো পূজা হয় না। এই আশ্রম যিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ঐ মন্দিরে যাহার পূজা হয় তোমরা তাঁহার নাম জান? তোমরা কেউ তাঁহাকে দেখ নাই—তিনি এই ৭ বৎসর হয় চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তোমরা তাঁহার নাম জান তো? তাঁহার নাম তোমরা প্রার্থনার মধ্যে গান কর—তাঁহার নাম শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত। তিনি সরস্বতী পূজা করিতেন—কিন্তু কি রকম পূজা ছিল তাঁহার? এই পূজার অর্থ তিনি সবলকে লইয়া বসিয়া আলোচনা করিতেন। তাই তাঁহার আশ্রমের ইস্কুলে পড়িয়া তোমরা সরস্বতীপূজার অর্থ কি তাহা একটু বুঝিতে চেষ্টা কর। শীতের পর বসন্ত আসার ঠিক মাঝখানের সময়ে সরস্বতী পূজা হয়। বনে-বনে শীতে ঘাসপাতা জড়সড় হইয়া যায়। তাহার পরেই বসন্ত ঋতু

আসে—সমস্ত গাছে গাছে ফুল ফোটে, পুরাণ পাতা খসিয়া পড়িয়া নূতন পাতা বাহির হয়, পাখীরা আনন্দে ডাকে, ভ্রমর ফুলে ফুলে মধু খাইয়া বেড়ায়—সব যেন আনন্দে মাতিয়া উঠে। এই সমস্ত আসিবার আগে সরস্বতী পূজা হয়। কেননা সরস্বতী বলের দেবী, সমস্ত জল সব কিছুতে রস আসে বলিয়াই নূতন পাতা হয়, ফুল ফোটে। অর্থাৎ মানুষ খুশী হইয়া উঠে। খুশী হইবার আগে খুশীর দেবীকে প্রণাম জানাইতে হয়। প্রণাম জানান মানে খুশী হইয়া আমরা কিভাবে চলিব ফিরিব, আমাদের খুশীটাকে কিভাবে প্রকাশ করিব তাহা দেবীর নিকট হইতে, মায়ের নিকট হইতে জানিয়া লওয়া। পূজা মানে আমাদের স্রষ্টা, আমাদের বিশ্ব মাকে দিয়া আমরা কেমন করিয়া খুশী হইব তাহাই শিখিয়া লওয়া। মায়ের এক হাতে বীণা, আর এক হাতে পুস্তক। বীণার ঝঙ্কারে মানুষ আনন্দে আত্মহারা হইবে, কিন্তু তাহার আনন্দ যাহাতে তাহাকে খারাপ পথে লইয়া না যায় তাহারই জন্য তিনি আমাদের দিবেন—সেই বিদ্যা তিনি দিবেন, তাই তিনি বিদ্যা-দায়িনী, তাই তাঁহার হাতে পুস্তক। সরস্বতী শুধু আমাদের ইস্কুলের লেখাপড়াই শিখাইবেন না, কি রকম করিয়া খুশী হইতে হয়, আনন্দ পাইতে হয় সেই বিদ্যাও শুধু শিখাইবেন না, ভগবানকে জানার যে বিদ্যা তাহাও তাঁহার নিকট হইতে শেখা যায়। তাই তিনি ব্রহ্মবিদ্যা-দায়িনী। ভগবানকে জানিতে পারিলেই এই সংসারে থাকিয়াও মানুষ ইহার মধ্যে পচিয়া মরে না। তাই মায়ের কাছ হইতে আমরা যাহাতে এই সংসারে মানুষের মত মানুষ হইতে পারি, এই সংসারে যাহাতে পচিয়া না মরি, সেই আশীর্বাদ চাহিয়া লইব, সেই বিদ্যা শিখিয়া লইব। আমরা বলিব, মা, আমাদেরকে তোমার মত পবিত্র কর, সুন্দর কর, আমাদিগকে সত্যিকার মানুষ কর। আমাদের ঘরে যেমন আমাদের মা আছেন, এই বিরাট জগতেরও একজন মা নিশ্চয়ই আছেন—সেই মা সরস্বতী—তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহার নিকট আশীর্বাদ পাইবার জন্যই আজ আমাদের এত আয়োজন।

পূজা ও অঞ্জলি অন্তে ছেলেমেয়েদের খিচুরী প্রসাদ দেওয়া হয়।

নরনারায়ণ সেবায়ন শিক্ষাকেন্দ্র : গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী আশ্রমস্থ মহিলা সেবায়ন শিক্ষাকেন্দ্রের বার্ষিক প্রদর্শনীর শেষ দিবসে ডিপ্লোমা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বুনিয়াদী শিক্ষার ডেপুটী চীফ ইন্সপেকটার শ্রীশিক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের আশ্রম-গঠনের আদর্শকে স্মরণ করা হয়। পরে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের বালিকারা আবৃত্তি ও ছড়াসঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করে। ইহার পর একদিকে বুনিয়াদীর ছেলেমেয়েরা সুতা কাটে আর একদিকে সেবায়ন শিক্ষাকেন্দ্রের সেলাই প্রদর্শনী দেখান হয়। সেলাইগুলির বিচারও হয়। অতঃপর সভাপতি ৬ জনকে লেডী ব্রাবোর্ণ প্রাথমিক ও মিড্‌ল ডিপ্লোমা এবং সেলাইগুলির পুরস্কার বিতরণ করেন। সেলাইর তিন বিভাগে—কাটিং এম্‌ব্রয়ডারী ও উল—তিনটী পুরস্কার দেওয়া হয়। ইহার পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে আশ্রমের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাইয়া প্রাক্ বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে বলেন যে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে উপযুক্ত হইবার জন্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখ্যতঃ খেলাধূলার গল্প-সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রস্তুত হইতে হয়। আনন্দময় পরিবেশই ইহার বৈশিষ্ট্য। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলেন তাঁহাদেরও এই সমস্ত শিশুদের বন্ধু হইয়া শিক্ষা দিতে হইবে। তাড়াহুড়া না করিয়া শিশুরা সহজে আনন্দের মধ্যে যেটুকু গ্রহণ করিতে পারে, সেই ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে। পরিশেষে তিনি বিদ্যালয়ের কর্মে সন্তোষ প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে বহু ছেলে মেয়ে বয়স্কা মহিলা ও ভদ্রলোকেরা উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বারুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও

UJJWAL BHARAT

FORM IV

(See Rule 8)

1.	Place of Publication	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
2.	Periodicity of its publication	...	Monthly.
3.	Printer's Name	...	RENU MITRA M. A.
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
4.	Publisher's Name	...	RENU MITRA M. A.
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
5.	Editor's Name	...	RENU MITRA M. A.
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
6.	Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital	...	RENU MITRA M. A. Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.

I, RENU MITRA, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 26th February, 1965.

Sd. RENU MITRA,
Signature of the Publisher.

UJJWAL BHARAT

FORM IV

(See Rule 8)

1.	Place of Publication	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
2.	Periodicity of its publication	...	Monthly.
3.	Printer's Name	...	Renu Mitra M. A.
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
4.	Publisher's Name	...	Renu Mitra M. A.
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
5.	Editor's Name	...	Renu Mitra M. A.
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
6.	Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital	...	Renu Mitra M. A. Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.

I, Renu Mitra, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 26th February, 1965.

Sd. Renu Mitra,
Signature of the Publisher.

খাঁটি ভারতীয়ও নহে। মিলে মিশে যা হয়েছি তার মধ্যেও খাঁটি ভাব কিছু নেই, আমাদের আজ তাই কোন ভিত্তি-ভূমি নেই। শ্রীনিত্যগোপাল যে জীবনবোধ তাঁর জীবন ও দর্শনের মধ্য দিয়ে রেখে গেছেন, তাতে যে সমস্ত আচার আচরণ সর্ব মানবীয় বা বিশ্বনাগরিকত্ব বোধের বিপরীত বা বিরুদ্ধ তা যেমন থাকছে না, আবার যে জীবন-বোধ স্থূল ইন্দ্রিয়াদি অতিক্রম সীমায় সীমিত, তাতেও আঁকড়ে থাকবে তা-ও নয়। শ্রীনিত্যগোপাল বললেন, রূপরসের এই যে জগৎটা—এক রকম করে চলাফেরার ফলে, ব্যবহার করার ফলে এটা বন্ধনের কারণ হয়ে ওঠে, এর থেকে কেবল ক্লেদ উঠতে থাকে, আবার আর এক রকম করে চলার ফলে, ব্যবহার করার ফলে এ আনন্দের জন্ম দিয়ে থাকে। এ বিশ্বটা এই জন্যই কোনমতে পুরান হল না যে এর কোন কিছুই মার্কামারা এক রকম নয়। একই বস্তু সুখেরও কারণ হয়, দুঃখেরও কারণ হয়। নিত্য-গোপাল লিখছেন, 'অগ্নিতে উপকার ও অপকার উভয়ই হইয়া থাকে। জলে উপকার অপকার উভয়ই হয়। প্রত্যেক পদার্থ দ্বারাই মনুষ্যের উপকার অপকার উভয়ই হয়'। জ্ঞান ও অনুভূতির সমগ্রতা ছিল না বলেই বস্তুকে এতদিন সমগ্রভাবে দেখা সম্ভব হয় নি—যে যেরকম করে যতটুকু দেখেছে সে ততটুকুকেই সমগ্র করে ধরেছে। শ্রীনিত্যগোপাল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সহায়ে বস্তুর সব রকম রূপেরই বিচার করে দেখবার কথা বলেছেন। বিপরীত বা বিরুদ্ধ মেলে না, এই আমরা জানতাম। তাই আত্মা অনাত্মা, জড় অজড় প্রভৃতি বিভিন্ন নামে যে দুইটী বস্তু বা ধারণা আছে তাদের বৈপরীত্য আমাদের মুগ্ধ করেছে, আমরা তাদের অন্তর্নিহিত অভেদত্ব খুঁজে পাই নি। শ্রীনিত্যগোপাল লিখছেন "উভয়ের বৈপরীত্যের ঐক্য কি প্রকারে প্রমাণ করা যায়? দুইটী পরস্পর স্বতন্ত্র ধর্মাবলম্বী বিপরীত পদার্থের ঐক্য হইতে পারে কি না? ঐক্য থাকিতে পারে কি না? ঐক্য থাকা সম্ভব হয় কি না? ঐ বিপরীতের পরস্পর অভেদত্ব প্রদর্শন করা যায়। তোমরা উভয়েই জান একই কাল। কিন্তু সেই একই কালের ছয় ঋতু দ্বারা ছয় প্রকার বিকাশ বুঝিতে পারা যায়। ছয় ঋতুর স্বাতন্ত্র্য, অনৈক্য বা বৈপরীত্যও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ছয় ঋতুর পার্থক্য আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি। অথচ সেই ছয় ঋতুই কি একই কাল নহে? অবশ্যই ছয় ঋতুই একই কাল। শীত এবং গ্রীষ্ম ঋতু যে পরস্পর বিপরীত তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। অথচ শীত ঋতুকে শীত কাল এবং গ্রীষ্ম ঋতুকে গ্রীষ্মকাল বলা হয়। বাস্তবিক শীত ঋতুও কাল এবং গ্রীষ্ম ঋতুও কাল। উভয়েই একই কালের দুই প্রকার বিকাশ। অথচ ঐ দুই বিকাশই পরস্পর বিপরীত। শীত গ্রীষ্মের পরস্পর বিপরীততা বুঝি, স্বাতন্ত্র্য বুঝি। অতএব ঐ উভয়ের বৈপরীত্য বা স্বাতন্ত্র্যও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ঐ দুইটি উভয়ে স্বরূপতঃ অভেদ; অর্থাৎ ঐ উভয়ই কাল স্বীকার করিতে হইবে। ঐ দৃষ্টান্তানুসারে বুঝা যায়, দুই প্রকার পদার্থ পরস্পর স্বতন্ত্র বা বিপরীত হইলেও তাহাদের পরস্পর অভেদত্ব, অস্বাতন্ত্র্য, অবৈপরীত্য বা ঐক্য থাকিতে পারে। সেইজন্য আত্মা বা ব্রহ্ম এবং অনাত্মা বা অব্রহ্ম পরস্পর অনৈক্যসম্পন্ন হইলেও, পরস্পর স্বতন্ত্র হইলেও, পরস্পর বিপরীত হইলেও শ্রুতির 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বচনানুসারে ঐ উভয়ে অভেদ বলা যাইতে পারে। পলতা লতা এবং তজ্জাত পটোল স্বরূপতঃ অভেদ হইলেও রূপতঃ এবং গুণতঃ পরস্পর স্বতন্ত্র বা বিপরীত। ঐ প্রকারে আত্মা ব্রহ্ম বা নির্মায়ার সহিত অনাত্মার অব্রহ্মের বা মায়ার পরস্পর অনৈক্য, স্বাতন্ত্র্য বা বৈপরীত্য থাকিলেও তাহারা পরস্পর অভেদ। গোলাপ-ফুলের গাছে কণ্টক আছে, গোলাপ ফুলে কণ্টক নাই। গোলাপ গাছের সহিত গোলাপ ফুলের রূপতঃ এবং গুণতঃ পার্থক্য আছে, বৈপরীত্য আছে, স্বাতন্ত্র্য আছে। অথচ ঐ উভয়েই স্বরূপতঃ যেমন পরস্পর এক বা অভেদ তদ্রূপ আত্মা ব্রহ্ম বা নির্মায়া ● ● ●। বদরীতে কণ্টক নাই, কিন্তু বদরীবৃক্ষে অনেক কণ্টক আছে। বদরী এবং তাহার বৃক্ষের কণ্টকসকল স্বরূপতঃ অভেদ হইলেও রূপতঃ এবং গুণতঃ পরস্পর পার্থক্য, স্বাতন্ত্র্য বা বৈপরীত্য আছে। ঐ প্রকারে আত্মা ব্রহ্ম নির্মায়া এবং অনাত্মা অব্রহ্ম বা মায়া পরস্পর বিপরীত হইলেও স্বরূপতঃ পরস্পর এক বা অভেদ।

কয়েকটী উদাহরণদ্বারা আত্মা ব্রহ্ম বা নির্মায়ার সহিত অনাত্মার অব্রহ্মের বা মায়ার স্বাতন্ত্র্য এবং অদ্বৈতত্ব, বৈপরীত্য এবং অবৈপরীত্য দেখান হইল। ঐ সকল দৃষ্টান্তানুসারেই নিত্যানিত্যের, ব্রহ্ম-অব্রহ্মের, আত্মা-অনাত্মার বা মায়া-নির্মায়ার অভেদত্ব এবং প্রভেদত্ব উভয়ই বুঝিতে হয়"।—বিবিধতত্ত্ব ২৭৮, ৩৭৯

উদ্ধৃতি বড় হয়ে যাচ্ছে—তবু আরও একটা দৃষ্টান্ত তুলে আমরা দেখাতে চেষ্টা করব যে শ্রীনিত্যগোপালের যুক্তি বাস্তবিকতার বৈজ্ঞানিকতাকে কত বেশী রক্ষা করে চলেছে। তিনি লিখেছেন, 'একটি পক্ক আম রহিয়াছে। আমটীর ত্বক্ বা খোসাও আম, (আমটীর আঁটিও আম), আমটীর শাঁসও আম।...ব্রহ্ম নামক আমের শাঁস আত্মা। ব্রহ্ম নামক আমের খোসা ত্বক বা আবরণ মায়া। আত্মাও ব্রহ্মময়, মায়াও ব্রহ্মময়। আত্মা আত্মজ্ঞানীর জন্য। মায়া অনাত্মজ্ঞানী বা অজ্ঞানী পশুর জন্য। আত্মারও প্রয়োজন আছে, মায়ারও প্রয়োজন আছে'।—বিবিধতত্ত্ব ৩৮০

এই ভাবে বিপরীতের মধ্যেকার অভেদত্ব ও প্রভেদত্ব দেখিয়ে শ্রীনিত্যগোপাল বিপরীতের সমন্বয়বার্তা রেখে গেছেন। এই দৃষ্টিতে বিশ্বের সব বৈচিত্র্য নিয়েই আমরা মিলে মিশে বাস করতে পারি। সে বাস করতে হলে নিজেদেরকে আমাদেরকে বড় করতে হবে, ব্যাপক করতে হবে, বিশ্বকে দেখতে হবে সেই ব্যাপকতর গভীরতর দৃষ্টিতে। তখন বিশ্বও আমাদের কাছে সত্য, বিশ্বনাথও আমাদের কাছে সত্য; তখন পাশ্চাত্যের প্রবল আমাদেরকে স্থিতিচ্যুত করতে পারবে না, তখন বিশ্বনাথের অন্বেষণে আমরা বাস্তবকে, তাঁরই গড়া এই জগৎকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে এখানে অপমান লাঞ্ছনা অসত্যকে সহ্য করব না—আমরা এইখানে মানুষের মত মানুষ হয়েই বিশ্বনাথের গৌরব রক্ষা করব।

এই ভাবে শ্রীনিত্যগোপালের জীবন-চেতনাকে বা শ্রীনিত্যগোপালের ধর্মকে অনুসরণ করলে প্রচলিত ধর্ম-ভাবের আমূল পরিবর্তন এসে যাচ্ছে। আজ ধর্মের ক্ষেত্রে সমাজের ক্ষেত্রে পুরাণো মানদণ্ড সব ভেঙ্গে গেছে, নূতন মানদণ্ড কিন্তু সৃষ্টি হয়ে ওঠে নি—তাই মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্বের শেষ নেই। জীবনধারণের নূতন মানদণ্ড সৃষ্টি হয়ে উঠবার জন্য নূতন জীবন-বোধ চাই—সেই নূতন জীবন-বোধ দিতেই শ্রীনিত্যগোপালের আসা। এই নূতন মানদণ্ড স্থিরীকৃত হলে কিছুকালের জন্য মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে দ্বন্দ্বের অনেকটা অবসান হবে, মানুষ অনেকটা শান্তি ও আনন্দ উপলব্ধি করতে পারবে।

এই নূতন জীবন-বোধ শ্রীনিত্যগোপালের দার্শনিক চিন্তাধারায় যেমন আছে, তেমনি আছে তাঁর জীবন-যাপনে। এইজন্য তাঁর জীবনে নির্বিকল্প সমাধিরও বিশেষ বাহুল্য, আবার তিনি বলেন, 'আমি বিশ্ব নাগরিক'। সেই জন্য তাঁর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, 'ট্যাঁকে টাকা আর সমাধি নিত্যগোপালেই সম্ভব'। বিশ্বকে নিয়ে থাকতে হলে তাই টাকার প্রয়োজন আছে। কিন্তু টাকা থাকলেও যার সমাধি নষ্ট হয় না, বিশ্বনাথের সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ ব্যাহত হয় না, সেই তিনিই বর্তমান বিশ্বের দেবতা, যুগদেবতা—শ্রীনিত্যগোপালের প্রয়োজন এই-খানে। তিনি বিশ্বে সকলকে নিয়ে সকলের হয়ে বাস করবার পথের কথা বলেছেন, এমন করে বাস করতে বলেছেন যে এইটেই জাগ্রত জীবন হয়ে ওঠে, রূপরসের জগৎটা যেখানে ক্লেদের জন্ম না দিয়ে আনন্দের জন্ম দেয়, তাই স্থূল বাস্তবের ক্ষুদ্রতার মধ্যে তিনি নেই, এদেরকে তিনি বিচরণের কৌশল দ্বারা নূতনতর রূপে আস্বাদন করে গেছেন, আবার এর বাইরে বিশ্বনাথের সঙ্গে সমাধি যোগে যুক্ত হতেও তাঁর এতটুকু দেরী হয় না। জাগ্রত বিশ্বের বাইরে গিয়ে, সব ঘটনার বাইরে এসে সমাধি বা সমাধান আজকের দিনের কথা নয়—সমস্ত ঘটনাবৈচিত্র্য রেখে সুস্থ থাকতে পারি কি না প্রয়োজন আজ সেইটে। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ বলেছেন যে, ক্লোরোফরম করে সব করার অর্থ কিছুই হয় না, মাথা কেটে মাথা ব্যথা দূর করার অর্থ কি হয়? জাগ্রত থেকে, বিশ্বের রূপরসের বিকৃতি দূর করে, তার আসক্তি বিদ্বেষের বশীভূত না হয়ে তাকে আনন্দময় করে তোলা যায়, এইটেই নিত্যগোপালের কথা; মাথা রেখে মাথা ব্যথা দূর করা যায়, এইটে নিত্যগোপালের কথা।

আজকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকৃতি দিয়ে আমরা পীড়িত হয়ে পড়ছি। শ্রীনিত্যগোপালের উক্তিগুলির মধ্যে আছে প্রত্যেক বস্তু বা অবস্থার স্বাতন্ত্র্য ও অস্বাতন্ত্র্য দুটোই সত্য এই কথা। ব্যক্তির ক্ষেত্রেও তাই—ব্যক্তি স্বতন্ত্র, সে আবার অস্বতন্ত্রও অর্থাৎ পরতন্ত্রও। স্বাতন্ত্র্যের অহংকারে উঁচু মাথা যে আবার অস্বাতন্ত্র্যের বিনয়ের মধ্যে নীচু করতে পারে না, পরতন্ত্র হতে পারে না, সে অসুন্দর। তার উৎকট স্বাতন্ত্র্যবাদ বিশ্বে অচল। তাই যার যার ক্ষেত্রে সে অনন্ত হয়ে তখনই সুন্দর যখন সে সমগ্রের মধ্যে বিধৃত, সমগ্রের সঙ্গে যখন সে নিজেকে বেঁধে রাখে। এমন করে জীবনের আচরণকে সমগ্র সত্যের সুরে বেঁধে নিলেই ব্যষ্টি-জীবন ও সমষ্টি-জীবন সুন্দর সার্থক হতে পারে। শ্রীনিত্যগোপাল সেই কথা বলে গেছেন। তাই তাঁকে আজ প্রয়োজন। সত্যের দুই দিক আত্মপ্রকাশ করে যখে যখে মানুষকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে—আজ সমগ্রের সুরটি কোথায় তাই খুঁজে নিতে হবে—সে সুর শ্রীনিত্যগোপাল রেখে গেছেন।

শুক্লা বাসন্তী অষ্টমীতে একশত দশ বৎসর আগে শ্রীনিত্যগোপাল এসেছিলেন, আজ আবার বাসন্তী অষ্টমী এসেছে। আজ আমাদের আনন্দ করবার দিন, আজকের এই দিনটী আমাদের এমন একজনকে দিয়েছে যিনি আমাদের পরম সুহৃৎ, পরম ভরসাস্থল; যিনি আমাদের পরম জ্ঞান, পরম আনন্দ ও পরম বৈরাগ্যের খোঁজ দিয়েছেন, যিনি আমাদের বিশ্বের সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে বাস করবার কথা বলেছেন, এক-জগৎ রচনা হতে পারে যে পথে সেই পথের কথা বলেছেন, ভারতবর্ষ তার ধর্মভাবকে যে চিন্তাধারায় গতিশীল সুস্থ সামগ্রিক জীবনের পরিপোষক করতে পারে, সেই চিন্তাধারা দিয়েছেন। তাই তাঁকে আমাদের সমগ্র সত্তার আহ্বান জানাই, প্রণাম জানাই; তিনি প্রকাশিত হোন তাঁর তত্ত্বমূর্তিতে সমস্ত মানুষের মধ্যে। মানুষ সুস্থ হলেই বিশ্বের তাপ কমবে, ভীতি কমবে—বিশ্বের চেহারা বদলে যাবে। জয় হোক শ্রীনিত্যগোপালের, জয় হোক শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের, আর জয় হোক সর্ব্ব মানুষের।

শ্রীনিত্যগোপাল-বাণী

অধিক সম্ভ্রম থাকিলে, অধিক যশ থাকিলে, অধিক রূপ থাকিলে, অধিক যৌবন থাকিলে এবং অধিক বিদ্যা থাকিলেও যিনি অহঙ্কারী হন না তিনিই প্রকৃত সাধু।

এই জগৎ আমার সম্বন্ধে একটী পবিত্র তীর্থ।

অনাত্মজ্ঞানী পুরুষের পক্ষে অনাত্মজ্ঞান সম্পন্না প্রকৃতি নরকের দ্বার। অনাত্মজ্ঞানসম্পন্না প্রকৃতির পক্ষে অনাত্মজ্ঞানী পুরুষও নরকের দ্বার।

স্ত্রীলোকেরও যোগ এবং তপস্যাতে অধিকার আছে। শ্রীবিষ্ণুর অবতার ভগবান কপিলদেবের মাতা দেবহূতী যোগিনী এবং তপস্বিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার সমাধিও হইত। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ শ্রীভাগবত পুরাণের তৃতীয় স্কন্ধে বিবৃত হইয়াছে।—বিবিধতত্ত্ব

ভগবান শ্রীনিত্যগোপাল ও তাঁহার বৈপ্লবিক চিন্তাধারা

॥ শ্রীবিষ্ণুপদ রায় ॥

পৃথিবীতে মনুষ্য জন্মাইবার পর হইতে ভগবান বহুরূপ ধারণ করিয়া মর্ত্যধূলিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং বিশ্বের মনুষ্য সমাজকে বহু মত ও পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। ভগবান যুগে যুগে আসেন আর তাঁহার আসার একটা বিরাট প্রয়োজনও রহিয়াছে।

ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের বিনাশসাধন করিবার জন্য যুগে যুগে তিনি আসিয়াছেন এবং আগামীকালেও তিনি আসিবেন। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধের কথা আমরা প্রত্যেকেই শুনিয়াছি এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর জানি, কিন্তু শ্রীনিত্যগোপাল সম্বন্ধে খুব কম লোকই আমরা জানি। এই শ্রীনিত্যগোপাল সম্বন্ধেই এখানে কিছু আলোচনা করিব।

ভগবান শ্রীনিত্যগোপাল যে জীবনদর্শন লইয়া মর্ত্যভূমির ধূলিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইহা দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পাঁচসহস্রাধিক বৎসর পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-প্রবর্তিত সমন্বয় ধর্ম আরও ব্যাপক ও গভীর করিয়া মনুষ্যলোকের করিবার জন্য ভগবান শ্রীনিত্যগোপাল দেবের আগমন। ভারতবর্ষ এতদিন ধরিয়া যে সব চিন্তা, ভাবনা, আচার, অনুষ্ঠান করিয়াছে, যে সব মুনিঋষি নূতন নূতন চিন্তাধারার উদ্ভাবন করিয়াছেন, দেখা যায় সে সমস্ত চিন্তাধারার মধ্যে বিস্তর বৈষম্য রহিয়াছে। এতদিন ভারতবর্ষ মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণ কৌলীন্যের দেশ ছিল, পুরুষতন্ত্রের উপর ভিত্তি করিয়া শাস্ত্রাদি প্রণীত হইয়াছে, সমাজ সংগঠন হইয়াছে, বৈষয়িক জগতের মূল্যায়ণ নির্ধারিত হইয়াছে। ফলে বিপরীত দিকটি শোষিত, নির্যাতিত হইয়াছে। আজ বিশ্বের সম্মুখে অতীতের চিন্তাধারার ফাঁকগুলি ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, আর তাহার ভিত্তিভূমি সমূলে উৎপাটিত হইবারও উপক্রম দেখা যাইতেছে। বর্ণাশ্রম পন্থীদের সম্মুখে, ব্রাহ্মণের সম্মুখে, কুলীনের সম্মুখে ধনিকের সম্মুখে তথা পৃথিবীর সমস্ত শোষক সম্প্রদায়ের আজ বড় ফাঁপরে পড়িয়াছে, তাঁহাদের সম্মুখে কোন খোলামেলা পথ আজ আর খাকিতেছেনা। সহস্র সহস্র বৎসরের নিষ্পেষিত মানবাত্মা আজ রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন—কোথায় পথ আজ? দেশের ও জাতির জীবনে যেমন এক বিরাট ভাঙাগড়ার দিন আজ—তেমনি পথও বড় বিপদসংকুল। আজ এই দিনে কাহারো একচেটিয়া মতবাদ চলিবেনা, কোন এক শ্রেণীর মানুষ অপর একশ্রেণীর মানুষকে ঠকাইয়া, ঘৃণা করিয়া চলিতে পারিবেনা। বিশ্ব আজ এক নূতন পথের দিকে ধাবিত হইয়াছে, সে যেন কোন এক রহস্যলোকে সমস্ত মনুষ্য সমাজকে লইয়া চলিয়াছে—কে জানে। আজিকার দিন দেখিয়া যেমন আনন্দবোধ হয়, তেমনি শ্রীনিত্যগোপাল জীবন-দর্শন-তত্ত্ব লইয়া হৃদয়ে আশারও অন্ত নাই। সমস্ত মানুষ যদি আজ বলেন দেশ আজ অধর্ম্মের দিকে যাইতেছে, মানুষ ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইতেছে তথাপি আমরা তাহা মানিতে রাজি নহি। আমরা বিশ্বাস করি বিশ্ব আজ এক নূতন উন্নত সভ্যতার মার্গে পৌঁছাইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে যাহার ফলে সমাজের এই উর্ধ্বপতন। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আজ একত্রিত হইবার জন্য আকুলি বিকুলি করিতেছে, বিশ্বের সমস্ত ধর্ম, একত্রিত হইবার জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে—তাই বুঝি কাহার ধর্ম আজ আর টিকিতেছেনা। আজ নূতন বিশ্বের নূতন সভ্যতার আলোকবর্তিকা যাহাদের চোখে এখনো সমুজ্জ্ব

হইয়া উঠিতেছেনা, তাহাদের সেই অতীতের অন্ধকার রাজপুরীর বন্দীশালায় ফিরিয়া যাওয়াই শ্রেয়।

শ্রীনিত্যগোপাল সর্বধর্ম, সর্বমত ও পথের সমন্বয়মূর্তি। তাঁহার নিজস্ব বলিয়া কোন মত নাই, নিজস্ব কোন দল নাই। তিনি বলিয়াছেন "সকলকে লইয়া আমার এক অখণ্ড দল। I am a Cosmopolitan, আমি বিশ্ব-নাগরিক"। তিনি পৃথিবীর সমস্ত ভগবান নামধেয় মানুষের নাম স্মরণ করিয়া সমাধিস্থ হইয়াছেন, কখনো বা অশ্রু বিসর্জন করিয়াছেন। মানুষ মানুষকে ঘৃণা করিবে এ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। মানুষের জন্য তিনি অহরহ কাঁদিয়াছেন। তাঁহার শ্রীচরণপদ্মে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল, এমনকি বারবনিতার পতিতা পর্যন্তও আশ্রয় পাইয়াছেন। ঐকদেশদর্শী জীবনাদর্শ প্রচার করিতে তিনি আসেন নাই—তিনি বিশ্বমানবের পূজারী। সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ গার্হস্থ্য হেয়, পুরুষ শ্রেষ্ঠ নারী হেয়, ব্রাহ্মণ পূজিত অব্রাহ্মণ লাঞ্ছিত, এমন শাস্ত্র পথ ও মত তিনি দিতে আসেন নাই। তাঁহার জীবন-দর্শনে ও তত্ত্বে পৃথিবীর যে কোন মানুষের স্থান আছে এবং তাহা সমগ্র ও ব্যাপক দৃষ্টির আলোকে। তাই তিনি বলেন, "মহা-সিদ্ধাবস্থায় গার্হস্থ্য সন্ন্যাস এক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ গার্হস্থ্য হেয় এ বোধও বন্ধন"। চিন্তাশীল ব্যক্তি আশাকরি একথার তাৎপর্য ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করিতে পারিবেন। কিন্তু বড় বিস্ময়ের কথা আমরা সংসার হেয়, নারী নরকের দ্বার বলিয়া এখনো সাধু সাজিতে লজ্জাবোধ করিনা। কেন মানুষ এমন হয়! কেন মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে? মানুষ যে এই কঠিন ভেদের প্রাচীর তুলিয়া চলিতেছে, ইহা কোন্ ভগবানের তৈয়ারী? ইহা কি আজ প্রবল বন্যার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে না! বিশ্বসংসারে মানুষ সৃষ্টি হইবার পর হইতে শ্রীভগবান যতবার আবির্ভূত হইয়াছেন, একবারও কি তিনি জীবকে উচ্চ-নীচের ভেদের কাঁটালে, দ্বেষের অন্ধকার আবর্তে ফেলিয়াছেন? এ পর্যন্ত আমরা যত ভগবান নামধেয় মানুষকে জানি—তাঁহাদের কাহারও মুখে তো মানব-প্রেম ছাড়া অন্য কথা শুনিনা। অথচ মানুষের সহিত মানুষের ভেদের প্রাচীর কাহারা এতদিন পোষণ করিয়াছেন? আজ তাহা বুঝিবার, ভাবিবার, অনুভব ও অনুতাপ করিবার দিন সমাগত হইয়াছে। ধর্মের সংস্কার সাধন করিবারও দিন সমাগত। আজ বিশ্বে বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া মানুষ চলিতে চায়—মানুষ ধর্মকে চায় আজ হাতুড়ী-বাটালী চালনার মধ্যে, ব্যাবসা, বানিজ্য, রাজনীতি প্রভৃতির মধ্যে। কিন্তু এতদিন যে ধর্মাচরণ করিতে আমরা শিখিয়াছিলাম তাহাতে কি আজিকার মানুষের চলিবে? চলিবেনা। ধর্ম কতকগুলি শাস্ত্রের বাক্য নয় অথবা তন্ত্র মন্ত্র পূজা অর্চনাও নয়। যে ধর্ম মানুষকে উদার হইতে শিখায় না, মহৎ হইতে শিখায় না, বোদ্ধা হইতে শিখায় না, সে ধর্ম দিয়া আজ আমাদের প্রয়োজন কিসের! শ্রীনিত্যগোপাল বলিয়াছেন "ভবিষ্যতে পৃথিবীর সমস্ত জাতি একজাতি হইবে, সমস্ত জাতি এক ধর্ম মানিবে; তখন ধর্ম সম্বন্ধে কাহারও কোন বিদ্বেষ থাকিবে না"। আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় থাকিব। শ্রীনিত্যগোপাল-দেবের আশ্রিত হইয়া অন্ততঃ এইটুকু অনুভব করিয়াছি ধর্ম বলিতে যাহা বুঝায় তাহা নেতিবাচী নহে—তাহা বিশ্বের মানুষের সংগে মানুষের একত্রিত হইয়া থাকিবার জন্য প্রেরণা।

আজ শতাধিক বৎসর বিগত হইয়াছে কিন্তু শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের জীবনাদর্শ এখনো তেমন প্রচারিত হইতেছেনা, ইহা জাতির তথা প্রতিটি মানুষেরই বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আজিকার মানুষের সমাজ, সংসার, জাতি, কুল, ধর্ম সবই যাওয়ার পথে অথচ কাহারো সম্মুখে কোন শক্ত আদর্শ নাই যাহাকে অবলম্বন করিয়া মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজ জীবনে, পারিবারিক জীবনে সুখ থাকিতে পারে। শ্রীনিত্যগোপাল এমনই এক তত্ত্বধন জীবন যাহাকে সম্মুখে রাখিয়া সমস্ত জটিল কুটিল আবেষ্টনের মধ্যে চলিয়াও অক্ষত অবস্থায় থাকা যায়। মানুষ সংসার করিয়া কি করিয়া সাধু থাকিতে পারে, রাজনীতি করিয়া কি করিয়া সাধু থাকিতে পারে, জীবনের সমস্ত ঘটনার স্বরূপ দিয়া পরিপূর্ণ মানুষ

থাকিতে পারে তাহা শ্রীনিত্যগোপাল-জীবনে ও তবে আছে। সংসার ত্যাগ করিয়া ভগবান পাওয়ার কথা তিনি বলেন না। গীতার মহাবাক্য—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ৪.১১

কি আশ্বাসের কথা। মানুষকে তাহার স্বধর্মচ্যুত হইয়া ভগবানকে পাইতে হইবেনা, যে যেখানে আছে সে সেইখান হইতেই ভগবানের আশ্রয় লাভ করিতে পারে। সূর্যের আলো যেমন ব্রাহ্মণের ঘর হইতে মেথরের ঘর পর্যন্ত সমান ভাবে আসিয়া পড়িতেছে, ভগবানের করুণা কি তেমন করিয়া মানুষের উপর পড়িতেছেনা? যে ভগবানকে পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিবে ভগবান তাহার ঘরে প্রবেশ করিবেন। আজ আর কাহাকেও ব্রাহ্মণ হইয়া ভগবানকে পাইতে হইবেনা। শাস্ত্র বলিতেছেন "ব্রহ্ম জানাতি স ব্রাহ্মণঃ"—ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইবেন। টিকি দাড়ির বহর আজ তেমন বড় একটা দেখা যায়না। ঐ ঘরে—অঘরে দেখা যাইতেছে মুচির ঘরে ব্রাহ্মণ, মেথরের ঘরে ব্রাহ্মণ, চামারের ঘরে ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ আজ হইবে নিজ চরিত্রের মহিমায়—বংশ মর্যাদায় বা টিকি, দাড়ি, পৈতার জোরে নয়। শাস্ত্রের কথায় শুনি ব্রহ্মজ্ঞানীদের নাকি কেহ আপনপর থাকে না—তাঁহারা বিশ্বের সমস্ত কিছুকে আপন বলিয়া অনুভব করেন। এখানে উপনিষদের একটি মন্ত্র আস্বাদন করা যাক—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ ৬

যিনি সর্বভূতের মধ্যে আত্মাকে দর্শন করেন এবং আত্মার মধ্যে সর্বভূতকে দর্শন করেন, যাহার ফলে তিনি বিশ্বের আর কোন কিছুকেই জুগুপ্সিত করিতে বা নিন্দা করিতে পারেননা। তবে ভারতবর্ষের সাধুদের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের প্রাচীর কেন? তাঁহারা কি সর্বভূতে আত্মদর্শন করিতে নারাজ? শ্রীনিত্যগোপাল এইখানে ব্রাহ্মণ বিপ্লবী। তিনি মানুষের মধ্যেকার এই ব্যক্তিকৈন্দ্রিক বা গোষ্টিকৈন্দ্রিক মনোভাবকে ভাঙিয়া বিশ্বের মাঝে টানিয়া আনিয়া বিশ্বকৈন্দ্রিক করিতে চান। শ্রীনিত্যগোপাল আসিয়াছেন ভাগবতধর্ম প্রচার করিবার জন্য। সে ধর্মের প্রচারক ভগবান স্বয়ং নিজেই। ভগবান কেমন করিয়া সংসার করিয়াছেন, সন্ন্যাস করিয়াছেন তাহা আজ আমাদের তাঁহার নিকট হইতেই শিক্ষালাভ করিতে হইবে। এক জাতির সহিত আর এক জাতির কোথায় মিল আছে তাহা আজ বাহির করিতে হইবে। আপনি একজাতের লোক আর আমি একজাতের লোক অতএব আপনার সহিত আমার মেলেনা—ইহা আর চলেনা, চলিবে না—ইহা ভাগবতধর্মের কথাও নয়। আজ জগতের সমস্ত জাতি লইয়া একজাতি হইবার আহ্বান দুয়ারে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। অতীতের চিন্তাধারার লেজুড় ধরিয়া বসিয়া থাকিবার সময় আজ আর নাই। বিশ্বকবির ভাষায়:—

"পুরাণো সকল নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা
আর চলিবেনা।
বকনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি,
কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি,
তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর পানে
দিতে হবে পাড়ি।"

আজ যে পাড়ি দিবার দিন। যাহারা নূতন যুগে যুগধর্ম খুঁজিয়া পাইতেছেন না তাহাদের খুবই দুর্দিন আজ, অন্যদিকে যাহারা নূতন যুগের সন্ধান পাইয়াছে তাহারা বিশ্বের রহস্যের কথা চিন্তা করিয়া সত্যসত্যই পুলকিত ও আনন্দিত। গেরুয়া নিলেই সাধু হয়না মন্ত্রগ্রহণ করিলেই মানুষ রাতারাতি একটা মস্ত কিছু সাধুলভ্য হয় না যতক্ষণ না ভিতরের মনটি বদল হয় আজকাল নামের জোরে, এবং প্রাচীন সংস্কারের উপর ভিত্তি করিয়া অনেকেই গুরু সাজিয়া বসিয়া রহিয়াছেন মানুষকে দীক্ষা দিয়া থাকেন এবং ভারতীয় জনসাধারণ প্রাচীন সংস্কারের বশবর্তী হইয়া তাহা গ্রহণও করে কিন্তু প্রশ্ন শুধু একটি,—কোন্ মানুষটি সত্যভাবে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে আপন ভাই বলিয়া বুঝিবার ও ভাবিবার

সুযোগ বা প্রাণ পাইতেছেন? আজ ধর্মের ক্ষেত্রে আসিয়াছে বিপ্লব। কোন একজাতীয় বাঁধাধরা নিয়মে আজ আর জীবন চলেনা, সংসার চলেনা, কিছুই চলেনা; আপনি কি বলিবেন ধর্ম চলিবে? চলিবেনা। শ্রীনিত্যগোপালের ভাষায় ভাষা মিলাইয়া আজ যে সকলের বিশ্বনাগরিক হইতে হইবে। আপনাকে হিন্দু হইয়া হিন্দু ধর্মের উপর উঠিতে হইবে, খৃষ্টান হইয়া খৃষ্টধর্মের উপর উঠিতে হইবে, আপনাকে বিশ্বনাগরিক হইতেই হইবে। চণ্ডীদাসের ভাষায় "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই"। ধর্ম মানুষের জন্য, ধর্ম লইয়া যখন মানুষে মানুষে চলে বিদ্বেষ হিংসা, তখন সে ধর্ম দিয়া আমাদের কি হইবে! মানুষ বাঁচিলে ধর্ম বাঁচিবে, মানুষ বাঁচিলে ভগবান থাকিবেন; যেখানে মানুষ নাই, যেখানে মানুষ লইয়া চলে ছিনিমিনি খেলা সেখানে কোন্ বৃহৎ ধর্ম আছে কে জানে। শ্রীনিত্যগোপাল আমাদের মানুষের ঠাকুর। আমরা জানি শ্রীনিত্যগোপালদেবকে ভালবাসিতে হইলে জগতের সমস্ত মানুষকে ভালবাসিতে হয়—সমস্ত উচ্চ-নীচ সকল সম্প্রদায়কেই ভালবাসিতে হয়, সমস্ত ব্যষ্টি-সমষ্টিকে ভালবাসিতে হয়। শ্রীনিত্যগোপাল জীবন-দর্শন এমন ব্যাপক ও বিরাট যাহা জগতের সমস্ত ধর্মকে, জাতিকে, কর্মকে, জ্ঞানকে এমন কি মানুষের জীবনের দৈনন্দিন ছোটখাট ঘটনাকেও একত্রে স্থান দিতে পারে। এবারে ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মানুষ ঐকদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া চলিয়াছে যাহার ফলে পৃথিবীর বুকে এত রক্তপাত সম্ভব হইয়াছে। আমরা এমনই স্বার্থপর যে ভগবানের ইচ্ছাকে বা তাঁহার সামগ্রিক জীবন-বাদকে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নিজেদের স্বপক্ষে অপব্যাখ্যার দ্বারা সমাজকে বিষাক্ত করিয়াছি আর যাহা আমাদের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া মনে করিয়াছি তাহাকে মিথ্যা, ভুল, মায়া ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া সেপছাড়া করিয়াছি। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—We get only what we deserve. It is a lie when we say the world is bad and we are good. I can never be so. It is a terrible lie we tell ourselves.

স্বামীজীর এ-কথা যে কতখানি বাস্তব তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই অনুভব করিতে পারেন। একটা কথা প্রায়ই মনে আসে—সে কথাটি হইল, মানুষ কেন তাহার বুদ্ধির কারসাজি দ্বারা কোটি কোটি মানুষকে লইয়া ছিনি-মিনি খেলিতেছে! কখনো ধর্মের অছিলায়, কখনো বর্ণের অছিলায়, কখনো বা কৌলীন্যের অছিলায়। সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্থানে যে ব্যাপক নরহত্যা সংঘটিত হইয়াছে তাহা কি ধর্মের অছিলায় নহে? বুদ্ধির কারসাজি দ্বারা নহে? যে ধর্মের দ্বারা মানুষে মানুষে ভেদের প্রাচীর প্রসূত হয়, যে ধর্মের দ্বারা মানুষ বিপন্ন হয়, শোণিত হয়, লাঞ্ছিতা হয় তাহা যত শীঘ্রই নষ্ট হয় ততই মঙ্গল। আজ পৃথিবীতে তেমন ধর্মের প্রয়োজন যে ধর্মের মহীরুহের ছায়ায় কোটি কোটি মানুষ ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ সকলেই সমভাবে মূল্য ও মর্যাদা পায়। এজন্য প্রয়োজন United God-এর। জগতে সমস্ত God যদি united হন বা কোন একটি অসামান্য মানুষের জীবনে তাহা সংঘটিত হয় তবেই আজকের বিশ্বের ধর্ম জগতে একটা মস্ত বড় সমস্যার সমাধান হইবে। এখানে বলা বাহুল্য এ গুণটি শ্রীনিত্যগোপালে আছে। কারণ, তাঁহার নিজস্ব বলিয়া কোন স্বতন্ত্র দল বা গোষ্ঠী নাই। শ্রীনিত্যগোপাল-জীবনে জগতের সমস্ত ধর্ম, মত ও পথ একত্রে সমন্বিত হইয়াছে তাহা তাঁহার জীবন ও তাঁহার অলৌকিক জীবন-দর্শন, বিভূতি মহিমা পর্যালোচনা করিলে আমাদের মনে প্রতিভাত হইয়া উঠিবে।

শ্রীনিত্যগোপাল জীবন-দর্শন এতই ব্যাপক ও গভীর যাহা এই সামান্য প্রবন্ধে আলোচনা সম্ভব নহে। স্বামী বিবেকানন্দের আর একটি বাণী আলোচনা করিয়া এ প্রবন্ধের যবনিকা টানিতেছি:—When the life-blood is strong and pure, no disease germ can live in that body. Our life-blood is spirituality. If it flows clear, if it flows strong and pure and vigorous, everything is right; political, social, any other

material defects, even the poverty of the land, will all be cured if that blood is pure। তেমনি কোন সুস্থ জীবন, বা ধর্ম যদি strong and pure হয় তবে তাহাতে কোন সংকীর্ণতার স্থান থাকিতে পারে না, ক্লেদ জন্মিতে পারে না। শ্রীনিত্যগোপালদেবের ভাষায়—"আমিও দল চাই না। দল মেড়ে ভোবাতেই, পঙ্কিল পঙ্ক পরিপূর্ণ পূতিগন্ধযুক্ত পল্বলেই হইয়া থাকে, স্বচ্ছ সরোবরে প্রবাহিনী স্রোতস্বিনী নদীতে হয় না। তবে আমি কে? আমি সকল দলের ভিখারী ভিখারীর জন্য সকল দ্বারই উন্মুক্ত। আমাকে প্রেম ভক্তি ভিক্ষা সকল দলের সাধুরাই দিয়া থাকেন। আমি সকল দলেই ভিক্ষা পাই; সেই জন্য আমার সকল দল লয়ে এক অখণ্ড দল"। কী অপূর্ব স্বচ্ছ, পবিত্র জীবন। মধুর জীবনে কোন্ নোংরা জিনিসের ঠাঁই মিলিবে? এই জীবনই কি স্বামীজীর ভাষায় strong and pure blood নহে! শ্রীনিত্যগোপালদেব ধর্মের ক্ষেত্রে তথা দর্শনের ক্ষেত্রে, চিন্তার ক্ষেত্রে, সাধনার ক্ষেত্রে যে বিরাট প্লাবন আনিয়াছেন, যে বিরাট বিপ্লব আনিয়াছেন তাহাতে বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন রহিয়াছে সমধিক। আমরা তাঁহার বৈপ্লবিক জীবন-দর্শন সম্মুখে রাখিয়া বিশ্বের সমস্ত মানুষের সহিত এক বোধে চলিব। তিনি যেমন করিয়া সংসারের, সন্ন্যাসের, বর্তমান জগতের মূল্য দিয়া চলিয়াছেন আমরাও তেমনি করিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিব। আজ পৃথিবীর দুর্যোগের দিনে ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

নিত্যগোপাল

॥ শ্রীপ্রতিভা রায় ॥

ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে প্রাণের রসধারায় প্রকৃতিরাণী ভরপুর হইয়াছেন। প্রিয় সঙ্গম লালসায় চঞ্চলা ধরণীর বুকে এক আকুল প্রতীক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, এহেন সময়ে পানিহাটি গ্রামে মাতুলালয়ে মাতা গৌরীমণির কোল আলো করিয়া বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে প্রাণ-প্রজ্ঞাঘন মূরতী শ্রীনিত্যগোপাল আবির্ভূত হইলেন মরি মরি সে কি রূপ! 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়'। এ যে রস-ভাব মূরতি শ্রীগৌরাঙ্গ সে রূপরাশী রসোন্মত্তা প্রকৃতির সকল রসকে ভাবের হাঁড়ি-ছানি দিয়া ভাকিল, সে ডাকে চঞ্চলা ধরণী, উন্মত্তা প্রকৃতি মূর্ছা হইল, স্তম্ভিত হইল, প্রাণ প্রিয়তমকে নিকটে পাইয়া নিজেকে নিঃশেষে উজার করিয়া তাঁহার চরণে নিজেকে ডালি দিল। প্রকৃতিরাণী প্রিয়তমের প্রেম স্পর্শে জুড়াইল, শান্ত হইল, পরাপ্রকৃতি রূপে ফুটিয়া উঠিল। প্রিয়তমের আদরে আনন্দে গাহিল—'তোমারি গরবে গরবিণী হাম, রূপসী তোমারি রূপে'। একা রসবতী প্রকৃতি উজ্জ্বল হইয়া পড়িয়া যাইতে বসিয়াছিল,—ভাবের মূরতী শ্রীনিত্যগোপালের মিলনে সে সুস্থ সুন্দর হইল অর্থাৎ তাহার স্বরূপতা প্রাপ্ত হইল। ইহাই হইল তত্ত্বমূর্তি শ্রীনিত্যগোপালের ধরায় অবতরণের প্রয়োজন, ইহাই তাঁহার 'জড়াজড় সমন্বয়' বাণীর তাৎপর্য।

ব্রহ্ম-মায়ার ভেদের উপর গঠিত বিশ্ব পড়িয়া গিয়াছে। বিশ্বনাথ-শূন্য বিশ্ব আজ হানাহানি, জাল-জুয়াচুরীর আগার হইয়াছে। শ্রীনিত্যগোপাল-প্রদত্ত এই জড়ের বুকে, জড়ের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে যদি জড়কে আস্বাদন না করা যায় বিশ্বের এই জটিল সমস্যার সমাধান আর কোনও পথেই হইবার সম্ভাবনা নাই, কেননা ইহা যে মানুষের জীবনের মূলগত প্রশ্ন, এ প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে শ্রীনিত্য-

গোপালের এই সম্বন্ধকে তত্ত্বতঃ বুঝিয়া জীবনে লইতেই হইবে। কাম মানুষকে পাগল করিয়া তোলে, ভোগ-লালসায় সে বিপথে পরিচালিত হয়, এই কামকে শান্ত করিতে হইলে মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইতেই হইবে, নতুবা কামে তো বিশ্ব পুড়িয়া ছারখার হইবেই। মানুষ যখন সব কিছুকে ভেদের দৃষ্টিতে দেখে, নিজ থেকে পৃথক করিয়া রেখে তখনই তাহাকে পাইবার জন্য তাহার মনে দারুণ কাম-লালসা জাগ্রত হয়, তাহাকে ভোগ করিতে বাসনা হয়; কিন্তু মজা এই পুরুষোত্তম-বিশ্বে সকলেরই একটা নিজস্ব পুরুষোত্তম-সত্তা রহিয়াছে, সে অন্যের ভোগ্য হইবে কেন? ধরা দিবে কেন? তখনই আরম্ভ হয় দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। এই দ্বন্দ্বের ভিতর যে মিথুন আছে, ইহা না বুঝিয়া লইলে দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইবে কেমন করিয়া? দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিতে হইলে বিশ্বের সহিত অনন্ত হইতে হইবে, অন্ত বুদ্ধি, পৃথক বুদ্ধি ছাড়িতে হইবে। এই জন্যই শ্রীনিত্যগোপাল বলিলেন—"অল্প অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ। অল্প অগ্নিও অধিক হইতে পারে। পরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ, অপরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ। পরিমিত সচ্চিদানন্দও অপরিমিত সচ্চিদানন্দ হইতে পারে"। বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘণ্ড জড় প্রকৃতির বুকে যে প্রতিনিয়তই ব্রহ্মাদ্বৈত পুরুষ রমণ করিতেছেন, ইহা ভুলিয়া ব্রহ্ম এবং প্রকৃতিকে পৃথক করিয়া দেখার ফলেই জগৎ মিথ্যা, মায়া হইয়াছে। শ্রীনিত্যগোপাল বলিতেছেন—"মায়ার দোষ নাই, দোষ তোমার। অসির দোষ নাই, দোষ তার যে অসি ব্যবহার করে। ভয়-বিহ্বলা হরিণীর ন্যায় যিনি মায়াকে ভয় করিয়া থাকেন, তাহারও নিষ্কৃতি নাই, মায়াকে ভয় করিলে মায়া ত্যাগ হয় না"। মায়াকে ত্যাগ করিলেই ত্যাগ করা যাইবে না, তাহার সহিত ব্যবহার করিবার কৌশল শিখিতে হইবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্' বলিয়াছেন। কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া মায়াকে দেখিলে মায়া যোগমায়া হন্, সেই দৃষ্টিভঙ্গি শিখিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বাঁশী শিখাইয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন আমার সুরে আসিয়া আমার মত হইয়া বাঁশী বাজাও, তবেই তোমার বাঁশীর সুরে যমুনা উজান বহিবে, বকুল ফুল ফুটিবে, বিশ্বব্যাপী শ্যাম-গরবে গরবিণী হইবে। পথ চলার কৌশল শিখিতে হইবে। পুরুষোত্তমানন্দ লিখিলেন—"গীতার কৌশল বুদ্ধি কৌশল ও ভক্তি-কৌশল। মানুষ যে কোনও কর্মের সাধনায় বর্ত্তমান থাকুক না কেন, সব সাধনায়ই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, যদি সে তাহার কৌশলটী জানিতে পারে। পথের তাড়াতাড়ি সাধনার বাড়াবাড়ি গীতায় নাই। হিংসা কিংবা অহিংসা হইতে হইবে ইহার কোন কথাই গীতায় নাই। গীতায় আছে 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে আমি তাহাকে সেই ভাবে ভজনা করি। মানুষ এতদিন ব্রহ্ম-পুরুষ হইতে বিশ্ব প্রকৃতিকে পৃথক করিয়া দেখিয়া ভজনা করিয়াছে, তাহার ফলেই ব্রহ্মের যোগ-রহিত বিশ্ব প্রকৃতি মায়া, মিথ্যা বনিয়া গিয়াছে। শ্রীনিত্যগোপাল তাই জড় অজড়ের সমন্বয়ের কথা, পুরুষ প্রকৃতির সমন্বয়ের কথা, আত্মা অনাত্মার সমন্বয়ের ভজনার কথা শিখাইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহার এই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিশ্বের সহযোগে বিশ্বনাথের ভজনার কলগানে যেদিন বিশ্ব মুখরিত হইবে, সেদিন বিশ্ব জুড়াইবে, শান্ত হইবে। ১২৮১ সনের ১৩ই চৈত্র রবিবার বাসন্তী অষ্টমীর শুভ লগ্নে পানিহাটী গ্রামে শ্রীনিত্যগোপালের আবির্ভাবে বাসন্তী পূজার সন্ধিক্ষণে এই জড়াজড় সমন্বয়ের নহবতই বাজিয়া উঠিয়াছিল। আজও নহবতের সে বাঁশী তেমনি সুরেই বাজিতেছে। বাঁশী বাজিয়া বাজিয়া বিশ্ববাসীকে এই কথাই বলিতেছে, ওরে উদ্ভ্রান্ত বিশ্ব, কান পাতিয়া আমার এই জড়াজড় সমন্বয়ের বাঁশী শোন, হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিয়া সুস্থ হও।

প্রাণ-পুরুষ শ্রীনিত্যগোপাল, তুমি আমাদের জীবনে অবতরণ কর—তোমার বিশ্বে অবতরণ সার্থক হউক, তুমি বিশ্ব-জীবনে অন্তর্যুক্ত হও, তোমার স্পর্শে হানাহানির বিশ্ব বৃন্দাবনের মিলন-বিশ্বে গড়িয়া উঠুক।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৪৪)

৪. ১০. ৫৬। ওঁ নমঃ তত্ত্বমূর্তয়ে···। কর্মজীবন আরম্ভ করেছি যেদিন থেকে—রাজনীতিই করি বা বেদান্ত-প্রচারই করি—মূলতঃ তা ছিল শহর—ঘরিশালও শহর, কলিকাতা মহানগরী। গ্রামের ভিতরে মেলামেশা করেছি, কিন্তু গ্রামে থাকা হয়নি কখনও। কেন সারা বাংলাদেশ ঘুরিয়ে এই ক্ষুদ্রতম পল্লীতে তিনি আমাকে এনে ফেলেছেন?···এখানে কেন আনলেন, কদিন থেকে ভাবছি। নিজে তো কিছু করি নি—আমার বুদ্ধির থেকে তাঁর বুদ্ধি বড়।···যে ঘটনাই ঘটে তার মধ্যে আমি তাঁর বুদ্ধি দেখবার চেষ্টা করি—তোমরা হয়তো কর না। সকল দুর্যোগকে দুর্যোগ রেখে যিনি সুযোগে গড়ে তুলতে পারেন তিনিই পুরুষোত্তম। পচে যাওয়া বীজের পক্ষে দুর্যোগ—তবু পচে যাওয়া থেকেই গাছ হয়।···আমি যে বেদান্ত প্রচার করি তা কলকাতার লোকই বুঝতে হিম-সিম খেয়ে যায়, আর এখানের লোক তা বুঝবে কে?···কেন এসেছি? ···পাকিস্তান কেন হয়েছে? বিরাট এক দল পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছে···সেখানে তাদের কোন status ছিল না—উচ্চ বর্ণের চাপের মধ্যে ছিল—আজ ··(পূজা সংখ্যা উদ্বোধন দ্রষ্টব্য)।···এখানকার স্থানীয় লোক বিশেষ আসে না।···আমার কাছে ভদ্রলোকদের পাই না···এদের মধ্যে, এই তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র লোকেদের মধ্যেই ভাগবতী কথা, শৃঙ্খলার কথা, ঘর-গুছানর কথা বলে যাই। ভদ্রলোকদের ঘর আছে, তাদের ঘর গুছানর কথা বললে হাসে। এরা স্থানচ্যুত—এদের যদি বা বৃন্দাবনের কথা, নিতাগোপালের কথা শুনাতে পারি।···এরা বিড়াল ছানার মত—এখান থেকে ওখানে···এরা কত অসহায়, ওল পায়খানা নিয়ে এদের কত লাঞ্ছনা···। রাজপথিগণ এদের শোষণই করছে।···আমি শুনি নিতাগোপাল বলছেন, ওরে পুরুষোত্তমানন্দ, আমি তো পতিত পাবন—অনাথারী তুমি এরা—কোন শিক্ষাদীক্ষা আমার তো এদের মধ্যে হয় নি—ইংরেজের ঠেলাঠেলিতে দেশে P. M. G. (Post Master General) হয়েছে বটে, কিন্তু উচ্চবর্ণের সমাজ-কাঠামোর মধ্যে তো এদের ঢুকাতে পারে নি।···অথচ এরা জাতির মেরুদণ্ড (উদ্বোধনের পূজা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)···। নিতাগোপাল চাইছিলেন মস্তিষ্কের সাথে মেরুদণ্ডের সংযোগ—তাই নিতাগোপাল কি এই জন্যই নিয়ে এলেন আমাকে এখানে?··

আজকে একটা ছোট্ট ঘটনা—আশ্রমের জমিতে পায়খানা করার চেষ্টা করেছে এরা···আমি এদের জল দিয়েছি, পায়খানা দিয়েছি—কিন্তু পায়খানা করেছে আশ্রমের মধ্যেই···! একটু বিরক্ত হয়েছিলাম—ওখানে মাঠে গিয়ে বুদ্ধি বদলে গেল—গান্ধীজীর কথা মনে পড়ল—ট্রেনের মধ্যে বসে একজন খুব কাশ ফেলছে···দেখে গান্ধীজী পরিষ্কার করলেন।···একদিন আস্তাবাবুর থেকে জল ভিক্ষা করে আমার চলেছে—আমি সে জল শোষ করব না?···ওরা যাই করুক আমি জল বন্ধ করব না—ওরাও পায়খানা করুক, আমিও পায়খানা পরিষ্কার করব··· এইভাবে ওদের মধ্যে শুচিতাবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, একত্র থাকার সাধনা—এসব আনতে হবে। তোমরা যদি শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন হও···এদের মধ্যে এসব গুণ আনা যায় কিনা দেখা যেত। ঠিক এদের মধ্যে ভাগবত-জীবন জন্মানোর চেষ্টা আমি কখনও করি নি—ভদ্রলোকদের মধ্যে চেষ্টা করে কিছু তো পাই নি।···উদ্বাস্তুদের মধ্যে ছুটব, তাদের ভালবাসব, তাদের মধ্যে থাকব, খাব···।

আনি না তাদের প্রাণ পায় কি না—কেননা আবহাওয়ায় হয়তো তারাও বুদ্ধিমান হয়ে গেছে, তাদের প্রাণ হারিয়ে ফেলেছে; তবু চেষ্টা করে দেখতাম প্রাণটা একটু ছড়ায় কিনা···। নিতাগোপাল, সঙ্গে সঙ্গে আছ—এই-ই শুধু আমার ভরসা···। সংসারকে গুছিয়ে তুলবার দর্শন আমায় দিয়েছ, কিন্তু সে রকম কোন কর্ম তো আমার করা হয় নি।···উদ্বাস্তুদের সমাজ তো গড়তে হবে। তাদের সামাজিক মানুষ করে দেবার তো কেউ নাই—কে আসবে এদের জন্য? পুরুষোত্তমানন্দ, তুই আয়—এই ছোট মানুষগুলিই হয়তো নিতাগোপালকে বাঁচিয়ে রাখবে।··· উচ্চ বর্ণের সাথে মেলবার সাধ আমার প্রাণ গেছে···এই সব বাস্তুহারাদের বাস্তু যদি গড়ে তুলতে পারি—তবে জীবনের শেষটুকু শান্তি পেতাম। নিতাগোপাল, তুমি তাই কর···।···তোমরা যদি প্রস্তুত হও···। তোমরা এখনও কি আমার সাথে প্রাণ খুলে মিশতে চেয়েছ?··· এদের জন্য আমি কি করতে পারি?···নিতাগোপাল, আমায় শক্তি দাও—আমি আমার যৌবন নিয়ে এদের মধ্যে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ব···

৫, ১০, ৪৬।···জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'আমার মাথা নত করে' গানটীর ভিতর সুন্দর ছবি এঁকেছেন। চোখের জল ছাড়া মানুষের অহংকার দূর হয় না।··· তোমার চরণধূলায় আমার মাথা নত করে দাও···নিজেরে করিতে গৌরব দান নিজেরে কেবলি করি অপমান, আপনারে শুধু ঘিরিয়া ঘিরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে।··· নিজেকে জীব আমরা গৌরব দিতে চাই···ইহাতে নিজেকেই শুধু অপমান করি···। আমার ভিতরে আর একটি আমি আছে—সেটী কায়া—আমি—জীব ছায়া আমি।···কৃষ্ণের আমি কায়া-আমি, নিতাগোপালের আমি কায়া-আমি।···তিনি তাই মহানির্বাণের কারণ— আমার আমি তুমি—নিতাগোপাল, তোমাকে ভালবাসলে আমার আমির মহানির্বাণ হয়।···আমার আমিকে গৌরব দিতে চাইলে কি হবে? বিষ্ঠার আতর মাখলে কি তাতে সুন্দর গন্ধ হয়?···তাঁর আমিতে আমি মেলাতে পারলে আমার সত্যিকার আমি ছুটে বের হবে।··· রাধারাণী তাই বলেন, তোমারই গরবে গরবিণী হাম রূপসী তোমারি রূপে।···চাঁদ যদি বলে এ আমার আলো?··· জীবেরও কোন নিজস্ব আলো নেই—তোমার আলোয় আমাকে আলোকিত কর—আমি তো কল্পনা, আমি তো negative—তোমার আলোতে শুধু আমি জ্বলতে পারি···নিজেকে আড়াল করিয়া, নিজের দৈন্যকে, নিজের নোংরামিকে ঢাকি করিয়া অর্থাৎ নিজেকে ফাঁকি দিয়া ঘুরে ঘুরে মরছি।···নিতাগোপাল আমি যেন নিজেকে ফাঁকি না দেই।···কালো হলে ভয় নেই, কিন্তু যদি ফাঁকি দেই, তবে তো তোমার আলো আমার উপর পড়বে না। নিজেকে আড়াল করিয়া চলা—নিজেকে আবরণ করা— নিজের দুর্বলতা ঢাকিয়া রাখা—এই তো বসন। এই ঢেকে রাখার কৌশল তুমি কেড়ে নিলে, তাই বলা হয় কৃষ্ণ উলঙ্গ করে ছাড়েন।···তাই শিব দিগম্বর, শিবানী দিগম্বরী ···দিকই অম্বর···নিজেরে ঘিরিয়া, নিজের খেয়ালে ঘিরিয়া, নিজের অহংকারকে ঘিরিয়া থাকে আমাদের বসন।···নিতাগোপাল, আমি বাঁচিতে চাই, তোমার চরণে আমার সকল বস্ত্র নিবেদন করিতে চাই, নিজেকে আড়াল করিয়া চলার চিত্তবৃত্তিকে তুমি দূর কর।···আমার যে আলো নাই, এ কথা আমায় বুঝিতে দাও।···ওগো মহানির্বাণের কারণ···তুমি পূর্ণ আমি শূন্য, তুমি যোগ আমি বিয়োগ।

৬, ১০, ৪৬। ওঁ নমঃ তত্ত্বমূর্তয়ে···। নরনারায়ণ আশ্রম একটী বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ আশ্রম আজকের নয়, দীর্ঘ বছরের। অনেক আসিয়াছেন, অনেক গিয়াছেন—আমি এই আশ্রম লইয়া আজিও বসিয়া আছি। ইহার বিশেষ কথা এই—ভগবান পাইলে শুধু চলে না, ভগবানের বিশ্বকেও পাইতে হয়।···নামে রুচি জীবে দয়া···। দ্বিমুখী সাধনা চালাতে হবে— ভগবানকে নিয়ে থাকতে হবে নাম নিয়ে থাকতে হবে— নাম মানে নোয়ানো—নিজেকে নোয়াতে হবে—বিনীত হতে হবে; আবার বিশ্বের সঙ্গেও মিলতে হবে—বিশ্বের সেবা করতে হবে—বিশ্ব থেকে গা বাঁচিয়ে ভাল মানুষ থাকলে চলবে না।···ভগবানের দিকে এক হাত, আর এক

হাতে বৈষ্ণব দেবা, মানুষ দেবা।··· এতকাল নাম কীর্তনের উপর জোর পড়েছিল, কিন্তু মানুষের দেবার দিকটা বাদ পড়েছিল। নিত্যগোপাল···জগতের সঙ্গে নাথ, গুরুর সঙ্গে শিষ্যকে জুড়ে দিয়ে গেলেন।···আমার বেদনা নিত্যগোপালের এই কথাকে বিশ্বকে দিয়ে যেতে পারলাম না। ···আশীর্বাদ একটা আসছে, অজস্র আশীর্বাদ—সেই যে আশ্বাস—সঙ্গে সঙ্গে আছি···সেই আশ্বাসই এই নূতন পথে আমায় বাঁচিয়ে রাখছে।···যে কৃপা আমি পাচ্ছি, সে কৃপা যদি ওরা নেয়, তবে আমার মত ওরাও কৃতার্থ হতে পারতো।···বিশ্বাস ছিল নিত্যগোপাল আমায় স্নেহ করেন, এত ভালবাসেন, আমাকে যদি কেউ খাওয়ায়, তবে তাকেও নিত্যগোপাল ভালবাসবেন।··· কোনদিন তো নিজের বলে কিছু বাখি নি···ভেদবুদ্ধি থাকলে পিতারটা পুত্র পায় না, স্বামীরটা স্ত্রী পায় না—এক হও, সব পাবে।···যে যখন এসেছে বুকে তুলে নিয়েছি কেন? নিত্যগোপালের ধন তাদের দেব বলে···। আমাকে ভালবাসলে দিতে পারতাম—দিতে পারছি না বলে বড় বেদনা পাচ্ছি—কেউ নেয় না···খেয়াল ডুবিয়ে না দিলে নেবে কি করে?···চাঁদ সূর্যমুখী হলেই তো আলো পড়বে—কৃষ্ণ-উন্মুখ হলে ওদের উপর কৃষ্ণের আলো পড়বে···মানুষকে কৃষ্ণ-কথা শোনাবার নেশা হয়তো এমনই ভাঙবে যেদিন মানুষের মধ্যে আর থাকতে পারব না।···নিজের জন্য ধর্ম অর্থ কিছু চাই না—চেয়েছিলাম যে স্নেহ আশীর্বাদ পাচ্ছি তারই এক কণা যদি মানুষকে দিতে পারতাম···। নিত্যগোপাল, আজও তুমি আমার আগলে রেখেছ—তোমার বিদ্যুৎ মানুষকে জাগ্রত করে তুলবে, তাড়িৎ-স্পর্শের মত তার ভাংচেতে স্বভাবকে electrified করে তুলবে।···অহংকার ছাড়···। আমি তো মানুষকে পেতে চাই—আমি তো প্রাণপণে পেতে চাই—কিন্তু যাদের পেতে চাই তারা যে ধরা দিতে চায় না···। সুরের টানে না পড়লে ছিটকে পড়বে—গোবিন্দের টানে না পড়লে বাইরের প্রলোভন টেনে নিয়ে যাবে···। নাম-সংকীর্তন-সেবা···। আমি যাতে দিতে পারি তোমরা তেমনি করে উন্মুখ হও···। করতাল খোল, হারমোনিয়াম প্রভৃতি দশটা যন্ত্র তো এমন মিলেমিশে বাজতে পারে যাতে সঙ্গী হয়। একজন পৌঁ, একজন পি করলে তো সংগচ্ছধ্বং হল না। অনেকগুলি মানুষ একসঙ্গে একই কথা বলবে—এ কি হয় না?···কৃষ্ণার্জুন সংবাদ—সংবাদপ্রসঙ্গের মধ্যে সংবাদ আছে···গো মনাংসি জানন্তাম—একজনের মন আর একজনে জানে···। তোমাদের মন তোমরা যা জান আমি তার থেকে বেশী জানি···। শহরের মনের কথা বুঝে রাখেন না, বৃন্দের মনের কথা শহর রাখেন না।···সবার মনের কথা মিললে অসাধ্য সাধন করা যায়···। অনেক ব্রজগোপী নৌকায় যাচ্ছে—গানে আছে এক মন না হলে নৌকার পার হওয়া যাবে না···এক মন হলে বিশ্বের সব সমস্যার সমাধান হবে। তবেমুক্ত পার হতে পারো যদি এক মন হও—আমরা বহু জন—নয়টী মন একজন হও—তখন আর তাঁর আশীর্বাদ পেতে দেরী হবে না।···জগৎ ও জগৎকে যদি চাও আমার স্নেহ আশীর্বাদ পাবে, জগৎ যদি না চাও চলে যেতে হবে, তিনিই সরিয়ে দেবেন···।

৭, ১০, ৪৬।···শ্রীনিত্যগোপালের আত্মধ্যানের মধ্যে একটু খোঁজ করলেই দেখা যাবে তিনি কেন এসেছেন···এতদিন মানুষ ওপারে যেতে চেয়েছিল, নিত্যগোপাল এসেছেন এই সৃষ্টিটাকে গড়ে তুলতে যাতে এইখানে বসেই মানুষ পারমার্থিক আনন্দ লাভ করতে পারে···তাঁর পাদস্পর্শ করার পর থেকে বিশ্বটাকে নূতন করে সৃষ্টি করার এক উদ্দাম লালসা আমায় পেয়ে বসেছে।···তিনি এসেছিলেন একটা কালচার সৃষ্টি করতে—পুরুষোত্তম কালচার···। সংসারটা পণ্ডিত—আবাদ করলে ফলবে সোনা···পারি নি—নিরাশ হয়েই হয়তো চলে যাব··· যা তিনি আমায় দিয়েছিলেন, যা নিয়ে তিনি এসেছিলেন—হয়তো দিতে পারলাম না···। আমার বাথার সাথী যদি কেউ না হয়—কি করে দেব? কি ব্যথার মন্ত্র দিয়ে আমায়—তাই তো জলি কেবল জলি···। নিত্যগোপাল তোমার জগৎ তুমি রাখ···আমার কি দায় হয়েছে?··· আমার চোখের জল কারো সাড়া জাগাতে পারে নি··· এসেছিলে যা নিয়ে আমি তা দিয়ে যেতে পারলাম না—আমায় নিয়ে যাও···কিছুতেই তো একটা সঙ্ঘ আজ গড়তে পারলাম না—মানুষে মানুষে প্রীতি জাগাতে পারলাম না···অন্ন তো কাঁদি নি—আজ তুমি আমায় স্থান দেও।···

ক্রমশ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৩—

(৪৫)

চাই তাই পরমাগতিদ্বারা দুয়ার খুলিয়া রাখা। আমার খেয়ালের মধ্য দিয়া তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। কৃষ্ণ-কামিনী হইয়াই কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। আমি যখন আছি, তখন তিনি নাই, জগৎ নাই। আমি যখন তাঁহার ভিতর নাই' হইয়া যাই, তখনই আমি থাকি, জগৎ থাকে। আমি যখন মাটিতে দাঁড়াইয়া দেখি, ফল আসে মাটিতে, সেই আমিই যখন ফলের মধ্যে বসি, তখন মাটি থাকে ফলের কাছে। আমি যখন মাটিতে, তখন ব্রহ্ম সত্য; আর আমি ব্রহ্মে, তখনই শুধু জগৎ সত্য। দুই জায়গায় যিনি বিচরণ করিতে পারেন, তাঁহার কাছেই ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ সত্য। এই দিয়া জানাই বর্ত্তমান যুগের কাম্য।

২২শে জানুয়ারী

'চরৈবেতি চরৈবেতি'—ওগো অভিসারিণি শ্রীরাধে, আমি তোমার মুক্ত জীবন-প্রবাহে নিজকে মিশাইয়া দিয়া চলিব, ঐ যে বাঁশী বাজিতেছে। বাঁশীর আহ্বান আমি শুনিয়াছি। জাতিকুলশীলের পঞ্জর ছিঁড়িয়া, সকল বাধা মথিত করিয়া আমি ছুটিয়া চলিব। আমার তো চলা ছাড়া গতি নাই। তোমাকে পাইবার আমি তোমাকে পাইব, তোমার মাঝে মিলিয়া গিয়াই আমি মিলিয়া উঠিব। তোমার পরিচয়েই আমার পরিচয়। আমি তোমার মাঝে আমাকে হারাইয়াই আমি আমাকে পাইব। আমি যে আমার নিজের কাছেই পর; তোমার কাছেই আমি আমার আপন। আমার সঙ্গে আমারও পরকীয় সম্বন্ধ, বিশ্ব যে পরকীয়ের সঙ্গ। সকলে এখানে 'পর' হইয়াই আপন।···গোপাকে 'হরের্নাম হরের্নাম' অবাকুসুমসঙ্কাশম্ শ্লোক দুইটি মুখস্থ করাই। বেলু ১ টার সময় বাহির হইয়া ফেরে ৩। টার পর।···ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার সহিয়াছিলেন।···সারাজীবন কাহাকেও শোষণ করি নাই, অমর্য্যাদা করি নাই। কয়েকটী প্রাণও কি এই বিশ্বের মধ্যে পাইব না যাহাদের বুকে লইয়া তাঁহার কাজে অগ্রসর হইতে পারি? আমার কাছে নিজেদের ছাড়িয়া দিবার মত কয়েকটি প্রাণও কি নাই? আমি তো প্রাণপণ মানুষের ভার লইতে চাহিতেছি। আমি কি বিশ্বাসভাজন হইবার যোগ্য নই?

২৩শে জানুয়ারী

ঠাকুর, তুমি আত্মবলি দিয়া, যজ্ঞ করিয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি 'নাই', না থাকার জন্যই তোমার তপস্যা, তাই আমি আছি, বিশ্ব আছে। আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণই আমি নাই। আমি যখন তোমার মাঝে 'নাই' হইয়া যাই, তখনই আমি 'আছি'। তুমিও নিজেকে 'নাই' করিয়া, শূন্য করিয়া আমাকে বিশ্বকে পূর্ণ করিতে চাহিতেছ! তুমি শূন্য বলিয়াই বিশ্ব পূর্ণ। বিশ্বকে সর্বগুণবান করিবার জন্যই তুমি নির্গুণ, বিশ্বকে সর্বরসময় কর্ত্তা বানাইবার জন্যই তুমি অকর্ত্তা!

···বৈকালে তুলসী ঘোষ (গুরু ভ্রাতা) ও দেবানন্দ আসে। ৩০শে জানুয়ারী মহাত্মাজীর তিরোভাব দিবসে বরাহনগর গান্ধী প্রচারিণী সভার দ্বারা অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে বক্তৃতা দিবার কথা বলে।···শ্রীনিত্যগোপাল শতবার্ষিকী গত বৃহস্পতিবার হইতে লিখিতে শুরু করি। তুলসীকে বেণু পড়িয়া শোনায়। যাহার জীবনে বর্ত্তমান যুগের সকল সমস্যার সমাধান দেখিতেছি, তিনি নিজে থাকিবেন অপরিচিত ইহা ভাবিতে বেদনায় বুক ভরিয়া উঠে। আমাকে যে এই চিন্তা পাইয়া বসিয়াছে। ইহা কি আমার খেয়াল? বেণুর উপর শুশ্রূষার ভার। তাহার জন্য আরও প্রস্তুতি তাহার প্রয়োজন। স্নান

করিতেই হইবে দেহটি রাখিবার মত। কিন্তু ঘুরে একটু স্থান কিনিয়া রাখিলে হয় না? এখন সেখানে যাই বা যাওয়া হইল? সুবিধা হইলে সেখানে এখানে দুই জায়গায়ই তো কাজ করা যাইতে পারে? কলিকাতার একেবারে কাছে না পাইলে দোষ কি? একটু ঘুরে যাইলে দুই হাজার আড়াই হাজারে কিছুটা জমি পাওয়া যাইতে পারে। ৯॥ টার পর 'উদ্ভিষ্ঠতাজাগ্রত' (মায়ের) পাঠ হয়। আমাদের প্রবন্ধগুলি বেণু পাঠ করে।

২৪শে জানুয়ারী

রাধারাণী আমার, আমার চক্ষু বিশ্বময় তোমাকে খুঁজিয়া বেড়ায়, আমার হিয়া তোমার লাগি দুরুদুরু কাঁপে, কবে সকল দেহ প্রাণ মন দিয়া তোমাকে গড়িয়া তুলিব, সকল দেহপ্রাণ নিংড়াইয়া ওগো সকল অঙ্গবন্ধন ধন, পরাণপুতলী আমার, আমার কল্পনা কি সফল হইবে না? তোমার আসন রচনা করিবার জন্য কত কাঁদিলাম। কই, পারিলাম কই? আজ আর তোরে বাহির হই না। ৯॥ টার পর আমি ও বেণু রওয়ানা হই। ৮ টায় সচ্চিৎ বাবুর বাসায় পৌঁছি। সুধীর ব্যানার্জি উপস্থিত দেখিলাম। কেমন করিয়া নচিকেতা যমপুরীতে প্রবেশ করিয়া 'জ্যোতিরিব অধূমক' ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন ও গীতায় মরণের ক্ষেত্র ঐ কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কথা বলি।...৪-১৪-তে পাঠ সুরু হয়। বিশ্ব মনের স্তর হইতে প্রাণের স্তরে যাইতেছে, গীতা প্রাণের শাস্ত্র। প্রাণের ভাষা শিখিতে হইবে। ঠাকুরের ভাষা ছিল প্রাণের ভাষা—'করা ভাল', 'থাকিলে সকলের আনন্দের কারণ হইবে' ইত্যাদি। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়, 'শ্রীভগবান্ উবাচ' ব্যাখ্যা করা হয়।...

২৫শে জানুয়ারী

ওগো নিত্যগোপাল, জীবনবল্লভ আমার, স্বয়ংমূল্যবান জড় ও স্বয়ংমূল্যবান অজড়ের পরস্পরীয় সম্বন্ধাত্মক সমন্বয়ই তো জীবন। সেই জীবনের সবটুকু তোমার শ্রীচরণে নিবেদিত। তুমি আমার দেহের স্বামী, প্রাণের স্বামী, মনের স্বামী; আমার দেহপরশ, মনপরশ, বিজ্ঞানপরশ, আত্মপরশ। যে বিশ্ব চোখে দেখিতেছি, সেই বিশ্বের বুকে তোমার গড়া বিশ্ব ভাসিয়া উঠিতেছে। তুমি আমার প্রাণের ভাষা শিখাইয়া দেও, মনের দেখা মুছিয়া ফেল সর্ববৃদ্ধির একায়ন হৃদয়দ্বারা আমি দেখিব, শুনিব, চলিব ফিরিব। জড়ের মত আমাকে ছুটিতে দেও। তোমার বিশ্ব তোমার হউক। সকালে আজ আর বাহির হওয়া হয় নাই। ৯॥ টায় বেণু আসিয়া প্রজাতন্ত্র দিবসের এক সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য নিয়া যায়। প্রিয়রঞ্জনবাবু সভাপতি উদ্বোধন করেন। অতুল সেন উপস্থিত ছিল সভাপতি হয় দেবব্রত চ্যাটার্জি। প্রথমে প্রিয়রঞ্জনবাবু পরে অতুল সেন, পরে আমি বলি। হিন্দু অন্তর্ধাত্র যথাযথরূপের ব্যবস্থিতিঃ মুক্তিঃ। ভারত আজ স্বরাজ ব্যবস্থিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। ভারত হইবে বিশ্বস্রষ্টা। তাই কোনও ব্লকে সে যোগ দেয় নাই। 'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত'। আজ জনসাধারণকে স্রষ্টা হইতে হইবে, নেতৃত্বকে সৃষ্টি করিতে হইবে। নারায়ণ আজ আসিয়াছেন নরদ্বারা সৃষ্ট হইবার জন্য ভারত বিশ্বসৃষ্টি করিবে। সে কোনও দিনই পরস্বাপহর স্বামী ছিল না। ভারতবর্ষ মাঝখানে থাকিয়া বিশ্ব ঠেকাইতেছে। ওটায় মিঠু আসে ২টাকার পানতুয়া-২৲ টাকার পানতুয়া না কিনিয়া আমার কল খাওয়ার ৪ টাকা দুইটী আনিলে ভাল হইত—ইহা মিঠুকে বলি কিসে সেবা সুষ্ঠু হয়, তাহা বুঝা দরকার। যতীনবাবু আসেন...।

২৬শে জানুয়ারী

ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ। পুরুষোত্তম আমাদিগকে সহভাবে রক্ষা কর, সহভাবে পালন কর। আমরা সহভাবে বীর্য লাভ করি, আমাদের অধ্যয়ন তেজস্বী হউক, আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। সঙ্ঘগঠনের ইহাই মূল সূত্র। ব্রহ্ম-গুরু-জগৎ-শিষ্য সকলে সহভাবে রক্ষা পাইতে পারে। অসহভাবে কেহ বাঁচিবে না, কেহ কাহাকে এমন কি নিজেকেও পালন করিতে পারিবে না। পুরুষোত্তম, আমার জীবনে সঙ্ঘ গড়িয়া উঠুক—এই করিও। বাস্তব সঙ্ঘই আমি চাই, প্রহস

চাই না। প্রহসন চাই নাই বলিয়াই এতদিন তাহা হয় নাই। সজ্ঞ গড়িয়া উঠুক। আমি ও উষারাণী লেক পর্যন্ত যাই। পথে কথা হয়। সুবেন ৮টার পর এসে কালীর দোকান হতে নিয়া আসে। ৮০৲ টাকা বেহালায় বাড়ী ভাড়া দিবার জন্য নিয়া কোর্টে যায়···যাহার জন্য যতটুকু পারিয়াছি করিয়াছি—৩এ রাসবিহারীর বাড়ীর ভাড়া বাবদ ১২০৲ টাকা, সত্যব্রতকে ২৫৲+৮৫৲, নিতাইতের ঘড়ি মেরামত শেখার জন্য ৩০৲ টাকা, ঐ বাড়ীর খরচের জন্য মাঝে মাঝে অনেক টাকা, কুসুমের ঘরের জন্য অনেক টাকা দিয়াছি। মানুষ স্নেহের মর্যাদা দেয় না। টাকা দিলে বোঝে ভালবাসা। দিতে পারিলে পথ সহজ হইত। কিন্তু আমার আছে কি? নেতৃত্বের জন্য অর্থ চাই, বাড়ী চাই, লোকজনকে খাওয়ানো চাই। এত রিক্ততা লইয়া আমি যতদূর আসিয়াছি তাহা ঠাকুরের শুধু আশীর্বাদের জোরেই। আজ যদি প্রয়োজনমত খরচ করিবার অর্থ থাকিত, কলিকাতার বুকে কাঁপাইয়া পড়িতে পারিতাম। যুগের দর্শন কেহ তো পায় নাই। গর্জন করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত। নরসিংহ তো আমার বুকের মধ্যে ছিলেন, তাঁহার গর্জনে একদিন বাঙলা দেশ কাঁপিত। আমার কি তিনি আমার জীবনে জাগ্রত হইবেন না এই বেদান্ত প্রচারের ক্ষেত্রে? নরসিংহ, জাগ্রত হও আমার প্রাণে মনে। ৮টায় পাঠ হয় কেন উপনিষদের প্রথম মন্ত্র। উদ্বোধন কতকগুলি পোষ্টাফিসে দেওয়া হয়।

২৭শে জানুয়ারী

ওগো শ্রীরাধারাণী, জীবের প্রতি স্নেহপ্রাবণ তোমারই সঙ্গে পুরুষোত্তম-অভিসারে ছুটিয়াছে সকল বিশেষের প্রবণতা লইয়া অথচ সকল বিশেষের বন্ধন ছিঁড়িয়া। বিশেষের সঙ্গে বিশেষের ও নির্বিশেষের কি গভীর পরকীয় সম্বন্ধ! বিশেষকে ছাড়িতেও পারে না, আবার রাখিতেও পারে না। এইখানেই তো বিশেষ-নির্বিশেষের সমন্বয়, এইখানেই তো রস। একান্ত বিশেষে কি রস আছে? নির্বিশেষের মন্থনের ফলেই রস উদ্ভূত হয়। ওগো রাসেশ্বরী, আমার জীবনের প্রতি স্পন্দনে তোমার আবির্ভাব ঘন হউক।...সকালে 'নিরক্ষর মূর্খ ও বড় বড় পণ্ডিতের দর্শন' একটি প্রবন্ধ আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের ভাষণ অবলম্বনে লিখিতে আরম্ভ করি। গত মাঘ সংখ্যায় ঐ ভাষণ বাহির হইয়াছে। বেলু ১১টায় বাহির হইয়া যায়।...আজ সারাদিন নিরক্ষরদের ও পণ্ডিতদের শাস্ত্র সম্বন্ধে মাঝে মাঝে আলোচনা হয়। নানা ঘাত প্রতিঘাতে আমার প্রাণটা যে উদাস হইয়া পড়িতে চায়। কিন্তু যে আশীর্বাদ ঠাকুর করিয়াছেন, তাহা বুকে লইয়া আমাকে যে চলিতেই হইবে। নিজের জীবনে কেন উপনিষদের 'শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ মনসো মনঃ' যতদূর পারিয়াছি আচরণ করিয়া চলিয়াছি। নিকটের ইহারা তাহা দেখিবে না, দেখিয়া শিখিবে না কি আচরণ করা উচিত? আমি গোঁজামিল দিয়া জীবন চালাই নাই, ফাঁকি কাহাকেও দেই নাই। 'শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্' মন্ত্র পাঠ হয়। কুসুমের কোন চিঠি আসিল না। আমি যে তাহাকে আমার জীবনের অংশীদার করিয়া রাখিয়াছি, তাহা কি সে বুঝিল?

২৮শে জানুয়ারী

ওগো সহযোগিনী রাধারাণী আমার, তুমি নিজ জীবনে বড় বড় পণ্ডিতদের দর্শন ও নিরক্ষর মূর্খের দর্শন সমন্বিত করিয়াছ। পণ্ডিতের দর্শন শুচির উপর জোর দিয়াছে। মূর্খদের দর্শন অশুচিদের কোলে তুলিয়াছে। তুমি শুচির শুচি, অশুচির অশুচি, তুমি সতী, অসতী। তাই তুমি পণ্ডিতজাতি ও মূর্খজাতি দুই ছাড়িয়া জাতি-ত্যাগিনী। তুমি আমাকে বিশ্বের মর্মস্থানে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছ। এই মর্মস্থানে কে আছে আমার সখী, সঙ্গিনী, বান্ধবী, শরণ তুমি ছাড়া? তুমি শ্রীনিত্যগোপালে সাজিয়া তোমার ঐ মূর্খ-পণ্ডিত-দর্শনের সমন্বয় দার্শনিক ভাষায় প্রচার করিতে লাগিয়াছ। তোমার জয় হউক।...বৈকালে গল্পভারতী হইতে সত্যেন মজুমদারের লেখা 'স্বামী বিবেকানন্দ' প্রবন্ধটা পড়িয়া শুনাই। বিবেকানন্দের জীবন না নিয়া জন্মোৎসবে হৈ চৈ করার জন্য লেখক দুঃখ করিয়াছেন। কেন নিতেছে না মানুষ? তিনি রজোগুণের গৌরব বাড়াইয়াছেন সত্য, কিন্তু যে দর্শন তিনি দিয়াছেন তাহাতে নির্বিকল্প সমাধিই

বড় হইয়া আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ যাহা চাবি দিয়া বন্ধ করিয়া কাজের জন্য পাঠাইয়াছেন। নির্বিকল্প সমাধি যদি হয় goal, ব্রহ্মোপল সেখানে কি ঠাঁই পাইবে? স্বামিজীর প্রচার ও দর্শন পরস্পরস্পর্শী। আমি স্বামিজীর প্রচারিত সত্যকে দার্শনিক ভাষায় রূপ দিয়া গেলাম। কেও বলিলেই মানুষ নিতে পারে না। নিবার উপযোগী মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন করা চাই। পবিত্রতা নারীদের সমাজে স্থান দেওয়া উচিত, কিন্তু সতীত্বের সংস্কারে যে মানুষ আটকাইয়া আছে। অন্তরতম প্রদেশের গুরু সংস্কার বহিরাগত শ্রবণদ্বারা মুছিয়া যায় না। বুদ্ধদেবের বিপ্লব, নানক-কবীর-গৌরাঙ্গের বিপ্লব, রামমোহন-গান্ধীর বিপ্লব সমাজের গোপনতম সংস্কারকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। এইখানে প্রয়োজন ছিল 'আমূল সংস্কারের'। দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিপ্লব ছাড়া আমূল সংস্কার হয় না।

২৯শে জানুয়ারী

'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি'—জীবের সকল ইন্দ্রিয় সারা বিশ্ব পাতি পাতি খুঁজিয়াও তোমার রূপ রসে হদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। সাধ তাহার মিটিল না—'জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু নয়ন না তিরপিত ভেল'—কোথায় তৃপ্তি? এই সাধ না মিটিবার ঘন বিগ্রহই তো শ্রীরাধা, বেদনাময়ী বেদময়ী। তোমাকে কি ভরাট বুকে ধরার প্রতিটি কণায় ভিতর সাস্ত রূপের আস্বাদন দিবে না? আমি বিশ্বের মর্মস্থলে দাঁড়াইয়া বিশ্বকে পাইতে চাই। মরমী আমার কে আছে? মরমী খুঁজিয়া খুঁজিয়াই তো মরিলাম। কে আছ বিশ্বের মাঝে আমার মরমী, আমি বিশ্বের কেন্দ্রে দাঁড়াইয়া একা লড়াই করিয়া চলিয়াছি, আমায় বল দেও, প্রাণ দেও; আমাকে জয় করিতেই হইবে, নূতন ধরা সৃষ্টির পথে অগ্রসর হইতেই হইবে ···

৩০শে জানুয়ারী

ঠাকুর, তুমি আমার সকল জীবনমন্থন ধন, শ্রোত্রের শ্রোত্র, বাক্যের বাক্য, মনের মন, পরম শ্রোত্র, পরম বাক্, পরম মন। তোমার জীবনেই আমি নিত্য সত্য ভাবে জীবিত। তোমার বাহিরে আমি বিশ্ব হইতে একান্ত বিচ্ছিন্ন। তোমার জীবনেই 'সহভাব' সার্থক সেখানে অনাত্মার সহ আত্মা, আত্মার সহ অনাত্মা, নিত্যের সহ অনিত্য, অনিত্যের সহ নিত্য, একের সহ বহু, বহু সহ এক, দেহের সহ প্রাণ-মন-সর্বেন্দ্রিয়। তুমি আমি বিশ্ব সমগ্রতার মধ্যেই নিত্য সত্য পারমার্থিক; আমাকে সমগ্র কর্ম, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র প্রেমের অধিকারী কর। -র মন খুব খারাপ। সে গান আরম্ভ করিতে পারে না খেয়াল তাহার কম ইত্যাদি। মন খারাপ করিলে আর পারিবে না। ঠাকুরের আশীর্বাদের দিকে চাহিয়া প্রফুল্ল রাখিয়া ধীর স্থির ভাবে চলিতে থাকিলে সব কি মানুষ পাবে। 'বিরস মনে বিবস গবে' যে মানুষ কিছু পারে না। কি বিপদেই আমি পড়িয়াছি। এখা আসিয়া সকলেরই মন খারাপ হয়। কেহই কি আমি প্রাণ খুলিয়া তৃপ্ত হইল? এখানে থাকাই যে প সৌভাগ্য, তাহা কি কেহ বুঝিল? পাঠ হয় কেনোপনি ব্রহ্মচা···।

৩১শে জানুয়ারী

ঠাকুর, তুমি আসিয়াছ জীবজগৎকে 'পাওয়া'র হইতে যাত্রা করাইয়া, না পাওয়ার বুক চি না-পাওয়ার ক্ষেত্রে নিত্য পাওয়াকে জমাইয়া তুলি তোমাকে তো পাইয়াই আছি, আমার না-পাও ভুল ভাঙিয়া দেও। তোমাকে পাইয়া না-পাও রাজ্য জয় করিব। না পাওয়াই রস, পাও ভাব। না-পাওয়াই পরিচ্ছিন্নের ধর্ম, তাই সেখ রস সম্ভব। তুমি রসরাজ মহাভাব দুই একত্র 'ব্রহ্মচা অনন্তাদিতম্ যেন বাক্ অভ্যুদ্যতে'।···৪॥ আলোচনা আরম্ভ করি। শ্রীকৃষ্ণের বাস্তব জীব আলোচনা প্রসঙ্গে 'মহানাম্ অশনিঃ' শ্লোক, 'গিরিধ নামের সঙ্গে যুক্ত লীলাকাহিনী, ব্রহ্মধামে সব সব গর্ব চূর্ণ হওয়ার কথা, 'দেহি মে পাদপল্লবমুদা বাক্যের তাৎপর্য, বিশ্বব্যাপী বাক্যের পরম অর্থ শ্রী শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে সকল সমস্যার সমাধান, He is communist of all communists—ইত্যাদি ভাবাবেগের সহিত আলোচনা করি। বিমল ঘোষ 'র

নামে সিনেমার জন্য একটি নাটক লিখিয়াছেন। তিনি আমাকে উহা শুনাইবেন এবং উহার যথাসম্ভব সংস্কার করিবেন।...পুরুষোত্তম-লীলা আলোচনা করিতে পারিলেও ভাল থাকি। আমার তৃপ্তি তো ইহাই। ধরার বুকে কবে যে তাঁহাকে ছড়াইয়া দিতে পারিব জানিনা। অনিল সমাজদারও আলোচনা-সভায় ছিল।...

১লা ফেব্রুয়ারী

ভাবরাণী আমার, সকল সোহাগের প্রহীণ আনিয়া আমি তোমার আরতি করিব। তুমি ছাড়া আমার কি আছে যাহাকে লইয়া দিন কাটাইতে পারি? আমার সারা জীবনের ধ্যান তুমি, শক্তি তুমি, তৃপ্তি তুমি। তোমাকে আমি বুকের মধ্যে পুরিয়া রাখিব।...আকাশের তোমাকে চাই না। তোমাকে চাই বাস্তবের দেহে রক্তমাংসের দেহে। ওগো পঞ্চব্রহ্মমহিষী যোগমায়া, মহা প্রকৃতি, আমার সকল দেহ-প্রাণ-মন আত্মারিত করিয়া প্রকাশিত হও।... গোপাকে 'মধুর মধুরমেতৎ'। 'মূকং করোতি বাচালম্' শ্লোকদ্বয় পড়াই।...'নিরক্ষর কুক্ষি ও বড় বড় পণ্ডিতদের শাস্ত্র' শীর্ষক প্রবন্ধটী শেষ করি।...'যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুঃ মনো মতম্' মন্ত্রটী পাঠ হয়। অন্ধবিশ্বাসী ফাঁকের খবর জানেন না; তাঁহারা মানেন হয় দিন, না হয় রাত্রি, হয় জল, নয় স্থল, নয় তো আকাশ। কিন্তু নৃসিংহ অবতীর্ণ হইলেন প্রাণপথে নিশাস্তের ফাঁক দিয়া। হিরণ্যকশিপু মনের জোরে দাঁড়াইয়া যত রকমে পারিয়াছেন অমর হইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু অমৃত যে দিন-রাত্রের সন্ধিতে, তাহা তো তাঁহার জানা ছিল না।

৯ই ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, 'কম্ বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম'। তুমি তোমার দক্ষিণী মঠে ভিন্ন সম্প্রদায়ের কোনও মহিলার দ্বারা কটীর সঙ্গে মিশ্রিত কাঠবিল খাওয়ার পরও অনুগতবর্গকে বলিয়াছিলে, 'সাবধান, তাঁহাকে যেন কিছু বলা না হয়'। তুমি তাঁহাকে ইহার পর আশ্রমমুক্ত কর নাই। এমন লোকও তোমাকে ছাড়িয়া কাহার শরণ লইবে? কেহ তো আর তেমন করিয়া ডাকে না, কাছে রাখিবার জন্য ব্যাকুল হয় না, 'ও হরি, শরৎ ছানা খায় না' বলিয়া কেহ তো আর দুঃখ প্রকাশ করে না! 'রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই দাঁড়াব কাহার কাছে?' ঠাকুর আমার, সোনার ঠাকুর আমার, জীবনবল্লভ আমার, জীবনে মরণে তুমিই আমার গতি।...বেলু ৯টার পূর্বেই বাহির হইয়া যায়—জগন্নাথ সাহার বাড়ী।...সুবোধ বাবু আশুবাবু, নাভানা প্রেস, রাজেনবাবুর ওখানে যায়। ৫টায় রাজেন বাবু সহ বেলু ফেরে। রাজেনবাবুর সঙ্গে ঠাকুরের ধর্মন ও জীবন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ঠাকুরের জীবনে যে বর্তমান যুগসমস্যার—হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, নর-নারীর অবাধ মিলনের ফলে উদ্ভূত সমস্যা প্রভৃতির—সমাধান মিলিয়া উঠিয়াছে, তাহা বলি। সত্য 'পাতকীচরণ বেলু গোস্তে' তাঁহার গায়ে। তিনি বেলুকে আশ্রয় দিয়াছেন। যাহাদের স্পর্শ পরমহংসদেবের গায়ে সিং মাছের মত কাঁটা বিঁধিত, তাহাদের স্পর্শ তিনি অবাধে পরিপাক করিয়াছেন। কাহারও পাপ লইয়া কচলান নাই। পাতকীকে মানুষ হিসাবে আদর করিয়াছেন।...'যং মনসা ন মনুতে' মন্ত্র পুনরায় পাঠের পর 'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি' মন্ত্র পাঠ হয়। যাহার মন সকলের মনের খোঁজ রাখে, সকলের মনের ভিতর যাহার মন ঘুরিয়া ফিরে, তাহার মনই পুরুষোত্তমকে মনন করিতে পারে। বিশ্বরূপ মনই ব্রহ্ম মনন করিতে পারে। তোমার মন যখন আমার মন, আমার মন যখন তোমার মন বুঝিবে, তখনই হইবে তাহারা ব্রহ্ম-মন। সেই মনের খোঁজই জৈব মন যুগ যুগ ধরিয়া অন্নময়স্তরে করিতেছে।...

৩রা ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, আমার প্রাণ তোমার প্রাণ হউক, তোমার মন ও আমার মন এক মন হইয়া এই সংসারের বুকে এক দিব্য কল্পলোক গড়িয়া তুলিবে। আমার মন যে তোমার মনের লাগি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। সর্বেন্দ্রিয়ের কান্না বুকে লইয়া চলিয়াছি...তুমি আমি সর্বতোভাবে এক অদ্বৈত হইব—ইহাই আমার সারা দিবসের ধ্যান।... মহানির্বাণ মঠ হইতে শতবার্ষিকীর আবেদনের প্রুফ দেখাইবার জন্য একটি লোক আসে। বেলু প্রুফ দেখিয়া

দেয়।...সন্ধ্যার একটু পূর্বে নীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় আসেন। 'মহাভারতে ব্রহ্মচর্যের আদর্শ' সম্বন্ধে লিখিতেছেন, তাহার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসার প্রয়োজন ছিল। রমণীমাত্রকে চাপিয়া রাখিয়া একান্ত মাতৃত্বের জয়জয়কার ঘোষণা দ্বারা ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইবে না। বরং পাশ্চাত্য আচারদ্বারা চাপিয়া রাখা রমণীত্ব ব্রহ্মচর্যকে ধ্বংস করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে। নারীর সহজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হইলেই পুরুষদের ব্রহ্মচর্য রক্ষা সহজ হয়। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের মধ্যেই ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠার খোঁজ রহিয়াছে। 'যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি' মন্ত্র পাঠ হয়। বাঁশী বাজিতেছে প্রতি মুহূর্তে—শোনে কয় জন? সেই কান আছে কয় জনের? গুরুজনদের কথা শুনিবার মত কান আছে কয় জনের? এক কান দিয়া শোনে আর এক কান দিয়া বাহির হইয়া যায়। ইহার সংখ্যাই তো সর্বত্র। 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল'—ইহাই সত্যকার শোনা। ইন্দুলেখা ঠাকুরাণী ঠাকুরকে ভুল দিয়া যান।

৬ঠা ফেব্রুয়ারী

রাধারাণী, তোমার কান্না বিশ্বের প্রতি স্পন্দনের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। জীব জগৎ তাই বিক্ষুব্ধ। তাহার প্রতিটি ইন্দ্রিয় তোমার রূপ-রসের জন্য উন্মাদ। কান চায় তোমার 'বাঁশী' শুনিতে, তোমার কথামৃত পান করিবার জন্য। তুমি আমাকে রূপে রসে গন্ধে আবরণ করিয়া রাখিয়াছ। বিশ্ব আজ চলিতেছে পুরুষোত্তম-অভিসারে। তাই সে আজ সকল সংস্কার ভাঙিয়া চুরিয়া চলিয়াছে তাঁহার আকর্ষণে। সে না পারিতেছে ধর্মকে আঁকড়াইয়া ধরিতে, না পারিতেছে অধর্মকে আঁকড়াইয়া থাকিতে। তোমার টানে সব ছিঁড়িয়া উপড়াইয়া ফেলিতেছে। ওগো মহানির্বাণ, তুমি আমাকে আত্মসাৎ কর, নিশ্চিহ্ন কর, তুমি বানাইয়া লও।...সন্ধ্যার সময় জগন্নাথ সাহা ও তাঁহার স্ত্রী আসেন। তাঁহাদের সঙ্গে পুরুষোত্তম-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ...'কেন' পাঠ হয়। যে বলে ব্রহ্মকে জানে, তিনি 'অজ্ঞানী' জানেন। জানার কবলে ব্রহ্মকে রাখিবার সম্ভাবনা নাই, বিশ্বের প্রতি কণাটিও ব্রহ্ম, অথচ। 'জানিয়া ফেলিয়াছি'—জ্ঞের বস্তু সম্বন্ধে এমন অপমানকর ঘোষণা হইতে পারে না। জানার বন্ধনে বাঁধিলে জ্ঞাতার কাছে জ্ঞেয় আসে মোহিনী বেশে। জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয় যখন যুক্ত তখনই ভোগ বাস্তব। ভোক্তা যখন ভোগের দাস ভোগ্য যখন ভোক্তার দাস, তখন কী রস দেখানে মুক্ত ছাড়া ভোগের সুখে কে বিচার করিতে সক্ষম মুক্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদের সঙ্গে রাস করিয়াছিলেন। ভোলানাথ ঘোষালের সঙ্গে হাওড়ার ওখানে জায়গা কেনার কথা হয়। একটি জায়গা দেখা চলে।

৭ই ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, তুমি আসিয়াছিলে মুক্তি দিয়া মানুষকে বাঁধিতে। নির্দেশ তুমি কাহাকেও দেও নাই; মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার উপর তুমি নির্ভর করিতে। তাই নিপীড়ি এই বিশ্বে তুমি কাহাকেও পাও নাই। তুমি মর্যা দিয়াছ, আদর করিয়াছ, কিন্তু তোমার মর্যাদা কেহ র করে নাই। আমিও তো, যতদূর মনে পড়ে, মানুষ মুক্তি দিয়া বাঁধিতে চাহিয়াছিলাম; বন্ধনের ভি দিয়া বাঁধিতে চাহিলে লোক পাইতাম। বন্ধু আমা মুক্তির বন্ধনে বাঁধিয়া রাখার মধ্যে যে কি বেদনা আ তাহা আমি বুঝিয়া গেলাম। তবুও ইহার মধ্যে মাধু খনি রহিয়াছে। আমার তো এই পথে চলা ছাড়া গ নাই। তোমার জয় হউক।...জানাইয়াছে যে, সে গ্রা থাকিবে না, অসুখে বহু খরচ হইতেছে বলিয়া। আ অবস্থা এইরূপই! মাসিক ১৲ টাকা দিবে বলিয়াছি দুঃখ করিয়া লিখিয়াছে, কেন বা মুক্ত হইল! আ বলিবার কিছু নাই। সবই সহিতে হইবে। আ একা থাকাই হয়ত ভাগ্য বিধান। ঠাকুরের স্ত্রী ও দর্শন অযাচিত করুণায় পাইয়া ছিলাম, তাহা ধরার ব প্রতিষ্ঠিত করিবার মত কিছু কি করিতে পারিলা মনোরঞ্জন বসু পত্রিকা বন্ধ করিতে বলিয়াছে। কে যাহারা পণ্ডিত তাহারা সরিয়া গিয়াছে, যাহারা ক আছে তাহারা আধমরা। অথচ ৫ বৎসর তো চলিয়াছে নিতে পারুক আর নাই পারুক, ইহা যে অনেক মা পদত্ব করে, ইহা তো চোখের উপর দেখিতেছি

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আমার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'বক্তার পাত্রের ভিতর এক নূতন সৃষ্টি খুলিয়াছে'। ইহা যে ঠাকুরের কৃপায় সম্ভব হইয়াছে, ইহা সত্য।...মিনুর নানারকম অসুখ। কি করিব? চলিব—এই পর্যন্ত জানি।

৬ই ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, তুমি নরেন্দ্রনাথকে একদিন বলিয়াছিলে, 'বিলে, আমি কাঁথা মুড়ি দিয়ে এসেছি, কাঁথা মুড়ি দিয়েই যাব'। ইহাই না গীতার 'যোগমায়াসমাবৃত' হইয়া আসা? কিন্তু আমার তো লোভ হইয়াছিল তোমার কাঁথা সরাইয়া অনাবৃত তোমাকে বিশ্বের সামনে উপস্থাপিত করা। আমার বুকের মধ্যে কেন এ সাধ জাগিল? ইহা কি আমার মনের বিকল্প? ইহা কি যন্ত্রতন্ত্র নয়? আমায় বুঝাইয়া দেও। আমি কি এই নেশায় উন্মাদ হইব? আমাকে কি সুযোগ করিয়া দিবে না যোগেশ্বর?...সারাজীবন আমি ছিলাম অপ্রতিকার ও অপত্র। আমি মরিয়া আসিয়া আমার ক্ষেত্র আমি পাইয়াছি।...ভগবান কোনও মানুষকেই কাহারও একান্ত মুখাপেক্ষা করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। সকলের জন্য—কি পুরুষদের জন্য কি মেয়েদের জন্য—এখানে পথ খুলিয়া রাখিয়াছেন। মানুষের জন্য অনন্ত ভবিষ্যতের দ্বার খোলা রহিয়াছে। সংসারে অনাদর পাইলেই কি আর পথ নাই? রাধারাণী এই পথের খোঁজ দিয়া গিয়াছেন। এই বিপ্লবের পথ কি পুরুষ কি মেয়ে সকলের জন্যই তিনি আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। যারা যেদিন পুলিশের কাছে আমাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বলিয়াছিলেন, আমি দিতে চাই নাই বলিয়া বলিয়াছিলেন, 'বাহির হও'। আমি বাহির হইয়া পশ্চিমের বাড়ীর পুকুর পারের বকুল তলায় বসিয়াছিলাম। ঐ বাড়ীর শরৎ ঘোষের মা আসিয়া বলিয়াছিলেন, 'শরৎ, আমাদের বাড়ী আয়, খাও এসে'। আমি বলিয়াছিলাম, 'বাবার ঘরে যদি স্থান না থাকে, কাকরঘায় কোন ঘরে থাকিব না। বাবার ঘরে যদি অন্ন না থাকে, কাকরঘা কাহারও ঘরে অন্ন খাইব না'। বাবার অপমান আমি করি নাই, অথচ সত্য গোপন করি নাই। কাহারও অমর্যাদা করি নাই, অথচ কাহারও কাছে মাথা বিকাইয়া নাই। যত দূর পারিয়াছি সংব্যবহার করিয়াছি, যতদূর সম্ভব সহিয়াছি, কাহাকেও আঘাত করি নাই। ইহাই আমার জীবন-কথা। এই ভাবে এতদূর চলিয়া আসিয়াছি। মনের খেয়ালের পিছু ছুটি নাই, আমার মনও ভরাডুবি করে নাই। ঠাকুরের বিরুদ্ধে নিতাইবাবু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা মানিতে পারি নাই, ঠাকুর আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। ৯টার পর অমূল্য ও সুশীল আসে।...

৭ই ফেব্রুয়ারী

ওগো ঠাকুর, তুমি 'প্রতিবোধ-বিদিত'; প্রতিটি বোধের প্রত্যক্ষরূপে, বোধকর্তারূপে বোধরূপে ও বোদ্ধব্য-রূপে তোমাকেই জানিব। জগতে যত প্রকার বোধ বা দৃষ্টিকোণ আছে, সব দৃষ্টিকোণে তুমি বিদিত হও বলিয়াই না তুমি প্রতিবোধবিদিত? তোমাকে কোনও এক বোদ্ধব্যরূপে পাইলে তো পাওয়াই হয় না। প্রত্যক্-পরাকের ভেদ যাহাতে নাই, তিনিই সত্য বাস্তব প্রত্যক্ ও পরাক। সব ইষ্ট আমার হউক, সব সাধন আমার হউক, সকলের সব দেখা আমার হউক। বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হইয়া তোমাকে জানিব। বিশ্ব তোমার ঘর, আমি সেই ঘরের ঘরণী হইব। আমাকে তেমনটি করিয়া লও। আমার বেদনের বেদনা দূর কর। তুমি মূর্ত্তিমান বেদ।...কেহই কি কথার কোন মূল্য দেয়? অথচ আমি সারা জীবন কথার মূল্য রক্ষা করিবার জন্য কি প্রাণপণ প্রচেষ্টাই না করিয়াছি। ১৪ হাজারের উপরের বক্তৃতায় late হই নাই। ২দিন বা ৩দিন অনিবার্য কারণে উপস্থিত হইতে পারি নাই। মনে পড়ে, একবার রাণাঘাট-বনগাঁ হইয়া যশোহর সকালে পৌঁছিবার কথা ছিল। বনগাঁর গাড়ী পাশে ছিল। একটি লোক বলিল—কিছু পরে গাড়ী ছাড়িবে। আমি অপেক্ষা করিতে থাকি। হঠাৎ বেঞ্চি গাড়ীটা ছাড়িয়া দিল। তখন নিরুপায় হইয়া urgent টেলিগ্রাম যশোহরে পাঠাইয়া দেই। সকালে যে বহু লোক স্টেশনে আসিয়া ফিরিয়া যাইবে! মানুষকে তো অনর্থক বিব্রত করি

নাই, আত্মরক্ষার তাগিদ ছাড়া। মানুষ আজ কথা রাখে না। ৩টার পর প্রবোধ সোমদার (বরিশাল জগদীশবাবুর বাসায় ছিল) তাহার বন্ধুদের সঙ্গ এখানে আসে।...৪-২০তে পাঠ হয়। প্রবোধ সোমদার প্রভৃতি উপস্থিত ছিল। ৬টার কিছু আগে পাঠ শেষ হয়। 'কুতস্ত্বা কশ্মলমিদম্' শ্লোকটি আস্বাদিত হয়।...

৮ই ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, আস্তাকুড়ে পড়িয়া থাকিতে পারিতাম আমি—৪০৲ টাকা মাহিনার ব্রজমোহন স্কুলের মাষ্টার আমি—অন্নাভাবে মনের দৈন্যে স্ত্রীপুত্রাদির ভারে বিব্রত হইয়া কোথায় পড়িয়া থাকিতে পারিতাম? তা কি আমি জানি না? তুমি সেই সম্ভাবনাকে মুছিয়া ফেলিয়া কি মূল্যই না আমায় দিলে? আমি আজ বেহাস্ত লিখি, আলোচনা করি। এত মূল্য আমার ছিল! কোনও দিনই তো ভাবি নাই। ধরার ধূলিকে শিরোভূষণ করিলে! তোমার স্পর্শে আমার এত মূল্য? আমাকে আমি চিনিয়াছি, পাইয়াছি। ভাস্টবিন হইতে কুড়াইয়া আমাকে তুমি বুকে তুলিয়া লইলে। আর আমি দুঃখ করিব না। তোমার জীবনে আমি আজ একজন। ধন্য তুমি।... কোথায়ও তো পুরুষোত্তমের কথা নাই। যিনি নর-নারী মিলনের দেবতা, মূর্ত্তিমান কন্দর্প, কাম তাঁহার জীবনেই ব্যাখাত হইতে পারে, অথচ তিনি কোথায়? জগন্নাথের জগতে তিনি কোথায়? 'মন্নি তে ন চাহং তেষ্বপি'। তাঁহাকে বাদ দিয়া জগৎ বেশ চলিয়াছে। এই 'বেশ চলার' সঙ্গে আমি কেমন করিয়া বেশ চলিব? কবে কোথায় সংসারে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিব?...বেশ সকালে ৭৷৷টার পর বাহির হইয়া যাব সেন্ট লরেন্টো স্কুল দেখিবার জন্য। সেখান হইতে ১১৷৷টায় একবার আসে, আবার যায়। বেশ ভাল লাগিয়াছে শিশুদের শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া।...সম্পর্ক ইহারা এমন ভাবে ছিন্ন করিয়াছে যে আর যাইবার সম্ভাবনা নাই।...চাকুরিয়া হইতে যোগেশ ব্রহ্মচারীর লোক, এখান হইতে ৮-৫তে যায়। তাহাদের ওখানে শিবরাত্রি উপলক্ষে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে। পারিব না বলিয়া দিয়াছি। আর ভাল লাগে না।

৯ই ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, তুমি আমার কি না করিয়াছ? কোথাকার মানুষকে তুমি কোথায় আনিয়াছ? আর আমি? আমি তোমার কিছু করিতে পারি নাই—তোমার সাক্ষাৎ সেবা খাওয়ানো পরানো করি নাই। তোমার জীবন ও দর্শন প্রচার—তাহাই কি করিতে পারিলাম? সেবা আমার হইল না—এই দুঃখ আমার অহরহ লাগিয়া রহিয়াছে। একটা চাপা দুঃখ আমার সর্বদার জন্য রহিয়াছে। সন্ধ্য গড়িব বড় লোভ ছিল। পারি নাই। আমি কি সন্ধ্য গড়িয়া যাইতে পারিব না? সেখানে তোমার 'গোগোপদজ্বারত' রূপের আস্বাদন করিতে দিবে না?...মিনুর সঙ্গে ঠাকুরের দর্শন ও তাহার জীবনের করণীয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়। পারেপার্শ্বিক প্রাণগোলা আচরণ ছাড়া যে সন্ধ্য গড়িতে পারে না এবং বৃন্দাবনে ব্রজগোপীদের মধ্যে যে ইহাই ছিল, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির লেশমাত্রও যে তাহাদের ছিল না, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি থাকিলেই যে কাড়াকাড়ির সৃষ্টি হয় ইত্যাদি বলি। Organism-এর ব্যাখ্যা করি। পায়ে কাঁটা ফুটিলে মাথা ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠে, পায়ের বেদনা সমস্ত শরীর ভাগ করিয়া লয়, একের সুখে অপরে সুখী হয়, কেননা সকলে তো একই অখণ্ড সমমূল্যবান অঙ্গ। কে বড়, কে ছোট? সকলেই সেবা করিয়া ধন্য। সুস্থ দেহ হৃদয় ও মস্তক কেহ কাহারও ঈর্ষা করে না। ঈর্ষা করিলে তো কেহই বাঁচে না। সকলে মিলিয়া মিশিয়াই এক অখণ্ড সত্তা। আমি ইহাই তো কয়েকটি মানুষ লইয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়া ছিলাম, যাহাদের একজনের গায়ে চিমটী কাটিলে অপর উহ্ করিয়া উঠিবে। আজ বিশ্বের ইহাই প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন যতখানি পূরণ করিতে পারিব, ততখানিই ঠাকুরের ইচ্ছা পূরণ করা হইবে। পাঠ হয় 'প্রতিবোধ-বিদিতম্'। উপরোক্ত আলোচনাই করি।...

১০ই ফেব্রুয়ারী

মুণ্ডকোপনিষৎ

অবধূত ভাষ্য সমেত

তৃতীয় মুণ্ডক, প্রথম খণ্ড

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লীলায় যিনি যোগমায়া, ভেদবুদ্ধির ক্ষেত্রে তিনিই মায়া। পুরুষোত্তমে জ্ঞানও ব্রহ্ম, অজ্ঞানও ব্রহ্ম, বিক্ষেপও ব্রহ্ম, আবরণও ব্রহ্ম। জ্ঞানটা ভাবের ক্ষেত্রে খুব বড় বটে, রসের ক্ষেত্রে তাহার মূল্য রসের সিঞ্চনে; রসের ক্ষেত্রে না-জানার মূল্য, বিক্ষেপের মূল্য, আবরণের মূল্যই সাধনে; জ্ঞানটা সে স্তরে না-জানার পশ্চাতে। যিনি পুরস্তাৎ ব্রহ্ম, তিনিই পশ্চাৎ ব্রহ্ম; ব্রহ্ম পুরস্তাৎ পশ্চাৎ সমন্বিত। পুরুষোত্তমেই সব বিপরীত ধর্ম্মের যুক্তিযুক্ত একটা ব্যাখ্যান মিলে। সৃষ্টির আলো মহানির্ব্বাণে নিভাইয়া দিয়া এক স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময় খাড়া যে যুক্তিবাদ করিয়াছে, তাহা প্রাণকে উপবাসী রাখিয়াছে, হৃদয়কে ফাঁকি দিয়াছে, 'রসঃ বৈ সঃ'—শ্রুতিতে লেখা থাকিলেও তাহার উপর শুধু চোখই বুলাইয়াছেন। ভাব ও রসের পরিপূর্ণ বেলাই বুদ্ধির কাছে, মনের কাছে সর্ব্বেন্দ্রিয়-ধাঁধা ধরাইয়া দিবার জন্য যোগমায়ার বুকে বিক্ষেপ-আবরণময়ী মায়ার চাতুর্য্য। যিনি বুদ্ধির স্তরে মায়া, তিনিই ঊর্দ্ধমূল পুরুষোত্তম-স্তরে লীলাশক্তি, যোগমায়া।

সর্ব্বদা যুক্ত, সমান আখ্যাবিশিষ্ট দুইটী পাখী একই বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একটী স্বাদু ফল ভোগ করিতেছে, অন্যটী ভোগ না করিয়া দর্শন করে। ৩।১।১

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো-
নীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্
অস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥ ২

সমানে বৃক্ষে [একই শরীর-বৃক্ষে] পুরুষঃ [পৃথক্-ভাবে জীব] নিমগ্নঃ [ডুবিয়া গিয়াছে] অনীশয়া [অনীশ ভাবে ; কার্য্য-কারণের মধ্যে শক্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া নিজকে জীবত্বের উপাধিতে অপমানিত করিয়া এবং ঈশ্বরকে মায়া-উপাধির ঈশ্বর অন্য বলিয়া, দূরে সরাইয়া দিয়া অনীশ হইয়া, হীন-হীন-কাঙ্গাল সাজিয়া, অনন্ত ভগবানের মহিমার সমান অংশীদার না হইয়া ; পুরুষোত্তমকে 'অন্য' মনে করার ফল অনৈশ্বর্য্য দৈন্য, হীনতা প্রাপ্তি] শোচতি [শোক করেন] মুহ্যমানঃ [ঈশ্বর জীবের 'অন্য'—এইরূপ জীব ঈশ্বর ভেদে মোহ প্রাপ্ত ; ঐশ্বর্য্যশক্তির শাসনে শোষণে নিষ্পেষণে সব হারাইয়া, সর্ব্বহারা হইয়া, দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া, দুশ্চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাইয়া] জুষ্টম্ [সেবিত, সর্ব্বস্বার্পণদ্বারা সেবিত] যদা [যখন] পশ্যতি [দেখেন] অন্যম্ [ফলভোগ করিবার দুষ্ট লালসায় যাহাকে 'অন্য' মনে করিয়া দূরে সরাইয়া দিয়াছেন, সেই অন্যকেই সেবার দ্বারা 'অনন্য' বলিয়া যখন দেখেন] ঈশম্ [ঈশ্বরকে] অস্য মহিমানং ইতি [সেবিত হইলেই ঈশ্বর নিজের মহিমা জীবকে দিয়া নিজে নিরীশ্বর হন্, তখন ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য-উপাধি গলিয়া যায়, ঈশ্বরই হন্ বিশ্বাত্মা-ভগবান্। এই অনন্ত, অনীশ, বিশ্বাত্মা ভগবানকে, পুরুষোত্তমকে যিনি দেখেন] (তখনই) বীতশোকঃ [সকল ভেদবুদ্ধির অনুশোচনা কাটিয়া যায়, দেহ মন প্রাণ সব প্রসন্ন হয়।]

একই বৃক্ষে পুরুষ ঐশ্বর্য্যহীনতায় নিমগ্ন থাকিয়া, মুহ্যমান হইয়া শোক করেন ; যখন অন্য, ঈশ্বর, ইহার মহিমাকে সেবার ভিতর দেখেন, তখন বীতশোক হন্। ৩।১।২

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি। ৩

যদা [যখন] পশ্যঃ [যে দেখেন, সে পশ্য, পশ্যতি ইতি ; বিদ্বান্ দ্রষ্টা,] পশ্যতে [পশ্যতি দেখেন] রুক্মবর্ণং [সোনার বরণ] কর্তারম্ [অবর্ত্ত-কর্ত্তাকে] ঈশং [মহিমমণ্ডিত এবং রসঘন] পুরুষং [পরিপূর্ণ স্বরূপ ও রূপ পুরুষকে] ব্রহ্মযোনিং [জগৎ কারণ ব্রহ্মকে] তদা [তখন] বিদ্বান্ [সেই অপরোক্ষদর্শী] পুণ্যপাপে [পুণ্য ও পাপকর্ম্মক] বিধূয় [বিশেষভাবে তুলার মত ধুনিয়া, সব মল (অঞ্জন) ছাটিয়া ফেলিয়া, নির্মল করিয়া পুরুষোত্তম-কর্ম-রূপতা প্রধান করিয়া] (অতএব) নিরঞ্জনঃ [সমস্ত অঞ্জন অর্থাৎ কালিমা যাহার জীবনে পুড়িয়া গিয়া জ্যোতির রূপ আরও উজ্জ্বল করিয়াছে, তিনিই নিরঞ্জন, নির্মল ; অঞ্জন যাহার চোখের 'কাজল' রূপে শোভা বাড়ায়, দৃষ্টির ক্ষমতা বাড়ায়, সে অঞ্জন কি আর কালিমা ? তাহা তো সোনারই নামান্তর মাত্র] (হন) পরমং [পরিপূর্ণ] সাম্যম্ [পুরুষোত্তমসাম্য] উপৈতি [প্রাপ্ত হন]।

যখন বিদ্বান্ দ্রষ্টা 'সোনার বরণ' জগৎ কর্ত্তা, পরমেশ্বর, পরিপূর্ণ স্বরূপ-রূপ জগৎকারণকে দেখেন, তখন সেই বিদ্বান্ পুণ্যপাপ বিশেষভাবে ধুনিয়া নিরঞ্জন হন, পরম সাম্য প্রাপ্ত হন। ৩।১।৩

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্
এষঃ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৪

প্রাণঃ হি [প্রাণের প্রাণ নিশ্চয়ই] এষঃ [এই পরম-পুরুষ ঈশ্বর] যঃ [যিনি] সর্বভূতৈ [সর্বভূতের দ্বারা, সর্বভূতের সঙ্গেই, পরম সমভাবে বিবিধ সর্বভূতরূপে] বিভাতি [বিভাত হইতেছেন] বিজানন্ [ইহাকে নিজ জীবনে আত্মভাবে জানিয়া] বিদ্বান্ ভবতে [ভবতি, হন] নাতিবাদী [অতিবাদী হন না ; সকলকে অতিক্রম করিয়া বাড়াইয়া বাড়াবাড়ি করিয়া কোনও কিছু সত্য বাস্তবের স্তরে না পৌঁছিয়া পুষ্পিতবাক্য বলাই যাহার স্বভাব, সেই অতিবাদী ; সকল 'অতি'কেও অতিক্রম করিয়া যিনি লোকে ও বেদে প্রথিত পুরুষোত্তম, তাঁহার কথা বলিলে আর 'অতি'বাদের ভয় কোথায় ? সব কথাই তাহার নিজের কানে কানে) আত্মক্রীড়ঃ [যিনি নিজেই নিজের সঙ্গে নিজের মধ্যে ক্রীড়া বিলাসে রত, সমস্ত বাহ্য যাহার নিজরূপে পরিণত, তিনিই আত্মক্রীড়] আত্মরতিঃ [নিজেই নিজের সঙ্গে নিজের মধ্যে যিনি রমণ করেন তিনি আত্মরতি ; ক্রীড়ার বাহ্য সাধনার অপেক্ষা আছে, রতি সাধননিরপেক্ষ বাহ্য বিষয় প্রীতিমাত্র—দুইয়ের এই প্রভেদ। আত্মরতি অর্থ এখানে আত্মভাবে ভাবিত সর্বভূতরতি ; সর্বভূত যাহার আত্মা, তাহার সর্বভূত রতিই আত্মরতি। কূটস্থ অক্ষর অপ্রাণ, অমন, নিষ্ক্রিয় আত্মার পক্ষে ক্রীড়া-রমণ প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যান দুর্কোধ্য ; একটা 'ভাব'কেই 'আচারস্তন দ্বারা' ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলা মাত্র। বস্তুতঃ ক্রীড়া বা রমণকে বাস্তব করিতে হইলে চাই খেলোয়ার, খেলার সাধন ও খেলার পাত্র ; ইহাদের মধ্যে শক্ত ব্যবধান দেখিলে খেলা হয় মিথ্যা, আর তিন যদি অদ্বৈতভাবে, আত্মভাবে পরস্পরকে আস্বাদন করেন, তখন তাহাদের এই রতিই আত্মরতি (cross-fertilisation) ; যেখানে পারমার্থিক কূটস্থ আত্মা সেখানে ক্রীড়াও নিস্তব্ধ, রতিও নিস্তব্ধ। ঐ শব্দগুলিকে টানিয়া কূটস্থের স্তরে নিয়া যাওয়া শব্দের পারমার্থিক আত্মা ও ব্যবহারিক সর্বভূতের উপর জুলুম মাত্র। যেখানে আত্মরতি (self-fertilisation) সেখানে ক্রীড়া চলে না, সৃষ্টি হয় লোপ। উদ্ভিদের স্তরে সীম গাছের মধ্যে একই বৃক্ষের অন্তর্গত পুরুষ ও মেয়ের রমণ দেখা যায় ; কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন কি পেপে প্রভৃতি বৃক্ষের মধ্যেও এ-দেশের পেপে গাছের মেয়ের গর্ভে ও-দেশের পেপে গাছের পুরুষ-ফুলের বীর্য্য কখনও বা বায়ুর মধ্য দিয়া,

কখনও বা মক্ষিকার দ্বারা বিহিত হয়। যেখানে cross-fertilisation সেখানেই সৃষ্টির উৎকর্ষ। ভাগবত তাই বলিতেছেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থা অপি উরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

আত্মারাম নির্গ্রন্থ মুনিগণও উরুক্রমে অহৈতুকী ভক্তি করেন। হরি ঈদৃশ্‌ভূত-গুণই বটেন। Self-fertilisation আর cross-fertilisation-এ পরিপূর্ণ গড়িয়া উঠিবার জন্য ভক্তিবাদের অপেক্ষা করিতেছেন; আত্মারাম পুরুষোত্তম নিজে ভগবান সাজিয়া আত্মারাম সাধককে ভক্ত সাজাইয়া এবং সর্ব্ব ক্রিয়াকে ভজনে রূপায়িত করিয়া 'আত্মারামোঽপি অরীরমৎ'—আত্মারামের রমণ পারমার্থিক। আত্মরতি ও সর্ব্বভূতহিতির সমন্বয় পুরুষোত্তম ধৃতি।] ক্রিয়াবান্ [জীবনে ভেদাভেদ ভাবাপন্ন আত্মা ও সর্ব্বভূতের এই আত্মক্রীড়া ও আত্মরতিমূলক লৌকিক-বৈদিক সমস্ত ক্রিয়ার সঙ্গে যাহার নিত্যযোগ সাধিত হইয়াছে, সর্ব্বক্রিয়াকে যিনি নিজ জীবনে পাইয়াছেন, সর্ব্বক্রিয়া যাহার জীবনে পুরুষার্থরূপে, পরম-আস্বাদনরূপে আছে, তিনিই ক্রিয়াবান] এষঃ [ইনি] ব্রহ্মবিদাং [ব্রহ্মবিদ্‌গণের] বরিষ্ঠঃ [বরতমঃ]।

ইনি নিশ্চয়ই প্রাণের প্রাণ, যিনি সর্ব্বভূতের সঙ্গে সর্ব্বভূতরূপে বিবিধ আকারে বিভক্ত হইতেছেন। ইহাকে যে বিদ্বান্ জানেন, তিনি অতিবাদী হন্ না। তিনি আত্মক্রীড়, আত্মরতি, ক্রিয়াবান্; ইনি ব্রহ্মবিদ্‌গণের বরিষ্ঠ। ৩।১।৪

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃ শরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥৫

পুরুষোত্তমরতির অনুকূল-অর্থে সর্ব্ব সহকারী সাধনার নির্দ্দেশ করিতেছেন—সত্যেন [সত্যদ্বারা; পুরুষোত্তমান্বিত বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয় ও কর্ম্মসমূহ যখন ভজনের অনুকূলরূপে রূপায়িত হইল, তখন তাহা সমগ্র পারমার্থিক 'সত্য'; শুধু তথাকথিত পারমার্থিক সত্যদ্বারা ব্রহ্ম-লাভ হয় না; পুরুষোত্তমের সত্য একান্ত (absolute) নয়, নিরেট স্থির (static) নয়; প্রতি দেশ-কাল-পাত্রের মর্য্যাদা ও ছন্দ বজায় রাখিয়া যে সত্য, তাহাই পুরুষোত্তম-সত্য; কেবল মুখের বা কেবল হৃদয়ের যথার্থ ভাষণের সত্যই সত্য নয়; যখন ইন্দ্রিয়-মন, ইহকাল পরকাল একাগ্র হইয়া বিশ্ব-কল্যাণ আনয়ন করিবে তাহাই সত্য] লভ্যঃ [প্রাপ্তব্য] তপসা [সর্ব্ব ইন্দ্রিয় ও মন যখন তাহাদের স্ব-ছন্দ, ক্রীড়া বজায় রাখিয়া স্ব-ছন্দে পুরুষোত্তমে ডুবিল, পুরুষোত্তমসত্তা প্রাপ্ত হইল, তখনই প্রতিষ্ঠিত হইল তপস্যা; তপস্যা শুধু কৃচ্ছ্রের দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে তাপিত করাই নয়, উহাতে ইন্দ্রিয় তাপিতই হয়, ক্ষিপ্তই হয়, শুকাইয়াই যায়, বিষয় গ্রহণে কৈবাই প্রাপ্ত হয়; এমন তাপ লাগাও যাহাতে সব বৃত্তি-ইন্দ্রিয় গলিয়া পুরুষোত্তম ছাঁচে আবার গড়িয়া উঠে] হি [নিশ্চয়ই] এষঃ [এই] আত্মা [পুরুষোত্তম] সম্যক্ জ্ঞানেন [আত্মজ্ঞান ও সর্ব্বভূত বিজ্ঞানের সমন্বিত সম্যক জ্ঞানদ্বারা] ব্রহ্মচর্য্যেণ [পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে আস্বাদিত ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা; যে কৌশলে পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির সমকক্ষতা স্বীকার করিয়া, পুরুষের চাপ হইতে প্রকৃতিকে যে কৌশলে মুক্ত করিয়া, যিনি প্রকৃতির সকল স্তরে বিচরণ করিয়াও যে কৌশলে অচ্যুত, তাঁহার এই কৌশলই ব্রহ্মচর্য্য।] নিত্যম্ [নিত্য, এই নিত্য পদটী সত্য, তপঃ, জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য্য সমভাবেই প্রযোজ্য; পুরুষোত্তম-স্তরই নিত্যস্তর; অন্যস্তরের সত্য, তপঃ, জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য্য প্রকৃতির একটু গোপন দৃষ্টিভঙ্গিতেই ধূলায় লুটায়।] অন্তঃশরীরে [শরীরের পরতে পরতে, জীবনের সকল ছিদ্র-পথে, সন্ধি স্থলে; এই অন্তঃশরীর পুরুষ অহল্যার জীবনে ছিলেন বলিয়াই না গৌতমের অভিসম্পাত সত্ত্বেও শ্রীরাম পাষাণস্পর্শ রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন? পুণ্যই বল, আর পাপই বল, সব-কিছুর মধ্যে 'অন্ত' আছে, অবকাশ আছে, ছিদ্র আছে, তাই জীবের রক্ষা। পুণ্যের ফাঁক দিয়া, পাপের অন্তরের ফাঁকে দিয়া পুরুষোত্তম যে কি নটবর বেশে কত না ক্রীড়া করিতেছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?]

জ্যোতির্ময়ঃ হি [আলোর সাগরই ; যখন-তখন যেখানে-সেখানে, যেন্তা চিন্তামণির কুৎসিৎ আলয়েও, যার তার কাছে প্রকাশিত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন স্বয়ংজ্যোতিঃ] শুভ্রঃ [ধবধবে ; যিনি আছেন বলিয়া সকলের সব মলিনতাও শুভ্র হইয়া ফুটিয়া উঠে] যৎ [যাহাকে] পশ্যন্তি [আরাধন করেন, দেখেন ;] যতয়ঃ [যত্নশীলের দল, এই নিত্য পুরুষোত্তমকে প্রতি অঙ্গের কাম্য নির্ব্বাচিত করিয়া প্রতি অঙ্গে পাওয়ার জন্য সারা জীবন, প্রতিক্ষণ ধাবিয়া যাহারা কতই না যত্ন করিতেছেন, তাঁহারাই ক্ষতি] ক্ষীণদোষাঃ [ক্ষয় হইয়াছে দোষ যাহাদের ; রাগদ্বেষই দোষ ; যাহাদের সর্ব্বভূত সম্বন্ধে রাগ (আসক্তি) এবং তাহাতে দ্বেষ বুদ্ধি বলতঃ তাহা হইতে পালাইয়া বাঁচিবার জন্য 'দ্বেষ' দুই-ই ক্ষয় হইয়াছে। প্রকৃতির উপর রাগ-দ্বেষই পুরুষোত্তমরতির অন্তরায়।]

যাহাকে রাগদ্বেষ রহিত যতিগণ উপলব্ধি করেন, সেই জ্যোতির্ময় আত্মাকে নিত্য সত্য, নিত্য তপস্যা, নিত্য সম্যগ্‌দর্শন ও নিত্য ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা অন্তঃশরীরে উপলব্ধি করিতে হয়। ৩।১।৫

সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥৬

সত্যম্ এব [সত্যই] জয়তে [জয়যুক্ত হয়] ন অনৃতম্ [অনৃত, মিথ্যা নয় ; সমস্ত জটিলতা কুটিলতারূপ অনৃতকে মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া যাহারা সত্যকে সহজ সরল করিতে চাহিল সেখানে সত্য পরাজিতই হইল। জটিলতা-কুটিলতা যে সত্যের রস যোগায়, জটিল কুটিল হইয়াই যে সত্য সত্য, তাহাই জয়যুক্ত হয় ; জটিলতা কুটিলতা বর্জ্জিত সত্য অনৃত পর্য্যায় ভুক্ত] সত্যেন [সত্য দ্বারা] পন্থা [পথ] বিততঃ [বিস্তৃত] দেবযান [দেবযান। সত্য যদি নিছক (absolute) পারমার্থিক হইত, দেশ-কাল-পাত্রের অপেক্ষা না করিয়া শুধু নির্বিকল্প থাকিত, তবে উপনিষৎ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানের তুলনা নিষ্ক্রমমুক্তিমার্গ rigid সত্যদ্বারা বিস্তৃত হইতে পারি না। সমস্ত স্তর, তা যতই নিম্ন হউক তাহা যদি পার সম্মত হয়, তবে সেখানেও সত্য প্রকাশিত। সত্যের এ নমন স্বভাব (flexibility) পুরুষোত্তমস্বরূপের] যেন [দেবযান মার্গ দ্বারা] আক্রমন্তি [আক্রমণ করেন, গমন করেন ঋষয়ঃ [তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ] হি আপ্তকামা [আপ্ত হইয়াও কাম যাহাদের ; যতদূর কাম দেবযান পথে পুরুষোত্ত শ্রীচরণ-পূত হইয়া মিলিতে পারে প্রাপ্ত হই সাধারণ কামে বিগতস্পৃহ হইয়া] যত্র [যেখানে] [সেই] সত্যস্য [পূর্ণ পুরুষোত্তম সত্য সাধনার স সম্বন্ধ রাখে এমন এক সাধন কণাও পূর্ণ ; পূর্ণ সত্যের পূর্ণ সত্য এক কলা (অংশ) সাধনা দ্বারা, দেবযান সাধ দ্বারা সাধ্য] পরমং [প্রকৃষ্ট, অখণ্ড] নিধানম্ [পুরুষ রূপ নিধি। যাহা পরমার্থ সত্য, তাহা সব স্তরের স প্রাণের সকল সাধনাকেই 'সত্য' রূপে প্রতিষ্ঠা দ করিয়াছে।]

সত্যই জয়যুক্ত হয়, অনৃত নয়। সত্যদ্বারাই দেবয পথ বিস্তৃত, যাহাকে অবলম্বন করিয়া আপ্তকাম ঋষি গমন করেন, যেখানে সত্যের সেই পরম নিধ রহিয়াছেন। ৩।১।৬

ক্রম

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীনিত্যগোপাল ॥

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় জন্যই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের মূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে, দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেইজন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়-নির্দ্দেশিত 'সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

শ্রীনিত্যগোপাল

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত

যে অহঙ্কারের প্রভাবে আত্মার ও আত্মজ্ঞানের পর্য্যন্ত অস্তিত্ব-বোধ হয়, তাহাকে তুমি অসত্য বলিতে পার না। তোমার তাহাকে নিত্য-সত্যই বলা উচিত। তাহা নিত্য-সত্য বলিলে, তাহা যে মায়ার অংশ, সে মায়াকেও নিত্যসত্য বলিতে হয়। ৩।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত

যাহার কারণ নাই, তাহা নিত্য। যাহার কারণ নাই, তাহার উৎপত্তিও হয় নাই। উৎপত্তি যাহার হয় নাই, তাহার বিনাশও নাই। পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের আত্মানাত্মবিবেকানুসারে অবিদ্যারও উৎপত্তির কারণ নাই। সেমতে অবিদ্যার উৎপত্তির কারণ নাই বলিয়া অবিদ্যাও অজ। সেমতে অবিদ্যা অজ বলিয়া অবিদ্যা অমরও বটে। সেমতে অবিদ্যা অজ-অমর বলিয়াই অবিদ্যাও নিত্য। সুতরাং সেই মতানুসারে অবিদ্যা ও ব্রহ্ম অভেদ বলিতে হয়। কারণ সেমতে ব্রহ্মও অজ অমর ও নিত্য। সেমতে ব্রহ্মকে অনাদি ও অবিদ্যাকেও অনাদ্যা বলা হইয়াছে। যাঁহার আদি কেহ নাই, তিনিই অনাদি। যাঁহার আদি কেহ নাই, তাঁহার উৎপত্তিও হয় নাই, তাঁহার মৃত্যুও নাই। শঙ্করাচার্য্যের মতে পুংলিঙ্গে ব্রহ্ম যেমন অনাদি, তদ্রূপ তাঁহারই মতে স্ত্রীলিঙ্গে অবিদ্যাও অনাদ্যা। অবিদ্যা অনাদ্যা, সুতরাং অবিদ্যারও কেহ আদি নাই। অবিদ্যার আদি নাই বলিয়া অবিদ্যারও ঐ ব্রহ্মের ন্যায় জন্ম-মৃত্যু নাই। সেইজন্য ব্রহ্মের ন্যায় অবিদ্যাও নিত্য। (ক্রমশঃ)

সাময়িকী

নরনারায়ণ মিলন সভা ঃ—বন্ধুবর শ্রীশান্তশীল দাস নরনারায়ণ আশ্রমের শ্রীপার্থিতা নাথ বিশ্বাসকে বললেন, প্রতি মাসের প্রথম রবিবার আসুন যে যা পারে বা ইচ্ছে করে তা করে' একত্র বসে এক ঘণ্টা কাটানো যাক। যে কবিতা বা প্রবন্ধ বা গল্প লিখতে পারে সে তা পাঠ করুক, যে গান গাইতে পারে, গান গাক; কেউ হয়তো অন্যের একটা লেখা খুব ভাল লেগেছে বা খুব প্রচলিত হয়—তা পড়ে শোনাক—এমনি যার যার ইচ্ছেমত নিজের খুশীকে প্রকাশ করার একটা সুযোগ হোক, দশজনে মেলবার আর একটা সহজ পথ হোক। এই ইচ্ছা তাঁরা দুই পাঁচজনকে বললেন। গত ৭ই মার্চ দুপুর ৩টে থেকে ৬টেতে তাঁরা জনা কুড়ি সমবেত হয়েছিলেন। সভার নাম দিলেন নরনারায়ণ মিলন সভা; পরিচালনা করলেন শ্রীশান্তশীল দাশ। সমবেত সঙ্গীত হল, আরও দুটো গান গাইলেন সুব্রত সান্যাল আর একটী গাইলেন সুনীতি চক্রবর্তী। কবিতা আবৃত্তি করলেন মধুসূদন সূত্রধর, প্রবন্ধ পাঠ করলেন গীতা সেনগুপ্তা, শোভা দাস, কৃষ্ণিদাস সাহা; বক্তৃতা দিলেন পূর্ণেন্দু ঘোষ। উদ্যোক্তারা অনুরোধ জানালেন উদ্যম-ভারতকে দুটো প্রবন্ধ ছাপাতে। আমরা দুটো প্রকাশ করলাম।

যারা এরকম উদ্দেশ্য নিয়ে মিলতে চেয়েছেন তাঁরা ভাল কাজই করছেন সন্দেহ নেই। মানুষের অন্তরের সম্ভাবনাকে প্রকাশ করবার পথ করে দেওয়া খুব ভাল, আর এতে পাঁচজন নিজের কথা বলবার সুযোগ পাবে বলে আসবার আগ্রহও তাদের হবে বেশী। এ জিনিষ হোক আমরা ইচ্ছা করি। তবে কথা হল এতে কেউ উন্নততর মানুষ হবে কি না—অপরের প্রতি যেটুকু আমার প্রীতি ছিল, তার থেকে আর একটু প্রীতি বাড়বে কিনা, অপরের সুখে আমি আর একটু বেশী সুখী হতে পারব কিনা, অপরের দুঃখে আর একটু বেশী দুঃখ বোধ করব কিনা, নিজের বুদ্ধিতে যেটা বুঝি বা ভাবি সেইটেই ঠিক, যেটা বুঝতে পারলাম না সেটা ঠিক নয়—এই যে ভাব আজ শতকরা ৯৯ জনের—এ ভাব দূর হয়ে মানুষকে আরও খানিকটা শ্রদ্ধাশীল করবে কিনা—ইত্যাদি প্রশ্নগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখতে উদ্যোক্তাদের আবেদন জানাই। তা যদি না হয় তাহলে খুব একটা সার্থকতা এর থাকে না। অধিকতর মানুষ হওয়াই যদি না হল, তাহলে অন্ততঃ নরনারায়ণ আশ্রমের মধ্যে বসে এ করার সার্থকতা কি হল? মানুষকে যোগ্যতর করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর শ্রদ্ধাশীল করে তোলা—গণতন্ত্রের সমস্যার সমাধান এইখানে! আজ সমস্ত মানুষকে সমান অধিকার দেওয়া হল, সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়া হল, জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দেওয়া হল—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি তাকে শ্রদ্ধাবান করে তোলা না যায়, শ্রদ্ধাশীল করে তোলা না যায়, তাহলে আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়—মানুষের মানুষ হওয়াই হল না, জীবনে শান্তিই আসে না, আনন্দ দূরে চলে যায়। আমাদের সকল প্রচেষ্টার মধ্যে এই কথাগুলি যেন আমাদের মনে থাকে।

প্রথম রচনা—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁর ধর্ম

শ্রীকৃষ্ণিদাস সাহা

দ্বিতীয় রচনা—ঈশ্বর নিরাকার কি সাকার—গীতা সেনগুপ্ত।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁর ধর্ম ঃ প্রেমময় বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ 'নিজে আচরি ধর্ম পরেরে' শিখিয়েছেন। এখানেই অন্যান্য ধর্মগুরুর সঙ্গে তাঁর প্রভেদ। তিনটি ভাবে বিভোর ছিলেন তিনি—সাধারণ, ভক্ত ও ভগবৎ

ভাব। তিনি যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছেন তা ভগবদ্-ভাবে বিভোর হয়েই। অপর দুই ভাবে তাঁর আচরণে খুঁজে পাবো তাঁর ধর্মের শিক্ষা। অতএব তাঁর ধর্মকে জানতে হ'লে অনুধ্যান করতে হবে তাঁর অমৃতময় জীবনকে।

ভক্তাবস্থায় তিনি ভক্তশিরোমণি। ভগবানের জন্যে কী তাঁর আকুলতা! ভগবানের দরশন পেতে হ'লে এমনি ব্যাকুল হ'তে হয়,—এই তাঁর শিক্ষা। তাঁর ধর্মে ভগবান ভয়ের দেবতা নন্, প্রেমের দেবতা তিনি। তাঁকে পেতে পূজার্চনার প্রয়োজন নেই। 'প্রেমভক্তিতে তাঁকে মেলে'। প্রাণখুলে ডাকতে হয় তাঁকে। তখন তিনি নিজেই আসেন। যেমনটি আসেন পিতামাতা। ভগবানের সঙ্গলাভই শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মের উদ্দেশ্য। মোক্ষলাভ একেবারে তুচ্ছ। পরকালের চেয়ে ইহকাল শ্রেষ্ঠতর। দুঃখজরাক্রান্ত পৃথিবী থেকে পালিয়ে যেতে নেই। শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম প্রেমধর্ম। মন্ত্রতন্ত্রের স্থান এতে গৌণ। যে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসায় মানুষে মানুষে ঘটে প্রাণের মিলন, সেই প্রেমে ভগবানের সঙ্গে মানুষের হয় আত্মিক মিলন।

শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম মানবধর্ম। এ ধর্মে ধ্বনিত হয়েছে মানুষের জয়গান। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। তাঁর ধর্মের মূলমন্ত্র—'জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব (মানব) সেবন'। এ ধর্মকে ভিত্তি করে মানুষে মানুষে ঘটে যে হৃদয়-বন্ধন তা দৃঢ়, অচ্ছেদ্য।

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয়নি শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মে। 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ'। অস্পৃশ্যতার স্থান নেই এতে। সে যুগে চণ্ডালের ছায়া মাড়ালে হ'ত পাপ। শ্রীগৌরাঙ্গ মানবতার এত বড় অপমান সহ্য করতে পারলেন না। পদ্মনেত্রযুগল থেকে সাগর ছুটে এলো। সেই সাগরের জলে পাপীর পাপ হ'ল বিধৌত। মুচি যেথর ডোমকে কোলে টেনে নিলেন তিনি। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল নির্বিশেষে কীর্তনদল তৈরী করলেন। সৃষ্টি হ'ল সমবেত ভজনের। অস্পৃশ্যতার মূলে কুঠারাঘাত এখানেই শেষ হল না তাঁর। প্রচলন করলেন মহোৎসবের। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল নির্বিশেষে এক পংক্তিতে বসে গ্রহণ করতে হবে ভগবানের প্রসাদ।

শ্রীগৌরাঙ্গ ক্ষমাসুন্দর। ক্ষমা তাঁর ধর্মে, একটি মহৎ গুণ। কিন্তু সে ক্ষমা দুর্বলের ক্ষমা নয়, সবলের। যে ক্ষমা অপরাধীর জীবনে পরিবর্তন এনে দেয় তা হ'ল প্রকৃত ক্ষমা। জগাই-মাধাইকে ক্ষমা করে তাঁদের জীবনে এনে দিয়েছিলেন তিনি এক বিরাট পরিবর্তন।

শ্রীগৌরাঙ্গ-ধর্মও দুর্বলের ধর্ম নয়, এ ধর্ম সবলের। মুসলমান শাসকের আদেশ—কীর্তন বন্ধ। আইন অমান্যে রুদ্র গর্জে উঠলেন শান্তসুন্দর শ্রীগৌরাঙ্গ। তাঁর আহ্বানে জড় হ'ল নদীয়ার সমস্ত লোক। আদেশ হ'ল আইন অমান্য। মাথা নত হ'ল শাসকের। রাজপুরুষের অন্যায় আদেশকে কীটের মত অস্বীকার করা তাঁর ধর্মের শিক্ষা।

গার্হস্থ্যজীবন যাপন শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষায় অঙ্গীভূত। ভগবৎ-আরাধনায় সংসার ছেড়ে বনে যেতে হয় না। সংসার-মন্দিরে ভক্ত সঙ্গে বিরাজ করেন তিনি। বিশেষ প্রয়োজনে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ। জননী শচী দেবী ও পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বিলাপ তাঁর কোমল প্রাণে যথেষ্ট বেদনাপাত করেছিল। কিন্তু উপায় ছিল না তাঁর। অবিচার-অনাচার-জর্জরিত মানব-সমাজের 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' আর্তনাদে মানব-পিতা গৃহের তুচ্ছ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন কী করে! মানুষকে সংসারে আকৃষ্ট করার জন্যে গার্হস্থ্যধর্মে দীক্ষা নিতে আজীবন সন্ন্যাসী নিত্যানন্দের প্রতি তাঁর কঠোর আদেশ। শতশত নরনারীকে সংসারধর্ম পালন করতে উপদেশ দিয়েছেন তিনি।

'ত্যাগস্বীকার' শ্রীগৌরাঙ্গের এক শিক্ষা। ত্যাগে আসে শান্তি, ত্যাগে দূর হয় ঈর্ষা। ত্যাগেই অপরের প্রশংসা অর্জন নিজের হয় আনন্দের কারণ। ত্যাগে আসে প্রতিভাধরের প্রতি শ্রদ্ধা। ন্যায়গ্রন্থ রচনা করেছেন রঘুনাথ। তা ন্যায়শাস্ত্র-জগতকে উপহার দেবেন বলে তাঁর কত না আনন্দ! সে আনন্দে নিত্যানন্দের কারণ হবেন না সতীর্থ শ্রীগৌরাঙ্গ। সানন্দে তিনি তুলের মত

ছুঁড়ে ফেলে দিলেন স্বরচিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থরত্নখানি ভাগীরথীর জলে।

করুণাময় পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম মানবতায় পরিপূর্ণ; সহজ সরলতায় অদ্বিতীয়, ভজনের সাধনের শ্রেষ্ঠতম পথ, সংকীর্তন-মাধুর্যে মহীয়ান, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ধনী-নির্ধন বৈষম্যবিহীন, ভক্তিস্পর্শে ভাস্বর, মানবতার জয়গানে মুখরিত, ত্যাগাসনীলনে অতুলনীয়, অনাসক্ত গার্হস্থ্যজীবন-প্রশংসিত, বলিষ্ঠ ও অহিংসা-মহিমায় মহিমান্বিত।

ঈশ্বর নিরাকার কি সাকার ? ঈশ্বর নিরাকার কি সাকার এ সম্বন্ধে বহু লোকের বহু মতভেদে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহা দেখিয়া তিনি হয়ত ভান্ত করেন। তিনি সর্বশক্তিমান বলিয়া যদি সকলের বিশ্বাস থাকে তবে নিরাকার হইতে সাকার কেন হইতে পারেন না, একথা আমি বুঝি না। তিনি সাকার হউন আর নিরাকার হউন তাহার ইচ্ছা শক্তিতে সমস্ত পৃথিবীর কাজ চলিতেছে এ বিষয়ে সকলেই একমত। নাস্তিকেরাই শুধু বিশ্বাস করেন না। চর্মচক্ষুদ্বারা যা দেখা যায় না তাকে আমরা নিরাকার বলি। নিরাকার পদার্থের অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি। বাতাসের আকার না থাকিলেও ঝড় তুফানে যখন গাছপালা বাড়ীঘর পড়িয়া যায় তখন আমরা বাতাসের ক্ষমতা বুঝিতে পারি। গরমের সময় যখন শীতল বাতাস আমাদের দেহ ঠাণ্ডা করে তখন তাহার উপকারিতা অনুভব করি। আমাদের প্রাণ আছে বলিয়াই আমরা জীবিত আছি। দেহের ভিতর হইতে প্রাণ চলিয়া গেলে দেহের কোন ক্ষমতাই থাকে না। কিন্তু আমরা প্রাণের রূপ কখনই দেখি নাই। সুখ হইলে হাসি, গান করি, নাচি। দুঃখ হইলে বিষণ্ণ বদনে বসিয়া থাকি। কিন্তু মনের রূপ কখনই দেখি নাই। ভালমন্দ বুঝিবার জন্য আমাদের জ্ঞান বিবেক আছে, তাহাকেও কষ্ট দেওয়া উচিত নহে বিবেক আমাদের বুঝাইয়া দেয়। আমাকে কেহ কষ্ট দিলে আমার মনে যে অবস্থা হয় তাহার মনে সেই অবস্থা হয়। ইহা আমাদের বিবেকদ্বারা বুঝি। জ্ঞান বা বিবেক দেখিতে পাই না বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারি না। আমাদের মধ্যে শক্তি আছে বলিয়া দৌড়াইতে পারি, মারামারি করিতে পারি, অপরকে আঘাত করিতে পারি এবং আত্মরক্ষা করিতে পারি। চক্ষুদ্বারা শক্তিকে দেখিতে না পাইলেও কার্যদ্বারা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করি। আমরা কোন বস্তু যে চোখে দেখি তাহা মস্তিষ্কের ভিতর একটা ভাব মাত্র। সেই ভাবের যেমন আকৃতি নাই কেবল অনুভূতি, তেমন কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকদ্বারা যাহা অনুভব করি তাহারও কোন আকৃতি নাই। নিরাকার ভাবদ্বারা নিরাকার ঈশ্বরকে জানা যায়! কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে বড়ই কঠিন। সাধারণ লোকের প্রকৃতি এমন যে চোখে না দেখিতে পাইলে এবং হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে না পারিলে তৃপ্তি হয় না। আমরা চাই রূপটি। আমাদের কোন আত্মীয়ের বিষয় ভাবিতে হইলে তাহার রূপটি সর্বাগ্রে আগে মনে হয়। আমের মিষ্টত্ব ভাবিবার সময় আমের রূপটি মনের ভিতর দেখি। পৃথিবীতে যত কিছু আছে প্রথমতঃ রূপদ্বারাই আমরা তাহাদিগকে চিনি পরে জানিলে তাহাদের কার্য বুঝিতে পারি। নিরাকার ঈশ্বরকে যদি ভাবিতে না পারি এবং ভাবিতে চেষ্টা করিয়া যদি আনন্দ না পাই তবে উপায় কি? সাকার রূপে আমাদের চোখের সম্মুখে আসিবার ক্ষমতা তো আমাদের নাই। তিনি যদি আমাদের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য আমাদের দয়া করিয়া দেখা দেন তবেই আমরা তাঁহাকে দেখিতে পারি। গীতায় আছে যে তাঁহার সৃষ্টির মঙ্গলের জন্য, সাধুদের রক্ষার জন্য এবং দুষ্টদের দমনের জন্য মাঝে মাঝে তিনি রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া থাকেন। ইহা মিথ্যা নহে। ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যমান ইহা যদি আমরা বিশ্বাস করিতে পারি তবে তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণুর মধ্যে নাই, রাম বা কৃষ্ণের মধ্যে নাই, মহম্মদ বা যিশুর মধ্যে নাই ইহাই বা কেমন কথা। সর্বত্র বিদ্যমান হইলে তিনি প্রত্যেক জীবের মধ্যে, প্রত্যেক বৃক্ষলতায় ফুলে ফলে পর্বতে নদী সমুদ্রে, হিন্দুর মন্দিরে মুসলমানের মসজিদে খৃষ্টানদের গির্জায় বর্তমান আছেন স্বর্গ বলিয়া বিশেষ কোন স্থান থাকিলে তাহার তথা

থাকিবার কথা, নরক বলিয়া কোন স্থান থাকিলে তিনি তথায় বর্ত্তমান আছেন। প্রত্যেক মূর্ত্তির মধ্যে এবং মাটির ঢিলির মধ্যে বর্ত্তমান আছেন। ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যমান শুধু বলিলেই চলিবে না। ইহার জন্য প্রত্যক্ষ অনুভূতি চাই। এই অনুভূতির জন্য চাই সাধনা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন—"সাকার ও নিরাকার কিরূপ জান? যেমন জল আর বরফ। তিনি সাকারও বটে নিরাকারও বটে। সত্য সত্যই ঈশ্বরের দেখা পাওয়া যায়রে। এই যেমন তোতে আমাতে এখন বসে কথা কইছি। ভক্তের ভক্তির হিমে তাঁহার রূপ দর্শন হয়! জ্ঞান-সূর্য্য উদয় হলে সাকার রূপ বরফ জল হয়ে যায় ও সব নিরাকার হয়। আমি বোধ থাকিলে তুমি বোধ থাকিবে। যার পাপ জ্ঞান আছে তার পুণ্য জ্ঞান আছে"। পাগল হরনাথ বলিয়াছেন—(ইংরাজী হইতে বাংলা অনুবাদ) "যদি ঈশ্বর মানুষের ভাব বা চিন্তার বাহিরে হন, তবে তাঁহার সহিত আমাদের যোগ সাধন কি করিয়া হইতে পারে? মানুষের ভালবাসা পাইতে হইলে ঈশ্বরকে মানুষ হইতে হইবে, কারণ মানুষ কেবল মানুষকে ভালবাসিতে পারে। যাহাদের মধ্যে বিভিন্নতা আছে যাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য নাই যাহারা এক প্রকারের নহে তাহাদের একজন আর একজনকে ভালবাসিতে পারে না। সুতরাং মানুষের ভালবাসা পাইতে হইলে ঈশ্বরকে পৃথিবীতে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া আসিতে হইবে"।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে',
'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর'।
'অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর'॥

আমার মনে হয়—যেদিন পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুর ভিতরে কেহ ঈশ্বরকে অনুভব করিতে পারিবেন, সেদিন তাহার হৃদয়ে পার্থক্য ভাব দূর হইবে। যেদিন পরের সন্তানকে নিজের সন্তানের মত স্নেহ করিতে পারিবেন, যেদিন তাহার উপার্জিত ধন অনাথা ও দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না, যেদিন শোকার্ত্তের কান্না শুনিয়া তাহার হৃদয় গলিয়া যাইবে সেই দিনই তিনি ঈশ্বরের সর্বত্র বিদ্যমানতা অনুভব করিবেন। নিরাকার ঈশ্বরকে আমরা ধরিতে পারি না বলিয়াই ত প্রকৃতির মধ্যে তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াই। ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার এ বিষয়ে তর্ক করিয়া কোন ফল নাই। যিনি যে ভাবে পাবেন তাহার উপাসনা করিয়া হৃদয়ে শান্তি আনিতে চেষ্টা করুন। ভিন্ন ভিন্ন জাতির উপাসনাপ্রথা ভিন্ন ভিন্ন রকম হইলেও সকলের উদ্দেশ্য এক শান্তিলাভ করা। যদি কেহ প্রকৃতিতে সূর্য্যের ভিতর ঈশ্বর আছেন মনে করিয়া সূর্য্যকে প্রণাম করেন, গঙ্গার মধ্যে ঈশ্বর আছেন মনে করিয়া তাহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া পরে স্নান করেন, রাত খাইবার পূর্বে ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদন করেন, বটবৃক্ষের গোড়ায় জল দিয়া তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করেন, সন্ধ্যার সময় তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া তাহার উদ্দেশে প্রণাম করেন তবে কি কাহারও ক্ষতি হয়? অনেকে বলিবেন এই সমস্ত কাজের কোন সার্থকতা নাই। যিনি সার্থকতা খুঁজিয়া না পান তিনি তাহার নিজের মতে চলিবেন। যে ঈশ্বর আমাদের সুখ শান্তির জন্য এত করিতেছেন তাঁহাকে আমাদের প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিলে হয় ত ইহাতে আমরা কোন অন্যায় করি না। আর কিছু না হোক এই সমস্ত কার্য্য আমাদের নাস্তিকতা হইতে দূরে রাখে। ভক্তেরা এই ভাবে প্রতি কাজে ভগবানকে স্মরণ করিয়া হৃদয়ে যে আনন্দ আর মুক্তির আশা পান নিরাকারবাদীরা তাহা বোধহয় বুঝিতে পারে না।

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

CALCUTTA UNIVERSITY

উদ্বোধন

বৈশাখ, ১৮৮৭ শকাব্দ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ

১৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৪৫)

সকাল সন্ধ্যা সন্ধ্যা সকালে এক কথা মনে হয়—কেন আমায় ডেকেছিলে, রাধারাণী কেন এসেছিলে—সমাজকে শোষণমুক্ত করতে কিছুই তো করা গেল না···। দিনের প্রান্তিক সমাজকে দেখে প্রাণ কেঁদে ওঠে ·····বাংলার বুকের মধ্যে ডেকেছিলাম, কই তারা? কত এল, কত গেল—তোমার বেদান্ত নিয়ে আমি বিপন্ন। কে পড়বে? যারা তোমার নাম লয় তারাও তো পড়তে পারত? যাক্; সেই শরৎ ঘোষ তোমার পায়ের কাছে বসেছিল—সেইখানে নিয়ে চল·····তুমি বিপ্লবী—সেই বিপ্লবের এক স্ফুলিঙ্গ আমার সমাজকুলদীপ সব ছাড়িয়েছে··· যাদের সঙ্গে এতকাল মেলামেশা করলাম, তাদেরও ছাড়িয়ে দিয়েছ···। হইল তোমার বিশ্ব, আমার এইবার নাও···।

৮. ১০. ৪৬ ·····ভগবান গীতায় বলেছেন, 'মমৈবাংশঃ জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ'—আমার অংশই জীব হয়েছে এবং এই জীব সনাতন—নিত্যকালের। এই কথাটী অনুধ্যানের বিষয়—আমার অংশ; প্রত্যেক জীবের ভিতরে আমার সমগ্র জীবনের এক একটী দিক আছে। অর্থাৎ যেমন আমার হাত পা আমার অংশ কিন্তু তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আমার জীবন রয়েছে·····অংশেরা যদি কার অংশ না জানে তারা মিলতে পারে না। হাতের কাজ পায়ের নয়, পায়ের কাজ চক্ষুর নয়—এরা মিলতে পারে যদি এরা জানে আমরা সমগ্র জীবনের এক একটা দিককে ফুটিয়ে তুলে আমরা সমগ্র জীবনকে ফুটিয়ে তুলব। অংশের দুটো কাজ—এক, কার অংশ জেনা, দ্বিতীয়তঃ অংশীর অন্যান্য অংশের সঙ্গে মেলা····· জীবন তো শুধু পায়ে বা হাতে বা মনে নয়···। কার অংশ আমি তা আমাকে চিনতেই হবে···তিনি বললেন 'মমৈবাংশঃ'—তাঁর অংশ আমি···। আমি শুধু বাঙালী আটির অংশ নই, আমি বিশ্বেরও অংশ··। বাংলার আমি—বিহারের আমি—বোম্বের আমি···অর্থাৎ ভারতবাসী আমি। বাঙ্গালীকে ভারতবর্ষের মধ্যে বিলিয়ে দিতে না পারে, তবে বিহারীর সঙ্গে মিলবে কি করে? বিহারী যদি নিজেকে ভারতবর্ষের মধ্যে বিলিয়ে দিতে না পারে সে বাঙ্গালীর সঙ্গে মিলবে কি করে?··· বিহারীর যোগ্যতা বাঙ্গালীর নেই·····বাঙ্গালী ভারতবাসী হবে, বিহারী ভারতবাসী হবে, তবে না বিহারী বাঙ্গালীর মিল হতে পারে? উপরের স্তরে উঠতেই হবে· জীব হল সে যে নিজেকে শুধু বাঙালী বলে জানে, আর নিকৃষ্ট জীব সে যে নিজেকে শুধু বাগুইআটির বলে জানে·····একটা কথা তোমাদের বলব, যদি সত্যিই নিত্যগোপালের কাছে এসে থাক তোমাদের হাতে ধরে বলি, বুঝতে শেখ আমি বিশ্ব বাসী··। তিনি বার বার করে বললেন 'আমি বিশ্ব নাগরিক' ····তিনি নিজ মুখে বলছেন 'আমি জানি তোমরা আমারই বিকাশ'·····আমি যদি তাঁর বিকাশ, তবে আমি তাঁর কোন্ বিকাশ? কি কাজ করতে এসেছি আমি? হাত 'জীবনের জন্য' গ্রহণ করে, চোখ 'জীবনের জন্য' দেখে, কান 'জীবনের জন্য' শোনে। আমি এ বিশ্বে

এসেছি, আমি তাঁর সেবা করব না? আমি তাঁর এইটেই আমার পরিচয়···সেই আমি তাঁর সেবা করব না?···হাত দেহের বা জীবনের সেবা করুক, কান জীবনের সেবা করুক—এরই নাম শরণাগতি—মমৈবাংশঃ। নিত্যগোপাল, কবে চিনব আমি তোমারই অংশ? কবে চিনব আমি বিশ্বের অংশ?···সীমানা যদি বেঁধে দেওয়া যায়—তবে তা বড় অবজ্ঞা। আমাদের এই পুকুরটার কোন্ দিকে কি তার সীমানা স্থিরীকৃত হয়ে আছে—তাই সে বদ্ধ। মানুষের পক্ষেও তাই তোমার সীমানা নির্দিষ্ট করে ফেলে তুমি চলবে? তাহলে তো তুমি বদ্ধ। বিশ্বকে চৌহদ্দী কর···। কেবল ছেলে মেয়ে নিয়েই তোমার সীমানা?···নিত্য নূতন মুখ দেখে তোমার সীমানা বাড়াবে না?···ঘরিয়ার থেকে এগোতে এগোতে সাগরে যেতে পারলেই না গঙ্গা মুক্ত?···অপরাধ বিশ্বের জন্য···। ভুলে যাও নিজের ক্ষুদ্র সীমানা, ক্ষুদ্র চৌহদ্দী। তুমি অসীম, তোমা হতে না—তোমার বদ্ধ জলের গন্ধে লোক নাক সিঁটকে চলে যাবে—তুমি সাগর, সাগর হও,···। এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশতে মিশতে অপর সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেল···। বিশ্বের সকল সম্প্রদায় তোমার সম্প্রদায় বলে ভাবতে শেখ···। নিত্যগোপাল আমার, আমার সকল ছোট চৌহদ্দি ভেঙে যাও, ভেঙে যাও···। যার মুখ দেখলে ব্রহ্মসাধনা সম্ভব হয়, তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটাও।···

৯. ১০. ৫৬। ওঁ নমঃ তত্ত্বমূর্তয়ে। শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজা সমাগত। আজ বোধন, কাল অধিবাস, পরশু সপ্তমী পূজা···। বোধন অনেকে আগেও করেন···তোমাদের জানা ভাল এই শ্রীদুর্গাই আমার ইষ্টদেবী। আমার জীবনের যা কিছু তা এঁরই কৃপায়। নিত্যগোপাল এঁরই মন্ত্র আমাকে দিয়েছেন। এঁকে নানা ভাবে নানা ভাবে পূজা করেছেন। ব্রজগোপীরা এঁকে কাত্যায়নী রূপে পূজা করে শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিলেন। তিনি বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। অর্জুন যুদ্ধের পূর্বে এঁরই পূজা করেছেন।···কাত্যায়ন ঋষি এঁরই পূজা করেন।····· ঋষিবচন এঁকেই 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী' বলে বন্দনা করেছেন। বৈষ্ণবেরাও এঁকে পূজা করেন···। নিত্যগোপাল এঁর সম্বন্ধে বললেন, 'ভারতের মহাশক্তি তুমি আদ্যাশক্তি'···। এই দুর্গাময় দেওয়ার ফলে অধ্যাত্ম সাধনা আর দেশসাধনা এক হয়ে গেছে।···তিনি আত্মার মুক্তি দেন, তিনি জাতির মুক্তি দেন—তাই রাজনীতি করতে সক্ষম হয়েছি।···এই দেবীর পূজা হৈ হৈ নয়—নিজের প্রকৃতিকে বদল করে তাঁতে মজতে হয়, পেতে হয়।···বোধন অর্থ জাগরণ। মা ঘুমিয়ে আছেন—তাঁকে জাগাতে হবে। আসল কথা আমি ঘুমিয়ে আছি—তিনি যে জেগে আছেন, ঘুমিয়ে আছি বলে তা-ই আমি দেখতে পাই না। মা জেগে আছেন—তিনি চির জাগ্রত—বিশ্বের বিষয়ে তিনি জেগে আছেন। আমি অহঙ্কারে অজ্ঞানে ঘুমিয়ে আছি—তাই দেখছি মা ঘুমুচ্ছেন। বোধনের সাধনা হল আমার অহংকারকে ঘুম পাড়ান। যতদিন অহংকার থাকবে, দেখবে তোমার শুধু ঘুমিয়ে আছেন। তুমি যদি নিজের কল্যাণ অকল্যাণ বোঝ, করে দেব। ব্রহ্ম আজ বোধন করবেন—ব্রহ্মার বুদ্ধিকে লয় করতে হল—আমি লয় মানেই মায়ের জাগরণ। ···কি তুমি সৃষ্টি করবে? কি তুমি কর্ম করবে? এই বিরাট বিশ্বের তুমি কি জান? শরণাগত হও...। তুমি যতটুকু ঘুমিয়ে পড়ছ, অর্থাৎ তোমার অহংকার যতটুকু লোপ পাচ্ছে, মা ততটুকু জাগছেন। মা, আসি; আমার জীবনে অধিবাস কর—আমার সবটুকুতে অধিকার করিয়া বাস কর।···সেইদিন তুমি আত্মবান। তোমার আজকের আমি মাকে দিলে তিনি এসে বসবেন, তখন তাঁর কাজ আরম্ভ হল···। বেশ তো, তুমি যদি তোমার ঝঞ্ঝাট সামাল দিতে পার, বেশ তো কর—আমি নাই, কিছু নাই—তুমি করে দেখ। কিন্তু বাছা, পারবে না—জীবের আদির এতখানি ক্ষমতা নাই যে তুমি সব সামলাবে।...

নিত্যগোপাল জড় অজড় সমন্বয় বলেছেন। মানুষের ১/৬ ভাগ মানুষ জানে না, মাত্র ১/৬ ভাগ জানে।···এই পুঁজি নিয়ে সংসারে চলতে যাওয়া বাতুলতা। চিত্রগুপ্ত সব লিখেছে···। কি করে এই বিরাট বিশ্বে নূতন পথে চলবে? শরণাগত হলে অজ্ঞাতে সমন্বয় করা

চলে ···গুরু যখন ভার নেন, তখন তিনি সক্রিয় ক্রিয়মান-প্রারব্ধও নেন।...পাপ ফুটে বের হবেই হবে—যত শীঘ্র রোগ ফুটে বের হয়, ততই মঙ্গল।···মায়ের কাছে বল, মা, আমি শরণাগত। শরণাগত হলেই দেখবে রোগ সারবার পথ দেখা যায়।···ভক্তিতে মা জাগ্রত হন, বাধা হন। অহংকার বশতঃ তুমিই মাকে দূরে সরিয়ে রেখেছ। কত কথাই বলার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু কেউ তো নিল না—দিতে দিল না ···বড় দুঃখে আজ চলে যেতে ইচ্ছে করে।...তাঁরো আমার কাছে কিছু চাইতে হয় নি—মানুষ চাইবার আগে আমি তার প্রয়োজন অনুভব করে দিয়েছি ...আমি কি বুঝি না মা যেন ঘুমিয়ে আছেন? তুই যেদিন শরণাগত হবি, সেইদিন তোর কিছু করতে পারব।...অহংকারকে ক্ষয় করতে চেষ্টা কর—অনন্ত অতীতের দুষ্কর্ম সুকর্ম তোমার পিছনে—পারবে না সামলাতে একা নিজে।...শরণাগত হও; বল, মা দুর্গতিনাশিনী—দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। মাকে কর্তৃত্ব দেও—মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়—তবেই মা জাগবেন। নিজের ভাল বোঝাবুঝি নিজের হাতে রাখিস না...যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষ জানত নিজের বুদ্ধিতে চলা করলে কি গতি হয়...বাইরের বিষয় আমি চাই.... নরনারায়ণ আশ্রমে যারা এসেছ তারা হৈ হৈ করো না...। প্রার্থনা কর, মা আমি তোমার কোলে ঘুমাব ...। মানুষকে ভাল বাসতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কি যন্ত্রণা ভোগ করছি···। কেউ তো আমাকে দিতে দিল না।···অন্তরের পাত্রকে, অন্তরের দৃষ্টিভঙ্গিকে বলি দাও—রক্ত বলি দাও। রক্তের টানে মানুষ কত কুকর্ম করে—ধৃতরাষ্ট্র রক্তের টানে দুর্যোধনকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। রক্ত বলি চাই না—বাইরের পাঠা বলি না··· মা, সন্তানস্নেহে উন্মাদিনী, বিশ্বময়ী—কে তোমায় চায়? তবু তুমি আস—সন্তানের অপরাধ দেখ না।···নিজের ভার নিজে রাখলে চলবে···সেবা করে যাও—যাঁর সেবা করছ তাঁর চোখ আছে। চোখ উৎপাটন করে বলি দাও—অর্থাৎ নিজের দেখাকে, নিজের বুদ্ধিকে, নিজের যোগ্যতাকে বলি দাও। রামকৃষ্ণ চক্ষু বলি দিয়াছিলেন··· মা, আমি তোমার হব—আমার জীবন তোমায় দেব—দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, শ্রীদুর্গা—নিতাগোপাল-জননী দুর্গা, কৃষ্ণ-জননী দুর্গা, ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গা—আমার অহংকার আমার নিকটে ফেলে, আমার অহংকে ভেঙে দাও ····· ।

নবমীপূজা—১৩৬৩। (দুপুরে অঞ্জলির পূর্বে বলেন —শ্রীনিতাগোপাল পরম রূপবান।...শ্রীনিতাগোপাল জীবনে আমি মহাকালী মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতীর রূপ দেখেছি। মায়ের কোটরের থেকেই তাঁকে ভালবাসতাম কোনদিন আমি বিশ্রী ছিলাম না···। কালী যে সুন্দর—বিশ্রব বড় সুন্দর। সৌভাগ্য হয়েছিল যে বিশ্বরূপী রূপ আস্বাদন করবার। নিতাগোপালের সব দর্শনের মধ্যে এই বৈশ্বরূপিক রূপ আস্বাদন করেছি ... শ্রীনিতাগোপাল-লিখিত 'ভক্তিযোগ' সাধনার বিশ্ব 'সিদ্ধান্ত-দর্শন' দর্শনের বিশ্রব, 'জাতিদর্পণ' সমাজের কেন্দ্রে বিশ্রব শ্রীনিতাগোপাল না হলে মাকে আমি বুঝতাম না। সত্যি তিনি পরম রূপবান—অতুলনীয় বিশ্রূপ সে রূপ যে রূপে বিশ্রব নাই—সে রূপে সৌম্য কোথায়? তোমার সরস্বতী রূপে জ্ঞানের গাম্ভীর্য লক্ষ্মীতে ঐশ্বর্যের কলাপরূপ, কালীতে তোমার ভাঙ্গার রূপ। তোমার জীবনে আমি তিন রূপ আস্বাদন করেছি আজ মহা সরস্বতীপূজা···। সরস্বতী—সরস্+মতু অর্থাৎ রসবতী। বসন্তে রস আসে—তার আগে সরস্বতী পূজা। রসের উপাদনা পাছে কামে পরিণত হয় তা সরস্বতী পূজা। বিদ্যা আত্মনি বিদ্যাধাঃ। যে কামে ক্ষয় থাকে না, সে কামের বিনাশ করেছে।···অনন্ত হও—অনন্তভাই বিদ্যা। শুক্লর সঙ্গে, চৈত্রের সঙ্গে, বিশ্বের সঙ্গে অনন্ত হও।...শুম্ভনিশুম্ভের প্রতিনিধি বিশ্বের নিংড়ান রূপ ঐ নারীমূর্তিকে দেখেছিলেন···। নিতাগোপালের রূপ নারী-ভীতি গেছে। সরস্বতীমন্ত্রে কালীপ্রসন্ন ঘোষ লিখে ছিলেন নারী ব্রহ্ম, নারী নারায়ণী ···কী সুন্দর রূপ

ক্রমশ

ফরাসী সাহিত্যের ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

সূচনা থেকে মধ্যযুগ

॥ অধ্যাপিকা শ্রীমীরা রায় ॥

যুলিয়াস সিজার যখন গল (ফ্রান্সের প্রাচীন নাম) অধিকার করেন তখন সেখানে কেল্টজাতির লোকেরা বাস করত। তাঁর পিছনে পিছনে ফ্রান্সে এল ব্যবসায়ী ও উপনিবেশ স্থাপনকারীর দল, সৈন্য-সামন্তরা তো ছিলই। রোমান শাসন ফ্রান্সে সাড়ে চারশো বছর স্থায়ী হয়। গলরা রোমান সভ্যতার দ্বারা স্বভাবতই যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছিল। বিশেষ করে নিজেদের ভাষা তারা সম্পূর্ণ ত্যাগ করে ল্যাটিনকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করেছিল। অবশ্য এ ল্যাটিন বইয়ে ব্যবহৃত শুদ্ধ ল্যাটিন নয়। সাধারণ অশিক্ষিত রোমান সৈন্যরা বা ব্যবসায়ীরা যে ভাষায় কথা কইত, গলরা সেই ভাষাই শিখল। স্পেন পর্টুগাল প্রভৃতি রোম-অধিকৃত অন্যান্য দেশেও ঠিক এই রকম ব্যাপার ঘটল। জনসাধারণ পরভাষা নিল কিন্তু অবিকল রপ্ত করে নিতে পারল না। একে শুধুমাত্র কানে শুনে শেখা তার ওপর গলদের উচ্চারণভঙ্গী আলাদা;—তাই ধীরে ধীরে এই কথ্য ল্যাটিন বিকৃত হ'তে আরম্ভ হোল। এই বিকৃতি স্পেনে এল অন্যরূপে—পর্টুগালে আবার আর একরকম ভাবে। অর্থাৎ ফ্রান্সে যে-ল্যাটিন বলা হোত তার সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত ল্যাটিনের তফাৎ হইতে আরম্ভ হোল। ফ্রান্সে ব্যবহৃত কথ্য ল্যাটিন বা রোমান ভাষার নাম হোল গলো রোমান। তাই থেকেই ধীরে ধীরে ফরাসী ভাষার উদ্ভব। ফরাসী ভাষার সঙ্গে ইংরেজীর এইখানেই মৌলিক প্রভেদ। ফরাসী জাতি কেল্ট, ফ্রাঙ্ক নর্মান ইত্যাদি বিভিন্ন রক্তের সংমিশ্রণে বড় হলেও ফরাসী ভাষা কিন্তু নেওয়া নেবেছে ল্যাটিন থেকে, অন্য ভাষার প্রভাব তার ওপর যৎসামান্য। ইংরেজী ভাষার বৈচিত্র্য-সৃষ্টির ক্ষমতা বেশী—নানা স্থান থেকে সে শব্দ-সম্পদ আহরণ করেছে বলে। ফরাসী ভাষার রোমান্টিকতা সৃষ্টির শক্তি তত না থাকলেও তাকে ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্যের সুযোগ্য উত্তরসাধিকা বলা চলে। তার স্বচ্ছতা, সরলতা, সংযম ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে গ্রেকো রোমান সাহিত্যের ঐতিহ্য সে বয়ে নিয়ে চলেছে।

যেমন লণ্ডন ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার ভাষাই হ'য়ে দাঁড়ায় প্রামাণ্য ইংরাজী ভাষা, কলকাতা আর হুগলী জেলার কথা ভাষাই করে বাংলাভাষার প্রতিনিধিত্ব (যদিও আমাদের জেলায় জেলায় বাংলাভাষার রূপ এক এক রকম), তেমনি, রাজনৈতিক কারণে ইল্-ড-ফ্রান্সের আঞ্চলিক ভাষাই নানা ওঠা নামা ভাঙা গড়ার পরে ফরাসী ভাষারূপে বিশ্বের দরবারে আত্মপ্রকাশ করে।

ইল-ড-ফ্রান্সের ভাষার উত্থানের পূর্বে দক্ষিণ ফ্রান্সের একটি আঞ্চলিক ভাষা, প্রোভাঁসাল, খুব শক্তিশালী হ'য়ে উঠে। বিশেষত বারশ শতাব্দীতে ত্রুবাদুর কবিদের দৌলতে প্রোভাঁসালের নামডাক সে দেশের বাইরেও বহুদূর ছড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের এ সাহিত্যেরও বিনাশ ঘটে। বর্তমান যুগে আবার মিস্ত্রাল প্রমুখ কতিপয় লেখক চেষ্টা করছেন প্রোভাঁসালকে আবার লেখ্য ভাষার আসনে বসাবার। প্রোভাঁসাল সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের ময়মনসিংহ-গীতিকা গুলির তুলনা করা চলে। নিঃসন্দেহে মঙ্গলকাব্যগুলির মানবিক আবেদন বা শিল্পসুষমা উচ্চতর শ্রেণীর—তবু বাইরের নানা কারণে এ জিনিসের ক্রমাগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে গেছে।

ফরাসী সাহিত্যের ক্লাসিক পরিমিতিবোধ, সরলতা

ইত্যাদি তার একেবারে গোড়াকার রচনাগুলোতেই আত্মপ্রকাশ করেছে। ফরাসী সাহিত্যের সবচেয়ে পুরোনো নিদর্শন হিসাবে শাঁস ঙ জেস্ত্‌কে আমরা ধরতে পারি, এই কবিতাগুলো মহাকাব্যের ধাঁচে লেখা কয়েকটি পরস্পর সংযুক্ত কাহিনীমূলক কবিতা নিয়ে এক একটি cycle সৃষ্টি হয়েছে—এই রকম গোটাকতক cycle নিয়েই শাঁস ঙ জেস্ত্‌। সেকালে ভ্রাম্যমান চারণকবিরা এগুলি আবৃত্তি করে বা গেয়ে গেয়ে ফিরত, লেখার রেওয়াজ ছিল না। মেলায় বা তীর্থস্থানে শ্রোতারা হাঁ কোরে গিলত এদের লম্বা লম্বা রোমান্স ও ছুঁচোলো কীর্তিতে ভরা কাহিনী-কাব্য। চারণেরা আবার তাদের আখ্যায়িকার ঘটনাকাল জোগাড় করত মঠের যাজকগণ কর্তৃক সযত্ন-রক্ষিত প্রাচীন ল্যাটিন ক্রনিকল ইত্যাদি হ'তে। একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে শাঁসগুলোর জন্ম কিন্তু গোটা মধ্যযুগ জুড়েই এরা আধিপত্য করে গিয়েছে এদের ফিরে ফিরে নতুন কোরে সাজানো হয়েছে, পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে—সেরে এসেছে এদের অবনতির যুগ।

রোলাঁর শাঁস (গান) এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর আর পুরোনো। এই কাব্যটির মধ্যে ওজস্বিতা ও দার্ঢ্যের ভাব আছে; দেশপ্রেম তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শার্লমাইনের নাইটদের সঙ্গে সারাসেনদের স্পেনের প্রান্তে যুদ্ধের বিবরণ এতে বিবৃত হয়েছে। রাজবল রোলাঁ ছিলেন এই যুদ্ধের প্রধান নায়ক। কিছু কিছু অতিপ্রাকৃত কথাবার্তা এতে আছে ঠিকই কিন্তু তবু একাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স এই 'শাঁস'র চমৎকার ফুটে উঠেছে—তার সেই অভিজাততন্ত্র, সেই বর্বর শক্তিগৌরবে সেই সম্মান ও ধর্মের উচ্চ বোধ সব কিছু নিয়ে। কবিতাটির প্রধান গুণ তার সাদাসিধে ভাব, রচনা পদ্ধতি অতি সুপরিস্ফুট ও পরিষ্কার। "হোমারের বৈচিত্র্য ও সূক্ষ্মতা, ভার্জিল বা দান্তের শিল্পনৈপুণ্য এই শাঁসের নামহীন রচয়িতার ছিল না ঠিকই। মস্তবড় চিত্রপট নিয়ে দুর্জয় সাহসে তিনি কাজ করেছেন। অলঙ্কার-বাহুল্য নেই অথচ তাঁর বর্ণিত যুদ্ধ বা বীরগণার দৃশ্যগুলো যেন প্রত্যক্ষবৎ পাঠক দেখতে পায়। চরিত্রগুলো জীবন্ত—এমন কি মাঝে মাঝে জটিল বিচিত্র। রোলাঁ আর অলিভার যখন পরস্পরের কাছে বিদায় নিচ্ছেন বা রোলাঁর মৃত্যুদৃশ্য এসব জায়গায় তিনি এমন সংযতভাবে করুণ রস পরিবেশন করেছেন যে তা সত্যই মহিমাময় হয়ে উঠেছে। ফরাসী-সাহিত্যদিগন্তে শাঁস ঙ রোলাঁ প্রাচীন, মহিমাময়, বিরাট, নিরাভরণ, নিরাবরণ এক পর্বতের মত দাঁড়িয়ে আছে।"

শার্লমাইনের মৃত্যুর পর নবম শতাব্দীতে ঐক্য বা একটা সংহতির ভাব যা গড়ে উঠেছিল বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে একটা বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার অভাব অনুভূত হ'তে লাগল। ক্রমাগত বহিরাক্রমণ চলছিল: কখনো আরব কখনো নরমানরা হানা দিচ্ছিল। ফলে প্রতি অঞ্চলেই গ্রাম বা নগরবাসীরা বাধ্য হচ্ছিল সবচেয়ে শক্তিমান লোকটিকে তাদের প্রভু ও রক্ষক বলে গ্রহণ করতে। এই ভাবেই সামন্ততন্ত্র নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল। সামন্ততন্ত্রকে বলা চলে অসংখ্য স্থানীয় স্বরাষ্ট্রদের মধ্যে ক্ষমতা ও জমির বণ্টন।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ পাঁচ শতাব্দী (৯—১৫শ শতাব্দী) টিঁকেছিল। মূলতঃ দু'টি জিনিসের ওপর এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল: কর্তব্যপালনমূলক সম্মানবোধ ও বিশ্বাস (honour and faith)। এই সমাজের প্রধান সাহিত্য ছিল এইসব কীর্তিগাথা (শাঁস ঙ জেস্ত) যাদের সূত্রপাত হয় খৃষ্টীয় একাদশ শতকে প্রথমদিকের ক্রুসেডগুলির উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে (রাজবেতর যাজিয়াই মঠের ঐতিহ্য গুলোকে কাজে লাগিয়েছিল)।

কীর্তিগাথাগুলোর সাফল্যই হোল তাদের কাল জনগণের তৃপ্তিহীন কৌতূহলকে নিবৃত্ত করার জন্যে ক্রত্যাবৃত্তরা সুকৌশলে এগুলোকে কেনিয়ে বাড়াতে লাগল এবং এদেরকে কতকগুলো কাহিনীচক্রে ভাগ করে ফেললে। 'অনার' ও 'ফেথ' ছিল এ সাহিত্যের মূলে—এ সাহিত্যের এরা ছিল রক্ষাকবচ স্বরূপ। ক্রমে এ দুটি জিনিস সমাজে অবকল্পিত হ'য়ে আসল তত তা সাহিত্যও আতিশয্য বা ছাকামীর দিকে ঝুঁকে পড়ল।

এগুলোর রচনাগুলো যেন নৈর্ব্যক্তিক গোছের—প্রথমে

এ জিনিসটা চোখে পড়ে। শাঁস ও ছেড়ে এবং আর যা কিছু এ যুগে লেখা হয়েছে, সবই এমন এক ধাঁচের যে সবগুলোই মনে হয় বুঝি একই লেখকের সৃষ্টি। কার বিশেষ স্বাতন্ত্র্য নেই। জিদ এবং রমিন্-এর কথা অবশ্য আলাদা। এঁরা ঠিক মধ্যযুগের প্রতিনিধি নন, এঁদের মুখ নবযুগের দিকে ফেরানো। দ্বিতীয়ত কথা করবার, ক্রিস্চিয়ানিটির প্রভাববশতঃ স্বভাবতই, প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য ও অবিশ্বাস করার একটা ভাব। জাঁ ক্রিস্তোফ এবিষয়ে ব্যতিক্রম তৃতীয়ত দেখতে পাই শিল্পবোধ বা গঠন-সৌন্দর্য্যের দিকে লক্ষ্য কারু নেই। প্রকাশ-ভঙ্গী যেন ছকে ফেলা—মামুলী কতকগুলো কথা বারবার সবাই ব্যবহার করছে।

এগারশ থেকে পনরশ শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাসের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইখানে দিয়ে নেওয়া যাক একাদশ শতকে বেশ ভাল কাজ হয়েছে—রোলাঁর গান তো এই যুগেরই বস্তু। তবে বারশ শতাব্দীই হচ্ছে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের সবচেয়ে গৌরবময় কাল। শাঁস ও ছেড়ে হচ্ছে যেন জাতীয় মহাকাব্য; ব্রেতঁর কাব্যে দেখা দিল নূতন শিষ্টাচার, নূতন শিক্ষালয়ী, নারীর মূল্য। এই সময়ই চার্চের আওতা থেকে মুক্ত হ'য়ে স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করল নাটক। গদ্যও একটু একটু ক'রে গ'ড়ে উঠতে সুরু করল অনুবাদ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে। ত্রয়োদশ শতকে কতকগুলো নূতন প্রবণতা লক্ষণীয়। মহাকাব্যের কাল ফুরিয়েছে—শাঁস ও ছেড় বা এখন রচিত হোল তাদের প্রেরণা নিঃসেবিত। শিভালরী প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে—জনসাধারণ এগুলোকে অনেকটা ব্যঙ্গবিদ্রূপ করছে। অন্যতমকে একটা বাস্তবনিষ্ঠ, আদর্শবাদে অবিশ্বাসী ব্যঙ্গবিলাসী একটা সাহিত্যের ধারা জন্ম দিয়েছে। কাব্যগুলো, যেমন শেয়ালের রোমান্স ও গোলাপের রোমান্সের দ্বিতীয় অংশের নাম উদাহরণস্বরূপ করা যায়। রূপকের দিকে এইসময় খুব ঝোঁক এসেছিল। জিলহার্দুয়ঁ ও জোয়েঁভিল নামক দুজন ঐতিহাসিকের লেখায় গদ্যও অনেকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করে ত্রয়োদশ শতকে। চতুর্দশ শতাব্দী কিন্তু বন্ধ্যা। মধ্যযুগের সমাজ, তার আদর্শ সব ভেঙে ভেঙে পড়ছে। সাহিত্যিকরা পূর্ব্বসূরীদের রচনার পুনরাবৃত্তি, চর্বিতচর্বণ করে চলেছেন—কাব্যের প্রাণহীন প্রতিমাকে বাহ্যিক আড়ম্বরে সাজাচ্ছেন—যে জিনিসটি আমরা দেখতে পাই আমাদের রাজচন্দ্রের সময়ে। তবুও নয়, কলা-কৌশলই শুধু হয়েছে তাঁদের সম্বল গদ্যের ক্ষেত্রে এ যুগে নাম করা যায় ঐতিহাসিক ফ্রোয়াসারের। এর পরের শতকে কাব্যে এলেন জিন—গদ্যে কোমিন্। নাটাসাহিত্য নানা শাখায় নিজেকে বিস্তৃত করতে লাগল। মধ্যযুগের আদর্শের ভগ্ন কিন্তু নাভিশ্বাস উঠেছে, চতুর্দশ শতকেই যার দেখেছি আমরা সূচনা। মানুষের মন এই সময় রেনেসাঁসের নূতন প্রভাবকে গ্রহণ করবার সম্পূর্ণ উপযোগী হ'য়ে উঠছে।

শাঁস ও ছেড়ের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। এখন আমরা তাকাব রোমাঁ ব্রেতঁর দিকে। ব্রিতানী ছিল সাম্রাজ্য আক্রমণের সময় ব্রিটেন হ'তে পালিয়ে আসা কেল্টিকদের উপনিবেশ। ব্রিতানী ও ইংলণ্ডে প্রচলিত নানা কিংবদন্তীমূলক কাহিনী থেকেই জন্ম নেয় রোমাঁ ব্রেতঁ গুলো। শাঁস ও ছেড় গুলো যখন বিচিত্র কাহিনী-চক্রের সৃষ্টি করে চলেছিল সেই সময় এই রোমান্সগুলোর আবির্ভাব। এই কাব্য-কাহিনীগুলোর সঙ্গে শাঁস ও ছেডগুলোর প্রভেদ স্বভাবতই অতি সুস্পষ্ট। এই প্রভেদ বাস্তববাদী ফরাসী প্রকৃতির সঙ্গে স্বপ্নবিলাসী কেল্টিক জাতীয় চরিত্রের প্রভেদ। ফরাসী প্রতিভার বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করেছে সেই গোড়াকার দিন থেকেই—যখন ক্লোভিস্ ও তার বাদশ শতাব্দীর শেষে এই স্বপ্নময় কাব্যগুলোকে ঠেলে সাজালেন, নিজের ও ফরাসী চরিত্রের প্রবণতা অনুযায়ী এদের একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য, বাস্তবিক, মাত্রাজ্ঞান ও তথাকথিত সুলভ্য মূর্তি দিলেন। স্বপ্নলোক অদৃশ্য হোল—তার বদলে এল সাধারণ ভোজবাজীর গল্প, অনির্দিষ্ট সূক্ষ্ম আবেদনময়, সৌরভময়, দেহাতীত, চন্দ্রাহত প্রেমের বদলে তিনি আঁকলেন অনেকটা বাস্তব-অনুগ, সে যুগের রাজসভাদিতে প্রচলিত মামুলী ছকে-ফেলা বাঁধাধরা প্রণয়-কলার ছবি।

সকল মিষ্টিক রহস্যঘনতা, অস্পষ্টতা বা অতীন্দ্রিয়তার অন্তর্হিত হোল। যাই হোক্ ক্লেসিসিজ্‌ম্ গুলোর রূপান্তর সাধনের আগেও এরা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। আর্থার আর তাঁর নাইটদের আশ্চর্য কীর্তিকলাপ—বিশেষত যার লান্সলট ও যীশুর ব্যবহৃত পবিত্র পাত্রের অনুসন্ধানের কাহিনী ত্রিস্তাঁ ও ইজুল্তের দুঃখাবহ প্রেম এই সবই রোমাঁ ব্রেতঁর বিষয়বস্তু।

এই রোমাঁ ব্রেতঁ আর শাঁসঁ ত দেশে দুইই রাজরাজড়া বা বড় বড় অভিজাতদের নিয়ে লেখা—তাদের পৌর্যবীর্য, প্রণয়ের উচ্চ আদর্শ, উচ্চ সম্মানবোধ—মোট কথা তাদের জীবনাদর্শই এসব কাব্যের উপজীব্য। কিন্তু এইবার আর একরকমের সাহিত্য এল—ছোট ছোট কবিতায় মধ্যবিত্ত জীবনের ছোট ছোট সুখদুঃখের সাধারণ সব কাহিনী বিবৃত হ'তে লাগল। এদের নাম ফাব্‌লিও। বিশেষ সাহিত্যিক মূল্য এদের নেই। বরং রেনার শেয়ালের রোমাঁ সেদিক থেকে অনেক উন্নততর; সংসার-প্রীতি ও বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে এরা ফাব্‌লিওর সঙ্গে তুলনীয় কিন্তু এই রোমাঁগুলো বহু গুণে সুসংহত, পরিমার্জিততর; এদের রসবোধও অনেকাংশে বেশী। মানবতাবোধ, নাটকীয়তা, গল্প বলবার ক্ষমতা সব মিলে এ ছোটোখাটগুলোকে রসোত্তীর্ণ কোরে তুলেছে। মানুষের দুর্বলতা আর দুর্বৃত্ততাকে পশুজীবনের রূপকের পর্দায় ঢাকা হয়েছে—কিন্তু সে বেশ বড় স্বচ্ছ। পশুর ছদ্মবেশে মানুষ বড় প্রকটভাবেই উঁকি মারছে। চারপো বছর পরের লা ফন্তেনের ফেব্‌ল্ পড়ে যে আনন্দ পাই তার খানিকটা আভাস রয়েছে এখানে। ফাব্‌লিওগুলোর কিন্তু একটা গুণ ছিল; শিল্প বা সৌন্দর্যের দিক থেকে তারা হীন, তাদের বিষয়বস্তুও অতি স্থূল, কিন্তু শাঁসঁগুলোর মতই তারাও ফরাসী চরিত্রের একটা দিককে প্রকাশ করছে। বাস্তবপ্রীতি, ছোটোখাট ব্যাপার শক্তি, এগুলো ফরাসীদের চিরকালের। তাছাড়া কোন কোন ফাব্‌লোতে যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও মনস্তত্ত্ব-জ্ঞানেরও পরিচয় আছে।

শাঁসঁগুলির রুক্ষ পৌরুষ বা ফাব্‌লিওর কাঁচা বাস্তবধর্মিতা নেই 'রেনার' ও নিকোলেতের' গল্পগুলো মেখানো চন্দ্রকারো এ একটা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। এর গল্পাংশটুকু পশুভাগের ছেঁড়াও যেন বেশী কাব্যগুণোপেত; পশুটুকু ছাড়া, স্বচ্ছ; এর সৌন্দর্য যেন তরুণ, অপলক্ষা, আবার যেন চিরকালীন, মৃত্তিকাও বটে। সূক্ষ্ম অপরূপ রূপপ্রণয়ন এর শিল্পকর্ম। রোমান্সের একটি সুকুমার মনোহরণ পরিবেশ তৈরী করতে পেরেছেন অজ্ঞাতপরিচয় লেখক। নবোন্মেষিত নবীন প্রভাতের লেখক ছবি এঁকেছেন—দুটি তরুণ তরুণী শিশুর মত সরলসুন্দর, পরস্পরের প্রতি তাদের আকর্ষণও যেন ছেলে-মানুষীতে ভরা, মধুর, সুখদ, আপনমনে তারা তাদের নিজেদের গড়া এক আশ্চর্যজগতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তরুণ ওকাস্যাঁ ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধে যাচ্ছে—চোখে তার নিকোলেতের মূর্তি আঁকা আকাশে তারা জ্বলছে—নিকোলেতকে সে তাদের মাঝখানে দীপ্তি পেতে দেখছে। তার চোখে স্বর্গ মূল্যহীন—স্বর্গ যদি প্রেমের আনন্দ না দিতে পারে। "স্বর্গে গিয়ে কি হবে আমার? স্বর্গে আমি যেতে চাই না যদি নিকোলেৎ আমার সবচেয়ে মিষ্টি বন্ধু, নিকোলেৎ যাকে আমি এত ভালবাসি, তাকে পাই (তাকে পেলেই আমার হোল)...বরং নরকে আমি যেতে চাই।...কিন্তু নিকোলেৎ যেন আমার সঙ্গে থাকে"। "ওকাস্যাঁ সরল সাহসী, একই সঙ্গে ইন্দ্রিয় ও অতিন্দ্রিয়বাদী; মধ্যযুগীয় প্রেমিককুলের সে প্রতিনিধি স্বরূপ"। গগনচারী কল্পনার সঙ্গে বাস্তবকেও সুসমঞ্জসভাবে মেলানো হয়েছে এই ক্ষুদ্র কাব্যে; হাস্যরস, কৌতূহলোদ্দীপক সংলাপ কোন কিছুরই ত্রুটি নেই। কাব্যের সঙ্গে গদ্যের সঙ্গে বস্তু-জগতের খুঁটিনাটি মিশিয়ে ভিনসিটাকে বিশ্বাসযোগ্য কোরে তোলবার মত শিল্পবোধ ও পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা ছিল কবির।

ত্রয়োদশশতাব্দীর প্রথমদিকে ইতিকথাকার ভিল-হার্দুয়ঁ তাঁর 'কন্‌স্টান্টিনোপল্ জয়' গ্রন্থ লেখেন; এই সঙ্গে গদ্যের জয়যাত্রার সুরু হোল—যে গদ্য ফরাসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অবদান বলে পরে পরিগণিত হবে। ফরাসী ভাষায় ঐতিহাসিক memoir বহু আছে।

ভিলহার্ডুয়েঁ এই সব memoir লেখকদের সর্বাগ্রজ। তাঁর লেখায় কবিত্ব বা প্রসাদগুণের অভাব আছে, নেহাৎ সোজাসুজি সাদামাটা ভাবে তাঁর গন্তব্য বক্তব্য তিনি বলে গিয়েছেন। তবে সেকেলে লেখার যে একটা বিশেষ স্বাদ থাকে, একটা সহজ সৈনব সারল্য থাকে তা এতে আছে। মাঝে মাঝে বর্ণনার মধ্যে কিঞ্চিৎ হাস্য ও গতি তিনি লাগাতে পেরেছেন। বিস্মিত ক্রুসেডারদের চোখে প্রথম যখন কন্‌স্টান্টিনোপল্ ভেসে উঠ্‌ল, তার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা পড়ে এই আধুনিক যুগেও সেই প্রাচীন এড্‌ভেঞ্চারের রোমাঞ্চ আমরা যেন অনুভব করতে পারি। "তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না যে অমন সমৃদ্ধ নগর জগতে থাকতে পারে যখন দেখল উঁচু প্রাচীর ও মিনার (যা শহরটিকে চারদিকে ঘিরে রেখেছিল) প্রাসাদোপম অট্টালিকা আর উন্নতশীর্ষ গীর্জা তারা দেখতে পেল।...জেনে রেখো যে এমন দুঃসাহসী সেখানে কেউ ছিল না যার গা কাঁপে নি। আর এ হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়; যেন না সৃষ্টির আদি থেকে সুরু কোরে অমন বিরাট ব্যাপারে কোন মানুষ কখনো হাত দেয় নি"।

ভিলহার্ডুয়েঁতে আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের একান্ত অভাব। জোয়েঁভিলের 'সাঁ লুইয়ের জীবন' (এই শতকের শেষে লেখা) এর ব্যতিক্রম। এ বইয়ের মানবিক আবেদন যথেষ্ট। শুধু বিবরণী জোয়েঁভিল লেখেন নি। ধীরস্থির ভরতরে কথোপকথনের ভঙ্গিতে মহান রাজা লুইয়ের স্মৃতিকথা তিনি লিখে গেছেন—লুইয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের কথা; নিজের কথাও অবিশ্রাম বলেছেন তিনি। এ বই পড়ে লুইকে যেমন জানি, জোয়েঁভিলকেও তেমনি দেখতে পাই—ব্যবহারিক বুদ্ধিসম্পন্ন, প্রাণবন্ত, মানবতা-পূর্ণ এক অভিজাত কথা বলেছেন গম্ভীর, মহৎ ভাবনার ভাবুক, উন্নত হৃদয়, ভগবৎ চরণে সমর্পিত-চিত্ত রাজার সঙ্গে। দীর্ঘকাল জোয়েঁভিল রাজার সঙ্গে কাজ করেছিলেন ও অন্তরের সঙ্গে তাঁকে শ্রদ্ধা করতে পেরেছিলেন। মধুর সহানুভূতির সঙ্গে লুইয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাবনা কামনা, তাঁর কথা তাঁর কাজ চিত্রিত করেছেন জোয়েঁভিল অথচ নিজের স্বাধীন সত্তাকে কোথাও খর্ব করেন নি—সত্যের অপলাপ কোরে অতিরঞ্জন করেন নি। এ-বই জোয়েঁভিলের আত্মজীবনী। আপন ব্যক্তিত্বের ছাপ দিয়েছেন এ-বইয়ের সারা দেহে। দুই বন্ধুর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে তাঁদের চরিত্রের অমিল ফুটে উঠেছে চমৎকার ভাবে। রাজা যেন অধ্যাত্মবাদ, আত্মত্যাগ ও স্বপ্নপ্রবণতার প্রতীক—আর জোয়েঁভিলে ফুটেছে জাগতিকতা ইন্দ্রিয়বাদ; দুজনে মিলে মধ্যযুগের ভিতরকার বিচিত্র বৈষম্য ও বিরোধীভাবকে তুলে ধরেছেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাব্যসৃষ্টি গোলাপের রোমাঁ। গিইয়োম দ লরিস এটা লিখতে শুরু করেন কিন্তু ৪০০০ পংক্তির বেশী লিখে যেতে পারেন নি। বাকী ১৭,০০০ লাইন যোজনা করেন জাঁ দ মেয়াঁ গিইওমের মৃত্যুর ৪০ বছর পরে। দুজনের লেখা দুটো অংশের মধ্যে প্রভেদ আকাশ-পাতাল। গিইওমের রচনা আভিজাত্যিক; আর মেয়াঁ জনগণের দিক থেকে লিখেছেন, ফাবলিও বা রেনার শেয়ালের রোমাঁর ধরণে। গিইওমের ভঙ্গী বিদগ্ধ, পরিশীলিততরও বটে; ওভিদ ও ক্লেডিয়ান্ থ্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর কবিতায় এক বিচিত্র রূপকের তিনি অবতারণা করেছেন—তাতে সেকালের রাজসভাদিতে প্রচলিত গতানুগতিক প্রণয়রীতি বর্ণিত হয়েছে। গোলাপ হোল প্রণয়পাত্রীর প্রতীক। আনন্দকাননে এ গোলাপ ফুটে আছে কিন্তু তাকে তোলা (প্রণয়িনীকে লাভ করা) সহজ ব্যাপার নয়। মে মাসের এক প্রভাতে নদীতীরে বেড়াতে বেড়াতে স্বপ্নদ্রষ্টা (সব ঘটনাই যেন স্বপ্নে ঘটছে) প্রেমের দেবতার রাজ্যসীমায় এসে পড়েছেন—পাঁচিল দিয়ে সে রাজ্য ঘেরা। পাঁচিলের গায়ে নানা বিশ্রী কু-জিনিসের মূর্তি আঁকা রয়েছে—যেমন ঘৃণা, ঈর্ষা, দুঃখ, বার্ধক্য, দারিদ্র্য এই সব। কিউপিড্ কারুকার্য শেষে স্বপ্নদর্শকের ওপরে তাঁর তূণীরের সব তীর উজাড় কোরে দিলেন। তিনি তখন বন্দীরূপে আত্মসমর্পণ করলেন ও প্রেমের লাভক্ষতি ব্যাপারে কিউপিডের কি অনুজ্ঞা সে বিষয়ে জ্ঞান অর্জন হল তাঁর। অতঃপর

প্রেমিক গেলেন গোলাপ সন্নিধানে কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁকে পালাতে হোল গোলাপের অভিভাবকদের (লজ্জা, ভয়, প্রতিরোধ, নিন্দা, হিংসা) তাড়া খেয়ে। প্রেমিকের বিলাপেই গিইওমের এই কবিতা শেষ হয়েছে। জাঁ দ্য মোং অবশ্য আখ্যান ভাগটিকে একেবারে বর্জন করেন নি, এবং শেষ পর্যন্ত প্রেমিককে দিয়ে গোলাপফুল তুলিয়েওছেন—কিন্তু গল্পের বিষয়ই মূল্য থাকে নি তাঁর হাতে। তাঁর বিরাট পাণ্ডিত্য ও বাস্তবসচেতন রোমান্সের একটা পেরেকমাত্র হোয়ে দাঁড়ায় মূল কাহিনীটি অসংখ্যবিধ বিষয়ের ওপর তাঁর যত মতামত কবিতা বেচারীর দুর্বল কাঁধে তিনি চাপিয়েছেন—দারিদ্র্য, বিত্তশালিতা, শাসনপ্রণালী, ধর্ম, বিচার, সহজাত-প্রবৃত্তি, সমাজের উৎপত্তি, যাদুবিদ্যা, বিবাহ, নারী এমনি ঢালাও বিষয় নিয়ে তিনি কথা বলেছেন। তাঁর রচিত কবিতাংশটিকে মধ্যযুগের একটি বিশ্বকোষ বলেই চলে। জাঁ দ্য মোংই প্রথম বুদ্ধিবাদ এবং স্বভাবকে অনুসরণ করা, এই দুই জিনিসের প্রবর্তন করেন। রাবলে ও ষোলতেরের পূর্বসূরী বলতে পারি আমরা তাঁকে। মোং-এর শিল্পবোধ নেই, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষুদ্র পরিবেশে গিইওমের মার্জিত অভিজাত পরিবেশের বদলে তিনি অভিষিক্ত করেছেন তবু তাঁর চিন্তার অভিনবত্ব ও আধুনিকতার জন্য তিনি স্মরণীয়। রেনেসাঁসীয় মনো-বৃত্তির একজন অগ্রদূত তিনি। পরবর্তী যুগে সমালোচনা নিন্দা সবই হয়েছে বটে তবু ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্তই এই রোমাঁ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। আর এই রোমাঁর জন্যই রূপক সাহিত্য অত বিস্তৃতি লাভ করে, অত আদৃত হয়। ইংরাজী সাহিত্যের ওপরও এই রোমাঁ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

কিন্তু জাঁ দ্য মোংএর যে সময়ে জন্মানো উচিত ছিল তার অনেক আগেই ভুল করে তিনি জন্মে ফেলেছিলেন তাঁর রচনার যে ইঙ্গিত যে সম্ভাবনা ছিল তার কিছুই সার্থকতা লাভ করে নি, ফলপ্রসূ হয় নি। বুদ্ধির জগতে যে বিপ্লব আসার কথা ছিল তা এল না। শতবর্ষের যুদ্ধ ফ্রান্সকে সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য কোরে দিয়ে গেল; শিল্পের সাধনা করার সাধ বা সাধ্য তার আর অবশিষ্ট রইল না। তারপরে আবার এল রিভীষিকাময় গৃহবিগ্রহ; ফলে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর মত বড়ো নিখাদ কাল ফরাসী সাহিত্যে আর নেই। চতুর্দশ শতাব্দীর মানসিকতাকে কিছুটা রূপ দিয়েছেন ফ্রোয়াসার তাঁর ক্রনিকে। ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের ইতিহাস লিখবেন ব'লে উপাদান সংগ্রহের জন্য ফ্রোয়াসার বহু শ্রম ও অর্থব্যয় করেছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিকের অন্তর্দৃষ্টি, যুগের চরিত্র বা গতিবিধি বোঝবার শক্তি তাঁর ছিল না; ঐতিহাসিক হিসাবে নয়, অনুপম গদ্য লেখক হিসাবে ফ্রোয়াসার আজো বেঁচে আছেন। তখনকার দিনের যুদ্ধ বিগ্রহের সকল বর্ণাঢ্যতা, সকল উত্তেজনা তাঁর উজ্জ্বল দ্রুতধাবমান বাক্যগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ বর্ণনায় তাঁর জুড়ি নেই। চিত্রময় লেখা তাঁর পড়তে পড়তে মনে হয় লম্বা গুটোনো একটা চিত্রপট চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে—যুদ্ধের পর যুদ্ধ ভেসে আসছে—ঘোড়ার চর্ম বর্মাবৃত নাইটরা, সুন্দরী অভিজাতার মুখ, টুর্নামেন্ট কাউন্ট ব্যারনদের ভিড়ের মধ্যে পড়ে দিশেহারা হয়ে ঘুরে যেতে হয় এ সবের বর্ণচ্ছটাহীন, আড়ম্বরহীন নিতান্ত ম্লান উল্টোপিঠটা, যুদ্ধের অগৌরবের দিকটা যেখানে শস্যক্ষেত বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, গ্রামগুলো জ্বলছে, কৃষক সম্প্রদায়ের সর্বনাশ হয়েছে। শতবর্ষের যুদ্ধ দীর্ঘদিনের জন্যই ফ্রান্সকে রিক্ত, নিঃস্ব, দীন ক'রে রেখে দিয়ে গিয়েছিল। ১৩২৬ ১৩৯০-এর মধ্যবর্তী যুগ তাঁর ক্রনিকের উপজীব্য প্রধানত ফ্রান্স ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করা হলেও ইটালী স্পেন ইত্যাদি দেশ সম্বন্ধেও নানা তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। নানা দেশ ঘুরে ফ্রোয়াসার এই সব তথ্য আহরণ করেছিলেন—কিন্তু প্রায়শই ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ ও একদেশদর্শী।

ফিলিপ দ্য কমিন্ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মাঝখানে একটা সেতুর মত বিরাজ করছেন। ফ্রোয়াসার ও তাঁর পূর্ববর্তীগণ জনসাধারণকে নিয়ে মোটেই মাথা ঘামান নি। কিন্তু কমিন ও কবি ভিঁল আধুনিক যুগের অগ্রদূত কোমিনের ধর্মীয় গোঁড়ামী নেই, আছে জ্ঞানস্পৃহা।

অত্যাচারিত জীবনের প্রতি সমবেদনা। কোমিনের 'মেমোয়ার্স' (১৪৮৮-১৫২৭) ক্লাসিক্স্ নয়, ইতিহাসের লক্ষণ এতে বেশ বিদ্যমান। পঞ্চদশ শতাব্দীর সেই শেষভাগে নাইটদেরও লড়াইয়ের দিন ফুরিয়ে গেছে বর্ণনার ঘনঘটা, জাঁকজমক কিছুই কমিনে নেই, দ্বিতীয় রাজনীতিবিদ্ শান্ত অচঞ্চল ভঙ্গীতে ফ্রান্সের তথা ইওরোপের সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতিগুলির রূপান্তরটি ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজশক্তির প্রাধান্যে দেশে সংহতি ও শৃঙ্খলা এসেছে, পোপ ও রোমান ক্যাথলিক একাধিপত্য ঘুচে যাচ্ছে—স্বয়ংসম্পূর্ণ, জাতীয়তাবোধবিনিষ্ট এবং ধর্মের অধীনতাপাশ-মুক্ত স্বাধীন সব আধুনিক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হ'তে চলেছে, ইউরোপের এই নবযুগের আগমনকথা শুনিয়েছেন কোমিন। কোমিন নিজে ছিলেন একাধিপ লুইয়ের ডান হাত। নূতন কর্মপদ্ধতি গঠনে বুদ্ধিমান ক্ষুরধার লুইয়ের সঙ্গে তাঁর দানও কম ছিল না। সে-সব ইতিহাসই তাঁর বইয়ে লিপিবদ্ধ। সেকালের রাজনীতির ধূর্ত ছলাকলা—(যার পূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাই ম্যাকিয়াভেলীর প্রিন্স বইতে; ম্যাকিয়াভেলীর সঙ্গে কমিনের দেখাও হয়েছিল) ইত্যাদির সম্বন্ধেও ধারণা হয় তাঁর লেখা পড়ে। কমিন রাজতন্ত্রে ও অভিজাততন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতার নয়। তাঁর মতে সরকার হবে নিয়মতান্ত্রিক, রাজা অন্যের উপদেশে কান দেবেন এবং যুদ্ধ বা শান্তি সম্বন্ধে জনগণই চরম মতামত দেবে। তাঁর কৌতূহল ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ব্যক্তিগত মানুষে সীমাবদ্ধ নয়, বিভিন্ন জাতির সম্বন্ধেও তা বর্তমান। তাঁর মনস্তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণ ও কারণানুসন্ধানের রীতি হেরোডোটাসের কিছুই ছিল না (যদিও তাঁর চরিত্রগুলো যথেষ্টই প্রাণবন্তই ছিল)। কমিনের লেখার ধরণ সেকেলে —কিন্তু বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গী নিঃসন্দেহে একালের। ইংলণ্ড তাঁর বড় ভাল লেগেছিল, কারণ "পৃথিবীর যত রাজ্যের কথা আমি জানি তাদের মধ্যে ইংলণ্ডেই শুধু জনগণ অপেক্ষাকৃত সুব্যবহার পায়, কম অত্যাচারিত হয়"—যুদ্ধের নখদন্তও ইংলণ্ডকে বিক্ষত করে নি।

কোমিন ছিলেন ক্ষমতাবান ও বিত্তবান এক অভিজাত তনয়, আর সমাজের নীচুতলা থেকে আবির্ভাব হোল ভিলঁর (১৪৩১-?)। আশ্চর্য এই কবির জীবন—অন্যান্য ওয়াইল্ড বা কার্লেনের সঙ্গেও তুলনা চলে না। এঁরা অন্তত নরহন্তা ছিলেন না। আমাদের বাল্মীকি ডাকাত ছিলেন কিন্তু ডাকাত যতদিন ছিলেন কাব্যলক্ষ্মী তাঁর ওপর প্রসন্ন হন নি। ভিলঁর হাতে ছুরি আর কলম সমভাবেই খেলা করত। মার্লোর মত ভিলঁ এম, এ, পাস ছিলেন। (মার্লোরও জীবন যাপনের ছন্দ তেমন সুসংযত ছিলনা।) প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্রাঁসোয়া ভ মঁকবিয়েকে (ঠিক মঁকবিয়েই কিনা বলা দুষ্কর, ভিলঁর পিতৃ পরিচয় অজ্ঞাত; পাঠান তাঁর পালক পিতা, ভিলঁ নাম তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। ২৪ বছর বয়স পর্যন্ত সাধারণ নিরীহ ভদ্রসন্তান ছিলেন ভিলঁ। খুব শান্তিপ্রিয় অবশ্য বলা চলে না। বাজারে হুজ্জত মারামারিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হ'লেও হৈ-হল্লা তাঁর অরুচিকর ছিল না। এটা ওটা নিয়ে ব্যঙ্গকবিতা লিখতেন না শুধু, অন্যান্য কুস্থানেও যেতেন, কুসঙ্গীদের সঙ্গে মিশতেন। ১৪৫৫ সালে নারীঘটিত ব্যাপারে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এক পুরোহিতকে হত্যা কোরে রাজরোষভীত কবি প্যারিস ত্যাগ করেন (সেযুগে যাযকসম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট নৈতিক অবনতি এসে গেছে বিরেছিল যার প্রতিক্রিয়ারূপে পরে এল সংস্কার আন্দোলন)। সহায় সম্বলহীন আশ্রয়হীন অবস্থা তখন, হয়তো বা অনেকটা বাধ্য হ'য়ে তস্করের দলে তাঁকে যোগ দিতে হোল। যাই হোক্, পুনঃ প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিল সরকার তাঁকে। ভিলঁ প্যারিসে ফিরলেন। অনতিকালপরেই অবশ্য প্রাণভয়ে প্যারিস ছাড়তে হোল আবার—একজায়গায় লুটপাট করেছিলেন বন্ধুদের সঙ্গে মিলে। প্যারিসের হাওয়া তাঁর জন্যে রুদ্ধ হ'য়ে গেল। অতঃপর কিছুদিনের জন্য শার্ল দোর্লেয়াঁর কাছে তাঁকে দেখতে পাই—শার্লের অধীনে কর্ম এবং কাব্যচর্চা দুইই করতেন। (শার্ল দোর্লেয়াঁর কাব্যপ্রতিভা ছিল, ভিলঁর চেয়ে তা নিশ্চই ওপরের ধরণের। ইনি অভিজাত বংশীয় ছিলেন—সামন্ত সমাজের নিজস্বরী শিষ্টতা সুমার্জিত শালীনতা,

সৌন্দর্য্য—তাঁর মধ্যে দিয়ে সব যেন শেষবারের মত কথা ক'য়ে উঠেছিল। তাঁর রোমার প্রাসাদে তাঁকে ঘিরে একটি কবিসভা গড়ে উঠেছিল—কবিতা প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা হোত। শার্ল দোলেঅঁর কবিতা কোনদিন দিয়ে নূতনত্বের দাবী করতে পারে না। ব্যালাড রন্দেল শার্স ছাড়িয়ে নূতন কোন রীতির আবাহনায় তিনি প্রবর্ত্তন করেন নি। পূর্বগামীদের মতই তাঁর রূপসপ্রীতি। তবে তাঁর শিল্পবোধ ছিল যথেষ্ট। তাদের গভীরতা বা প্রসার নেই, কিন্তু তাঁর লঘুছন্দের এই কবিতাগুলি মধুর ও গীতিময়। তাদের প্রসাদগুণ ও স্বচ্ছতার জন্য এ যুগেও কবিতাগুলি সুখপাঠ্য।) তারপর আবার আমরা তাঁকে দেখি ১৪৬১তে—অলিয়েন্সের কারাগারে। এডোয়ার্ড যুদ্ধের সেই সময় রাজ্যাভিষেক হয়। এই উপলক্ষে অন্য আরও বন্দীদের সঙ্গে ভিলঁও মুক্তি লাভ করেন। পুনর্বার তিনি প্যারিসে ফিরলেন—পকেটে গ্রাণ্ড টেস্টামেন্ট। গুণ্ডামীর জন্য প্যারিস কর্তৃপক্ষ তাঁর এবার প্রাণদণ্ড বিধান করলেন—আবেদন নিবেদনের ফলে সে দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়ে পরিবর্ত্তে নির্বাসনের আদেশ হোল। এরপর থেকে কবির আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। খুব সম্ভবত অনতিকাল পরেই তিনি মারা গিয়েছিলেন।

এই ভিলঁ, শখের লক্ষীছাড়া বাউণ্ডুলে বোহেমিয়ান নয়—সত্যই অপরাধপ্রবণ। তবু ভিলঁকে জন্ম দিয়ে উষর চতুর্দশশতাব্দীর চেয়ে কিছুখানি শ্রেষ্ঠতার দাবী করতে পারে পঞ্চদশ শতাব্দী। (পঞ্চদশ শতাব্দীতে সাহিত্যিকের সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত বেশী—তাছাড়া মধ্যযুগীয় নাট্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অবদান বিখ্যাত শতদলী প্রহসন এ যুগেরই সৃষ্টি)। ভিলঁর কবিখ্যাতি প্রধানত তাঁর গ্রাণ্ড টেস্টামেন্টের (১৪৬১-) উপর নির্ভরশীল। কারাবাস কালে এটির রচনা সুরু হয়। লেভি টেস্টামেন্ট (গ্রাণ্ড-এরই যেন ক্ষুদ্র সংস্করণ) লিখেছেন প্রথমবার যখন প্যারিস ছেড়ে পালিয়েছিলেন সেই সময়। দুটো টেস্টামেন্টেই রহস্য কোরে ভিলঁ আপন মিত্র এবং শত্রুদেরও উদ্দেশ্যে নানা উপহার দিয়েছেন। ব্যঙ্গপ্রিয়তা 'এপ্রি গোলোয়া' (ফরাসী চরিত্রের সবকিছুকে হেসে উড়িয়ে দেবার, অমান্য করবার বেপরোয়া, বিদ্রোহী ভঙ্গী), ব্যক্তিগত নানা আশা-আকাঙ্ক্ষার উল্লেখ, রঙ্গরস এসবের সঙ্গে ভিলঁ মিশিয়ে দিয়েছেন প্রাণের গভীরতম সুর। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামী সখেদে অতীত জীবনের দিকে শেষবার নেত্রপাত করছে—অপরাধ স্বীকার কোরে উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের ভ্রমাত্মক আচরণের জন্যে দুঃখ অনুশোচনা করছে, ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছে। মধ্যযুগের সকরুণ অন্তিম বিলাপ ১৫০০ পংক্তির এই গ্রাণ্ড টেস্টামেন্টে যেন স্পন্দিত ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। ভিলঁতে মধ্যযুগীয় সাহিত্য তার শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হয়েছিল—ভিলঁতেই তার অবসান ঘটে। মধ্যযুগের শেষদিকটা কেমন শীতার্ত, নিরানন্দ। ভিলঁর কাব্যে যেন উত্তরবায়ুর মৃত্যুহিম স্পর্শ লেগেছে। যে কাল দ্রুত চলে যাচ্ছে তার নিষ্ফল কামনা অসহায় বেদনা ভিলঁর কণ্ঠে মর্মর কেঁদে উঠেছে—সেই তীব্র আর্ত্তস্বর যখন একসময় মিলিয়ে গেল, মধ্যযুগের দীর্ঘ বিষণ্ণ শীতরাত্রি ভোর হোয়ে আশ্বাসিত হোল রেনেসাঁসের আনন্দোজ্জ্বল স্বর্ণপ্রভাত।

গ্রাণ্ড টেস্টামেন্টে ব্যালাড রন্দো ও রন্দেলেরও অভাব নেই—রূপকের বেড়াজাল ছিঁড়ে বেরোলেও কবির রচনাশৈলী চিরাগত প্রথাকেই অনুসরণ করেছে। কিন্তু অসামান্য শিল্পানুভূতি ও ছন্দবোধ থাকায় কুশলী কারিগর ভিলঁ এইসব কাব্যরূপের আড়ষ্ট কৃত্রিম জটিল আকৃতিতেও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। বিশেষ কোরে ব্যালাড রচনায় ছন্দের এই যাদুকর অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শুধু সৌন্দর্য নয়, ছত্রে ছত্রে ফুটে বেরিয়েছে কবির ব্যক্তিত্বও, আপন স্বাতন্ত্র্যের ছাপ পরিয়ে দিয়েছেন কাব্যদেহের সর্বত্র। ভিলঁ ফ্রান্সের প্রথম আধুনিক কবি—এতকালের ঐতিহ্য রূপকসাহিত্যের, তাকে তিনি সাহসের সঙ্গে বর্জন করেছেন; কবিতায় নিজের ছায়া ফেলেছেন, তাঁর অনুভূতির জটিলতা বা বৈচিত্র্যও ইতিপূর্বে অপরিজ্ঞাত ছিল। জৈব উল্লাস যখন মিলিয়ে যাচ্ছে হতাশায়, রূপের পাশে ঠেলে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে বীভৎসতা।

একটি পত্র ঃ মহাত্মাজীকে লিখিত

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখিত

[১৩৩১ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ আজ হইতে ৪০ বৎসর আগে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহাত্মা গান্ধীজীকে একখানি খোলা চিঠি লিখিয়াছিলেন। মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার প্রাণ-দর্শনের বাস্তব দৃষ্টান্ত পাইয়াছিলেন। তাই তাঁহার সমস্ত শক্তি দিয়া উহাতে সংযোজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্র আদর্শের অনুযায়ী ছিল না। ইহাতে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ নিদারুণ দুঃখ বোধ করিতেছিলেন। সেইসময় লেখা এই চিঠিখানা শ্রীদুর্গামোহন সেন সম্পাদিত 'বরিশাল হিতৈষী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই বরিশাল হিতৈষী পত্রিকা হইতে লিথিয়া আনা জরাজীর্ণ কাগজখানি হইতে আমরা এই পত্রখানি ভবিষ্যতের বুকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া এইখানে প্রকাশ করিলাম। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দকে বুঝিতে ইহা সহায়ক হইবে। সব স্থানে হাতের লেখা বুঝিতে পারি নাই বলিয়া কোন কোন স্থানে অর্থবোধে অসুবিধা হয়। স—উজ্জলভারত]

৮ই আশ্বিন—১৩৩১

মহাত্মার নিকট খোলা চিঠি।

মহাত্মাজী, মহা যোগীন্, তোমার শ্রীচরণে অভিবাদন জানাচ্ছি। বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যা কিছু আমার মনে উদয় হচ্ছে তোমার কাছে প্রাণ খুলে নিবেদন করবো, ভরসা আছে কথাগুলি প্রাণের দিক দিয়ে যথাযথ ভাবে গৃহীত হবে। মদীয় আচার্য্যদেব বলতেন I am a cosmopolitan। তোমার ভিতর এই বিশ্ব নাগরিকত্বের মহান প্রকাশ দেখে তোমাকে ভালবাসতে প্রলুব্ধ হয়েছি। তাঁর মহাপ্রচার ছিল সার্বভৌম ও সনাতনের সমন্বয়। তোমার ভিতর দিয়ে তাঁর ধর্ম্ম ও রাজনীতি সমন্বয় মূর্ত্তিতে ফুটে উঠেছে। তোমাকে আপনার জন বলে বরণ করে নিতে তাই প্রাণের এত প্রয়াস। তোমাকে সাক্ষাৎ ভাবে দেখিনি, তুমি যখন বরিশালে এসেছিলে তখন আমি ব্রিটিশের অতিথি। তবু আজ মনে হয় তুমি আমার কত যুগ-যুগান্তের নিজ জন। তোমাকে সকল দেহ মন দিয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করছি, আশীর্ব্বাদ কর।

আমরা আহম্মদাবাদে তোমাকে কাঁদায়েছি, তোমার কোমল হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করেছি। যে বিষবৃক্ষ কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে তুমি নিজ হাতে রোপন করেছ, তারই পরিণাম বিষফল আহম্মদাবাদে তোমায় খেতে হয়েছিল, যার তীব্র জ্বালা সহ্য করতে না পেরে কংগ্রেস কমিটি হতে পালাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছ। তুমি অসময়ে কংগ্রেসের ভিতর দিয়ে আমাদিগকে দলবদ্ধভাবে দেশসেবা শিখাতে চেয়েছিলে, আমরা যে কতবড় ভণ্ড তা তোমার সহজ সরল উদার প্রাণ কল্পনাও করতে পারেনি। তুমি চেয়েছিলে short cut, অথচ এই short cut-এর সুযোগ নিয়েই আজ তোমায় আমরা পেয়ে বসেছি। আমরা ত চিরকালের আরামপ্রিয়, তাই কংগ্রেস কমিটীর বাহিরে সত্য দেশসেবার শুষ্ক অধিকার আমাদের ভাল লাগেনি, তোমার দেশসেবার গতি আমরা আদৌ বুঝতে পারিনি। সাক্ষাৎ দেশসেবার অধিকারী না করে কেন আমাদের কংগ্রেস কমিটির মধ্যে পরোক্ষভাবে দেশসেবার জন্য আহ্বান করেছিলে? তোমার কাছে কংগ্রেস ও ভারতবর্ষ এক—যেমন ভক্ত ও ভগবান অভিন্ন; কিন্তু দেশের সাক্ষাৎ সেবায় তো আমাদের চিত্ত মুগ্ধ হয়নি, কাজেই আমরা দেশসেবা ও কংগ্রেস-সেবাকে পৃথক করে বুঝেছি এবং দেশসেবার চেয়েও কংগ্রেস কমিটির সেবাকে বড় বলে স্থান দিয়েছি; তার ফল স্বরূপ আমরা দেশসেবার ছলে কংগ্রেসে নিজ ভোগ-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি। আমরা

কংগ্রেস কমিটি চিনি, দেশ আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত কবিরজী বলতেন—দুধ গলি গলি ফিরে সুরা বৈঠল বিকায়। যা কিছু সত্ত্বগুণ, তাই জন সাধারণের কাছে যে গলি গলি ফিরে বিকাতে হবে; যা কিছু রজঃ বা যা কিছু তমঃ তা বসে বসেই বিকাবে। সরকারের স্কুল কলেজ আইন আদালত সব বসে বসে বিকাচ্ছে বলেই না ওর সঙ্গে শক্তিপূর্ণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিত্য ফেরিওয়ালা ভগবানের অনুচররূপে ঐ ঐ বস্তুগুলিকে জন সাধারণের দ্বারে দ্বারে তুমি ফেরি করে বেড়িয়েছিলে? গলি গলি ফিরে সত্য ভারতবাসী হবার পূর্ব্বে আমাদের কংগ্রেস ক্ষেত্রে স্থান দিয়ে যা করেছ, তার যোগ্য ফল হাতে হাতেই পেয়েছ, তাই তুমি আজ পরাজিত। তোমার জেলে গমনের সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও কংগ্রেস ভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমরা না নড়ে চড়ে কেবল কাগজে কলমেই দেশসেবা করে যাচ্ছি। সত্যব্রত, সত্য প্রচারে তোমার কোন ভয় নাই, তুমি আজ সত্য সত্যই আমাদের কাছে হেরে গিয়েছ। তুমি আজ কংগ্রেসের বাইরে, যা কলিকাতা কংগ্রেসের পূর্ব্বে ছিলে। তুমি ত ছিলে আগে সত্যাগ্রহী, তৎপর কংগ্রেস সেবক। তুমি যদি কংগ্রেসকে নিজের হাতে নেবার পূর্ব্বে ভারতের আকাশ বাতাস অহিংস অসহযোগ মন্ত্রে ভরপুর করাতে, তবে এতদিনে কংগ্রেস তোমার হত, আমাদের হাতেও গঞ্জনা সহ্য করতে হত না, আমরাও বোধহয় মানুষ হতাম। তোমার short cut short হয় নাই, আবার তাই সেখান থেকে আরম্ভ করতে হবে। তোমার প্রতিনিধিবর্গ তবে কোথায় কোন্ পথে প্রতিনিধিত্ব লাভ করল? আজকাল প্রতিনিধি হয় ভোটের জোরে, দেশ-সেবার জোরে নয়। এই প্রতিনিধিত্বের দিয়েই তোমার ও তোমার প্রাণতুল্য আন্দোলনের এমন দুর্দশা, তোমার আন্দোলন কিন্তু নিজে স্বপ্রকাশ এবং স্বয়ম্পূর্ণ। তোমাকেই আজ কাঙ্গালের মত আবার গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে সত্য প্রতিনিধি হবার সাধনা শিখাতে হবে। তোমার জেল গমনের পর থেকে দেশবাসীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রায় উঠেই গেছে। তুমিই কংগ্রেস, কংগ্রেসই তুমি। কংগ্রেস একটা কল-কারখানা নয়, সে যে জীবন্ত বিগ্রহ। তোমাতেই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, অবশ্য তুমি একথা আমাদেরও উচ্চারণ করতে দিতে নারাজ। ওগো বত্রিশ কোটী ভারতবাসীর সত্য প্রতিনিধি মহাত্মাজী, আজ তুমিই কংগ্রেসের কেউ নও। তবুও যে তোমাকে চাই কেন জান? তোমার নামের আড়ালে আমাদের সর্ব্ব স্বার্থ সিদ্ধি হবে, ব্রহ্মচারীর বেশ না ধরলে রাবণ আমরা সীতা হরণের সুবিধা হবে কি করে? তুমি স্বরাজ সলিলে ডুবে মরেছ। তোমার কংগ্রেসে তোমাদের আদরের গণ-শক্তি আজ 'পারিয়া': যদি না তোমায় বের করে দিয়েই থাকেন, জন সাধারণকে নিয়েই থাক; তোমার 'For me I must sink or swim with meanest of my country men' এই বাণী অক্ষরে অক্ষরে তোমার জীবনে ফুটে উঠুক। জন সাধারণের তুমি ছাড়া কেউ নাই, তাদের ছেড়ে তোমার কাছে কোন্ কংগ্রেস বড়? তুমিই ত বলেছ The Congress Constitution has been broken down। বাস্তবিকই আমরা self elected-এর দল: যতখানি সাক্ষাৎ সেবা করে প্রতিনিধি হবার অধিকার জন্মে তা তো দূরের কথা, তার শতাংশও করিনি! ভারতে একমাত্র প্রতিনিধি তুমি; একাই অহিংস অসহযোগ সাধনায় দেশকে সচেতন করে তোল, তোমার কাছে প্রোচেঞ্জার নোচেঞ্জার সব সম্প্রদায় সমান থাকুক কোন দল করেই তোমার দরকার নাই, নো-চেঞ্জার নিয়ে দল করতে বলেছি—তোমার পক্ষে তাও সঙ্গত হবেনা দলবদ্ধ হওয়ার সাধনাই আমরা এতদিন করিনি আমাদের মিলাতে চাইলে বিরোধই শুধু বাড়বে। মিল চাইলে মিলন অমিলনের বাইরে যেখানে তোমা বিরোধের কথাও যায় নি, সেখানে গিয়ে শুধু দেশসেবা আমাদের সঞ্জীবিত কর। ওগো সচল ভারতবর্ষ, তুমি কোন্ মিলনের আশায় বসে আছ?

গতিহীন ভারতবর্ষকে গতি প্রদান কর, কংগ্রে আজ গতিহীন নিশ্চল, তোমায় পর্য্যন্ত গতিহীন করা ষোগাড় করেছে। যত দেরী হচ্ছে ততই আমাদে

নিষ্চেষ্টতা বাড়ছে, আমাদের সংকীর্ণ অহম্ উঁকি দিচ্ছে, তোমার ব্যক্তিত্ব আর মনুষ্যত্বের চাপে আমাদের যা কিছু ক্ষুদ্রত্ব চূর্ণ হয়ে যাক্। মিলনের সূত্র যে তোমার অন্তরে, অন্য কোন বাইরের সংশ্লেষে মিলন হবেনা, বরং বিরোধ আরও ঘন হবে Common প্রোগ্রাম বাইরে নেই, তাও যে তোমার আহিতে মুছে ফেলবার প্রয়াসে নিহিত তুমিই lowest common multiple, তুমিই মূর্ত্তিমান spinning resolution. ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রাণতত্ত্ব বাতীত কে অন্নব্রহ্মের হাত থেকে জগৎ মুক্ত হতে পেরেছে? প্রাণই সর্ব্বম্বরী—all nourishing: মন বাক্ কেউ নয়। তোমার প্রাণের স্পর্শে common প্রোগ্রাম ফুটে উঠবে। কর্ম্ম রয় থাকবেই, কেউ তাকে এড়ে পারেনি, প্রাণ তাদের L. C. M.

কংগ্রেস resolution-এর দুর্গতি কি এই কয় বৎসরেও পরিস্ফুট হয় নি? ভোটে পাশ করে কি ফল হবে আমি কেবেই উঠতে পারি না। Resolution এর দিন বয়ে গিয়েছে, এখন ভারতের অন্তরাত্মা চায় জীবন্ত resolution। আমরা নাস্তিক, কিছু মানিনা, কিছু মানবও না। আমাদের জোর করে মানাতে হবে। তুমি একার মত চলে যাও, তোমার পিছনে সত্য দল আপনা আপনি গড়ে উঠবে। মিলন করা যায় না, ওটা হবার জিনিস। মিলনটা যদি করার জিনিস হয় তবে contract এর প্রয়োজনীয়তাও আছে। দল দল নিয়ে আলোচনা সভা চলে, কিন্তু কর্ম্মী সভা হয় না, কংগ্রেস যে তোমার হাতে কর্ম্মী সভা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি থাকতে মিলনের ভাবনা কি? তুমি যে ভারতের ছিন্নপ্রাণ জোড়া লাগাবার cement। তোমার কংগ্রেস সভাপতি হয়েও দরকার নেই, তুমি ওর বাইরেই থাক। জগতে একও সত্য বহুও সত্য; মিলনও সত্য বিরোধও সত্য। ভগবানও এক ও বহুর, মিলন ও বিরোধের অতীত বলেই তিনি খেলাতে জানেন। কেবল এক করতে চাইলে বিরোধ বেড়েই যাবে, বিরোধ যে মিলনের অপর অর্দ্ধ। প্রাণের মাঝে unity ও diversity মিলে মিশে এক হয়ে থাকতে পারে। শত চেষ্টাতেও বেলগাঁওয়ে দল দল এক হবেনা; বাইরের জগতে এমন কোন কর্ম্ম পন্থা নাই বা কেউ দিতেও পারে না যা অবিসম্বাদিত ভাবে সকলে মিলে নিতে পারে। যারা এতদিন পরে spinning মেনে নিতে চান তারা শুধু তোমাকে পাবার জন্যই চান, spinning-এর জন্য নয়। এ ভাবে কি বস্তুর প্রতিষ্ঠা হয়? তোমার আহম্মদাবাদের spinning resolution প্রতিনিধিদের সংখ্যা হিসাবে কয়জন নিয়েছে? যে মিলনের কথা শুনতে পাচ্ছি তাতে কোনও দল তৃপ্ত হবে না। মিলন হতে গেলে সকলের মিলনই যে তোমার কাম্য তা বুঝি, কেননা তোমার দ্বেষও নেই, প্রিয়ও নেই। কিন্তু এই mechanical মিলন যা from within নয়, তা কি টিকবে? মহাত্মাজী, বড় ভয় হচ্ছে মিলনের নামে ভীষণ বিরোধের সূত্রপাত হবে। এ মিলনে তোমার নো চেঞ্জার দল তুষ্ট হবে না, অসহযোগ যে তাদের সাধনা, ও যে suspend করা যায় না। আমি ত আমার প্রাণের কথা বলছি, অহিংস অসহযোগ আমার ভাগবত। কংগ্রেস যদি অসহযোগ বর্জ্জনও করে, যতদিন সাধনা বলে বুঝব ততদিন একে কেমন করে ছেড়ে দেব? বুঝতে পারছি এই অহিংস অসহযোগনীতির উপরেই ভগবান বিশ্বসৃষ্টি করেছেন, তারই পরে তোমার এই আন্দোলন বাঁধা। যে স্কুল কলেজ, আইন আদালতকে অসত্যের ধারক ও পোষক বলে বুঝেছি তাকে কেমন করে আবার জড়িয়ে ধরব? জীবন নিয়ে এমন খেলা কি খেলতে পারব? একজনকেও যদি এ অসহযোগ সাধনায় বিমুখ করে থাকি শুধু তার জন্যই কি ঐ আন্দোলনকে বুকে রাখার পক্ষে যথেষ্ট নৈতিক যুক্তি নেই? আজ শ্রেষ্ঠতার ফলে কি জাতি হিসাবে defence দেব? না-দেওয়াই সঙ্গত? বয়কট বলতে ঘরে ফিরে আসা ছাড়া ত আর কিছু বুঝিনি। Boycott suspend করলে ত construction দাঁড়াবেনা। জন সাধারণের সঙ্গে সহযের স্কুল কলেজ, আইন আদালতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকলেও তারা সবই সমর-

মুখো। এই সহযোগিনী শক্তি বোধ করে অন্তর্ঘাতিনী করাই না পক্ষ বর্জনের মুখ্য উদ্দেশ্য? পক্ষ বর্জন স্থগিত রাখলে ত জাতীয় বিদ্যালয়, আদালত বোর্ড সব শুকিয়ে যাবে। একা কখন দাঁড়াতে পারবেনা। ঐ গুলির পতনের সঙ্গে পক্ষটিও তলিয়ে যাবে। তোমার প্রোচেঞ্জার দলই কি এতে তৃপ্ত হতে পারবে? যদি নন-কোঅপারেশন কার্য্যতঃ স্থগিত থাকে তবে কি মডারেটদের সঙ্গে শক্তি সামর্থ্যে তাঁরা সমকক্ষ থাকবেন? অসহযোগের শক্তিতেই না তাঁদের শক্তি। অসহযোগ অভাবে তারা ভারতের কেউ নয়। আবার নরম-পন্থীদের কি এই মিলনে আনন্দের কোন হেতু থাকবে? তাঁরা জনসাধারণের সাক্ষাৎ সেবা অপেক্ষা নিয়মানুগ ভাবে সরকারের সহিত বোঝাপড়াই অধিক পক্ষপাতী, কর্ম্মী হিসাবে তাদের মূল্যই বা কতটা হবে?

Constitutional আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া রক্তাক্ত বিদ্রোহ, তুমি এই দুইটি সর্ব্বনেশে বিকৃত আন্দোলনকে অহিংস অসহযোগের ভিতর এক করে জগৎ উদ্ধার করতে চেয়েছিলে। সব দল অতৃপ্ত হলে তার ফাঁক দিয়ে বেড়িয়ে পরবে নিশ্চয় হিংসে আন্দোলন।

সকলকে মিলাতে গিয়ে তুমি কংগ্রেস সভ্যদের জন্য বাধ্যতামূলক সুতাকাটা প্রবর্ত্তন করতে চেয়েছ, কিন্তু তুমি ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা-কার্য্যও পছন্দ কর না, ওখানেও যে জুলুমের সংস্রব আছে কোরান ত বলেছেন—ধর্ম্মে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। চারটি বর্জ্জন তুলে দেওয়াও যা, আমাদের সৃষ্টিকে শাসন দণ্ড হতে তুলে নিয়ে ব্রিটিশের উপর স্থাপন করাও তা। যদি বর্ত্তমান সংগ্রাম ব্রিটিশের সঙ্গে ঘোষিত হয়ে থাকে তবে অবৃটিশদের মিলন বুঝি; কিন্তু আমি যতদূর বর্ত্তমান আন্দোলন বুঝতে সক্ষম হয়েছি বর্ত্তমান যুদ্ধ ভারতীয়দের সঙ্গে অভারতীয়দের। আমিরা অবৃটিশ হলেই যে ভারতীয় হব এমন কিছু বোঝা যায় না। যদি আমরা সকলে ভারতীয়ই হতাম তবে স্বরাজ আন্দোলনের দরকারই হত না। যারা ভারতবর্ষীয় বলে পরিচিত হচ্ছে সবাই কি তারা ভারতবাসী? ভারতবাসীদের খুঁজে বের করাই এই অসহযোগের তাৎপর্য্য। ভারতের যদি আত্মস্থ হতে হয় তবে ভারতীয়দের সহিত অভারতীয়দের বিরোধ অনিবার্য্য। বর্ত্তমান সংগ্রাম চলছে ভারতীয় সভ্যতা ও বিদেশী সভ্যতার ভিতরে। বরঞ্চ স্থগিত রেখে স্বরাজ্য নীতির কাছে আত্ম সমর্পণ করার ফলে আমাদের যে আক্রমণ এতদিন শাসন-যন্ত্রের উপর ছিল, তা বিরুদ্ধ হয়ে শাসকদের উপর স্থাপিত হবার অধিকতর সুযোগ জুটবে। এইভাবে আমরা ধীরে ধীরে হিংস্র বিদ্রোহের ভিতর ঝাঁপ দিতে অগ্রসর হব।

এই আশঙ্কায়, দেব, পায়ে ধরে বলছি, আর একবার ভেবে দেখ। কংগ্রেসকে কংগ্রেস হয়েই থাকতে দাও তোমার মতে তুমি নিরন্ন নিরক্ষর জনসাধারণ নিয়ে জীবন কাটিয়ে দাও। তোমার নোচেঞ্জার প্রোচেঞ্জার মজারেট কিন্তু তাদের দরকার নেই। তুমি গীতার সুরে সুর মিলিয়ে বল

সমোঽহম্ সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাম্ ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

তুমি ত নিজেই বলেছ I have no other follower than myself। যদি কেউ তোমার জীবন ব্রত গ্রহণ করে নেয় তুমি তাকে কোলে নিও। তোমার পিছন ফিরে দরকার নাই, এগিয়ে যাও—আমাদের সব দলাদলি থেমে যাবে। তুমি কারুরই একচেটে সম্পত্তি হয়ো না, নিজে নীতি অণুমাত্রও সঙ্কুচিত করোনা, সব ঠিক হবে অসহযোগ নিজ হাতে স্থগিত করো না, দেশের অন্তরাত্ম এই প্রেরণা চায়, এ যে তাদের মন্ত্র। দেশকে যখে শুনান হয়নি, তুমি ঋষি-কণ্ঠে আর একবার শোনাও কংগ্রেস অচিরাৎ তোমার অনুকরণ করবে, হারান ধ কিছু সব ফিরে পাবে। তুমি অসহযোগ বর্ত্তিকা নিয়ে একা আগে চল, আমরা বিভিন্ন পন্থী তোমার আলোকে স্ব স্ব ক্ষেত্র চিনে নিয়ে যে যার স্থানে দাঁড়াব। তখন হবে organic unity। সব সম্প্রদায় fore front এ দাঁড়িয়ে এক হবে না, যে যার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সরল ভাবে স্বধর্ম রক্ষা করলেই মিলন হবে বাস্তব। তুমি সব পন্থা মিলিত হবার একমাত্র উপায় প্রাণের প্রচার কর। ১৯২

মনের চেয়েও অহিংস অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষিত বহু সংখ্যক নরনারী তুমি পেয়েছ, তারা কিছুকে ভয় করে না। আবার বলি, মিলন বাইরের কোন কর্মপন্থার নেই, মিলনের ক্ষেত্র দেশ, তুমি ও আত্মবিলোপকারী মহা সাধনা। তোমার উদার সত্য মিলন হবে, বেলগাঁওয়ে নয়। তুমিই ভারতের 'within'। তোমার উপর থেকে মিলন গড়ে উঠবে, কোন বেলগাঁওয়ের সাধ্য নাই এই যোগসূত্র ছিন্ন করবে। আমার প্রণেতরা প্রণাম গ্রহণ কর। আজ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীশরৎ কুমার ঘোষ

পৃথিবী ও মানুষ

॥ শ্রীভারতী ॥

এ পৃথিবী ধন্য ;
কারণ ঈশ্বরের দানে সে সমৃদ্ধ।
অপরিমেয় উপকরণের ভারে সে আনত
রূপ স্বীকারে সে অকৃত্রিম।
তাই করজোড়ে আমরাও কৃতজ্ঞতা জানাই সেই অদৃশ্য
শক্তিকে
বলি, আমরাও হলেম ধন্য।
কিন্তু দ্বন্দ্ব ও তর্কের অসীম সমুদ্রে যার স্থিতি
সেই শ্রমহীন, চিন্তাহীন ব্যথাহীন ঈশ্বর যদি
নিতি অনায়াসে করেই থাকেন এই সমুদ্র-মেখলা
আদিগন্ত প্রসারিতা ভূমিমাতাকে সৃষ্টি,
তবে সেই অদৃশ্য শক্তির পায়ে প্রণাম রেখেও আমরা বলি,
আজ আমাদের চেতনাবিদ্ধ জন্য এই ভূলোকেরই আকাশে
নিয়ত দৃশ্যমান। কারণ আমরা জেনেছি
মানুষের শ্রমে ঘামে, ব্যথায় যন্ত্রনায়
তৈরী হয়েছে এই পৃথিবী ; জেনেছি
মানুষের ক্লান্তিহীন সানন্দ অধ্যবসায়ে
মস্তিষ্কের কোষে কোষে সঞ্চিত চিন্তার অমৃত করাঘাতেই
এই বসুধার মৃত্তিকাও হয়েছে উন্মোচিত ;
তার দীর্ঘায়ত শ্যামাঞ্চল হয়েছে অন্ন-পরিপূর্ণা।
এই মানুষকে অঙ্কে ধারণ করেই ধরণী হয়েছেন রত্নগর্ভা
মৃত্তিকা হয়েছেন ঐশ্বর্যশালিনী মাতা।
পুত্রগর্বে মহতী প্রাণাবে মাতৃভূমি স্বর্গাদপী গরিয়সী।
ধন্য এই মানুষের পৃথিবী
ধন্য পৃথিবীর মানুষ।

মুণ্ডকোপনিষৎ

অবধূত ভাষ্য সমেত

তৃতীয় মুণ্ডক, প্রথম খণ্ড

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং
সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥৭

'সত্যান্ত পরম্ নিধানম্'-এর স্বরূপ আলোচনা করিতেছেন—বৃহৎ চ [সমস্ত ব্যাপিয়া মহান্] তৎ [তিনি] দিব্যম্ [স্বয়ংপ্রকাশ] অচিন্ত্যরূপং [চিন্তার ভিতর যাহা সমগ্ররূপে নিশ্চিন্তরূপে নিশ্চিন্তরূপে ধরা পড়িল না] সূক্ষ্মাৎ চ [এবং সূক্ষ্ম হইতেও] তৎ [তিনি] সূক্ষ্মতরং [অতিশয় সূক্ষ্ম ; স্থূল সূক্ষ্ম দুই-ই তো একস্তরে ; পুরুষোত্তমস্তর যখন দুইয়েরই 'পর' তখন মনস্তরের সূক্ষ্ম হইতেও তাহা কত সূক্ষ্ম ! স্তর বদলানোই এখানের সূক্ষ্মতা, স্তর না বদলাইয়া কাটিয়া কাটিয়া সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম করিলেও তাহা কিছুতেই পরস্তরে পৌঁছাইবে না ; জাগ্রৎকে জ্ঞান-আনন্দের স্তরের মধ্য দিয়া ছাড়া স্বপ্ন বা সুষুপ্তির স্তরে নিবার সম্ভাবনা নাই] দূরাৎ [দূর হইতে] সুদূরে [অতিদূরে ; জ্ঞানীর কাছেও তিনি দূরে, অতি দূরে, তাই তিনি অন্তরাত্মা ; নিকট সর্বদা নিকটে থাকিলেও তাহা দূরেরই হয় ; নিকট যখন দূর, দূর যখন নিকট তখনই তাহা সত্য নিকট] (তাই তো) তৎ [তিনি] ইহ [এই দুনিয়াতে] অন্তিকে চ [নিকটে ; বিশ্বরূপকে মাঝখানে রাখিয়া যাহার সঙ্গে সব চেয়ে দূরতম ব্যবধান (maximum distance) তিনিই বর্তমান বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সব চেয়ে নিকট ; যতই জীব জটিলতা ছাটিয়া পথের ব্যবধান ঘুচাইয়া প্রেমাস্পদকে নিকটে পাইতে চায়, ততই সেই জটিলতা আরও জমাট বাঁধিয়া ব্যবধান বাড়াইয়া দে দৃষ্টান্ত ইহার ঘরে-বাইরে, সংসারে-সন্ন্যাসে। জটিলত যখন পথের রস, অনন্ত ব্যবধানযুক্ত প্রেমাস্পদই তখ রসের ভিতর সব চেয়ে নিকট। শ্রীকৃষ্ণ তাই 'বক্র' (বাঁকা) পশ্যৎসু [দর্শনকারী চেতনাযুক্ত জীবের মধ্যে] ইহ এ [এই জগতের মধ্যে] নিহিতং [নিশ্চয়রূপে স্থিত ; ধৈর্য ব্যাকুলতা ও বিশ্ববাসী সকলের মর্যাদা দিয়া খুঁজিলে দেখিবে তিনি নিধিরূপে এইখানেই নিহিত, নিগূঢ় গুহায়াম্ [খুব সঙ্গোপন স্থানে, অথচ কত সহজ সরল স্বপ্রকাশিত]।

বৃহৎ এবং দিব্য, অচিন্ত্যরূপ এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মত বস্তুরূপে প্রকাশমান। তিনি দূর হইতেও অতিদূরে অথ এই দেহেই অতি নিকটে—এই জগতে চেতন জীবগণে হৃদয় গুহাতেই তিনি নিগূঢ় ভাবে অবস্থিত। ৩ঃ ৭

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥ ৮

তিনি অসাধারণ ও সর্বসাধারণ, তাঁহার সাধন তত্ত্বও—তাই বলিতেছেন (যে হেতু) ন চক্ষুষা [ঘত এ চোখো চক্ষু দ্বারা] ন গৃহ্যতে [গৃহীত হন্ না ; দর্শ লইয়া যে চক্ষুতে চক্ষুতে অনন্ত বিরোধ, সে চক্ষু তাঁহাকে দেখিবার যোগ্য নয় ; সর্ব দর্শনকে নিজ দর্শন বলিয়া আস্বাদন করিবার যে যোগ্যতা, তাহাই পরে উচ্চার

'জ্ঞানপ্রসাদ', ইহার দ্বারাই দৃষ্ট হন্] ন অপি বাচা [বাক্য দ্বারাও নয়; বাক্যে বাক্যে যখন আরম্ভ হয় মনোবিকার, বুদ্ধিবিকার, শাস্ত্রবিকার, সেই বিকৃত বাক্যের অগোচর তিনি] ন অন্যৈঃ দেবৈঃ [অন্য সব ইন্দ্রিয়দ্বারাও নয়; ইন্দ্রিয়সমূহ সমগ্র মুক্তির অধিকারী না হইলে সেই পুরুষের তত্ত্ব ধারণে অযোগ্য] ন তপসা [তপস্যাদ্বারা নয়, কর্মতন্ত্র সাধনার অনন্তকাল শরীর-মন তপস্যায় শুকাইয়া ফেলিলেও, কাম ত্যাগ করিলেও তাহাকে মিলিবে না] কর্মণা বা [কিম্বা কর্মদ্বারাও নয়; যে কর্মের আরম্ভ জীব হইতে, সে কর্ম-সাধনা পুরুষার্থ সাধনার অযোগ্য] জ্ঞানপ্রসাদেন [জ্ঞানরূপ প্রসাদদ্বারা; 'বস্তু-তন্ত্র তদ্বৎ জ্ঞানম্'—পুরুষোত্তম-বস্তুতন্ত্রতাই জ্ঞান। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, তপস্যা ও কর্ম যদি বস্তুতন্ত্র না হয়, তখন ইন্দ্রিয়-জ্ঞানও অজ্ঞান। পুরুষোত্তম-তত্ত্ব হইলেই সকল ইন্দ্রিয়ের কর্ম, তপস্যা 'জ্ঞানে' পরিণত হয়, সেই জ্ঞানই পুরুষোত্তম-প্রসাদ, পুরুষোত্তম-কর্মও প্রসাদ, তপস্যাও প্রসাদ। 'যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্—পুরুষোত্তমার্পিত তপস্যা প্রসাদ। "ন নাম্ সাধয়তি যোগঃ ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপো ত্যাগঃ যথা ভক্তির্মমোর্জিতা।"—ভাগবত। ইন্দ্রিয়াদি যখন রাগদ্বেষযুক্ত, তখন দুনিয়ার সব কিছু জঞ্জালরূপে সেই সব ইন্দ্রিয়ে জমিয়া যায়, ইন্দ্রিয়-জ্ঞান হয় জঞ্জালপূর্ণ; ইন্দ্রিয়সমূহ রাগদ্বেষবিমুক্ত, আত্মবশ, স্বাধীন, তখন বিষয়সমূহ পরিণত হয় প্রসাদে, বিবেক-প্রসাদ-ক্ষেত্র বিচরণ করিয়া ইন্দ্রিয়সমূহ হয় স্বচ্ছ, প্রসন্ন; তখনই 'প্রসাদে সর্বদুঃখানাম্ হানিরস্যোপজায়তে। প্রসন্ন চেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে'] বিশুদ্ধসত্ত্ব [প্রসন্ন চিত্তজাত নির্মলা বুদ্ধি] ততঃ তু [সেই জন্যই] তং [সেই] পশ্যতে [সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা দেখেন, শোনেন, উপলব্ধি করেন, ভোগ করেন] নিষ্কলং [সর্বকলাসমন্বিত সর্বকলাবর্জিত] ধ্যায়মানঃ [নিরন্তর ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তি, সব ইন্দ্রিয় যখন নির্মলা ব্যবসায়াত্মিকা স্থিতধীদ্বারা 'একতান' হয়, তখনই ধ্যান জমে]

ইহা চক্ষুদ্বারা গৃহীত হন না, বাক্যদ্বারাও হন না, অপর ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা, তপস্যাদ্বারা কর্মদ্বারাও নন। জ্ঞানের প্রসন্নতায় শুভবুদ্ধি লাভ হয়, তখন নিরন্তর ধ্যানকারী সেই নিষ্কল ব্রহ্মকে দর্শন করেন। ৩১৮

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তঃ সর্বমোতং প্রজানাং
যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ৯

এষঃ [ইনি] অণুঃ [সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতি ছোট, যিনি সকল বিরাটে নিরাপদে অতি সংগোপনে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন] আত্মা [আত্মা] চেতসা [কেবল প্রসন্ন চিত্তদ্বারা, বিশুদ্ধজ্ঞানপ্রসাদ দ্বারা] বেদিতব্যঃ [জ্ঞেয়] (কোথায় ইনি ?) যস্মিন্ [যাহাতে] প্রাণঃ [প্রাণবায়ু] পঞ্চধা [পঞ্চরূপে, প্রাণাপানরূপে, প্রাণময় কোশ পুরুষোত্তমে অর্পিত হইলেই উহার অন্তর্নিহিত আত্মস্বরূপী-সর্বান্তরীরূপ সমগ্র রূপ ফুটিয়া উঠে; এই প্রাণেরই বন্ধন ইনি] সংবিবেশ [প্রবেশ করিয়াছে]। (যে আত্ম-দ্বারা) প্রাণৈঃ [সহেন্দ্রিয় প্রাণসমূহ] চিত্তম্ [সূক্ষ্ম-সূত্রোপরক্ত সর্বার্থ চিত্ত; চিত্তে সূক্ষ্ম শক্তি ও সূত্রদ্বারা উপবাহিত হয়, চিত্ত সর্ব প্রয়োজনের আধার; চিত্তের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বাসুদেব—'বাসুদেবঃ সর্বম্', সর্বার্থ সিদ্ধির ক্ষেত্র চিত্ত] সর্বম্ [সর্বার্থ] প্রজানাম্ [জীবসমূহের] ওতম্ [ব্যাপ্ত; তুলে যেমন মাখন ব্যাপ্ত থাকে, চিত্তের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রহিয়াছে প্রাণ মাখানো, রস মাখানো; দুনিয়ার যত রঙ, সব প্রাণেরই দান; প্রাণ-সাধনায় "শুষ্কতরু মুঞ্জরে যথা প্রমর গুঞ্জরে"—যদপোনক্ষুদ্রায় স্থাণবে ব্রহ্মবর্চোঽন্নাদ্যেতদ্রে-বাস্মিন্ শাখাঃ প্রশাখাঃ পলাশানীতি—ছান্দোগ্য ৫।২।৩। যদি এই প্রাণের তত্ত্ব শুষ্ক স্থাণুর কাছেও বল, সেখানে শাখা ও পলাশ গজাইবে। যস্মিন্ শুদ্ধে [যে চিত্ত শুদ্ধ হইলে] বিভবতি [বিশ্বের সব বিশেষকে রঙীন করিয়া তাহাদের ভাবরূপে বিভাত হন] এষঃ [এই] আত্মা।

আত্মাদ্বারা জীবসমূহের ইন্দ্রিয়সহ সমস্ত চিত্ত ওতপ্রোত রহিয়াছে। চিত্ত প্রসন্ন হইলেই এই আত্মা

বিশেষরূপে প্রকটিত হন। সুতরাং এই যে দেহে প্রাণ সক্ষ প্রকারে সংবিষ্ট হইয়া আছে, সেই দেহ মধ্যেই বিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা এই সূক্ষ্ম আত্মাকে জানিতে হইবে ৩১৯

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামা-
ত্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েদ্ ভূতিকামঃ ॥ ১০

'বাসুদেবঃ সর্ব্বম্'-কে যিনি অনন্যভাবে সেবা করিলেন, তাঁহার যে সর্ব্বলোক প্রাপ্তির সুযোগ সহজভাবেই সিদ্ধ হয়, উপনিষৎ তাহাই বলিতেছেন—যং যং লোকং [যে যে লোক, পিত্র্যাদি লোক,] মনসা [মনদ্বারা] সংবিভাতি [সঙ্কল্প করেন] বিশুদ্ধসত্ত্বঃ [নির্ম্মলান্তঃকরণ পুরুষ] কাময়তে [কামনা করেন নিজের জন্য,-সমাজের জন্য, দুনিয়ার জন্য] যাংশ্চ কামান্ [এবং যে সকল কাম ভোগ ; নির্ম্মলচিত্ত পুরুষের তাহা হইলে কামনা করিবার মত মন রহিয়াছে, যাহার দ্বারা সে কামভোগ কামনা করিতেছে। যতই নির্ব্বিকল্প হও না কেন, মন তোমার থাকিবেই লুকাইয়া। পুরুষোত্তমের প্রাণস্পর্শ পাইলে মন পুরুষোত্তম-মন হইয়াই সব কিছু কামনাও করে, অথচ তাহা পুরুষোত্তম-ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়, তখনই মন সার্থক] তং তং লোকম্ [সেই সেই লোক] জয়তে [জয় করেন] তাংশ্চ কামান্ [এবং সেই সকল কামও ; কাম এই অবস্থায় সর্ব্বকাম, পুরুষোত্তমকামে পরিণত হয়] তস্মাৎ [সেই হেতু] আত্মজ্ঞং হি (যোগেশ্বর-জ্ঞানিজিষ্ণু ধনুর্দ্ধর আত্মজ্ঞানী পুরুষকেই] অর্চ্চয়েৎ [অর্চ্চনা করিবে] ভূতি কামঃ [ভূতিতে কাম যাহার ; সকল ঐশ্বর্য্যের ভিতর দিয়া দুনিয়ার সব বিভূতির আস্বাদনকামী লোকই ভূতি-কাম, এবং ভূতি লাভ করিতে হইলে চাই যোগেশ্বর ধনুর্দ্ধরের, একই কর্ম্মক্ষেত্রে পরস্পরাশ্লিষ্ট দুই সখার শ্রীচরণতলে অর্চ্চনার ডালি দেওয়া। পুরুষোত্তম হওয়ার মাঝেই সকলের সব-কিছু হওয়ার আস্বাদন পরিপূর্ণ

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র পার্থঃ ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতি ধ্রুবানীতির্মতির্ম্মম ॥]

নির্ম্মলান্তঃকরণ পুরুষ যে যে লোক এবং যে যে কাম মন-দ্বারা সঙ্কল্প করেন, সেই সকল লোক ও ভোগই তিনি প্রাপ্ত হন, সুতরাং যিনি ভূতি কামনা করেন তিনি আত্ম-জ্ঞানীর অর্চ্চনা করিবেন। ৩১১০

তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড।

তৃতীয় মুণ্ডক
দ্বিতীয় খণ্ড

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্মধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা
স্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ। ১

(পূর্ব্বমন্ত্রোক্ত সেই আত্মজ্ঞ পুরুষই) (যেহেতু) স [তিনি] বেদ [জানেন] এতৎ [এই] পরমম্ [প্রকৃষ্ট] ব্রহ্মধাম [সর্ব্ব কামনার আশ্রয়, সম্পদ] যত্র [যেখানে] বিশ্বং [সর্ব্ব জগৎ] নিহিতম্ [অর্পিত] (এবং যিনি নিজের জ্যোতি দ্বারা) ভাতি শুভ্রং [বিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত হন] (কিম্বা বিশ্ব পুরুষোত্তমে অর্পিত হইয়া শুভ্ররূপে প্রকাশিত হয়) (সেই জন্য) পুরুষং [এই আত্মজ্ঞ পুরুষকে যে হি অকামাঃ [যে সব সর্ব্ব-কাম, অকাম পুরুষগণ উপাসতে [পরমের জ্ঞানে উপাসনা করেন] তে [তাহারা] শুক্রম্ এতৎ [জন্মকারণ এই যে নূবীজ] অতি বর্ত্তন্তি [এই নূবীজকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ অবা পুরুষোত্তমবীজরূপে পরিণত করিয়া বর্ত্তমান থাকেন এই দেহ ভজন করিয়া পুরুষোত্তমকল্পতা প্রাপ্ত হন] ধীর [ধীরে ধীরে জীবনের সকল স্তরকে নিপুণ কুশলতা সহিত পুরুষোত্তম-জীবনের আস্বাদনরূপে গড়িয়া তুলিয়া

যে ব্রহ্মে বিশ্ব নিহিত, যিনি নির্মল জ্যোতিতে প্রকাশিত, পূর্বোক্ত মন্ত্রের সেই আপ্তকাম পুরুষ পরম ধাম ব্রহ্মকে জানেন। যে সব অকাম ধীরগণ আপ্তকাম পুরুষের সেবা করেন তাঁহারা এই নূতন দেহ গ্রহণ করিয়া পুরুষোত্তম-দেহ প্রাপ্ত হন। ৩।২।১

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্ত
ইহৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥৪

কামান্ [ধর্মকাম, অর্থকাম, মোক্ষকাম] যঃ [যিনি] কাময়তে [কামনা করে] মন্যমানঃ [অভিসন্ধি পূর্বক কর্তৃত্বতার ভিতর দিয়া মনের বিষয় রূপে চিন্তামান; 'মোক্ষো নেহস্ত ইতি চিন্তা হেতু অন্তর্ভূতা উত্থিতং মনঃ। মননোত্থে মনস্তেয়ং দৃঢ়ঃ সাংসারিকঃ বন্ধঃ—শ্রুতি] সঃ [সেই কামী পুরুষ] কামভিঃ [কামৈঃ; ধর্মাধর্ম প্রবৃত্তির হেতু বিষয় বাসনা সহ] জায়তে [জন্ম-গ্রহণ করে] যত্র তত্র [কার বাসনা ভোগের উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহে, যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ] পর্যাপ্ত-কামস্য [পবিত্র, সর্বতোভাবে আপ্ত হইয়াছে কাম যাহা দ্বারা তিনিই পর্যাপ্তকাম; সকল অকাম-সর্বকাম-মোক্ষ-কামার্পণকারী মদন-মোহন শ্রীচরণ-সেবী পর্যাপ্তকাম পুরুষগণ] কৃতাত্মনঃ তু [কৃত হইয়াছে আত্মা যাহাদের; 'স্বয়ম্ আত্মানং অকুরুত'—মন্ত্রার্থের সম্যক্ অর্থ অবগত হইয়া যিনি আত্মাকে সারা বিশ্বের মননঘনরূপে, সর্বভূতাত্ম-ভূতাত্মারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারাই কৃতাত্মা, তাঁহাদের কিন্তু] ইহ এব [এই দেহেই, এই দেহে জীবিত থাকিতেই] সর্বে কামাঃ [সকল কাম] প্রবিলীয়ন্তে [কামের উপর, কাম্য বস্তুর উপর, রাগ-দ্বেষ না রাখিয়া সাক্ষাৎ বস্তুর মস্তক পুরুষোত্তমের চরণে পড়িয়া গেলেই তবে প্রকৃতরূপে কাম-বিলয় হয়; পুরুষোত্তমে প্রবিলয় এবং পুনরুজ্জীবন দুই সমকালে সমভাবে লভ্য]।

কামসমূহকে কামা মনে করিয়া যে কামনা করে, সে কামনারূপ সেই সেই লোকে বাসনাসহ জন্মগ্রহণ করে। আর যাঁহারা পর্যাপ্তকাম, কৃতাত্মা তাঁহাদের কাম জীবিত থাকা অবস্থায় এই দেহেই প্রবিলীন হয় ৩।২।৪

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥ ৩

'যন্নান্যৎ ন পরো লাভঃ"—'যাহার লাভ হইতে পর লাভ আর নাই, তাহাই প্রচুর ভাবে বলিতেছেন—অয়ম্ আত্মা [যে আত্মার বিষয় ব্যাখ্যাত হইতেছে তাহা] প্রবচনেন [কর্তৃত্বমূল বেদাধ্যয়নদ্বারা] ন লভ্যঃ [প্রাপ্তব্য নহেন] মেধয়া [গ্রন্থাবধারণ শক্তিদ্বারাও নহে] ন বহুনা শ্রুতেন [বহু শ্রবণের দ্বারাও নহে] যম্ এব [যাহাকেই; কাহাকে কেহ জানেনা, 'পাত্রাপাত্র বিচারণাং ন কুরুতে'—কে পাত্র কে অপাত্র তাহার বিচার পুরুষোত্তম করেন না] এষঃ [এই পুরুষোত্তম] বৃণুতে [বরণ করেন। কর্তৃত্বতন্ত্রতা দূর হইতেই পারে না, যতই ইহাকে মুছিয়া ফেলিয়া বস্তুতন্ত্র হইবার প্রয়াস করনা কেন, সে প্রয়াসও তো কর্তৃতন্ত্রই রহিয়া গেল; সাধনার প্রথম দীক্ষা (Initiative) যদি পুরুষোত্তমের কাছ হইতে না আসে, পুরুষোত্তম যদি বরণ না করেন, মনের সাধ্য কি 'সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া' অজানা পথে—কর্মে না জ্ঞানে না যোগে না শাস্ত্র পাঠে তাঁহার দেশে উপস্থিত হইবে? তিনি যদি বর সাজিয়া মনোমোহন বেশে আমাকে হাত ধরিয়া নিজের পদাঙ্ক অনুসরণ করাইয়া তাঁহার পথে চালাইয়া না লন, আমার যাওয়া হইবে না, আমি শুধু শত সহস্র প্রবচনের মাঝে, মেধার দাম্ভিকতার গর্বের মাঝে, কত কিছু শোনার মাঝে হাবুডুবি খাইয়া ক্ষতবিক্ষতই হইব, তাই করুণার ঠাকুর বররূপে আসেন, সাজাই আসেন, আমার মর্যাদা দানের জন্য]

করুণঃ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৩—

(৪৬)

জগন্নাথ নিতাগোপাল, জগৎ লইয়াই তোমার খেলা, একান্ত ব্যক্তির তুমি কেহ নহ। প্রলয়-পয়োধি জলে নিমগ্ন এই বিশ্বের সামনে মীন অবতারে বেদ ও জীবন রাখিয়া গিয়াছ। তুমিই কূর্মরূপে ইহাকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছ, শূকররূপে আকাশে তুলিয়া ধরিলে, বামনরূপে বলির অভিমানের দর্প চূর্ণ করিলে, একুশবার শোষণের জ্বালা হইতে মুক্ত করিবার জন্য ধরাকে নিঃক্ষত্রিয় করিলে, রামরূপে সীতা প্রকৃতিকে মুক্ত করিলে, হলধররূপে লাঙ্গল সভ্যতার প্রবর্তন করিলে, হিংসাজর্জরিত বিশ্বের বুকে বুদ্ধরূপে অহিংসার গৌরব প্রতিষ্ঠা করিলে, কল্কিরূপে ম্লেচ্ছ যবনের হাত হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিলে, গৌররূপে ধরার বুকে অজড় সভ্যতার প্রবর্তন করিলে, রাধাকৃষ্ণ একীভূত হইয়া নিতাগোপালরূপে তাহাকেই দার্শনিক ভাষ্য ছড়াইয়া দিলে। জগন্নাথ, তোমার সৃষ্টির আমি দৃষ্টিহীন হইব, ক্ষুদ্রতা আমার মুছিয়া ফেল।…(৮-এর) ঐ বাড়ীতে ঐ ঘরে কত মানুষের সঙ্গে কত ভাবে মিলিয়াছি, মিশিয়াছি। আজ আমার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়িয়াছে ইহাদের উপর। বর্তমানে আমার দায়িত্ব আর পুত্রদের উপর নাই। ইহারা শান্তিতে থাকে, শান্তিতে থাকিব। মরিতে মরিতে কতদূর আসিয়াছি! সংসার হইতেও কতদূর আমি আজ! এত দূর হইতে সংসার-দেখা বেশ। সব ছবির মত প্রাণহীন মনে হয়। কোথায় ইহাদের জীবনের প্রশ্ন! দিনের পর দিন যায়, কি নিয়া আছ ইহারা! এত ব্যাপারের মধ্যে আমার ঠাকুর কই, আমার দেবতা কই?…

১১ই ফেব্রুয়ারী

নীলকণ্ঠ, আশুতোষ, 'সত্যং শিবং সুন্দরম্' নিতা-গোপাল আমার, তুমি যুগে যুগে কত ব্যাধকে অহৈতুকী কৃপাদ্বারা কৃতার্থ করিয়াছ। তুমি যাহারা এই ধরা মানুষের হাতে দেওয়া বিষ পান করিয়াছ, অথচ কাহাকে নিজ আশ্রয় হইতে বিতাড়িত কর নাই। অকৃতজ্ঞ মানুষ তোমাকে বিষই দিয়াছে। তুমি পরিশাক করিয়াছ তুমি সকলকে অধিকার দিয়াছ তোমাকে স্পর্শ করিবার সেবা করিবার। তুমি আসিয়াছিলে, ধরার মানুষ বিষ দিয়া বিদায় করিল। তবুও তোমার আসার বিরাম নাই কবে আমার প্রাণ-মন-বুদ্ধি দিয়া ভালবাসিব? মানুষ প্রাণ বাদ দিয়া শুধু মন দিয়া, বুদ্ধি দিয়া বা বাকী দিয়া ভালবাসে। আমি প্রাণ-মন-বুদ্ধি সব দিয়া তোমাকে জড়াইয়া থাকিব।… অবধূত সম্প্রদায়ের আদি দেব শিব সুন্দর। আমরা তাঁহার চরণাশ্রিত দাস। তাঁহার জীবনে জীবন লাভ করিব, ধন্য হইব—ইহাই তো চাহিয়াছি। শিবসুন্দর ছিলেন সন্ন্যাসী-গৃহী বা গৃহী সন্ন্যাসী; তিনি ছিলেন কর্মী, জ্ঞানী, ভক্ত; তিনি ছিলেন সর্ব সাম্প্রদায়িক; কুবের তাঁহার দ্বারী কিন্তু তিনি থাকে শ্মশানে; দুনিয়ার সব দেবতা আছেন অমৃতের খোঁজে আর শিব বিষপান করে নীলকণ্ঠ, তাঁহার পূজায় সকলে অধিকারী। কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত তাঁহার অর্চনা চলিয়াছে। মিশর ব্যাবিলোনিয়া, গ্রীস রোম ক্যাম্বোডিয়া আনাম পর্যন্ত তাঁহার প্রভাব ছড়াইয়া রহিয়াছে। শিবচরিত ও কৃষ্ণচরিত ভারতবর্ষকে অগ্রণী করিতেছে। ৮টার সময় আনন্দবাজার হইতে 'শিবরাত্রি' প্রবন্ধ পাঠ হয়। কিন্তু আলোচনাও হয়।

১২ই ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, আমার নয়ন, বিশ্বের প্রতি জীবের নয়ন জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে বিশ্বনয়নের সঙ্গে এক হইয়া তোমারই রূপের অন্বেষণ করিয়া যুগ যুগান্তর ধরিয়া

বেড়াইতেছে। এই উন্মাদ অন্বেষণের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীরাধা, শ্রীরাধাই বিশ্বজীবের সত্তা চৈতন্য ও আনন্দ। সুধার জীবনে তোমাকেই খুঁজিয়াছি, আজও সর্বের ক্ষেত্রে তোমাকে খুঁজিতেছি। সুধা আমার আশ্রমে আসিতে চাহিয়াছিল, সেই চাওয়ার মধ্যেই দেহ ত্যাগ করিয়াছিল ···· —এর বেশী কেহও দিয়াছে। অর্থাৎ এই সমস্ত হইল না। কি অপমানই না সমাজ মেয়েদের করিতেছে? জীবনে কোন পুত্রবধূকেই বার বার মেলি নাই, এখানে ওখানে পুত্রবধূ খুঁজিয়া বেড়াই নাই। যত বাড়াবাড়ি মেয়েদের উপর। মেয়েরা যদি নিজের সম্মান নিজেরা রক্ষা না করে, আমি কি করিব? মেয়েরা যদি দাবী না করে যে শাস্ত্র হইতে 'দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী', 'নারী নরকের দ্বার' ইত্যাদি প্রত্যাখ্যান করা হউক, পুরুষ কি স্বেচ্ছায় অধিকার ছাড়িবে? এই সব কথা আলোচনা হয়। আসিবার কালে মঠে নামি। কিছুকাল থাকিয়া চলিয়া আসি ····

১৩ই ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, আমার জীবনের বাহিরে তুমি থাকিও না, আমার জীবনের সকল প্রচেষ্টায় তোমার দোষণমুক্তি জন্মিয়া উঠুক। সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তির দ্বারা সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তির মাঝে তোমাকে না পাইলে আমার জীবনের কান্না তো ঘুচিবে না। তোমাকে প্রাণে মনে আমার পাওয়া চাই-ই? তুমিই আমার শরণ। তোমার রাতুল চরণ, তোমার পাদুকা আমি মাথায় বহন করিয়া বেড়াইব, উহাই তো আমার মস্তকের শোভা। কি আমার আছে, যে আমার আছে তুমি ছাড়া এই বিশ্বে? যে পরম প্রয়োজনে আসিয়াছিলে, সেই প্রয়োজনকে আমি তো সার্থক করিতে পারিলাম না। অথচ তাহার জন্য নিজেকে দায়ী মনে করি। তোমার মন্দির, তোমার সম্প্রদায় আসিয়া যাইতেছে, আর তোমার আশ্রিতেরা হাজার হাজার টাকা নিজ নিজ স্থানে বসিয়া উৎসবে খরচ করিতেছে। তুমি কি তৃপ্তি পাইতেছ? কোথায় তুমি, কোথায় তোমার দর্শন? আমি যে বেদনায় আকুল হইতেছি।··· মনোরঞ্জনবাবু আসে, ··। এখানের অবস্থা বলা হয়। আমাদের এই কথা লইয়া বসিয়া থাকা ছাড়া উপায় নাই। জানি আজ হউক, কালি হউক দেশকে নিতে হইবে। মনোরঞ্জন বলিল, ভাবিয়া কূল পাই না, তাই ভাবি না। আমরা পত্রিকার মধ্যে positive কিছু দিতেছি, অন্ধকারের মাঝে আলোর সন্ধান দিতেছি। শ্রীঅরবিন্দ conciousness-কে কেন্দ্র করিয়া দর্শন লিখিয়াছেন, সেই দর্শনে কি করিয়া এই বাস্তব জগতের প্রতিষ্ঠা তিনি দান করিবেন? এই বাস্তব জগৎ যে un-conciousness-প্রধান। Conscious-unconciousness-এর ভেদ-দর্শন তো মনেরই ব্যাপার। অরবিন্দের জগৎ চিন্ময় ছাড়া মৃন্ময় কিছুতেই নয়। Conciousness হইতে বঞ্চনা করিলে মাটিতে কিছুতেই পা তাঁহার পড়িবে না। 'জীবন' হইতে যাত্রা করিলে চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয় প্রতিষ্ঠা হইবে—ইহাই শ্রীনিত্যগোপালের বিশেষ অবদান। আজ প্রতিটি মানুষকে সর্ব সমস্যা সমাধানের জন্য দরবার হইতে হইবে। পাঠ হয় ····

১৫ই ফেব্রুয়ারী

ওগো মানিনি শ্রীরাধা আমার, তুমি আত্ম-মান বজায় রাখিবার জন্য আত্তি-কুল-শীল ভেসাদিলে। তুমি উন্মাদিনী বেশে সকল সংস্কারের জাল ছিন্ন করিয়া একটি জীবন প্রবাহরূপে আসিয়া দাঁড়াইলে। কি তোমার বিদগ্ধা রূপ, বিনীতা রূপ। বিশ্ব-প্রকৃতি তোমারই জীবনে ব্যাখ্যাত, তুমি অপমানিতা নারীশক্তির মাঝে মূর্তিমতী মান। আজ বিশ্বের নারীশক্তি পুরুষ-কৌলীন্যের শোষণ হইতে মুক্ত হইয়া তোমার মানে মানিনী হইবে না, গর্জন করিবে না? অপমানিতের মনোবৃত্তি লইয়া নারী আজ স্তব্ধ। তাহাদের হৃদয়ে কি তোমার সাড়া আসিবে না? নইলে এ বিশ্ব প্রলয়ধাম হইবে কি করিয়া? নারীর পুরুষ-সমকক্ষতা তো শুধু ব্রহ্মেই আস্বাদিত হইয়াছে।·· সৃষ্টি করিতে না পারার অক্ষমতাই ক্লৈব্য। আদর্শ ছিল impotent, উহার সঙ্গে সৃষ্টি-ক্ষমতা জুড়িয়া দিতে আসিলেন পুরুষোত্তম। মানুষের জীবনে তিনটি 'কল্মষ'—অনার্যজুষ্ট অর্থাৎ আদর্শহীনতা, অকর্মা অর্থাৎ সেই আদর্শে এই জগৎকে গড়িয়া তুলিতে না পারার পাপ, (৩) অকীর্তিকর

অর্থাৎ সেই স্বর্গসৃষ্টিকে বিশ্বের সমস্তে সমস্তে সঞ্চারিত এবং আস্বাদন না করিতে পারার দৈন্য। নারায়ণ দিয়াছেন আদর্শ, নর-অর্জুনকে তাহা কর্মে রূপ দান করিতে হইবে। আজ দায় পড়িয়াছে নারায়ণের, তাই নরের পিছু পিছু তাঁহাকে ছুটিতে হয়। এতদিনে মনস্তত্ত্বের দ্বারা উল্টাইয়া গিয়াছে সভ্যতার ক্রম বিবর্তনের ইতিহাস দিয়া। স্পেসিফিক মেডিসিনে একটি নির্বিশেষ ওষুধ আছে ১ নম্বর, তাহাতেই অনেক সময় রোগ আরোগ্য হয়, organ-এর জন্য ঔষধের দরকারই হয় না। নির্বিশেষ ব্রহ্মধারাও তেমনি অনেক রোগ সারিয়া দেয়। কিন্তু জটিল কঠিন রোগ সারিবার জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ বিশেষ organ-এর স্পেসিফিক। ঠিক তেমনি পুরুষোত্তমের প্রয়োজন হয় জটিল কুটিল ব্যাধির জন্য।

১৩ই ফেব্রুয়ারী

নারায়ণ, তুমি দিয়াছ আদর্শ, মানুষ জোগাইয়াছে রক্ত-মাংস। নর-নারায়ণই ভারতীয় সভ্যতার চরম পরিণতি। শিব দিয়াছেন পিতৃত্বের আদর্শ, সেই আদর্শ রূপবান হইতে পারে বাস্তব জগতের পিতাদের দ্বারা। এই জগতের পিতা ও শিব যখন এক হন, তখনই স্থাপিত হয় আদর্শ পিতা। আদর্শ পিতা, আদর্শ মাতা, আদর্শ স্বামীত্বের আস্বাদন করিবার দিন আসিয়াছে। আদর্শের অপর অর্দ্ধ বাস্তব, বাস্তবের অপর অর্দ্ধ আদর্শ। দুই এক তত্ত্ব। নারায়ণ 'অনশ্নন্', আর নর 'অশ্নন্'। খাওয়া ও না খাওয়ার সমন্বয়েই বিশ্ব চলিতে পারে সত্য সার্থক পরমার্থভাবে। স্বামী জোগায় হাড়, স্ত্রী দেয় রক্ত-মাংস। কে বড়? কে ছোট? পুরুষোত্তম-মূল্যে সব কিছুর মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।... আমার লেখা 'শ্রীনিত্যগোপাল ভক্ত-শতবার্ষিকী' বেদুকে পুনরায় লিখিয়া দিতে বলি। ঠাকুরের প্রাণ-দর্শন লিখিবার ভার আমার উপর চাপিয়াছে। উহাকে যথাযোগ্য ভাবে সফল করিতে হইলে সকলের থাকিবার প্রয়োজন আছে। ঠাকুরের সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ ইহার উপর নির্ভর করে। বর্ত্তমান সময়ে কোনও সম্প্রদায়ের কোনও পৃষ্ঠপোষকের দর্শন নাই। ইহাকে সুন্দর করিয়া দিতে পারিলে মানুষের একটা কিছু ধরিবার তাকিবার পথ হইবে। মানুষ অন্ধকারে হাতড়াইতেছে, কোনও নির্দ্দিষ্ট চিন্তা-প্রণালী সমস্তাজর্জ্জর মানবজাতির সামনে নাই। অথচ ঠাকুর সেখানে পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর, বল দেও, বুদ্ধি দেও, তোমার দর্শন যেন যথাযোগ্যভাবে উপস্থাপিত করিতে পারি।...

১৬ই ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, তোমার প্রাণস্পর্শে আমার বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র ও মন প্রাণময় হউক। প্রাণের অভাবে উহারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, পরস্পরকে পরস্পর বাধাই দেয়। বাক্, চক্ষু শ্রোত্র ও মন কি ফাঁকিই দেয় এবং কি ফাঁকিতেই পড়ে যতক্ষণ না উহাতে প্রাণস্পর্শ হয়। মন কতদূর গিয়া আটকাইয়া যায়, প্রাণই অবাধ। প্রাণ সম্বল করিয়া চলিয়াছিলাম বলিয়াই শত দুর্যোগের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিয়াছি। বুদ্ধিবল হইলে কোথা জড়াইয়া পড়িতাম! প্রাণের ফাঁক দিয়াই নরসিংহ, রাম কৃষ্ণ আসিয়াছিলেন। বাক্, চক্ষু সব ধরা পড়িল, প্রাণ অধরা রহিল।...হুমায়ুন বলে, 'সে পিছাইয়া যাইতেছে, জীবনে ভগবান পাওয়া হইল না। উপায় কি? সে যোগ্য হইতে পারিতেছে না'। নিজ আশ্রয়ের সঙ্গে একাত্ম হইতে হইতেই মানুষ যোগ্য হয়। পাইয়া যোগ্য হয়। যুক্ত থাকিতে থাকিতেই মানুষ যোগ্য হয়। যোগ্যতা আগে নয়, আগে যুক্ত হওয়া এবং তাহাতে জমাইয়া তোলা। অগ্রে ভগবানে ভক্তি, পরে তাঁহা পূজার অনুরাগ। পবিত্র হইয়া ঠাকুর ঘরে যাইতে হইবে ইহা ছিল সনাতনীদের কথা, ভাগবতধর্ম্মের কথা ঠাকুরকে জীবনে লইয়াই তবে পবিত্র হইতে হইবে। জলে নামিয়া সাঁতার শিখিতে হয়। আগে স্বরাজ, পরে যোগ্য হওয়া যোগ্য হইয়া স্বরাজ পাওয়ার কথা ইংরেজ শুনাইয়াছে কিন্তু স্বরাজ না পাইলে কিসের যোগ্য হইবে? যোগ্যতার অর্থ কিছুর বিচারে যোগ্য হওয়া। সেই কিছুর সঙ্গে আগে পরিচিত না হইলে যোগ্যতার অর্থ কি? কিসে যোগ্যতা?...মনটা ভাল নয়।

১৭ই ফেব্রুয়া

ঠাকুর, কেন উপনিষৎ তোমায় নাম রাখিয়াছেন 'তখন', অর্থাৎ তাহাদের (বিশ্বপ্রাণিগণের) সম্ভজনীয়; তবে তোমায় সমাকৃরূপে ভজনা করিব, 'যখন তখন বলিয়া' যাইব? বিশ্বে একমাত্র তুমি আছ, যাহার সঙ্গে সকল দিক দিয়া বনি-বনাও হওয়া সম্ভবপর। কাহার সঙ্গে কে এতেবারে বনিয়া যাইতে পারে তোমার সঙ্গে ছাড়া? আমার মন তোমার মন বনিয়া যাউক, আমার দেহ-প্রাণ তোমার দেহ-প্রাণ বনিয়া যাউক, আমি তুমি বনিয়া যাই। এমন সার্থকতা আমাকে প্রদান কর। আমার সকল হওয়ার মূলরূপ তুমি। আমি তুমি হইব, তোমার মাঝে আমার সকল হওয়ার সাধ মিটিবে। তোমার 'তখন' নাম আমার জীবনে সার্থক হউক। আজ আর বাহির হই নাই। ৮টায় শ্রীযুক্ত দাসগুপ্ত (বরিশালে জগদীশবাবুর বাসায়) আসেন। তাহার কাছে 'স্থান' কিনবার কথা বলিলে হরিদাসবাবুর নারায়ণপুর কলোনী হইতে কিছু জায়গা দিবার প্রস্তাব করিতে বলেন। পুরী হইতে হরিদাসবাবু ফিরিলে আমাকে জানাইবেন, আমি ও তিনি যাইব।...নিত্যধর্ম পত্রিকা (এক বর্ষ) হইতে বৃক্ষ ও ফলের সম্পর্ক আলোচনার অংশ পাঠ করা হয়। ঠাকুরের জীবনী পাঠ কাল হইতে করা হইবে।...প্রতিটি ঘটনাই আমার জীবনে সমস্যা। পথে দাঁড়াইবার জন্য এবং এই সংসারের বুকে ঠাকুরকে স্থাপন করিবার জন্যই সব সমস্যা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। ঠাকুর দুই হাত দিয়া রক্ষা করিতেছেন, তাই আজও টিকিয়া আছি। ঠাকুর, তোমার পাদস্পর্শে আমার সমস্যাগুলি লীলারসে জমিয়া উঠুক। ৩টায় উঠি, রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় না।...

১৮ই ফেব্রুয়ারী।

ঠাকুর, যেদিন হইতে পথে দাঁড়াইয়াছি, সব কিছুই আমার জীবনে সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে—আমার খাওয়া-পরা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়, পথের বন্ধুগণ। তুমি দুই হাত দিয়া তাহার সমাধান করিয়াছ। 'তার কি? টেনে তুলব'—এই বাণী তুমি সার্থক করিয়াছ। তোমার জীবন-দর্শন প্রতিষ্ঠা—এও তো আমার জীবনে সমস্যা। কে কবে তোমার দর্শন চালাইবে? সমস্যা-সঙ্কুল আমার জীবনে তুমিই মূর্তিমান সমাধান বা সমাধি। তোমার সমাধান নির্বিকল্প, নির্বিকল্প সমাধি ছাড়া আর কোনও সমাধান দিতে পার না। 'সমাধানম্ এব সমাধিঃ'। ওগো সমাধানমূর্তি, আমার সব সমস্যার মধ্যে তুমি সমাধানরূপে প্রকাশিত হও। সকালে বাহির হই না।...বাগমারী হইতে দুই ভদ্রলোক আসেন প্রবোধ সমাবারদের বাড়ী হইতে। হরিসভার বক্তৃতার কথা বলেন। সভায় দাঁড়াইয়া আর বলিতে ইচ্ছা হয় না। আগে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে পরে নিজেই হয়ত যাইব। বিশেষ কোনও একদিনের জন্য গিয়া সভা শোভন করিতে ইচ্ছা হয় না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে নকুলেশ্বরবাবু (চাকুরিয়া) ও তাঁহার এক বন্ধু অনন্ত চ্যাটার্জী আসেন। নকুলবাবু ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে বক্তৃতা দিবার কথা বলেন। তাঁহাকেও বলি—অনেক বলিয়াছি। এখন ২৪ জন চাই যাহাদের সঙ্গে একান্ত হইয়া তত্ত্ব আস্বাদন করিতে পারি। Intuition-এর স্তরে দাঁড়াইয়া বলি, লোকে শোনে; কিন্তু psycholigically তারা নিতে পারে না বলিয়া শোনা ব্যর্থ হয়। কাছে বসিয়া আলোচনা করিলে intuition-কে psychology-তে গড়িয়া তোলা সম্ভব হয়। অনন্তবাবু গ্রাহক হন। অনেক কথা হয়—গিরিধারী প্রসঙ্গ, হোয়াইটহেডের লেখা, বন্ধন-মুক্তির ব্যাখ্যা। প্রায় ২ ঘণ্টা থাকেন, আহারের পর যান ...

১৯শে ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, তুমি সৃষ্টির ভিতর সৃষ্ট হইবার রস আস্বাদন করিবার জন্য জীবজগতের বুকে নিত্যলীলা হইতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ। তোমার এই আসা আমার ব্যষ্টি জীবনে সমষ্টি জীবনে সার্থক হউক। আমার সকল সমস্যার ভিতর তুমি সৃষ্ট হইবে, কিম্বা আমার সকল সমস্যা দিয়া তোমাকে সৃষ্টি করিব—ইহাই তো আমার জীবনের সাধনা। তাহা কি সফল হইবে না? সকল সমস্যার তুমি ছিলে আমার সঙ্গী, তাই আমি এতদূর এত সমস্যার ভিতর দিয়া আসিতে পারিয়াছি। নহিলে কোথায় তলিয়া যাইতাম।...ধীরেন ডাক্তার...মীরুকেও দেখে। বলিল, হাত। স্পাইনাল কর্ডে বেদনা হয়। বেদনা নিগা-

মেন্টে।···নলহাটির ঠাকুরের জীবনী হইতে মধ্যলীলা আজ পাঠ আরম্ভ করা হয়। যে তত্ত্বটী পাইয়াছি, তাহা আমার জীবনকে দখল করিয়া বসিয়াছে। অথচ ইহার কিছুই করিতে পারিলাম না। ঠাকুর, আমাকে বল দেও, আমি যে আর পারি না। তোমার রাতুল চরণে মাথা রাখিব। আর আমার বিশ্রাম করিবার স্থান কোথায়? শরীর মন আমার কিছুই ভাল নয়।···মেয়েটির জন্ত বড় চিন্তা হয়। কে দেখিবে?···আমি বড় দুর্বল। এমনই তো অনেকটা চিরদিন ছিলাম। তবুও ঠাকুর ভাল-বাসিয়াছেন, তাঁহার দর্শন লিখিবার অধিকার দিয়াছেন ··· প্রাণ দিয়া সারা জীবন কাজ করিয়াছি। এখানে কি কাজের মধ্যে প্রাণ দিবার লোক নাই? প্রাণ, প্রাণ, প্রাণ, কোথায় তুমি?

২০শে ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, রাম আমার, কৃষ্ণ আমার, কি ঝড় মাথায় করিয়াই না তুমি আসিলে! ঝড়ে জীবন আরম্ভ, ঝড়েই পরিসমাপ্তি। প্রতিটি ঘটনা ছিল সকল সমস্যার সৃষ্টি। ঝড়ে ঘুরপাক খাইতে খাইতে তোমরা চলিয়াছ, চলিতে পারিয়াছ, ঝড় তোমাদিগের অগ্রগতির পথ রোধ করিতে পারে নাই। তাই তুমি ব্রহ্ম। আমার এই সমস্যা-বিক্ষুব্ধ, তাপিত জীবন আত্মসাৎ কর। আসিয়াছ নিজ দয়ায়, কিন্তু আমি তো অযোগ্য। তবু কেন যেন তোমার তত্ত্ব ভাল লাগে। ইহা ছাড়া আর কিছু যে ভাল লাগে না। ব্যক্তি জীবনের, বিশ্ব জীবনের প্রতিটি ঘটনার মধ্যে তোমার এই তত্ত্ব আস্বাদন করিতে চাই। আমি আজ জুড়াইতে চাই, আমি জুড়াইতে চাই।···আজ এ বাড়ী ছাড়িবার কথা হয়। যাইবার ইচ্ছা ছিল না অন্ততঃ এক বৎসরের মধ্যে। কিন্তু এখানের মশা, ড্রেন, গন্ধ, জলের অবস্থা, বর্ষাকালে পথঘাটের অবস্থা, সর্বোপরি এখানের আবেষ্টনের ঔদাসীন্ত যাইবার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রেণু বর্ষাকালে কেমন করিয়া এতদূর হইতে কলিকাতা যাইবে ও আসিবে? এখানের খাটুনীও তো কিছু খাটিতে হয়। কেহই এ স্থান পছন্দ করে না। পুলিন আমাদের সঙ্গে থাকিবে বলে। তাহাকে বাড়ীর খোঁজ লইতে বলা হইল ···

২১শে ফেব্রুয়ারী

নিত্যগোপাল, গৌরগোপাল আমার, ধরার ধূলিতে লুটাইয়া, জড়ের বুকে লুটাইয়া তুমি ইহাকে অজড়ের ঐশ্বর্যে গড়িয়া তুলিতে চাহিলে। বৈকুণ্ঠ আজ ধূলায় লুটায় ধরার গ্লানি দূর করিতে, ধরার ভার হরণ করিতে। স্বামিন্, তোমার বিশ্ব-ঘরের ঘরণী হইব, ছোট স্বামীর ঘর করিব না। তোমাকেই কেন্দ্র করিয়া বিশ্বময় আমি হাসির খেলির নাচির গাহির। তুমি রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত। সারা বিশ্বের কান্না তোমারই কান্না। তুমি বিশ্বকান্নার, বিশ্ববেদনার ঘনরূপ। তুমিই সর্বভূতে বেদনারূপে অধিষ্ঠিতা। তুমিই মূর্তিমতী বিরহ, মূর্তিমতী সকলের সব না-পাওয়া। তোরে প্রতিভা যখন ফুল তুলিতে হরি গোপালবাবুর বাড়ী যায়, আমিও সঙ্গে যাই।··· আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। একটু পরেই চলিয়া আসি।··· তিনি তাহার মত করিয়া গান না বলিয়া একেবারে নিসম্পর্কীয় হইবার কথা দৃঢ়ভাবে বলিলেন। ছাড়িতে চাহিলেই যে ছাড়া যায় না, ছাড়িতে গেলে আকর্ষণ যে আরও বাড়ে, এই সব কথা ইহাদের জানা নাই। হয় একান্ত আসক্তি, নয় তো অনাসক্তি—ইহারা ইহা জানেন। কিন্তু আসক্ত থাকিলে যে অনাসক্তির সঙ্গে সমন্বিত হইয়াই তাহা সম্ভব এবং তাহা যে প্রাণের স্তরে সম্ভব, ইহা আজ বুঝিবার দিন বিশ্বের আসিয়াছে। বিশ্বে কিছুই কিছুকে আজ ছাড়িতেও পারিবে না, রাখিতে পারিবে না। ছাড়া ও না-ছাড়ার সমন্বয় করিয়া প্রাণের স্তরে পাওয়ার জন্ত সচেষ্ট হইতে হইবে ···পাঠ হয়। 'অশোচ্যান্ অন্বশোচস্ত্বম্' অংশ পাঠ হয়।···নিষ্ফল বেদনা বেশ। সবই যে আমার রোগী। ঠাকুর আ কি তোমাকে লইয়া আপাইতে পারিব না? ছুটিতে চা কিন্তু পারিতেছি কই?···

২২শে ফেব্রুয়া

ঠাকুর, সৃষ্টির এ-পারে সৃষ্ট জীব, ও-পারে স্রষ্টা নারায় উভয় উভয়ের পাইবার জন্ত বেদনার যে কান্না ফুটিয়া তাহার নিবৃত্তির জন্তই না সংসার অনাদি অনন্ত ছুটিয়া

জীব কাঁদে নারায়ণের জন্য, নারায়ণ কাঁদে জীবের জন্য। এই পারস্পরিক কান্নার ইতিহাসই তো সৃষ্টির ইতিহাস—এই কান্নাই ব্যষ্টি জীবনে সমষ্টি জীবনে আত্মপ্রকাশ করিতে গিয়া বিশ্বকে বিস্তৃত করিতেছে। ঊর্ধ্ব যখন এক, অখণ্ড, অদ্বৈত, তখনই সম্ভব এই কান্নার নিবৃত্তি। গীতা এই অদ্বৈতামৃত বর্ষণ করিয়াই অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী। নিত্যগোপাল জীবন ও দর্শনে বিশ্ব এই অদ্বৈত জীবন ও দর্শন উপলব্ধি করিবে। তোমার জয় হউক। ৯টার পর বেহালা হইতে সুরেন আসে। ওখানের বাড়ী-ভাড়ার জন্য এ তহবিল ও তহবিল একত্র করিয়া ৮৫৲ টাকা দেই। চিরদিন এমনি করিয়াই দেশের কাজের জন্য আগাইয়া গিয়াছি। আমার দায়িত্ব কেহ বাতলায় নাই। কেহ চায় নাই, আমি সাধিয়া করিয়াছি। স্বরাজসেবক সঙ্ঘের জন্য প্রথমে ২৫ টাকার ছাওনোট আমিই দিয়াছিলাম, অথচ দুর্গামোহনবাবুরাও তো ছিলেন যাহারা এই অর্থ অনায়াসে দিতে পারিতেন। 'কি হবে কি হবে না, কি হবে, কি হবে না'—কোনও দিনই তো ভাবি নাই। হিসাব একটা ছিল, নহিলে এতদূর আসিলাম কি করিয়া? কিন্তু বিষয়ীর মত হিসাব তো করি নাই। সেইখানে এক দিক দিয়া ঠিকিয়া গিয়াছি।·· সকাল ১০৷৷ টার পর মনোরঞ্জন গুপ্ত আসেন। বরিশালের রাজনৈতিক ইতিহাস লিখিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। উহা সুরেন ঘোষের নিকট দিবেন। কাহার কাহার নিকট সাহায্য পাওয়া যাইবে তাহার একটি list করিয়াছেন। আমি ২।৩টি নাম দিলাম। Synthesis is thesis on a higher plane—ইহাই Marxism। আধ্যাত্মবাদের (ভারতীয়) antithesis হইতেছে পাশ্চাত্যের জড়বাদ। আজ ভারত synthesis করিতে চলিয়াছে উপরের স্তরে ব্রহ্মের ভগবানরূপ দাঁড় করাইয়া। ভগবান=thesis×antithesis, আত্মা × অনাত্মা। Class-war তাই এ দেশ মানে না। আমি মনে করি মহাত্মাজী রাজনীতিতে যতখানি প্রগতিপন্থী, ধর্মক্ষেত্রে ততখানি নন, প্রমাণ তাহার অহিংসা ব্রহ্মচর্য প্রভৃতির ব্যাখ্যা।

২৩শে ফেব্রুয়ারী

উপনিষদের প্রাণ-উপাসনার মূর্ত বিগ্রহ শ্রীরাধা আমার, তুমি পুরুষোত্তমের সেই শক্তি যে জীবের বুকের ব্যথা খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহা অপনোদনের জন্য অযাচিত-ভাবে জীবের দুয়ারে আসিয়া উপনীত। যেদিন হইতে তুমি আমার জীবনে আসিয়াছ, কাহারও নিজের দুঃখ নিবেদনের পূর্বেই যে আমি তাহা দূর করিবার ভার নিয়া বসি, অথচ সেই ভার বহিবার মতো শক্তি ও অর্থসামর্থ্য আমার কই? ভার বহিবার দায়িত্ব লইয়াছিলাম, কিন্তু পূরণ করিবার শক্তিসামর্থ্য তো আমার নাই। আমার প্রাণ লইয়া কি বিপদেই না আমি পড়িয়াছি। আমায় রক্ষা কর।·· পুলিনকে ২ দিন হইতে রাত্রিতেও ভাত দেওয়া হয়, যদি সে সুস্থ হইতে পারে। সারা জীবন মানুষের মুখ চাহিয়া চলিয়াছি, মানুষের ব্যথার খোঁজ করিয়াছি। বিশেষ কিছু করিতে পারি নাই। আজ ঠাকুরের জীবনী কিছুটা পাঠ হয়।···

২৪শে ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর,···আমিও তো তাই চাহিয়াছিলাম—তোমারই সন্তান এই বিশ্বকে তোমার দর্শন ও জীবনের ছাঁচে সাজাইয়া গুছাইয়া তোমারই প্রতিরূপ হিসাবে তোমার চরণে নিবেদন করিব। কেন এ সাধ তুমি আমাকে দিলে? তোমার বিশ্বে তোমার ছবি দেখিবার লোভ কেন জাগ্রত হইল? কেন 'সত্যব্রত সমিতি'র আদর্শ ছিল—'বিশ্বেষু সত্যানন্দং দৃষ্ট্বা সুখী ভব ভবে'। আমাকে ধন দেও, জন দাও, বীর্য দেও তোমার বিশ্ব তোমারই ছাঁচে গড়িবার জন্য। আমার সাধ পূর্ণ কর, আমিন্।···রামায়ণের আলোচনা হইতেছিল। অযোধ্যায় যখন সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন হইতেছিল, তখন তো সব-কুশ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীরাম যাহাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করিয়া পুত্রোৎপাদন করিলেন, পুত্রদ্বয় যখন সাক্ষাৎ, তখন অগ্নিপরীক্ষার প্রস্তাব কি বীভৎস! কেন সীতাদেবী তাহা বরদাস্ত করিবেন? তাঁহার পৃথিবীর বুকে প্রবেশ করাই তো ঠিক হইয়াছে। লঙ্কা হইতে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে না আসিলেই তাঁহার আত্মমর্যাদা রক্ষা পাইত। পুত্রদের সামনে মাতার সতীত্বের পরীক্ষা! ২৫শে ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, তুমি ধর্মমূর্তি, আমার জীবনের সকল নিঃশ্রেয়স ও সকল অভ্যুদয় তোমার শ্রীচরণ-স্পর্শে জমিয়া উঠুক। তুমি বিশ্বের নিঃশ্রেয়স ও অভ্যুদয় দুই-ই দিতে আসিয়াছ। এই দুইয়ের সমন্বয় না হইলে যে ঠেলিয়া আর আগাইতে পারিতেছি না। অভ্যুদয় ব্যতীত একান্ত নিঃশ্রেয়স স্বরূপ আবেষ্টন জয় করা যায় না। ঘরে বাইরে দুই জায়গায় আমাকে স্বামিত্ব প্রদান কর। আমি তোমার সেবা করিব, তোমার বিশ্বকে তোমারই স্বরূপে, তোমারই রূপে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া দিয়া তোমার শ্রীচরণপ্রান্তে পৌঁছাইয়া দিব। বিশ্বের বুকে দাঁড়াইবার সর্ববিধ যোগ্যতা তুমি আমাকে প্রদান কর। তোমার শ্রীচরণে তোমার শরৎ-এর এই প্রার্থনা রহিল।…সারাদিন আমার লেখা 'শ্রীনিতাগোপাল জয়পতাকাধিকী' প্রবন্ধটী বেণু ঠিক করে ও পড়িয়া শোনায় …রাত্রি ১০।টা পর্যন্ত ইহারা উজ্জন-ভারতের ব্যাপার লাগায়।…প্রাণ ছিদ্রপথে যাতায়াত করে, সে দুকূল ত্যাগী—আত্মার কূল ও অনাত্মার কূল—কোন কূলেই সে আটকাইয়া পড়ে নাই। Law of Excluded Middle সে বর্জন করিয়া চলিয়াছে। হিরণ্যকশিপু বর চাহিয়াছিলেন ব্রহ্মার নিকট অর্থাৎ বিধির নিকট, বুদ্ধির নিকট যে, তিনি দিনে মরিবেন না, রাত্রিতে মরিবেন না। দিনে-রাত্রিতে তিনি মরেন নাই, মরিয়াছেন দিন-রাত্রির ফাঁকে, ছিদ্রপথে যে প্রাণের দেবতা আছেন, তাহার হাতে, নৃসিংহদেবের হাতে। প্রাণই নৃসিংহ—নর ও সিংহের সমন্বয়।

২৬শে ফেব্রুয়ারী

ঠাকুর, সমস্যা-সঙ্কুল আমার জীবন, তুমি সঙ্গে সঙ্গে আছ যুগ যুগ ধরিয়া, তাই আমি আজিও দাঁড়াইয়া আছি। আমি তোমাকে বিশ্বাস করিব; আমার সত্যিকার 'আমি' যে তুমি। আমার জীবনের 'অর্থ' তুমি। তোমার অর্থেই আমি অর্থবান, সার্থক। তোমাকে চাহিয়াছিলাম বিশ্ব-জীবনের সঙ্গে একাত্ম হইয়া আস্বাদন করিতে। বিশ্বকে তাই 'আমি' বলিয়া বুঝিবার জন্য, উপলব্ধি করিবার জন্য প্রাণ আমার ব্যাকুল। কোনও অভিসন্ধি তো আমার ছিল না। মানুষের সঙ্গে, মানুষের সম্পর্কের মধ্যে প্রাণ পরিপূর্ণভাবে থাকে। তাহার জন্য যথাসাধ্য করিয়াছি। প্রাণের পথই আমার পথ। সেই পথ বহিয়াই তো জীবনে চলিতে চাহিয়াছি …র নাকি ঘরে ঢোক যে দিবে যায় সেই দিকে চলিয়া যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তাহা অবশ্য হয় নাই। আজ জিজ্ঞাসা করে যে বেণু প্রতিভার সামনে, 'চলিয়া গেলে কাল হইত, না থাকাতেই ভাল হইয়াছে'? বেণু প্রতিভা বলিল, 'একটি ২২ বৎসরের মেয়ের বাহির হওয়া যে কত বড় বিপজ্জনক, তাহা না জানিয়া এইরূপ মুখের মত তাহার কোনও অর্থই হয় না' বাহির হওয়া কি এতই সহজ? বাহির হইলে ঘরে যাইতে কতক্ষণ? বাহির হইলে কে যে কার ঘরে নিয়া যাইবে কে জানে? আমার দুঃখ হয়—আমি তো বাহিরে আছি, আমার কাছে আসাই তো বাহির হওয়া বাহির হওয়ার সাধ যাহার এখানে আসিয়া মিটিল না তাহার কপালে বাহির হওয়ার সাধ মিটিবে না। যে বাহির হইতে চায় অধিকতর আসক্তি নিয়া ঘরে যাইবার জন্যই। আমি তো এখানে মুক্তিক্ষেত্র রচনা করিয়া রাখিয়াছি। এখানে তো কোনও চাপাচাপি নাই। তা ভিতরের সব চাপা-পড়া মনের খেয়াল এখানে আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ পায়। মনের পিছনে চলা আর আমার কাছে হইবে না। কাহারও মনের অপমান হয় না। তা খেয়াল চালাইবার সুযোগ এখানে পায়। খেয়ালের পিছনে চলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।…

২৭শে ফেব্রুয়ারী

শ্রীরাসা-মদনমোহন একাধারে নিতাগোপাল আমার বিশ্বের গোপনতম প্রদেশে জীব-জগতের অগোচরে অন্তরালে যে রসলীলা, গোপলীলা অহরহঃ চলিতেছে যাহা এতদিন মিস্টিকগণ প্রাণধারা ধারণ করিতেন, আজ তাহা বিশ্বগতির বিবর্তনের পথে তোমাদের অবাচি করুণায় দেহেন্দ্রিয় স্তরে অবতরণ করিয়াছে। কামমানুষ ও অকামী মানুষ আজ গোপলীলা রস আস্বাদনে এক অদ্বৈত। এই অবিদ্যার ক্ষেত্রই হইবে ব্রজধাম আমার প্রাণের ক্ষেত্র। আমার আদরের ধাম ব্রজধাম জীবনের পরা স্থিতি-ক্ষেত্র এই গতির বুকে, কামে

বুকে, রজোগুণের বুকে আজ নির্গুণের রসলীলা আস্বাদন করিবার জন্ত আজ (দোল পূর্ণিমা) বিশ্ব আবির-রাগ-রঞ্জিত, লালে লাল। বিশ্ব তোমার রসলীলায় লাল হউক। রাসবিলাসের পরিপতি গৌরসুন্দরের আবির্ভাব তিথি আজ। বাঙ্গলা আবার সকল মনপ্রাণ দিয়া তোমাকে চায়। যে-তুমি ছিলে মিস্টিকদের, আজ সেই তুমিই আসিতে চাহিতেছ মানুষের জীবনে সকল অঙ্গ নিংড়াইয়া। তোমারই দ্বিতীয় কলেবর শ্রীনিত্যগোপাল-অবতরণের প্রত্যক্ষ ফল হইতেছে ইহাই। মিস্টিসিজম্ আজ সাইকোলজির ভাষায় ব্যাখ্যাত হইবে। আমি তো তোমাকে এই রূপেই পাইয়াছি। তুমি তো আমার শুধু ভাবের ঠাকুর নও, তুমি আমার সকল জীবনের বল্লভ। তোমাকে যে আমি মাটির ভাষায়, বিশ্বের কামনা-বাসনার ভাষায়, কামের ভাষায় গড়িয়া তুলিতে চাই, নইলে ধরার জ্বালা জুড়াইবে কি করিয়া? কামী বিশ্ব যদি অকামী গোলোককে বুকের ভিতর জন্মদান না করিতে পারে, কি করিয়া মানুষ মদনমোহন হইবে ···আজ উজ্জল-ভারত হইতে 'নিরক্ষর মূর্খ ও বড় বড় পণ্ডিতদের শাস্ত্র' কিছুটা পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।··· ২৮শে ফেব্রুয়ারী

ওগো গৌরসুন্দর নিত্যগোপাল আমার, প্রথমবার বৃন্দাবনে থাকাকালীন যখন আমি কুসুম সরোবরে ছিলাম, তুমি আমাকে স্বপ্নলোকে দেখা দিয়া বলিয়াছিলে, 'যা বাঙ্গলায় যা, সেখানে কাজ আছে। এবার আর দেখা হইবে না। ৩০ বৎসর পর আবার দেখা হইবে'। সে ৩০ বৎসর কি আর আসিবে না? দিন গণিয়া গণিয়া দিন কাটাই, পথের দিকে তাকাইয়া থাকি তোমার প্রতীক্ষায়। কই, আসিলে না তো? তোমার জীবন মাটির মানুষের জীবনে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলাম। এতদিন বাঙ্গলা তোমাকে পাইয়াছিল মিস্টিসিজমের মধ্য দিয়া। আজ দিন আসিয়াছে সেই তোমাকে সাইকোলজিকালী পাইবার। মানুষ কি তোমাকে পাইয়া নিজেও গৌর হইবে না? স্বতন্ত্র পুরুষ, স্বতন্ত্র নারীর মিলনের কিতব দিয়া গড়া অদ্বৈত তত্ত্ব লাভ করিবে না? আজিও তোরে বাহির হই না—গোপাকে শ্লোক মুখস্ত করাই। 'মধুর মধুরমেতৎ', 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে'। ...'অশোচ্যান্ অন্বশোচস্ত্বং' শ্লোকটির মাঝামাঝি পাঠ হয়।...

১লা মার্চ

ঠাকুর, তোমাকে লইয়া আমি ঘাড় ঠেকিয়াছি। তুমি ছাড়া এই সংসারের কোনও সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়, তাই তোমাকে ঘরে ঘরে জনে জনে পৌঁছাইয়া দিবার জন্ত পথের ধারে তোমাকে বুকে লইয়া দাঁড়াইয়া আছি। জনে জনে কত ডাকিলাম, কেহ কি তোমাকে নিল? আমিই বুঝি অযোগ্য। না হইলে আমার ডাকে সাড়া দেয় না কেন? তোমাকে লইয়া ঝড়ের মত সমাজের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতে চাই, আমায় বল দেও, সামর্থ্য দেও, তদুপযোগী ধন-জন দেও। তুমি যেন প্রতিনিধি আমি কাহাকে দিয়া যাইব—এই বেদনায় আমি অস্থির। কবে তুমি আসিবে আমার জীবনে পড়িয়া উঠিবার জন্ত?···বড় বৌ সত্যব্রত ভটার মধ্যে আসে।... আমি আমার হার বিক্রয়ের কথা বলি। গত মাসের দুধের বাবদ ৪০ টাকা দেওয়া হয়। বিল পরে দিবে। ইহাদের নিয়া এখানে থাকি। ইহাদের সঙ্গে আমার ভাগ্য জড়াইয়া পড়িয়াছে। এখান হইতে যাহা কিছু আর্থিক সাহায্য করা হউক, তাহা প্রকারান্তরে ইহাদেরই করা হয়। ইহাদের নিয়া এখানে থাকিলেও আমি ও ইহারা সত্যব্রতদের কাছে একান্ত 'পর' হইয়া যাই নাই, ইহা বুঝাইতে পারিলে ভবিষ্যতের পথ সহজ হইবে।··· সকালে বৃহদারণ্যক উপনিষৎ হইতে বেণুকে 'সম্প্রত্তি'র অংশ পড়িতে দেই। ঠাকুর তাঁহার আরব্ধ কার্যের দায়িত্ব দিয়া অসম্পূর্ণ বেদ, যজ্ঞ ও লোকের সেবা করিবার ভার দিয়া গিয়াছেন, সম্প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কেমন করিয়া ইহার সার্থকতা করিব, ইহাই তো আমার বেদনা। ঠাকুর, জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়া যেন তোমার আরব্ধ কার্যকে পূর্ণতার দিকে নিয়া যাইতে পারি। ঠাকুরের জীবনী পাঠ হয়।··· ২রা মার্চ

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীনিত্যগোপাল ॥

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় জন্যই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে, দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেইজন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়-নির্দ্দেশিত "সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

শ্রীনিত্যগোপাল

চতুর্থ সিদ্ধান্ত

বেদান্তানুসারে সর্ব দেহেই একাত্মা। সে মতে সেই আত্মাই ব্রহ্ম। অথচ বেদান্তেরই কোন কোন স্থানে ব্রহ্মকে নির্বিকার, অপরিবর্তনীয় ও নিরঞ্জন বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রায় সকল দেহেই ত সেই ব্রহ্মাত্মাকে বিকারবিশিষ্ট, পরিবর্তনীয় ও অঞ্জনবিশিষ্ট দেখিতে পাই। যদি বল, বেদান্তানুসারে মায়া প্রভাবেই প্রায় সকল দেহেই সেই নির্বিকার-অপরিবর্তনীয়-নিরঞ্জন-ব্রহ্মাত্মা বিকারবিশিষ্ট, পরিবর্তনীয় এবং অঞ্জনবিশিষ্ট হইয়াছেন, তদুত্তরে বলি, তবে কি মায়া সেই মহান্ ব্রহ্মাত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? তবে কি মায়া সেই মহান্ ব্রহ্মাত্মা অপেক্ষা মহাশক্তিসম্পন্না যে সেই নিরঞ্জন, নির্বিকার ও অপরিবর্তনীয় ব্রহ্মকেও বিকারবিশিষ্ট, অঞ্জনবিশিষ্ট এবং পরিবর্তনীয় করিতে সক্ষম হইয়াছে? এমন কি সেই মায়াপ্রভাবে সেই মহান্ ব্রহ্মাত্মারও আত্মবোধ লুপ্ত হইয়াছে? এমন কি, সেই মায়া প্রভাবে সেই মহান্ ব্রহ্মাত্মাও শোক দুঃখ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য হিংসা অভিমান ও অহংকার প্রভৃতি নানা বিকারের অধীন হইয়া থাকেন? তিনি ঐ সকল দ্বারা অভিভূতও হইয়া থাকেন? সে অবস্থায় তিনি যে সর্বশক্তিমান নির্বিকার অপরিবর্তনীয় এবং নিরঞ্জন ইহা বুঝিতে পারেন না। সে অবস্থায় প্রকৃত পক্ষে তিনি যাহা, তাহাও ত তিনি বুঝিতে পারেন না। সে অবস্থা তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রমই থাকে। ১।

তুমি বলিতেছ, সর্বাত্মা ভ্রান্তিক্রমেই বলা হইয়া থাকে তুমি বলিতেছ সব দেহে একাত্মাই আছেন। তুমি বলিতেছ যত দেহ, তত আত্মা নহেন। তোমা মতানুসারে সর্ব দেহেই যদি একাত্মা থাকিতেন, তা হইলে সর্ব দেহ হইতেই সেই একাত্মার এক প্রকা স্বভাবই বিকাশিত দেখিতাম। তাহা হইলে প্রত্যে দেহেই সেই একাত্মা নিজেই আছেন বোধ করিতেন আমি-আত্মা এই দেহে আছি, কিন্তু আমিই সর্ব দে আছি, ইহা ত আমার বোধ হয় না। ২।

নবীন কালের দূত আসে অই

॥ শ্রীশশাংকশেখর চক্রবর্তী ॥

জীর্ণ ধরার অংগে অংগে জাগে আজ শিহরণ,
কাহার বারতা এল বুঝি ফিরে ভ'রে দিয়ে প্রাণমন !
ম্লান গোধূলির আড়ালে আড়ালে,
কে যেন প্রাণের দীপটিরে জ্বালে,
গভীর আঁধারে তা'র আলোকের হ'ল আজ বিকিরণ !

ঘুম নাই চোখে, জেগে আছে রাত—কাহার অপেক্ষায়,
দূর-দিগন্তে কা'র চরণের ধ্বনি বুঝি শোনা যায়।
নিখিল প্রাণের ব্যথা অপহারি,
কে আসিবে যেন তিমির বিদারি',
বায়ুর বীজনে-কানাকানি তা'রি কাননের সীমানায় !

ম্লান-চেতনায় যে-রূপ ফোটেনি, তাহারি প্রকাশ তরে,
অসীম আকাশ আছে উৎসুক কত আগ্রহ ভরে !
যে সুর জাগেনি মনের বীণায়,
তাহারি লাগিয়া বাঁশী মূরছায়,
তা'রি লাগি' গান মাগিছে মুক্তি অন্তরে অন্তরে !

নবীন কালের দূত আসে অই, চলে যাবে পুরাতন,
ধ্বংসের বুকে নবীন সৃষ্টি—হেরি তা'র আয়োজন !
মৃত্যু-শীতল বক্ষের মাঝে,
যে জীবন বাঁচে সংকোচে লাজে,
ফিরে চায় আজ প্রাণ-বন্যায় চকল আলোড়ন !

কে আসিছে বুঝি—দিকে দিকে তাই প'ড়ে গেছে আজ সাড়া,
যেন কত দূরে জয়-গৌরবে বাজিছে নাকাড়া-কাড়া !
যেন কোন্ দূরে রাত হয় ভোর,
ছিঁড়ে যায় জড়-অবসাদ-ডোর,
আঁধার কারার দুয়ার টুটিয়া বন্দীরা পায় ছাড়া !

অতন্দ্র আজ জেগে আছে আজ, জেগে আছে কোটি তারা,
জেগে আছে কোটি বেদনার ম্লান নয়ন-নিমেষ-হারা!
হতাশার মাঝে জেগে আছে আশা,
প্রাণে ভ'রে আছে মরণ পিপাসা,
পরীর মত নীরবে ধরণী রয়েছে ব্যাকুল-পারা!

সাময়িকী

নূতন বৎসর ঃ বৎসর ঘুরিয়া আসিল। বঙ্গাব্দ ১৩৭২-কে আমরা স্বাগত জানাই। এই নূতন বৎসরের দিনটি একটি মুহূর্ত যখন আমরা আমাদের সম্বন্ধে—আমাদের অতীত সম্বন্ধে, বর্তমান সম্বন্ধে, আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিব। সাধারণতঃ আমরা গা ছাড়িয়া দিয়া চলি, নিজেদের আদর্শ উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাই, চলার পথ সম্বন্ধে সচেতন থাকি না। এক একটি বিশেষ দিন সেই জন্যই পালন করিতে হয়—নূতন বৎসরের নূতন দিনটীতে ব্যক্তি হিসাবে ও সমষ্টি হিসাবে আমরা নিজেদের সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিব।

আলোবাতাসময় ভগবানের এই পৃথিবী সুন্দর, সত্যি সুন্দর; ভগবানের তৈরী মানুষগুলিও সুন্দর, কি সুন্দর! আবার দেখি পৃথিবীর রূপ ভীষণ! ঝড়ের তাণ্ডবে প্রলয়ের বিষাণ বাজিয়া উঠে, ভূমিকম্পে মৃত্যুর হাহাকারে আকাশ বিদীর্ণ হয়! হৃদয়-আনন্দকর মানুষ—আবার চোখের পলক ফেলিতেই দেখি সেই মানুষেরই কী কুৎসিৎ রূপ! প্রেমে সে সুন্দর, সমগ্র হইতে যখনই নিজেকে সে আলাদা করিয়া নিল—তখনই তাহার রূপ কুৎসিৎ, তখনই তাহার বেদনা সীমাহীন। চলার পথে যখন আমি একটা পক্ষ, অপরেরা আমার প্রতি পক্ষ—তখনই বিশ্বটা অসুন্দর। সমস্ত ঘটনার, চিন্তার বা বস্তুর পক্ষ বিপক্ষ দুইটিই থাকিবেই। কিন্তু একই জনে পক্ষ বিপক্ষ দুই-ই যখন হইতে পারে, তখন তাহার বাহিরে কিছু থাকে না—তখন সে বিশ্বভুবনময়, বিশ্বভুবন তাহার মধ্যে—তখনই বিশ্ব সুন্দর, মানুষ সুন্দর। কিন্তু আমি একদিকে, আমার দিকে আমার পছন্দমত দুই চারিজন, আর সব আমার বাহিরে—তখনই বিশ্ব অসুন্দর, মানুষ কুৎসিৎ। বুদ্ধিমান মানুষের ভেদ দৃষ্টি সৌন্দর্যের সামগ্রিক রূপকে ভুলিয়া যায়। খণ্ড খণ্ড করিয়া নিজের বুদ্ধি বিবেচনামত ভাগ করিয়া নেয় সে সব কিছুকে। অথচ তাহার মধ্যে আছে সুন্দরকে, সমগ্রকে পাওয়ার আকুতি। ইহা মানুষের জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনা—প্রতি মুহূর্তে সমগ্র হইতে নিজেকে সে আলাদা করিয়া নেয়, তাহার পর সমগ্রকে অর্থাৎ সুন্দরকে পাইল না বলিয়া চীৎকার করিয়া তাহার সমস্ত সত্তা কাঁদিতে থাকে। কিন্তু আলাদা করিয়া নেওয়াটাই যে রোগ—না পাওয়াটা না, এ কথা সে বুঝিতে পারে না। আমরা নূতন বৎসরের এই দিনে এই সাধনা লইব যেন নিজেকে আমরা বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া না লই, যেন আমি আমার দুই চারিজনকে লইয়া আমি না হই—সকলকে লইয়াই যেন আমি আমি হই। তাহা হইলেই বিশ্বের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়া যায়—বিশ্ব ও মানুষ তাহার সমস্ত কুৎসিৎ রূপ লইয়াও আমারই থাকে। বিশ্বের পরতে পরতে সৌন্দর্য আর অসৌন্দর্য মাখামাখি হইয়া আছে—তাহাদের সম্পূর্ণভাবে আলাদা করিয়া ফেলা

কোনদিন কোনমতেই সম্ভব হইবে না। কিন্তু নিজেকে যদি বিচ্ছিন্ন না করি, সমগ্র হইতে আলাদা করিয়া নিজের বুদ্ধিকেই একমাত্র চালক না করি—তাহা হইলেই সুন্দরকে পাইব,—সুন্দর মানুষ সুন্দর বিশ্বকে পাইব। তখনই আনন্দ লাভ করিব। নূতন দিনে অনুষ্ঠান অপরূপ বিশ্বে সুন্দরকে পাওয়ার এই সাধনা আমাদের হউক।

এই নূতন দিনে একটি আনন্দ সংবাদ স্মরণ করি। বর্তমান কালের মানুষের সাধারণ স্বভাব হইতেছে ছোট ছোট ক্লাব, সঙ্ঘ, দল গড়িয়া আধিপত্য করার প্রয়াস পাওয়া। অলিতে গলিতে আনাচে কানাচে এ রকম বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নরনারায়ণ আশ্রম দমদমের উত্তর পূর্ব অঞ্চলে যে স্থানে অবস্থিত—সেখানের একটি নববর্ষ উৎসবের কাগজপত্র ও সংবাদে দেখি তাহারা অনেকটা স্থান একত্র করিয়া নববর্ষ-উৎসব পালন করিতেছে—এবার সপ্তম বৎসর। তাহাদের নাম বাটগাছি-বাগুইআটি-দেশবন্ধু নগর সম্মিলিত নববর্ষ উৎসব। দেখিতেছি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল, পাড়া, ক্লাব, সঙ্ঘ অনেকই ইহার মধ্যে যুক্ত হইয়াছে। নববর্ষের দিন ইহা বড়ই আনন্দ দিল। এই উৎসবের ১৩৭১-এর সম্পাদক শ্রীশান্তিভূষণ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার প্রতিবেদনে লিখিলেন,—'ধীরে ধীরে এতদঞ্চলে ঐক্য প্রয়াসী মানুষের এক মহান শক্তি গড়ে উঠছে। তাই প্রতি বৎসরই এই উৎসব সুন্দর থেকে সুন্দরতর হয়ে অধিক সংখ্যক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলছে।...' আমরা বিশেষ আনন্দের সঙ্গে এই মহৎ প্রচেষ্টার প্রতি আমাদের আন্তরিক সংযোগ সংযুক্ত করিয়া দিতেছি, প্রতি বৎসর ইহা আরও অধিক সংখ্যক ঐক্যপ্রয়াসী মানুষকে একত্র করিয়া তুলুক এই আশা লইয়া ইহার সার্থকতা কামনা করিতেছি।

পিনাকেতে লাগে টংকার—
বসুন্ধরার পঞ্জরতলে কম্পন জাগে শঙ্কার।
আকাশেতে ঘোরে ঘূর্ণী
সৃষ্টির বাঁধ চূর্ণি,
বজ্রভীষণ গর্জনরব প্রলয়ের জয় ডঙ্কার।
স্বর্গ উঠিছে ক্রন্দি
সুরপরিষদ বন্দী,
তিমির গহন দুঃসহ রাতে উঠে শৃঙ্খল ঝংকার
দানবদম্ভ তর্জি'
রুদ্র উঠিল গর্জি,
লণ্ডভণ্ড লুটিল ধূলায় অভ্রভেদী অহংকার॥ —রবীন্দ্রনাথ

শ্রীস্বেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

উদ্বোধন

জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৭ শকাব্দ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ

১৮শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৪৬)

কোন্ সন্ন্যাসী ভারতবর্ষে দিনকা মোহিনী রাতকা যামিনী নারীকে মঠে আশ্রয় দিয়েছেন ?···নিত্যগোপাল, সত্যিই তুমি পরম রূপবান—স্মৃতি-শাস্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার বীর্য তোমার বিগ্রহে—নিত্যগোপাল, তুমি লক্ষ্মীপতি, আবার তুমি কালীকুমার । ঐ মেয়েকে শুম্ভনিশুম্ভ চাইলেন... অহংকার নিয়ে ওঁকে পাওয়া যাবে না··· । মানুষ শেষকালে অন্ন (ব্রীহি) হয়—ব্রীহি হলে সেখান থেকে বের হওয়া কী কষ্ট! উপনিষৎ জানাচ্ছেন—প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এই ব্রীহিত্ব স্বভাব···। ভোগস্পৃহা চলবে না—ভোগ করতে গেলে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে—সে যুদ্ধে তুমি পারবে না। ত্রৈভবনাদিনী কে সে উন্মাদিনী ?···প্রকৃতির দিকে পূজার বুদ্ধিতে তাকাও—সেই জন্যই জল অন্ন মাটি সব কিছুর প্রবর্তন করে গেছেন ঋষিরা। সব কিছুকে সম্মান কর—পূজা কর।····· খং (আকাশ), বায়ু, অগ্নি, সলিল, পৃথিবী ···সকল নদী, সমস্ত সাগর···এই সবই হরির শরীর—যা কিছু রয়েছে—তাকে প্রণাম—অনন্ত হয়ে প্রণাম কর। ভোগ করতে গেলে অনন্ত হতে হবে···। দুই দুইয়ের গুরু···এই বিদ্যার উপাসনা আজ শিখতে হবে···। অন্ন নিবেদন না করে খেতে নেই।—ভোগ করতে গেলেই তা ঘৃণা হবে।···যাকে ভোগ করতে যাবে, তুমি তারই স্বভাব প্রাপ্ত হবে। মা, নিত্যগোপাল-জননী·· বিশ্বের দিকে কাম-নয়নে তাকাব না···আমাদের চক্ষু বিশুদ্ধ করে দাও।···[illegible] যেন ভোগের তাপ বেরোয় না···। ভোগীরা এমন করে চায় তাতে যেন বস্তুর বীর্য শুকিয়ে যায়—কেবল মানুষের নয়—লাউকুমড়ো পর্যন্ত শুকিয়ে যায়···কাম জ্ঞানবিজ্ঞান-নাশন।···নিত্যগোপাল, তোমার স্পর্শ আমায় দিয়েছ, তার যোগ্যতা আমায় দাও। বিদ্যাপতি তুমি—আমার বিদ্যাকে নিংড়িয়ে বিদ্যানন্দন তুমি।···শৃঙ্খলার কি রূপ, লক্ষ্মীর কি রূপ তা তোমাতে পাব।···লক্ষ্মী হলেন ছন্দময়ী।···কালীর রূপ আমায় দাও, শৃঙ্খলার রূপ আমায় দাও। সকল রূপ তোমাতে আছে—তুমি মহানির্বাণের কারণ—তোমার কালীরূপে আমি ডুবে যাব··।···ব্রহ্মগ্রন্থি বিষ্ণুগ্রন্থি রুদ্রগ্রন্থিতে মানুষ আটকে আছে—সে গ্রন্থি তুমি ছেদ কর। বিদ্যা লাভের বাধক ভেদবুদ্ধি··· মা মুক্তকেশী, বাবা নীলকমল তোমরা আমাকে আশীর্বাদ কর···। মা, মা, মা আমার, যেদিন থেকে তুমি বুকে এসেছ, সেদিন থেকে তোমার ঐ বিগ্রহের ছোঁয়ায় আমি ধন্য হয়ে গেছি।···সকল রকম বন্ধন থেকে আমি মুক্তি চাই।···নিত্যগোপাল, তোমার রূপ আমাকে বুঝতে দাও। তোমাকে তো কাউকে চিনিয়ে দিতে পারলাম না, তোমার বিগ্রহ তো আমি কাউকে দিয়ে যেতে পারলাম না—সে বিগ্রহ আমার বুকে জলে জলে আমাকে ছাই করে দিল। নিত্যগোপাল ব্রহ্মগোপাল হরিগোপাল রামগোপাল কৃষ্ণগোপাল গৌরিগোপাল নিত্যগোপাল। তুমি আমি···দুর্গতিনাশিনী দুর্গা···।

বিজয়া রাত্রি। তিনদিন শ্রীশ্রীমাদেবীর অর্চনা হয়

গেল। শ্রীদুর্গা মূর্তিমতী ব্রহ্মবিদ্যা। আমি নিত্যগোপালকে দু ভাবে পেয়েছি। প্রথম যখন তাঁর আশ্রয় পাই, তিনি এক সাধারণ মহাপুরুষ, গুরু। ঐ দুর্গামন্ত্র জপতে জপতে অতীতের বর্ণাশ্রম থেকে মুক্তি পেয়েছি—সাধনার প্রথম স্তর। দ্বিতীয় স্তরে বিশ্বটাকে ভাল লাগতে লাগল। মহালক্ষ্মীর কৃপা লাভ করলাম। তখন নিজের সমস্ত বৃত্তিগুলিকে গুছিয়ে তুলবার জন্য আমার সত্তা আর্তনাদ করতে লাগল।...যে সমাজে আমি লালিত, তার থেকে মুক্তি পেলাম।...মহালক্ষ্মীর কৃপায় কৃপো আমি বিশ্বকল্যাণ সত্তা করি।...তৃতীয় স্তর...মহাসরস্বতীর কৃপা—সেই সময় বেদান্ত এল...। নূতন করে শাস্ত্র লিখেছি, নূতন করে সমস্ত শব্দের অর্থ পেয়েছি—এই তিনটী সাধনার স্তর অতিক্রম করে নিত্যগোপালকে ইষ্ট রূপে পেয়েছি...। আমায় যদি কেউ ভালবাস তবে এই সাধনাই করতে হবে...। আমার দুর্গার বিসর্জন নাই—অনন্তকাল বসে সে বিশ্বরমণী দেবীর আরাধনা করব।... ব্রজগোপীরা দুর্গাপূজা করে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেছিলেন, আমি দুর্গাপূজা করে নিত্যগোপালকে পেয়েছি।...কাল আর বাইরের দৃষ্টিতে পূজা হবে না—কিন্তু প্রতিদিন যেন আমরা পূজা করি।...যতকাল প্রকৃতি আছে, ততকাল শুম্ভ নিশুম্ভ আছে, ততদিন কামবীজ আছে...চিরকাল বসে আমায় রক্ত বলি দিতে হবে...। আমার দুর্গা তো আমাকে নিশ্চিন্ত করেন নি...।...প্রকৃতি বিজয়ের শেষ ফল শ্রীনিত্যগোপাল—ব্রহ্মবিদ্যা সাধনার ফল শ্রীনিত্যগোপাল। ইষ্ট আমার, বলে দিয়ে গেছ 'সঙ্গে সঙ্গে আছি—তুমি কি জাননা তোমার যখন যা প্রয়োজন ভগবান অন্তর্যামীরূপে তা তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছেন'।...আমার জীবনে কোনদিন তোমার বিসর্জন হবে না।...অনন্ত জীবনে অনন্তকাল তোমাকে লইয়া চলিব।...

১৪, ১০, ৪৬। ওঁ...। (শ্রীনিত্যগোপালের আত্মধ্যান পাঠ) শ্রীনিত্যগোপাল আমার মূর্তিমান বিজয়—তিনি বিজয়-মূর্তি—তাঁর অদ্ভুত জীবন—তাঁর জীবন ও দর্শনের মধ্যে বিশ্ব জয় হয়ে গেছে; সেদিন একদিন আসবে, সেদিন ভারত কেন বিশ্ব এ দর্শন গ্রহণ করবে।...আমরা তাঁকে চিনলাম না—ধর্মন-ক্ষেত্র, রাজনীতি-ক্ষেত্র এক করে যিনি এসেছেন তাঁকে আমরা চিনলাম না।...তিনি বলেছেন, 'এক ব্যক্তি হীরক পাইয়াছে',...তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিয়া লও, তবে তো তাঁকে বুঝবে।...শিশু হীরক দিয়া মোয়া কিনিবে। যে চেনে সে লক্ষ টাকা পাইবে। ছদ্মবেশী ভগবান পাইয়াছ সন্দেহ করিও না।... যে পাওয়ার জন্য মানুষ লক্ষ বৎসর তপস্যা করছে, তাঁকে বিনা সাধনায় পেয়েছ।...পুরুষোত্তমানন্দ তাঁকে চেনাবার জন্য প্রাণপণ করে গেলেন।...সংসারের সুবিধা নিত্যগোপালকে পাওয়ার পর হইয়াছে, কিন্তু নিত্যগোপালকে দিয়ে এতটুকু কাজ করাবার জন্য তিনি আসেন নি।... আমি মানুষ ভাবলাম,...শত লাঞ্ছনা পেয়েও বলে গেলাম —তবু কাউকে চেনাতে পারলাম না—এত সহজ করে বাংলা করে সমস্ত তোমাদের দিলাম—তবু তোমরা চিনলে না। ভক্তিযোগ দর্শনে নিত্যগোপাল বলছেন,— শ্রীভগবানের সহিত অদ্বৈততাবোধ না হইলে ভক্তি হয় না।...তোমার মনের খেলা চালাইয়া তো আমাকে বুঝিবে না। শরণাগতের লক্ষণ ১] আনুকূল্যস্য গ্রহণম্, ২] প্রাতিকূল্যস্যবিবর্জ্জনম্, ৩] রক্ষিষ্যতি ইতি বিশ্বাসঃ, ৪] গোপ্তৃত্বে বরণং, ৫].. কার্পণ্যং ৬] তৎক্রিয়াসু আত্মনিক্ষেপঃ। ছদ্মবেশী ভগবান পাইয়াছ, এ তিনি আশ্রিতকেও বলেছেন, বিশ্বকেও বলেছেন।...কাঁথা মুড়ি দিয়ে এসেছিলেন...আমি যদি সে কাঁথা ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি?...পুরুষোত্তমানন্দের ধর্মার্থকামমোক্ষ কিছু নেই—কেবল আছে নিত্যগোপালকে বিশ্বের নিকট পরিচিত করে দেওয়া।...সাধারণ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ আমি তুচ্ছ করি, বিশ্বের ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ আমি বিশ্বের কাছে প্রচার করব। পারলাম না তোমাদের মনের খেলা বন্ধ করতে...তবু আমার শেষ দিন পর্যন্ত চেষ্টা করে যাব...। বিজয়ায় নমঃ—ধ্বজবৈজয়ন্তীপ্রযুক্তা বৃষভজতুরঙ্গা রক্ষিণে ...দিব্যশ্রীপূর্ণকুম্ভা বিজয়ৃপগণিকাপুষ্পমালাপতাকা দধিমধু-গুরুকং কাঞ্চনং শুক্লবাসঃ...। আজ নবীন যাত্রা কর—বিশ্ববিজয়ের যাত্রা করতে ঐ যে সকল জিনিষ লাগে বলে

বড়কে প্রাণ খুলে স্বীকার করে প্রণাম জানিয়ে যারা যাত্রা করে, তাদের যাত্রা সফল হয়।···নিত্যগোপালের নাম ও বই সাধারণ্যে যেটুকু বের করেছি আর গ্রন্থানিত্রয়ের ভাষ্য লিখেছি—এই আমার বিজয়।···

পুরুষোত্তমানন্দের প্রার্থনা···, যারা একদিন এসেছিলেন আজ তাদের ডাকি—আমি রিক্ত ছিলাম না। আমি সাতরাজার ধন বিশ্বের মানিক পেয়েছিলাম—তোমাদের দিতে চেয়েছিলাম—কত পাঠক কত শ্রোতা ছিলেন—রক্তের সম্পর্কে, ভাবের সম্পর্কে—সকলকে আমি নাম করে করে ডাকি—শিশির ব্যানার্জী—সত্যেন শাস্ত্রী—সুধা—সবাইকে আমার চারপাশে দেখি।...ছদ্মবেশী ভগবান পাইনাই—তোমার এ কথা বার বার স্মরণ করি। তোমাকে প্রকাশিত করার এ বাসনা আবার কেনযে কি না জানি না।···কাউকে আশীর্বাদ করতাম না। আমি জানি আমি শূন্য···তোমরা যদি আমায় রাজা করে রাখতে, আমাকে যদি জয়ী করে রাখতে, যদি বিশ্বাস করতে পুরুষোত্তমানন্দ ভুল করেন না, তবে তোমরাও জয়ী হতে, আমিও জয়ী হতাম···আমার কথা নিয়ে কচলাতে না যদি তাহলে তোমাদের মঙ্গল হতো। নিত্যগোপাল করুন তোমরা জয়ী হও, আমিও।·· নিত্যগোপাল ছাড়া কেশাগ্র থেকে নখাগ্র পর্যন্ত আমার কিছুই নেই—নিত্যগোপালকে ভাল না বাসলে আমি কেন এখানে থাকব, কেন যাব—চলে যেতে ইচ্ছা করে···তোমাদেরও যেন সে দুর্ভাগ্য না আসে, আমারও যেন না আসে···। ধরার ধূলি স্বর্গধূলি হতো যদি নিত্যগোপালকে চিনতে পারতে···। এই বিজয়ার দিনে এই আমার সংকল্প।···সিংহের বাচ্চা সিংহ হও, সিংহী হও—প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা সিংহ আছে।···

১৩, ১৩, ৫৬। ওঁ নমঃ···, শ্রীনিত্যগোপাল নিজ পরিচয় নিজে দিয়ে গেছেন। তার ভিতরে নিত্যগোপাল জ্ঞানানন্দ সব উল্লেখ থাকায় ওটা যে নিজের সম্বন্ধেই লেখা এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। যদি তিনি ভগবান হন, তবে সাধনা একরকম, আর তিনি যদি শুধু মহাপুরুষ হন, তবে সাধনার ধারা অন্যরকম।···ব্রহ্ম সনাতন তিনি বাস্তব। যেখানে ব্রহ্ম নিজে অবতীর্ণ সেখানে তাঁর মারফত আর কাউকে পাওয়া নয়—তাঁকেই পাওয়া। এখানে গুরু ইষ্ট এক।···এতে সাধনার সুবিধা হয়েছে এই আমাদের কাজ শুধু তাঁর ইচ্ছাকে পূরণ করা। দুর্গা-ঠাকুরের যে যে-রকম কল্পনা করছে, সে সেই রকমই তৈরী করতে পারে—কিন্তু নিত্যগোপালের তো ফটো তোলা হয়েছে, তাঁকে তাঁর মত করেই ভাবতে হবে···। এখানে পাওয়ার পরে সাধনা—কেবল তাঁর ইচ্ছার মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া।···আমার সম্বন্ধে তুমি তোমার মন-গড়া কল্পনা করতে পার—কিন্তু তা তো আমি মানব না।···নিত্য-গোপাল আদি পুরুষ, ঐতিহাসিক পুরুষ—তাঁর অহংকার আছে, মন আছে, বুদ্ধি আছে।···আকাশের ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা যায় সহজেই যে তাঁর ইচ্ছায় চলছি, এতে কোন বাধা নেই, কেননা পরীক্ষা হয় নাই।···কিন্তু জীবন্ত মানুষের ইচ্ছায় চলতে পারা সহজ হয় না—কেননা নিজের ইচ্ছাকে সেখানে সেই ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয়, সেখানে পরীক্ষা দিতে হয়।···কর্ম সবাই করে, কিন্তু সেবা করে কজন?···তোমার খেয়ালমত সেবা করতে আকাশে ভগবানকে পার, কিন্তু জীবন্ত মানুষকে সেবা করতে সে মানুষটীকে জানতে হয়—তিনি কি ভালবাসেন, না বাসে না জানলে তাঁর সেবা করব কেমন করে?···নিত্যগোপা বার বার বলেছেন, অদ্বৈত না হলে ভক্তি হয় না···

ক্রমশঃ

ভাগবত সাধনা

॥ শ্রীপ্রতিভা রায় ॥

ভাগবত সভ্যতায় সাধনা পুরুষ-প্রকৃতির, ব্রহ্ম-মায়ার মিলনের স্তর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাই এই সাধনায় আগে পাওয়ার কথা রহিয়াছে। আগে শ্রদ্ধেয়, পরে শ্রোতব্য মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য—ইহাই শ্রুতির মত। আর বর্ণাশ্রমের সাধনায় আরম্ভই পুরুষ প্রকৃতিকে পৃথক করিয়া না পাওয়া হইতে। বিচ্ছিন্ন আমি হইতে সাধনা আরম্ভ হইলে যে তাহার সাধনায় তাহার বিচ্ছিন্ন আমিরই পরিপুষ্টি হইবে, সে কথা তাহারা জানিতে পারে নাই, তাই এত ফ্যাসাদের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাগবত সভ্যতায় ইহারই সমাধান দিবার জন্য আগে পাওয়া পরে সাধনার কথা বলিয়াছে। আগে অর্জুন সখারূপে, প্রাণ-বন্ধুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন। আগে সখা রূপে পাইয়া সখার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া ক্রমে তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া ভাগবত জীবন লাভ করিয়া, ভাগবত কর্ম করিয়াছিলেন, তাই তিনি ভাগবত জয় বর্মের পথ-প্রদর্শকরূপে আমাদের সামনে প্রতীয়মান হইয়া আছেন।

আমাদের জীবনের সাধনা আরম্ভ করিতে হইবে সেই সমগ্রের স্তর হইতে, যে পুরুষ এই বিশ্বের বুকে দাঁড়াইয়া বলিয়াছেন সমগ্রং মাং—আমিই সমগ্র, অর্জুন, আমাকে তোমার সমস্ত সমর্পণ কর, আমাতে তোমার বুদ্ধি লয় করিয়া, আমার বুদ্ধিতে বুদ্ধিমান করিয়া, আমার জীবনে জীবন লাভ করিয়া এই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অবতরণ কর। শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ হইতে পলাইয়া, সংসারের সকল ঝঞ্ঝাট এড়াইয়া, প্রকৃতির সকল দাবী অস্বীকার করিয়া জীবন লাভ করিবার কথা বলিতে আসিয়াছিলেন না, তাঁহার বজ্রনির্ঘোষ বাণী 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'; আমার মুখের পানে তাকাইয়া সকল ক্লীবত্ব ঝাড়িয়া ফেলিয়া গাণ্ডীব হস্তে যুদ্ধের বুকে দাঁড়াও। তুমি কি অর্জুন, তোমার রথের সারথিরূপে তোমার সখা আমি বর্তমান।

বর্ণাশ্রমবাদীদের মত সকল ঝঞ্ঝাট এড়াইয়া সকল ঝঞ্ঝাটকে অস্বীকার করিয়া ঘরের কোণে বা বনে যাইয়া সাধনার কথা ভাগবত ধর্ম বলেন নাই। ঝঞ্ঝাট এড়াইয়া কোথায় পালাইবে? ভাগবত তাই দেখাইতেছেন সকল কুণ্ঠাহীন, সকল ঝঞ্ঝাটহীন বৈকুণ্ঠের ঝগড়া। বৈকুণ্ঠের দ্বারের দ্বারপাল জয় বিজয়। সেখানেও স্বাধিকার প্রমত্ততা! তাই তো মাটির জগতের সাধক সনক-সনন্দ আদি যে দিন বৈকুণ্ঠেশ্বরের দর্শন আশায় বৈকুণ্ঠের দ্বারে যাইয়া হাজির হইয়াছিলেন, সেই দিন জয় বিজয় তাঁহাদিগকে দ্বার ছাড়িয়া দিতে রাজী হন নাই। এই দ্বার ছাড়িয়া দিতে রাজী না হওয়ার ফলে যে ঝঞ্ঝাট, যে অভিসম্পাত সেখানে নামিয়া আসিল তাহার জন্য জয় বিজয়কে তাহাদের প্রিয়তম ভগবানের সহিত বৈরীভাব লইয়া তিনবার এই ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বৈকুণ্ঠে থাকিয়াও তো জয় বিজয় ঝঞ্ঝাট এড়াইতে পারিল না। ভারতবর্ষ দীর্ঘ দিন ঝঞ্ঝাট এড়ানোর সাধনা করিয়া আজ অধিকতর ঝঞ্ঝাটের ভিতর পতিত হইয়াছে। ঝঞ্ঝাট এড়ানো যায় না, ঝঞ্ঝাটকে হজম করিয়া রস রূপে সেবারূপে আস্বাদন করিতে হয়। তাই শ্রীভগবান যুদ্ধের বুকে দাঁড়াইয়া অর্জুনকে সাধনার শিক্ষা দিতেছেন। কুরুক্ষেত্রের সেই আদর্শকে সেই বাণীকে রূপ দিয়া আমাদের গড়িয়া তুলিতে হইবে বর্তমান যুগ-সভ্যতা।

জীব ভগবানকে পাইয়াই আছে, তাঁহাকে পাইতে হইবে না। পাই নাই পাইব ইহা বর্ণাশ্রমের শিক্ষা। এই বর্ণাশ্রমের শিক্ষায় তাহার জীবনে যে ভুল প্রবেশ করিয়াছে সেই ভুল ভাঙার সাধনার নামই ভাগবত সাধনা। ভাগবত ধর্মে অন্য কোন সাধনা নাই। গীতায় আছে 'নিত্যযুক্তা উপাসতে'—জীব ভগবানের সহিত নিত্য যুক্তই রহিয়াছে, এখন মাত্র উপাসনার ক্ষেত্রে, আমাদের অহঙ্কারের ক্ষেত্রে তাঁহাকে অবতরণ করাইতে হইবে।

ভাগবত ধর্ম্মে সাধনা হইতেছে তখন। ভগবৎ ভাবাপন্ন ব্যক্তির সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহারই নির্দ্দেশ মত তাঁহারই জীবনের অনুবর্ত্তন করিয়া চলাই গুরুকরণ। স্ত্রীলোক যেমন স্বামীর সেবার দ্বারা, পুত্র যেমন পিতার সেবা দ্বারা, স্বামী ও পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, শিষ্যও সেইরূপ গুরুর সেবা রূপ ভজনা দ্বারা গুরুর নিকট হইতে ভগবদ্ভক্তি জ্ঞান ও ভগবৎ জীবন প্রাপ্ত হয়। গুরু অবশ্য হইবেন ব্রহ্মে অবগাহিত ও শাস্ত্রজ্ঞ। গুরুর জীবন যদি ব্রহ্ম-জীবনে অবগাহিত না থাকে তবে শিষ্যের সাধনা হইবে কাল্পনিক, বস্তুতন্ত্র হইবে না। না পাওয়ার দুঃখ কাটে আর এক জনের পাওয়াকে নিজের পাওয়া মনে করায়। যেমন স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থ স্ত্রী নিজের মনে করে। পাওয়া তো হইয়াই আছে, এখন সকল দেহ-মন-প্রাণ দিয়া তাঁহাকে আস্বাদন করা—ইহাই লীলাবাদ। ভগবানকে বাদ দিয়া আমরা যখন সংসার করি তখনই মায়া ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে আমাদের সামনে প্রতিভাত হইয়া উঠে, আবার ভগবানের সহিত যখন যুক্ত হইয়া আমরা সংসার করি তখন সেই মায়া হন যোগমায়া। শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াই এই মাটির জগতের বুকে পেন নিত্য বৃন্দাবন, বৃন্দাবনের লীলা তাই নিত্য লীলা। আজ সকল আবেষ্টনের ভিতর দিয়া এই নিত্য বৃন্দাবনের তত্ত্বই মানুষের হৃদয় দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ভাগবত ধর্ম্মের যুগে বর্ণাশ্রমের সাধনা আর কার্য্যকরী হইতেছে না, হইবেও না। মানুষের সাধনার গর্ব্ব ত্যাগ করিতে হইবে। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী বাজিতেছে—যে আমার জীবনের কাছে যেভাবে প্রপন্ন হয়, আমার জীবন তাহাকে সেই ভাবেই ভজনা করে। আজ বিশ্বের ঈশ্বর এবং বিশ্বের শাস্ত্র ভজনার কলগানে ভরপুর। সে গান বলিতেছে—আমি ভজনা করি। বিশ্বের পরতে পরতে, প্রতি স্পন্দনে গান ফুটিয়া উঠিতেছে—আমি ভজনা করি। জীবন দিয়া, জীবন-শাস্ত্রের গান গাহিয়াই শ্রীকৃষ্ণ জীবনবল্লভ। প্রচলিত বর্ণাশ্রমের সাধনা ছিল জীবনের বাহিরে—জপতপ ধ্যান ধারণার ভিতর। জীবন সেখানে পড়িয়া গিয়াছে বাদ। ভাগবত ধর্ম্মের সাধনা সহজ সরল জীবনে ছন্দ রাখিয়া চলায়। জীবন বাদ দিয়া যে সাধনা তাহা কিছু দিন চলে বটে তারপর আসে অবসাদ, ব্যর্থতা। 'আমি'কে নির্ভর করিয়া যে সাধনায় ভজনা হওয়া, তাহার পরিণতিও না পাওয়াতেই পর্য্যবসিত হয়। ঘাড়ে শুধু অহংএর আমির। হিরণ্যকশিপু, রাবণ আদি ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কত কঠোর সাধনাই না তাঁহারা করিয়াছিল কিন্তু ভগবান্ তাহাদের অহংএর আমি হইতে, তাই সে সাধনার ফল অহঙ্কার, যাহার ফলে তাহাদের অসুর শক্তিই বাড়িয়াছিল। ভাগবত তাই বলিয়াছেন—

বিদ্যা তপঃ প্রাণ নিরোধ মৈত্রী—
তীর্থাভিষেক ব্রত দান জপৈঃ।
নাত্যন্ত শুদ্ধিং লভতে অন্তরাত্মা
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে॥

ভগবানকে বাদ দিয়া যত কিছুই কর না কেন, আত্মশুদ্ধি লাভ করিয়া দুর্লভ প্রেম ভক্তি লাভ করিতে পারিবে না। 'মামেকং শরণং ব্রজ'—এই পথের অনুসরণ ব্যতীত শরণাগতি ব্যতীত নান্যঃ পন্থাঃ—আর কোন পথ নাই একমাত্র তাঁহার চরণে শরণাগতিই হইতেছে তাঁহাকে পাইবার পথ। জীবের এ অহঙ্কার উচিত নয় যে, সে সাধনার বলে ভগবানকে পাইবে। কোন্ সাধনা করিয়াছিল ব্রজের পশু পাখী, কোন্ সাধনা করিয়াছিল বনের বনিয়? তাহারাও তো তাঁহাকে পাইয়াছিল। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের পথেই ভক্তি আসিয়া ভক্ত ভগবানের ভিতর গাঢ় একাত্ম সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেন ভগবানের করুণা অহৈতুকী। আমাদিগকে পাওয়ার জন্য তিনি যে ব্যাকুল। তাঁহার এই করুণার নিদর্শনই তো অহল্যা, শবরী, গুহক, হনুমান, সুগ্রীব, বিভীষণ কুব্জা, পূতনা, বিদুর, অজামিল, বিল্বমঙ্গল আদি। তাঁহার অহৈতুকী এই করুণার ভিতর দিয়া তিনি এই কথাই জানাইতেছেন—জীব সাধনার দ্বারা আমাকে পায় না, পায় বেদনার ভিতর দিয়া, আমি বেদনার মূর্ত্তবিগ্রহ, আমিই বেদ। বর্ণাশ্রমের সাধনায় আমরা সকল ক্ষেত্রে সকলকে ছাড়ার ধাক্কায় ধাক্কায় আজ দুর্ব্বল। তাই দুর্ব্বলের

দেবতা, পতিতের দেবতা, করুণার শাস্ত্র লইয়া ধরায় অবতীর্ণ, নতুবা কলিযুগের দুর্ব্বল জীবের কি সাধ্য ছিল বর্ণাশ্রমের কঠোর শাসন মানিয়া চলে? আজ সকল মানামানির ভিত্তি ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। ভাগবত ধর্ম্মের করুণার প্লাবন নামিয়া আসিতেছে। যখন বাংলার রাজা সুবুদ্ধি রায়ের রাজ্য ও সিংহাসন হস্তগত করিয়া তাঁহার কর্ম্মচারী হোসেন শা রাজসাহ হুন এবং জল পান করাইয়া তাঁহার জাত মারিয়া দেন, তখন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মিথিলা, কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দেন সুবুদ্ধি রায়ের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে তুষানলে জীবন দান করিয়া। সুবুদ্ধি রায় কাশী গিয়া পণ্ডিতগণের নিকট ব্যবস্থা চাহিলেন; তাঁহারাও প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থারই অনুমোদন করিলেন। 'তেঁহ কহে তপ্ত ঘৃত খাইয়া মর প্রাণে।' আর করুণার বিগ্রহ মহাপ্রভু সেই কথা শুনিয়া বলিলেন—'প্রভু কহে ইহা হইতে যাহ বৃন্দাবন। নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন॥ এক নাম আভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে। অন্য নাম হইতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে॥' বর্ণাশ্রমের বিধানে যে পাপের শাস্তি তুষানলে প্রাণত্যাগ, ভাগবত ধর্ম্মে সেই অপরাধের শাস্তি নিরন্তর কৃষ্ণনাম করা, সে নামের মহিমা এতই যে, একবার নাম লইলে সকল পাপ কাটিয়া যাইবে, দ্বিতীয় বার নাম লইলে কৃষ্ণ চরণ লাভ হইবে। আগে পাওয়া, অর্পণ করা, পরে সাধনা—এই সহজ জীবনের সহজ সাধনা লইয়াই ভাগবত ধর্ম্মের অবতরণ। গৌতমের অভিশাপে অহল্যা পাষাণী বর্ণাশ্রমের বিধানে, কিন্তু ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে সে মুক্ত, প্রাণময়ীরূপা।

বর্ণাশ্রম বিধানে মানুষ আজ পাষাণ হইয়া গিয়াছে। পাষাণের বুকে প্রাণ-ধর্ম্মের প্লাবন নামিয়া আসিতেছে। প্রাণের নিকট উচ্চ নীচ, গুণ কর্ম্মের ভেদ-দৃষ্টি নাই। প্রাণই সকলের মিলন ক্ষেত্র। প্রাণের দেবতা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার চরণে নিবেদিত যে প্রাণ, সেই প্রাণের ভিত্তিতে গড়িবে বর্ত্তমান যুগের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্যই সমন্বয় মূর্ত্তি শ্রীনিতাগোপাল নূতন দর্শন লইয়া ধরার বুকে অবতীর্ণ। চলার পথে, অবাধ গতির পথে যে সংযম, তাহারই দর্শন-শাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে নরনারায়ণ আশ্রম হইতে। জীবনের সমস্ত স্তরে সমগ্রের যে ব্যাপক রূপ তাহাই রহিয়াছে এই গ্রন্থগুলির প্রতি ছত্রে। আমাদের বাঁচিতে হইলে, এই বিশ্বধারের ভিতর পথ চিনিয়া লইতে হইলে প্রয়োজন এই পুরুষোত্তম দর্শনশাস্ত্রগুলি জীবন দিয়া অনুসরণ করিয়া সেই পন্থানুসরণ করা। জীবনের উপরই গড়ে দেশ-জাতি সমাজ-রাষ্ট্র। বর্ত্তমান যুগ সমস্যার সমাধান দিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চাই জীবন-গঠন। নরনারায়ণ আশ্রমের প্রকাশিত দর্শনই জীবন-বেদ।

সান্নিধ্য

॥ শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ॥

১৯৪৯ সালের একটি ঘটনা। আমি সে সময় লেক-মার্কেটের কাছে ভাড়া বোডে ছিলাম। গরমের জন্যে সারারাত ছটফট করে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সূর্য ওঠবার বেশ কিছুক্ষণ আগে তখনও ভালো করে আলো ফুটে ওঠেনি; ঠিক সেই প্রত্যূষের মুহূর্তে আমার দরজায় কার করাঘাত বেজে উঠলো। দরজা খুলে সেদিন বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে গিয়েছিলাম।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে যিনি বলেছিলেন স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ।

ঘরে এসে চেয়ারে বসলেন স্বামীজি। বললেন, সারারাত ঘুমোতে পারিনি সন্তোষ। সকাল হ'তে না হতেই তোমার কাছে ছুটে এসেছি। আমার মন

অস্থির হ'য়ে রয়েছে। এর একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

স্বামীজি তাঁর হাতের 'দেশ' পত্রিকাটি খুলে ধরলেন। বললেন—পড়ো প্রবন্ধটা।

শরৎচন্দ্রের ওপর লেখা একটি প্রবন্ধ। লেখকের নাম সম্পূর্ণ অপরিচিত। তার আগে বা পরে আর কখনও সেই লেখকের কোন রচনা পড়েছি ব'লে মনে পড়ছে না। প্রবন্ধটিতে লেখক তাঁর বিশ্লেষণী মনের কোন পরিচয়ই দেননি; এমনকি কোন রকম যুক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনও বোধ করেননি। মোটা প্রবন্ধটিকে একতরফা গালি-গালাজের সমাবেশ বললে একটু ভুল বলা হয়না। লেখকের বক্তব্য হচ্ছে শরৎচন্দ্র অতি অশ্লীল প্রকৃতির লেখক। তাঁর 'শেষপ্রশ্ন' একটি কুৎসিৎ বই—যা বাঙালী সমাজের চরিত্র ধ্বংস ক'রে দেবে। ইত্যাদি ইত্যাদি। বস্তুতঃ 'দেশ' পত্রিকায় এমন বদখৎ একটি রচনা প্রকাশিত হ'তে পারে—এটা প্রবন্ধটি না পড়লে বিশ্বাস করতাম না।

স্বামীজি উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—প্রতিবাদ দেখ, সন্তোষ। একটি নির্বোধ পণ্ডিতমন্য লোক এসে 'শেষপ্রশ্ন' আর শরৎচন্দ্রের এইভাবে নিন্দে করে যাবে—এ আমার সহ্যের বাইরে। এ'র প্রতিবাদ করতেই হ'বে।

স্বামীজি বলতে লাগলেন—শরৎচন্দ্র এই বইটির মধ্যে তাঁর দার্শনিক অনুভূতিকে প্রয়োগ করেছিলেন। বুদ্ধের 'ক্ষণিকবাদ' যে তাঁকে আকৃষ্ট করেছে তারই প্রমাণ 'শেষপ্রশ্ন'। আশুবাবু হচ্ছে সমাজের স্থিতিশীল মানসের সনাতন রূপ। আর কমল-চরিত্র নিয়ে এসেছে 'গতিবাদে'র শক্তিকে। এই ঝুনো চলৎশক্তিহীন সমাজটাকে নাড়া দিয়ে নতুন ক'রে জাগানোর জন্যেই ত' 'কমল' আর 'শিবনাথ' এর সৃষ্টি।

আলো সন্তোষ, স্বামীজি বলে চললেন—জীবন হ'চ্ছে স্থিতি ও গতির সমন্বয়। উপনিষদ্ একদিন গতিবাদেই দীক্ষা দিয়েছিল এদেশের মানুষকে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেছিলেন—চরৈবেতি চরৈবেতি।

কিন্তু বৈদিক ভারত চলার ধর্মকে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই মিথ্যা অনুষ্ঠান আর আচারের মরুবালুতে বাঁধা পড়েছিল তার ঈশ্বরের চিন্তা। তার সমাজজীবনে এসে প্রবেশ করেছিল স্থূলমূঢ়তা ও নিষ্ক্রিয়তা। মায়াবাদের ধোঁয়ায় জগৎকে উড়িয়ে দিয়ে উটপাখীর মত বালিতে মুখ গুঁজে মানুষ মুক্তির সন্ধানে রত হ'য়েছিল। কিন্তু ভারতকে সেই কর্মহীন আত্মকেন্দ্রিকতার মোহ থেকে জাগাবার জন্যেই জন্ম নিয়েছিলেন মহাবিপ্লবী বুদ্ধ। উপনিষদের মানসপুত্র রবীন্দ্রনাথও যাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বললেন—'ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড় করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগ যজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছেন'। বস্তুতঃ রবীন্দ্র-চিন্তাতেও বুদ্ধ ও তাঁর 'ক্ষণ'-দর্শন একটি বড় স্থান অধিকার করে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন যে, কোন একটি সত্তাই পূর্ণ সত্তা হতে পারেনা। স্থিতিও যেমন সত্তা, গতিও তেমনি। তাই অনন্তকাল ও ক্ষণ বা মুহূর্ত পরস্পরকে আশ্রয় করে সত্তাকে পূর্ণতর করে প্রকাশ করেছে। এ অনুভূতি রবীন্দ্রনাথে ছিল বলেই তিনি লিখেছিলেন—

এই ধূলি এও সত্য হায়।
এই তৃণ
বিশ্বের চরণতলে লীন,
এরা যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবি।

রবীন্দ্রনাথ জীবনকে এই সমন্বয়ের ধারণা দিয়েই বিচার করেছেন। তাঁর ধর্ম-চিন্তা ও ঈশ্বর-চেতনার মূলেও রয়েছে এই ধারণা।

'বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি খুঁজিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।'

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' একটি উপন্যাস—যার মধ্যে তিনি এই দার্শনিক তত্ত্বকেই ব্যাখ্যা করেছেন। আর একটি উপন্যাস শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন'।...

স্বামীজিকে সেদিন যেমন উত্তেজিত দেখেছিলাম এমনটি আর কোনদিন দেখিনি। বস্তুতঃ এই চিন্তাধারাকে বোঝাবার জন্যই তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। চিন্তার মধ্যে কোন গোঁড়ামি ছিলনা বলেই তিনি 'চলার দর্শন'কে গ্রহণ করতে বলেছেন

বাঁচবার একমাত্র উপায় হিসাবে। এই চলার দর্শন তাঁর ছিল বলেই চিন্তার গোলামীকে তিনি ঘৃণা করতেন। তাই জাতিকে এই নতুন জীবনে নতুন ভাবে উদ্বুদ্ধ হতে তিনি ডাক দিলেন।

আমরা অপেক্ষা করে আছি—যেদিন স্বামীজির এই ভাবনায় সমগ্র জাতি জাগিত হ'বে—সেদিনের জন্য।

ভয়ের পরিবর্তে প্রেম

॥ শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বক্সী ॥

"ফাঁকি আর দুর্নীতি দিন দিন বেড়েই চলছে। পুলিশী ব্যবস্থার তো ত্রুটি নাই—শিক্ষা দীক্ষাও তো বাড়ছে বই কমছে না। তাহলে এই দুর্গতি রোধ হবার আর উপায় কই? এই অধঃপতন কেন? এর কি কোন কিনারা নাই?" উপরোক্ত প্রশ্নটি আজ অধিকাংশ লোকের মনে আসে। সবাই নিজের মনের মত একটা উত্তরও বের করেন—কিন্তু কেউ নিজেই নিজের উত্তরে তুষ্ট হ'তে পারেন না। কেউ দোষ দেন নেতাদের আদর্শের—কেউ দেন রাষ্ট্র ব্যবস্থার কেউ বা অস্পষ্ট যুগধর্মের দোহাই দেন। কিন্তু বিচার করে দেখলে দেখা যাবে ইতিহাসের নেতাদের আচরণ বর্তমানের নেতাদের চেয়ে খুব কিছু নিখুঁত ছিল না—আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিচয়ও অতীত ইতিহাস ঢুঁড়ে পাওয়া শক্ত। কিন্তু সব যুগেই কিছু কিছু ফাঁকি দুর্নীতি থাকলেও সাধারণ লোক মোটামুটি ভাবে সদাচরণেই অভ্যস্ত ছিল। একটা সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় তারা অসদাচরণ হতে প্রতিনিবৃত্ত হোত। সেই নিয়ন্ত্রণটি হচ্ছে ভয়। সমাজ ও রাষ্ট্রকে লোকে এখনো যতটুকু ভয় করে তখনো করতো। কিন্তু সেই ভয়ই নিয়ন্ত্রণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তারা ভয় করতো অদৃষ্ট কোনও বিধানকে—যে বিধান অনুসারে পুলিশ ও সমাজের চোখ ফাঁকি দিয়েও অন্যায়ের কুফল হ'তে রেহাই মেলে না। এই ভয়কেই বলা হয় ধর্মভয়।

আমরা যে কাজে সুফল প্রত্যাশা করি—তাকেই বলি ভাল কাজ, আর যে কাজে মন্দ ফল প্রত্যাশা করি তাকেই বলি মন্দ কাজ। সুতরাং ভাল কাজে সুফল ও মন্দ কাজে দুঃখজনক ফল ফলবেই। কিন্তু দুষ্কর্মের কুফল যে দুষ্কৃতিকারীকেই সব সময় ভোগ করতে হয় তা নয়—অনেক সময় সে কৌশল করে তার খারাপ কাজটির কুফল অন্য জনের ঘাড়ে চাপাতে পারে—অর্থাৎ দুষ্কর্মের কুফল হতে অব্যাহতি পেতে পারে। তেমনি সে কৌশল করে অন্যজনের সৎকার্যের ফলটি আত্মসাৎ করতে পারে। এ রকমটা সম্ভব হয় বলেই আমরা সুকর্মে প্রেরণা পাইনা আর দুষ্কর্ম হতে নিবৃত্ত হই না। ধর্ম বিশ্বাস আমাদিকে এই বিশ্বাস দিয়েছেন যে আপাততঃ বিচারে কর্ম ও তার ফলভোগের বৈষম্যযুক্ত দেখা গেলেও কোন এক অলক্ষ্য বিধানে তার সংশোধন হবেই—কেউ নিজ নিজ কর্মফল এড়াতে পারবে না। যারা ঈশ্বর-বিশ্বাসী, তাঁদের অনেকে অনুশোচনাদ্বারা ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রত্যাশা করতেন অবশ্য। বুদ্ধদেব ছিলেন নাস্তিক। তাই তিনি কর্মফলবাদকে আরো বেশী আঁকড়ে ধরতে বাধ্য হয়েছিলেন। কর্মফল ভোগ করার জন্যই তাঁকে জন্মান্তরবাদী হতে হয়েছিল—যদিও তিনি আত্মা বলেও কিছু মেনে নেন নাই। নিজের সুকৃতি দুষ্কৃতির দায়ে দায়িত্ব নিজেকেই ভোগ করতে হবে এই বিশ্বাসই ধর্মভয়। এর ফলেই সাধারণ লোক অসদাচরণ হতে প্রতিনিবৃত্ত হোত। অবশ্য ভাল কাজ আর মন্দ কাজে নির্ধারণের মাপকাঠি নির্ভুল ছিল বলা যায় না। তাহলে দাসপ্রথা, বর্ণবিভেদ-প্রথা ধর্ম [illegible]

চলতোনা। তবু সহজ বিচারেই যেগুলো অন্যায় সেগুলো হতে লোকে সহজেই প্রতিনিবৃত্ত হোত। এখন লোকের ধর্মভয় কমেছে ও দিন দিন কমছে। কেন কমছে? আবার কি ধর্মভয় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে?

না, তা হবে না। কারণ ঐরূপ ধর্মভয় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। শিশুকে ভূতের ভয় দেখিয়ে অনেক অন্যায় হতে নিবৃত্ত করা যায়। কিন্তু শিশু বড় হয়ে যখন ভূতের অস্তিত্ব বুঝে ফেলে, তখন তাকে আর ভূতের ভয় দেখিয়ে লাভ হয় না। মানুষেরও আজ শৈশব কেটেছে। তাকে ঐরকম অলীক ভূতের ভয় দেখিয়ে আর লাভ হবে না। কার্য্য কারণ সম্বন্ধবাদ সত্য হলেও প্রতি মানুষকেই যে তার কৃত কর্মের ফল ভোগ করতে হবে এমন বিধান আমরা কার্য্যকর হতে দেখিনা—এবং জন্মান্তরবাদ আমদানী করেও সে বিধানের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। কেন যায়না তা একটু আলোচনা করা যাক।

ঈশ্বর-বিশ্বাসী হলে ধরে নিতে হয় যে ঈশ্বর সকল মানুষের মধ্যে রয়েছেন। সুতরাং বাইরের বিচারে আমাদের পৃথক পৃথক সত্তা থাকলেও প্রকৃত প্রস্তাবে সব মানুষই এক। তাহলে আমার কর্মের ফল যে আমাকেই ভোগ করতে হবে তার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? মানুষ হাত পা কাটিয়ে খাদ্য আহরণ করে মুখ দিয়ে খায়—এতে কি তার হাত পায়ের উপর অবিচারের প্রশ্ন উঠে? তেমনি সব মানুষই যখন ঈশ্বরেরই অংশ তখন প্রত্যেক মানুষকে তার নিজ কর্মফল ভোগ করতে হবে এমন ঐশ্বরিক বিধানের প্রয়োজন কই?

ঈশ্বর-বিশ্বাসের সঙ্গে জন্মান্তরবাদ ও জন্মান্তরে পূর্ব্ব জন্মের ফলভোগ তথ্য আরো খাপ খায় না। ঈশ্বর তো প্রেমময়। তিনি প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশার বিধান দেবেন এটা যুক্তিসহ নয়। হাঁ শিক্ষার জন্য দুঃখ দুর্দ্দশার বিধান তাঁর পক্ষে রাখা সম্ভব। কিন্তু আমরা তো কেউ জাতিস্মর নই? পূর্ব্ব জন্মে যে অন্যায় করেছি তার কোন স্মৃতি আমাদের মনে নাই—অথচ এ জন্মে তার শাস্তি পাচ্ছি এতে আমাদের শিক্ষা হবার সম্ভাবনা কই? আজকের দিনে মানবীয় শিক্ষকগণই ছাত্রের জন্য শাস্তি বিধান করার আগে তাকে তার অন্যায়টা ভাল করে বুঝবার সুযোগ দেওয়া উচিত। ঈশ্বর শাস্তি দিবার এই অতি সরল বিধান অবলম্বন করবেন না এ হতেই পারে না। কর্মফল যদি জন্মান্তরে ফলতো তা হলে ঈশ্বর আমাদিগকে জাতিস্মর করতেন।

বুদ্ধদেব ঈশ্বর-বিশ্বাসী না হয়েও নিছক কর্ম্মফল বাদের তাগিদে জন্মান্তর-বাদের আশ্রয় নিয়েছিলেন। কার্য্যকারণ-বাদের যে পারম্পর্য্য বস্তু-জগতে ঘটে, তাকে তিনি ব্যক্তি-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান বস্তু-বিজ্ঞান সাক্ষ্য দিচ্ছে যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধবাদ সমষ্টি-ক্ষেত্রেই কার্য্যকরী হয়, প্রতিটি বস্তুকণায় তা কার্য্যকরী নয়। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ইউরেনিয়াম হ'তে কতগুলি পরমাণুর কত সময়ের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটবে তার সঠিক নির্দ্ধারণ সম্ভব—সেখানে প্রকৃতির নিয়ম নিখুঁত। কিন্তু একটি বিশেষ ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভবিষ্যৎ বিষয়ে প্রকৃতির বিধান কোনও তথ্যই প্রদান করে না। তেমনি মানুষের সমগ্র সমাজের ক্ষেত্রে ভাল ও মন্দ কাজের ফলাফল নিখুঁতভাবে ফললেও কোনও ব্যক্তির জীবনে তার ফলাফল কার্য্যকারণ সম্বন্ধাশ্রিত না হ'তে পারে। তাই আজকের যুগে প্রমাণ নিরপেক্ষভাবে পুনর্জন্মবাদ ও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বাদের যে জটিল তথ্যটি বুদ্ধ ধর্ম অবতারণা করেছে তাতে বিশ্বাস প্রত্যাশা করা সম্ভব নয়। সুতরাং ধর্ম ভয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের পরিবর্ত্ত হিসাবে কি ধরণের নিয়ন্ত্রণ মানুষকে স্বাভাবিক ভাবে সদাচারী করবে, তার অনুসন্ধানই আজকের যুগের সব চেয়ে বড় প্রশ্ন।

মনে হয় এমন নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব কিছু নয়। মানুষ যদি সমাজকে ভালবাসে—যদি তার প্রতিবেশী অন্য মানুষের সুখ দুঃখের প্রতি সমানভাবে সচেতন হয়, তবে সে যে কোনও মানুষের সুখকে নিজের সুখ বলে আনন্দিত ও যে কোনও মানুষের দুঃখকে নিজের দুঃখ হিসাবে বিচলিত হবে। তাহলেই সে তেমন কাজ করতে আগ্রহী হবে যাতে মানুষের সুখ বৃদ্ধি পায়, আর যে কাজে মানুষের দুঃখ বাড়ায় তেমন কাজ হতে সে বিরত হবে। অর্থা

ধর্মভয়ের পরিবর্তে সমাজ-প্রেমকেই বর্তমান যুগের সদাচারের ভিত্তি গড়তে হবে। প্রথম চিন্তায় ব্যাপারটা অসম্ভব মনে হতে পারে। কিন্তু ভেবে দেখলে দেখা যাবে ব্যাপারটা খুবই সম্ভব। ভয় যেমন একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, ভালবাসাও তেমনি। বংশগত ভাবে, গোষ্ঠীগত ভাবে, এমন কি জাতিগত ভাবে ভালবাসার তীব্র আবেগ সৃষ্টির উদাহরণ তো অনেক রয়েছে। মানবীয় ভাবেই বা তা অসম্ভব হবে কেন? সমাজের প্রতি যে স্বাভাবিক ভালবাসা মানুষের রয়েছে তাকে ঠিকমত বিশ্লেষিত করতে পারলেই তা সম্ভব হয়ে উঠবে।

অবশ্য সদাচারের মাপকাঠিরও কিছুটা পুনর্বিচার প্রয়োজন। মানুষের স্বাভাবিক আচরণের অধিকাংশকেই যদি আমরা "মন্দ আচরণ" বলে ঘোষণা করি, তাহলে সাধারণ মানুষকে ভাল হবার সুযোগই দেওয়া হয় না। যে ব্যক্তিগত আচরণগুলি সত্যই সমাজগতভাবে মন্দ, মাত্র সেইগুলিকেই "অবাঞ্ছিত আচরণ" বলে চিহ্নিত করতে হবে, ও তার বিরুদ্ধে সামাজিক বিবেক গড়ে তুলতে হবে। আর সাধারণ মানুষের জীবনে এমন সুযোগ সুবিধা এনে দিতে হবে যেন তারা ঐ অবাঞ্ছিত আচরণগুলি বাদ দিয়েও বেশ স্বচ্ছন্দে জীবন-ক্রিয়া চালাতে পারে ও অনেক ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে।

রাশিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাষ্ট্রগতভাবে এই রকম সমাজ-চেতনার উদ্যোগী হয়ে যথেষ্ট সুফল পেয়েছে। আমরা আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা মারফৎ এই রকম সমাজের উপযোগী নাগরিক গঠনের প্রয়াসী হয়েছি। আশা করা যায় যে ধর্মভয়ের ভিত্তির পরিবর্তে সমাজ-প্রেমের ভিত্তিতে গঠিত সমাজ অধিকতর অগ্রগতির স্বাক্ষরই বহন করবে।

মুণ্ডকোপনিষৎ

অবধৃত ভাষ্য সমেত

তৃতীয় মুণ্ডক, প্রথম খণ্ড

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তেন এব লভ্যঃ [তাঁহাদ্বারাই লভ্য, পুরুষোত্তমের যিনি স্ব-জন, প্রাণের প্রাণ, সেখানে তো নিজেই নিজের বর সাজিয়া নিজের কাছেই নিজের সাধনায় ধরা দিয়া আনন্দ করিবার জন্য এই লীলাবিস্তার করিতেছেন; যিনি লভ্য, তিনিই লভ্য, তিনিই সাধনা, তিনি লাভ; নিজের সাধনায়ই নিজে নিজকে লাভ করা যায়।] তস্য [সেই পুরুষোত্তম-বৃত পুরুষের কাছেই] এষঃ [এই দুই একতত্ত্ব] আত্মা বিবৃণুতে [বিবৃত করেন, কনের নিকট বরের 'দান' রূপে বিস্তার করেন] তনুং স্বাম্ [নিজ তনু; 'তাঁহার গলার ফুলের মালা আমার গলায় দিয়া আমার তনু করি যে মোর তনু ধ'রে'। 'স্বীয় তনু' না বলিয়া শ্রুতি 'স্বা তনু' বলিতেছেন; তাৎপর্য যে, আত্মা ও তনু অভেদ; চিৎ-জড় জেড় পুরুষোত্তমে বিগলিত।

এই আত্মা প্রবচনদ্বারা লভ্য নন্, মেধাদ্বারা নন্, বহু শ্রবণদ্বারাও নন্। ইনি যাহাকে বরণ করেন, তাহা দ্বারাই লভ্য, তাহার কাছেই তনুতত্ত্ব বিবৃত করেন। ৩।২।৩

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং

পুরুষোত্তমের টানই পুরুষোত্তমকে পাওয়াইয়া দেয়। ইহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—অয়ম্ আত্মা [এই পুরুষোত্তম-আত্মা] বলহীনেন ন লভ্যঃ [বলহীনদ্বারা লভ্য নন্; বল্ প্রাণনে—বলই প্রাণ; প্রাণের প্রাণ যদি প্রাণ-মাতানো আহ্বান না করেন, বল আসিবে কোথা হইতে? এত বড় বিরাট বিশ্বে পথ খুঁজিয়া বাহির করা এবং সেই পথে চলার মত 'বল' লাভ করা তখনই সম্ভব হয়, যখন যার বিশ্ব, যার পথ, যার সাধনা, এবং যিনিই লভ্য, তিনিই ইহার সবটুকু রহস্য, কৌশল নিজে শিখাইয়া নন্] ন চ প্রমাদাৎ [প্রমাদ হইতে নন্; বিশ্বের প্রতি অণুতে আকাশানন্তরূপে যিনি বিরাজিত, সেই চিত্র পথে প্রমাদ হইলেই, পা ফসকাইলেই তুমি আর পাইবে না; তোমাকে একান্ত আত্মা বা একান্ত সর্ব্বভূতের মধ্যে রন্ধ্রপথে দুইকেই সামলাইয়া দুইকেই হজম করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে চলিতে হইবে] তপসো বা অপি অলিঙ্গাৎ [লিঙ্গরহিত তপস্যারও নয়; সে পথের লিঙ্গ কি? নিশানা কি? চিহ্ন কোথায়? কাহার পদাঙ্ক তুমি অনুসরণ করিবে? এ সব কিছুই ছাড়া চলিতে পারিবে না। চাই পদাঙ্ক-জ্ঞান, চিহ্নজ্ঞান, লিঙ্গজ্ঞান। পুরুষোত্তমের পদাঙ্কলিঙ্গ না চিনিয়া তপস্যা বা জ্ঞানসাধনা তোমার কর্ত্তব্য হইবে, ব্যর্থ হইবে। পুরুষোত্তম-চিহ্নিত বিশ্বে সেই চিহ্ন চিনিয়া লওয়ার মত জ্ঞানই অর্জ্জনীয়] এতৈঃ উপায়ৈঃ [এই সব বল-অপ্রমাদ-জ্ঞান ও পুরুষোত্তম-চরণচিহ্নরূপ উপায়-দ্বারা] যততে [আদর পূর্ব্বক যত্ন করেন] বিদ্বান্ [বিদ্বান্] তস্য [তাঁহার] এষ আত্মা [এই আত্মা] বিশতে [প্রবেশ করেন] ব্রহ্মধাম [সর্ব্বাশ্রয় ব্রহ্ম, শ্রীধাম, পুরুষোত্তমধাম]।

এই আত্মা বলহীনের লভ্য নন্। প্রমাদদ্বারা বিশ্বে পুরুষোত্তম চিহ্নবর্জ্জিত জ্ঞানদ্বারাও নন্; এই সব উপায় দ্বারা যে বিদ্বান্ পুরুষ যত্ন করেন, তাঁহার এই আত্মা ব্রহ্মধাম প্রবিষ্ট হন্। ৩।২।৪

সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি ॥ ৫

ব্রহ্মধাম প্রবেশের প্রণালী বলিতেছেন—সম্প্রাপ্য [সম্যক্ রূপে প্রাপ্ত হইয়াছে] এনং [আত্মাকে] ঋষয়ঃ [সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিগণ] জ্ঞানতৃপ্তাঃ [সব জানিবার সুযোগলাভের তৃপ্তিতে ভরপুর; জানার সাধ তো আর পূর্ণ হইবে না, জানার পথে উঠার নামই জানা] কৃতাত্মানঃ [কৃত হইয়াছে আত্মা যাহাদের দ্বারা; সকল দেহ-মন-ইন্দ্রিয়কে আত্মরূপে গড়িয়া যিনি 'সর্ব্বভূতাত্ম-ভূতাত্মা'—সর্ব্বভূতের কাছে আত্মভূত অর্থাৎ আত্মতুল্য হইয়াছে যাহার আত্মা অর্থাৎ দেহ মন স্বভাব ইত্যাদি, তিনিই ভূতাত্মা] বীতরাগাঃ [বীত হইয়াছে রাগ যাহাদের; রাগবশতঃ কোনও বস্তুকে পাইতে চাহিলে তাহা হইবে তোমার পক্ষে তাহাকে আক্রমণ করা, সেই বস্তুর উপর বলাৎকার; বস্তুকে তাহার স্বাধীন, পুরুষোত্তম-সত্তা বজায় রাখিবার জন্য রাগের বিষয় হইতে মুক্তি দাও, তবেই বস্তু তাহার অন্তরের পুরুষোত্তম-গোপনধন তোমার কাছে উদ্ঘাটিত করিবেন; রাগের পথে বস্তু অধর] প্রশান্তাঃ [বীতরাগ হইলেই চিত্তের তরঙ্গ থামিয়া যায়, হৃদয় হয় প্রশান্ত] তে [তাহারা] সর্ব্বগম্ [সর্ব্বগত; সকলের সব কিছু সাধনায়, সিদ্ধিতে সম্প্রদায়ে আকাশের মত, অবকাশের রূপে সর্ব্বগত] সর্ব্বতঃ [সর্ব্বত্র, সর্ব্বসাধনায়, সর্ব্বসিদ্ধিতে, সর্ব্বক্ষেত্রে, বিশেষ কোনও খণ্ড ক্ষেত্রে, খণ্ড সাধনা বা খণ্ড সিদ্ধিতে নয়,] প্রাপ্য [পাইয়া] ধীরাঃ [ধীর স্থির অটল] যুক্তাত্মানঃ [যুক্ত হইয়াছে আত্মা অর্থাৎ দেহ-মন-স্বভাব যাহাদের পুরুষোত্তমে, তাহারা] সর্ব্বম্ এব [সকলেরই বুকের মধ্যে সর্ব্বক্ষেত্রে, সকল সাধনায়, সকল সাধকে, সকল সিদ্ধির অন্তরতম প্রদেশে] বিশন্তি [প্রবেশ করে; আস্বাদন করে, এবং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রের, সাধনা-সাধনার সিদ্ধি-সিদ্ধির পরস্পরে বিবাদ ভঞ্জন করিয়া তাহাদের ভিতরে সঙ্ঘশক্তি করেন সর্ব্ব প্রবেশের চরম ও পরম লাভ ব্রহ্ম সংগঠন-শক্তি]

এই আত্মাকে সম্যক প্রাপ্ত হইয়া ঋষিগণ জ্ঞান-তৃপ্ত

কৃতাত্মা, বীতরাগ, প্রশান্ত। তাঁহারা, এইরূপ বীত যুক্তাত্মা পুরুষগণ সর্বগত তাঁহাকে সর্বত্র পাইয়া সর্বেই প্রবেশ করেন। ৩।২।৫

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে॥ ৬

বেদান্তবিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থঃ [বেদান্ত জনিত বিজ্ঞান অর্থাৎ পুরুষোত্তম-বিজ্ঞান দ্বারা সর্ব পুরুষার্থধন পুরুষোত্তম যাহাদের কাছে উত্তমরূপে নিশ্চিত হইয়াছে] সন্ন্যাস-যোগাৎ [সম্যক্‌রূপে, নিশ্চিন্তরূপে নিঃশেষে অস্ত যাওয়ার অবস্থাই সন্ন্যাস; কিম্বা সম্যক্‌রূপে অস্ত হওয়ার অবস্থাই সন্ন্যাস; পুরুষোত্তমে যখন সর্ব কর্ম, সর্ব জ্ঞান, সর্ব সাধনা, সর্ব দেহ-প্রাণ-মন বৃদ্ধি নিঃশেষে নিশ্চিন্তরূপে অস্ত যায় কিম্বা সেখানেই অস্ত যাওয়া হয়, তখনই তাহা সন্ন্যাস; এই সন্ন্যাসের যোগদ্বারা] যতয়ঃ [যত্নশীল পুরুষগণ] শুদ্ধসত্ত্বাঃ [বিশুদ্ধমনা, বিশুদ্ধচিত্ত] (হইয়াছে) তে [তাঁহারা] ব্রহ্মলোকে [ব্রহ্মে, সাধক বহু বলিয়া ব্রহ্ম-লোকের বহুত্ব বলা হইয়াছে; কৃষ্ণ কেমন, যার কাছে যেমন] পরান্ত কালে [পরমপুরুষে অস্ত হওয়ার কালই পরান্ত কাল, সেই সময়ে; লীলা গুটাইয়া লইবার সময়] পরামৃতাঃ [পর-অমৃত যাহাদের তাহারাই পরামৃত; পরম অমৃত যাহাদের সমস্ত অস্তিত্বে, সকল চেতনা ও আনন্দে এই জীবদ্দশাই জড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহারা] পরিমুচ্যন্তি [পরি অর্থাৎ চতুর্দিকের সকল নানা হইতে মুক্ত হন; দেশান্তরে তাহাকে যাইতে হয় না; সব দেশই যাহার দেশ, সব কালই যাহার কাল, তিনি কোথা হইতে কোথা যাইবেন? লীলারসে ডুবিয়া যাওয়াই চরম পরামুক্তি, মহানির্বাণ, পরম আনন্দ]

বেদান্তজনিত বিজ্ঞানের বিষয় পুরুষোত্তম যাহাদের নিকট সুনিশ্চিত অর্থ হইয়াছেন, সন্ন্যাসযোগের দ্বারা যাহারা যত্নশীল শুদ্ধসত্ত্ব হইয়াছেন, তাহারা সকলেই জীবদ্দশায় মুক্ত হইয়া চরম অন্তকালে অর্থাৎ লীলা গুটাইবার সময় সর্বত্র মহানির্বাণ লাভ করেন। ৩।২।৬

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা
দেবাশ্চ সর্বে প্রতিদেবতাসু
কর্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্ব একীভবন্তি॥ ৭

(লীলা গুটাইবার কালে দেহ আরম্ভ যাহারা করিয়া-ছিল) কলাঃ [প্রাণাদি রসই কলা] পঞ্চদশ [পনর; প্রাণ, শ্রদ্ধা, বায়ু, জ্যোতি, অপ্, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, বীর্য, তপ, মন্ত্র, কর্ম এবং লোকসকল।] (স্ব স্ব) প্রতিষ্ঠাঃ গতাঃ [প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইল, পুরুষোত্তম-প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইল] দেবাঃ চ সর্বে [এবং চক্ষুরাদি সর্ব দেবতা-গণও, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবসকল] প্রতিদেবতাসু [মূল দেবতা আদিত্যাদিতে, সর্বদেবময় পুরুষোত্তমে; আদিত্যাদি দেবগণকে আত্মা হইতে অন্যত্র দেখিলে দেবতারা পরাজয় আনিবে। "দেবানাং পরাদুর্যোঽন্য-থাত্মনো দেবান্বেদ"—যে আত্মার অন্যত্র দেবসমূহকে জানে, দেবতারা তাহাকে পরাজয় করে।] কর্মাণি [অপ্রবৃত্ত ফল কর্মসমূহ] বিজ্ঞানময়ঃ [পুরুষোত্তমাশ্রিত বুদ্ধির উপাশ্রিত বিজ্ঞানঘন] আত্মা [পুরুষোত্তমত্ব প্রাপ্ত ভক্ত আত্মা] পরে [সর্বকে ডিঙাইয়া সকলকে হজম করিয়া অথচ সকলের অনুগমন করিয়া 'পর'-রূপে স্থিত] অব্যয়ে [সৃষ্টির জন্য, পোষণের জন্য অফুরন্ত ব্যয় করিয়াও অব্যয়, সদা পূর্ণ, অক্ষয়, আকাশানন্দ, অন্ত অথচ অনন্ত লীলা-রসবান্, অজর, অমৃত, অভয়, অপূর্ব, অনন্ত অথচ কতই অপর, অনন্তর—অথচ কতই অন্তর, অবাহ্য—অথচ সর্বতোভাবে বাহ্য, অদ্বয়—অথচ দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বিত, শিব, শান্ত, সুন্দর পুরুষোত্তমে] সর্বে [সর্ব স্বরূপে] একী-ভবন্তি [এক হয়; এই এক জীবন্ত যাহার ভিতর অনন্ত অনেক "এক" স্ব স্ব বৈচিত্র্য অটুটভাবে বজায় রাখিয়া স্ব স্ব ছন্দে লীলা সহযোগে আনন্দরস পানে বিভোর, এক সঙ্গে এক দেহ, এক প্রাণ, এক মন, এক বিজ্ঞান ও

একানন্দ; ষোড়শ-কল পুরুষের পঞ্চদশ কলা পুরুষোত্তম-গৃহীত হইয়া, পুরুষোত্তম-লীলার মাঝে ডুবিয়া গেলেন, লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গেলেন, কিন্তু ষোড়শ কলার সর্ব্ব শেষ অবশিষ্ট কলা তাঁহার "নাম" মুছিয়া গেল না, "নাম" রহিয়াই গেল, নাম ব্রহ্মরূপে জগৎ হইবার জন্য ধরার বুকে রহিয়া গেল।]

লীলা ওটাইবার সময়, প্রাণাদি পঞ্চদশ কলা পুরুষোত্তম প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারাও সর্ব্ব দেবময় পুরুষোত্তমে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং অপ্রবৃত্ত কল কর্ম্ম ও পুরুষোত্তম-অর্পিত বুদ্ধিতে উপাশ্রিত ভক্ত-আত্মা সর্ব্বস্বরূপ পর অব্যয়ে এক হন। ৩।৭।৭

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্ত-
ং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ৮

যথা [যেমন] নদ্যঃ [নদীসমূহ] স্যন্দমানাঃ [প্রবহমান] সমুদ্রে [সমুদ্রের বুকে] অস্তং গচ্ছন্তি [অস্তগত হয়; পরম "অস্তিত্বে" সত্তাবান্ হয়, "অস্-ক অস্ত"—সমুদ্রে ডুবিয়াই নদীর "অস্তি" ক্রিয়ার সাধ মিটে, অস্তিত্বের, থাকিবার সার্থকতা লাভ হয়] নাম রূপে [নাম বিশ্বনাম ও রূপ বিশ্বরূপ হইতে বিচ্ছিন্ন] বিহায় [বিশেষ নাম ও বিশেষ রূপহীন হইয়া] তথা [সেইরূপ] বিদ্বান্ [পুরুষোত্তম বিদ্যায় বিদ্বান্] নামরূপাৎ [বিশিষ্ট নাম রূপ হইতে] বিমুক্তঃ [বিশেষভাবে মুক্ত হইয়া; কবিত্বে আর কখনও বিশেষের ক্ষেত্রে জাগরিত হইবার সম্ভাবনা মুছিয়া ফেলিয়া] পরাৎ পরং [অব্যাকৃত অক্ষর প্রকৃতি এবং কূটস্থ ব্রহ্ম হইতেও পর] পুরুষম্ [পুরুষোত্তম] উপৈতি [প্রাপ্ত হন] দিব্যম্ [জ্যোতির্ম্ময়, লীলাময়]।

প্রবহমান নদীসমূহ যেরূপ বিশিষ্ট নাম ও রূপ ত্যাগ করিয়া সাগরের বুকে অস্তগত হয়, পরম অস্তিত্বে সত্তাবান্ হয়, তদ্রূপ বিদ্বান্ বিশিষ্ট নাম-রূপ হইতে বিশেষ ভাবে মুক্ত হইয়া পরাৎপর লীলাময় পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ
ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি॥ ৯

সঃ [তিনি] যঃ হ বৈ [যে কেহই] তৎ [সেই] পরমং ব্রহ্ম [পরম ব্রহ্মকে] বেদ [জানেন; ব্রহ্মকে সর্ব্বরূপে এবং সর্ব্বকে ব্রহ্মরূপে না দেখিলে পরিপূর্ণ ব্রহ্ম-দর্শন হইবে না। যাহাকিছু ব্রহ্মের "অন্যত্র", সে-ই বাধা দিবে, পরাস্ত করিবে। পুরুষোত্তম-প্রাপ্তি নিখুঁত করিতে হইলে পঞ্চদশ কলাকে পুরুষোত্তমের 'অনন্ত' বলিয়া বুঝিতেই হইবে, নইলে তাহারা পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবেই। "সর্ব্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকাঃ ইমে দেবা ইমে বেদা ইমানি ভূতানীদং সর্ব্বম্ যদয়মাত্মা"—"সর্ব্ব তাহাকে পরাস্ত করে, যে সর্ব্বকে আত্মা হইতে অন্যত্র' দেখে। এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই লোকসকল, এই দেবসমূহ, এই বেদসমূহ, এই ভূতগণ, এই সব তিনিই যিনি এই আত্মা" নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে এই দেহের সব 'কলা'কে পুরুষোত্তমদেহ বলিয়া আস্বাদন করা চাই-ই, তবে সম্ভব হইবে লীলায় যোগদান এবং লীলাসম্বোপন সম্ভোগ দিব্য জানা] ব্রহ্ম এব ভবতি [ব্রহ্মই হন্; ব্রহ্ম হওয়া পথে আর বিঘ্ন জন্মাইবার জন্য পুরুষোত্তম ব্যতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ নাই] অস্য কুলে [ইহার কুলে] অব্রহ্মবিৎ [অব্রহ্মজ্ঞ] ন ভবতি [হয় না; উপনিষদ্ ব্রহ্মবিৎ পুরুষের 'কুল' চান, এই দৃষ্টিধারা যাহাতে ব্রহ্ম-ধারায় গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহার প্রতি উপনিষদের সব সময়েই লক্ষ্য রহিয়াছে; কিন্তু যাহারা এই দুনিয়ার খোটা অস্তিত্বকে পারমার্থিক সত্তা হইতে চ্যুত করিয়া ইহার 'বিনাশে' উপর পরমার্থ সৌধ গড়িতে চান এবং সেই উদ্দেশ্যে সব ইন্দ্রিয়গণের সহজ স্পন্দনের উপর চাপ দিয়া উহার স্ব-ছন্দকে নিরুদ্ধ করিয়া সংযম উপদেশ দেন, তাহাদের এই রূপ প্রাণহীন নিগ্রহ (repression)-মূলক সংযমের ফলে

তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা মূল সৃষ্টিকে 'অবিদ্যা' বলিয়া উহার বিলোপ চান, তাঁহারা তো সব মূলের গোড়াই কাটিয়া দিলেন। এই চিন্তা-প্রণালীতে মূলে দীপ জ্বালাইবার মানুষ ক্রমে ক্রমে কমিয়া শেষে লোপ পাইবে, মূল-প্রদীপ নিভিয়া যাইবে। বর্তমান দেশ ইহার নিদর্শন। পুরুষোত্তম-দর্শনে সকল ইন্দ্রিয় জীবন্ত থাকিয়াও সংযত, পুরুষোত্তম-দর্শনের সংযম অবাধ সংযম, স্বতঃ সংযম, জোর জুলুমের সংযম নয়।] তরতি শোকং [শোক উত্তীর্ণ হয়, সৃষ্টির সন্তান-ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখায় সৃষ্টি কর্তার কি লালসা! জীব যদি এই সন্তান-ধারার মধ্য দিয়া অনন্ত প্রকৃতির হৃদয়স্থিত 'অবিজ্ঞাত' পুরুষকে অনন্ত ভবিষ্যৎ ভরিয়া আস্বাদন করিতে পারে, তবেই সে শোকমুক্ত। প্রাণ ছাড়া, প্রজা ছাড়া কে 'অবিজ্ঞাত' রাজা পাড়ি দিবে? প্রাণই প্রজা। প্রজা-সৃষ্টি তাইতো প্রজাপতির কামনা। প্রজাসৃষ্টির মধ্যে প্রজাপতি 'অবিজ্ঞাত' পুরুষোত্তমকে বিজ্ঞেয় করেন। সেই ধারা অক্ষুণ্ণ থাকিলে স্রষ্টার আর শোক থাকে না, ফলে যখন ব্রহ্মবিৎ হওয়ায়, তখনই স্রষ্টার শোক-উত্তরণ] তরতি পাপ্মানম্ [পাপ উত্তীর্ণ হয়, সৃষ্টি-কর্তার সৃষ্টি-লোপের পাপ হইতে তিনি-ই মুক্ত, যিনি ব্রহ্মধারা ও ব্রহ্মকে একীভূত দেখিয়া ব্রহ্ম-সন্তান দ্বারা প্রবাহিত দেখিতেছেন।

মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য বলে নিরবধি॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধ করিতেছেন, যখন অবিদ্যা-অনাত্মা-জড়কে ব্যবহারিক জ্ঞানে উড়াইয়া দিয়া একান্ত (absolute) ব্রহ্ম-আত্মা-চৈতন্যের মহিমা খ্যাপনে বিভোর; পুরুষোত্তম-মূলধারা অব্যাহত রাখাই শ্রুতির পরম প্রয়োজন।] গুহাগ্রন্থিভ্যঃ [হৃদয়-গুহার যে সব গাঁট ছিল, সেই সব হইতে] বিমুক্তঃ [বিমুক্ত হইয়া] অমৃতঃ ভবতি [অমৃত হন; তাঁহার মূল অমরত্ব বংশে দীক্ষিত হওয়াতে তাহার অমৃত প্রাপ্তি, এই অমৃত প্রাপ্তি ব্যক্তিগত নয়, মূলগত]

থাকেন, ইহার মূলে কেহ অব্রহ্মবিদ্ হয় না। তিনি শোক অতিক্রম করেন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন্। তিনি হৃদয়-গুহার গ্রন্থিসমূহ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হন্। ৩।২।৯

তদেতদৃচাভ্যুক্তং ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত
শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈশ্চ চীর্ণম্॥১০

তৎ [উক্ত ব্রহ্ম-বিদ্যা বিষয়ক] এতৎ [এই সম্প্রদান কৌশল যাহা দ্বারা ইহা অনন্ত ভবিষ্যতে প্রসারিত থাকিতে পারে] ঋচা [মন্ত্রদ্বারা] অভ্যুক্তম্ [অতিপ্রকাশিত হইয়াছে] ক্রিয়াবন্তঃ [যাহারা সকল সদ্গুণ ক্রিয়াকে পুরুষোত্তমার্পিত করিয়া শুদ্ধ বুদ্ধিতে, ঈশ্বর বুদ্ধিতে সেবার জন্য উদ্যুক্ত, 'অন্তে বিনাশশীল' এই ধারণা মুছিয়া ফেলিয়া অনন্ত অবিনাশী কর্মকে লীলায় পড়িয়া তুলিতে চাহিতেছেন, তাহারাই 'ক্রিয়াবান্' হওয়ায় পদের পাঠক। ক্রিয়ার সঙ্গে তাহাদের নিত্যযোগ রহিবে বলিয়াই ক্রিয়া শব্দের উত্তর মতপ্-প্রত্যয় নিষ্পন্ন হইয়াছে] শ্রোত্রিয়ঃ [শাস্ত্রীয় ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, শাস্ত্রীয় তর্ক-বিচারে পারদর্শী] ব্রহ্ম-নিষ্ঠাঃ [উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম-পুরুষোত্তমে নিশ্চিন্ত রূপে নিশ্চিন্তরূপে স্থিত হইবার জন্য লালসাবান্, শুধু শাস্ত্রের কচকচি লইয়াই বিভোর নন্; যাহারা শাস্ত্রীয় জীবন যাপন করিতে ব্যগ্র] স্বয়ং [নিজেই; ধার করা পুরোহিত ডাকিয়া নয়] জুহ্বতে [জুহ্বতি, হোম করেন] একর্ষিং [একর্ষি নামক অগ্নির; এক অগ্রগামী তেজোময় দেবতার (Divine will)] শ্রদ্ধয়ন্তঃ [শ্রদ্ধাশীল হইয়া। যাহারা কর্মক্ষেত্রে বিশ্বযোড়া কর্মের প্রেরণা লইয়া শাস্ত্রীয় ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্রহ্ম-জীবন যাপন করিয়া, স্বয়ং সেই এক অগ্রগামী আলো-দেবতার পথে শ্রদ্ধার সহিত চলিয়াছেন, কর্মের আবেষ্টনে থাকিয়া কর্মকে ত্রাসবন্ধন দিবার জন্য সর্বদা জ্ঞান-অগ্নি সাধনায় নিজে নিজেই নিয়ত আছেন, তাহারাই এই বিদ্যা সমর্পণের যোগ্য পাত্র। ব্রহ্মবিদ্

পাছে বলিয়াই কুল অব্যাহত থাকিতে পারে] তেষাম্ এষ [তাহাদের নিকটই] এতাং [এই] ব্রহ্মবিদ্যাং [ব্রহ্মবিদ্যা] বদেত [বলিবে] শিরোব্রতম্ [মাথায় অগ্নি ধারণ রূপ ব্রত, আথর্ব্বণদিগের এই ব্রত ; মস্তিষ্কে সর্ব্বদা অগ্নির তেজ জাগাইয়া রাখিবার ব্রত ; বাহিরের অগ্নি শুধু উপলক্ষণা, সেই কালে এইরূপ একটি বাহ্য আচার প্রচলিত ছিল। উদ্দেশ্য ইহার, মস্তিষ্ককে কর্ম্মবহুল জটিল কুটিল সংসারের মধ্যে জ্ঞানের অগ্রগামী তেজে সর্ব্বদা সচেতন রাখা] বিধিবৎ [বিধি অনুসারে] যৈঃ তু [এবং যাহাদের দ্বারা] চীর্ণম্ [আচরিত হইতেছে]।

উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রদানের জন্য মন্ত্র বলা হইতেছে—যাহারা ক্রিয়াতে শ্রদ্ধাবান্ ক্রিয়াবান্, শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ ; যাহারা শ্রদ্ধা সহকারে একটি নামক অগ্নিতে স্বয়ং হোম করেন, এবং যাহারা মস্তকে অগ্নিধারণ ব্রত যথাবিধি আচরণ করেন, তাহাদের কাছেই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে। ৩।২।১০

তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ
নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে।
নমঃ পরম ঋষিভ্যো
নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ। ১১

তৎ এতৎ সত্যম্ [সেই এই সত্য অক্ষর পুরুষকে] ঋষিঃ অঙ্গিরাঃ [অঙ্গিরা ঋষি] পুরা [জিজ্ঞাসিত হইয়া পূর্ব্বে সৌনকের নিকট] উবাচ [বলিয়াছিলেন] এতৎ [এই গ্রন্থ] অচীর্ণব্রতঃ [যে ব্রত আচরণ করে নাই সে] ন অধীতে [পাঠ করে না] (পরম্পরাক্রমে যাহাদের আশীর্ব্বাদে এই ব্রহ্মবিদ্যা ত্রুটিত না হইয়া গলিত হইয়া আসিয়াছে তাহাদিগকে নমস্কার) নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ [যাহারা পরম ব্রহ্মের ঋষি, সাক্ষাৎ দ্রষ্টা ব্রহ্মাদি তাহাদিগকে নমস্কার, ভূয়ঃ ভূয়ঃ নমস্কার ; গৌরবান্বিত করিবার জন্যই দুইবার প্রয়োগ।]

অঙ্গিরা ঋষি উক্ত এই সত্য অক্ষর পুরুষ উপদেশ করিয়াছিলেন ; যিনি ব্রত আচরণ করেন নাই, তিনি ইহা পাঠ করেন না। পরম ঋষিগণকে নমস্কার, পরম ঋষিগণকে নমস্কার। ৩।২।১১

শান্তি পাঠ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীনিত্যগোপাল ॥

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় জন্যই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে, দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেইজন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈতভাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়-নির্দ্দেশিত 'সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ত্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

পঞ্চম সিদ্ধান্ত

বেদান্ত প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রমতেই আত্মা সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু হস্ত-পদাদিবিশিষ্ট দেহ ব্যতীত অন্য কিছু অবলম্বনে ত আত্মজ্ঞানের স্ফুরণের বিষয় শুনা যায় না। যে সকল গ্রন্থে আত্মা ও আত্মজ্ঞানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সে সমস্তের মতে দেহস্থ আত্মা হইতেই আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হইয়া থাকে। মহাত্মা শঙ্করাচার্যও দেহস্থ ছিলেন, সেই দেহস্থ মহাত্মা শঙ্করাচার্য হইতেই আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হইয়াছিল। মহাত্মা অষ্টাবক্রও দেহস্থ ছিলেন, সেই দেহস্থ মহাত্মা অষ্টাবক্র হইতেই আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হইয়াছিল। বেদান্তসার রচয়িতা মহাত্মা সদানন্দ যোগীন্দ্রও দেহস্থ ছিলেন, সেই দেহস্থ মহাত্মা সদানন্দ যোগীন্দ্র হইতেই আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হইয়াছিল। ঐরূপ কত মহাত্মাই দেহস্থ ছিলেন, অথচ তাঁহাদের মধ্য হইতেই আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হইয়াছে। অদ্যাপিও কত দেহস্থ মহাত্মা হইতেই আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হইতেছে। দেহস্থ আত্মা ব্যতীত অন্য কোন স্থানস্থিত আত্মা হইতে ত আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হইবার বিবরণ কোন উপনিষদে, বেদান্তদর্শনে, বেদান্তসারে, পরমহংস শঙ্করাচার্যের বা অন্য কোন মহাত্মার বেদান্ত-প্রতিপাদক কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। ইদানীংও কোন আত্মজ্ঞানী অদেহস্থ নহেন। উপনিষৎ, বেদান্তদর্শন এবং অন্যান্য আত্মজ্ঞান-প্রতিপাদক গ্রন্থানুসারেই আত্মজ্ঞান দেহস্থ আত্মা হইতেই স্ফুরিত হইয়া থাকে। বেদান্ত দর্শনখানিও ত দেহস্থ বেদব্যাস হইতে স্ফুরিত হইয়াছিল। বেদান্তসারখানিও ত দেহস্থ সদানন্দ যোগীন্দ্র হইতে স্ফুরিত হইয়াছিল। বেদান্ত প্রতিপাদক যে সমস্ত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় সে সমস্তই ত দেহস্থ আত্মা হইতে স্ফুরিত। সে সমস্ত গ্রন্থের কোনখানিই ত অদেহ অবলম্বনে স্ফুরিত হয় নাই। সে সমস্ত গ্রন্থের প্রত্যেকখানিই ত সাকার-নিরাকার আত্মা হইতে স্ফুরিত হইয়াছিল। সে সমস্ত গ্রন্থের কোনখানিই ত কেবল নিরাকার আত্মা হইতে স্ফুরিত হয় নাই। যথা কেবল শূন্য, তথাও আত্মা বিদ্যমান। অথচ সেই শূন্যাবলম্বিত আত্মা হইতে আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হয় না। অথবা সেই শূন্যাবলম্বিত আত্মা হইতে ত কোন বৈদিক উপনিষৎ, বেদান্তদর্শন কিম্বা আত্মজ্ঞান প্রতিপাদক কোন গ্রন্থ স্ফুরিত হয় নাই।১

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৩—

(৪৭)

১৯৩০-এ যখন দমদম জেলে ছিলাম, তখন প্রত্যহ গীতা পাঠ হইত—সকাল ৮টা হইতে ৯টা। শশধর সেন নামক একজন রাজনৈতিক বন্দী, খুলনার মোক্তার, প্রিয়-নাথ সেনের ভ্রাতা, গীতা শুনিতে আসিতেন। কিছুদিন শোনার পর আর আসেন না। একদিন গীতা পাঠ করিতে যাইবার পথে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে না যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি সরলভাবে বলিলেন, 'আপনার গীতা খুব ভাল লাগে। কিন্তু উহা শুনিতে হইলে জীবনের আমূল পরিবর্তন করিতে হয়। বয়স নাই, সাহস হয় না। তাই পূর্বেরটা নিয়াই থাকিব'। আমার এখানে যে লোক আসে না, তাহার কারণ এইখানেই। নিত্যগোপাল-দর্শন আমূল পরিবর্তনের দর্শন। লাগে সকলেরই ভাল, কিন্তু পরিবর্তন করিবার সাহস, ধৈর্য, প্রচেষ্টা নাই। আবেষ্টন যে স্টীল-ফ্রেম কাঠামো। কবে, ঠাকুর, তোমার জীবন ও দর্শন সংসার নিবে, তুমিই জান। আমার যাহা সাধ্য, তাহা করিব।···

৩রা মার্চ

শ্রীরাধারাণী আমার, পরাশ পুতলী আমার, তুমি বিশ্ব-প্রকৃতির পুরুষ-নিরপেক্ষ স্বাধীনকর্ত্রী রূপ নিজ জীবনে প্রকট করিয়াই পরাশক্তি, organic nature, higher nature। তুমি যে আমার জীবনের কোন্ স্থান অধিকার করিয়া আছ, তাহা আর কি বলিব? তুমিই আমার সব, তুমিই আমার সার্থক রূপ, আমি তোমার মাঝেই সত্যিকার আমি, তোমার জীবনে এই বিশ্ব-প্রকৃতির সার্থক রূপ আমি দেখিয়াছি। তাই তোমার বিশেষ প্রকাশ এই নারীশক্তিকে এত শ্রদ্ধার চোখে সারা জীবন দেখিয়াছি—সতীর মর্যাদা দিয়াছি, অসতী বাজারের মেয়েদের মধ্যে তোমার জীবনের প্রকাশ দেখিতে প্রয়াস পাইয়াছি। সতী তোমার জীবনের এক দিক, অসতী অপর দিক। তুমি সৎ অসৎ সমন্বিত পরম পুরুষের শক্তি সতী-অসতী সমন্বিতা। তোমার জয় হউক।··· মানুষের সঙ্গে সম্পর্ককে মধুর করিবার জন্য কি প্রাণপণ প্রচেষ্টাই না করিয়াছি সারা জীবন! অন্ত প্রেসে ছাপাইবার মত শক্তি তো আজ আছে, তবুও বীরেন-বাবুকে লইয়া টানাটানি কেন? শুধু 'সম্পর্ক' রাখিবার জন্য, কিন্তু 'সম্পর্ক' কি রাখিতে পারিলাম? মানুষ সম্পর্ক এমন করিয়া ছিঁড়িতেছে, আর কোনও দিন সম্পর্ক হইবার সম্ভাবনাও মুছিয়া ফেলে। আমি সকল সম্পর্ককে 'নিত্য সম্পর্কে' গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলাম। উষাদিদী আসে ৮টার পর। ৭টার পর ঠাকুরের জীবনী পাঠ হয়—তখন মুচিতে কোল দেওয়া, গোবিন্দকে কৃপা করা নবদ্বীপ পরিক্রমা কালে, ধনঞ্জোজনে তরকারী কোটা ও কীর্তনে নৃত্য। বীরেনবাবু কফি নিয়া যান···। সকালে অমিতাভ আসিয়াছিল,···।

৪ঠা মার্চ

ওগো রাধারাণী, উচ্ছৃঙ্খল ব্রজবল্লভকে, উচ্ছৃঙ্খল কৃষ্ণকে সংসার-বাসনার সঙ্গে বদ্ধ করিয়া রাখিবার উপযোগী শৃঙ্খলা আমার, আমার সকল জীবনে এমন শৃঙ্খলা আনিয়া দেও যাহার দ্বারা পুরুষোত্তম সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। তুমি নিত্যগোপালরূপে আসিয়াছ ঘর গুছাইতে, পরিবার সমাজ রাষ্ট্র গুছাইতে। আমাকে গুছাইবার শক্তি দেও। ওগো বিশ্ব-জীবনের মূর্তিমতী শৃঙ্খলা, আমি যে তোমাকেই চাই। এ দেশ শৃঙ্খলা ভুলিয়া গিয়াছে, আত্মা অনাত্মার শৃঙ্খলা ভুলিয়াছে। আত্মা যতদিন না অনাত্মার বুকে তাহার আত্মাকে লইয়া শৃঙ্খলিত হইতেছে, ততদিন কোথায় পুরুষোত্তম-প্রতিষ্ঠা? রেণু ১টার পর

যাচ্ছ হইয়া যাচ্ছা, ফিলিপস্ প্রভৃতি স্থানে যাচ্ছ, ফেরে ৪টার পর। কাঁথির কাজাল গিরি আসে, ভজবালা গিরির চাঁদা ৫৲ টাকা দিয়া যায়। কাঁথির সকলের খোঁজ নেই। বিমল দত্ত, ঈশ্বর বেরা, বিজয় মাইতি, প্রভৃতিকে গ্রাহক হইবার জন্য অনুরোধ করিতে বলি। কাঁথিতে যে কাজ আমি করিয়াছি, তাহার আলোচনা করি। কি ঘোড়া-দৌড়ি কাঁথির পথে ঘাটে আমি করিয়াছি অম্লান বদনে প্রাণপণে! মনে করিলে আনন্দ হয়। কাঁথির মানুষও খুব সেবা করিয়াছে। কাঁথির প্রত্যেক থানার কত গ্রামেই না গিয়াছি—কাঁথি সদর, এগরা, পটাশপুর, ভগবান-পুর, খেজুরি থানার কত গ্রামে গিয়াছি। সন্ধ্যায় উপেন ধর আসে ১০টি কমলা লইয়া। মার্চের ১৲ টাকা ও তাহার গ্রাহকের চাঁদা বাবদ ৫৲ টাকা দিয়া যায়। তাহাকে মুরি খাইতে দেওয়া হয়।...৭টায় মনোরঞ্জন গুপ্ত আসে। আগামী ৮ই মার্চ রবিবার সন্ধ্যা ৫টায় ২২/১ এস, মনোহর পুকুর রোডস্থ মহেন্দ্র দাঁসের বাড়ীতে 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল'-এর ইতিহাস লিখিবার সংকল্প লইয়া বরিশালের কর্মীদের এক সভা হইবে। আমাকে যাইবার জন্য বলা হইল।...কেন এই প্রতীক্ষা? সারা জীবনই তো 'শবরীর প্রতীক্ষা'র মত সকলের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া গেলাম। যাহাকে পাইয়াছি, ঠাকুর জানেন। পাঠ হয় ঠাকুরের জীবনী—যামাইকে গঙ্গা পার করা ইত্যাদি।

৭ই মার্চ

ঠাকুর, কবে হইতে আরম্ভ করিয়াছি কড় ঠেলিয়া দুর্গম পথের যাত্রা; এই কড় কি শান্ত হইবে না তোমার চরণস্পর্শে তোমার বিশ্ব গড়িয়া তুলিবার উপযোগী করে? আমার আবেষ্টন গড়িয়া তোল। আমি তোমাকে ধরার বুকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। পাশ্চাত্ত্য ঘুরিয়া আসিলে যে ঐশ্বর্য লাভ হইত, তাহা দিয়া ভারতে তোমার প্রতিষ্ঠা সহজ হইত হয়ত; যেমন পরমহংসদেবের হইয়াছিল। কিন্তু সে ঐশ্বর্য তো চাই নাই। ভারতবর্ষে থাকিয়া, এখানের অনাদর অবজ্ঞা পরিপাক করিয়া এখানে থাকিয়াই তোমার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না? ঘর দিয়া কি ঘরের ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না? ঘরের প্রচারের জন্য বাহিরকে ডাকিতে হইবে? ঘরের বুকে বাহির নাই? সেই বাহির ঘরকে উঁচু করিয়া তুলিলেই তো ঘর দিয়া ঘরের ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা হইত। সকালে সুবোধ মুখার্জী (লাইব্রেরীয়ান) আসেন, সুইডেনের এস. গোস্বামীর বাবদ ৫৲ টাকা দিয়া যান।...কেন আমার কাছে লোক আসে না? যাহারা আসে তাহারাই বা টেকে না কেন? এই প্রশ্ন বার বার মনে উদয় হয়। আমি যদি বাক্ চক্ষু শ্রোত্র মনের দ্বন্দ্ব-পাপবিদ্ধ পথ বহিয়া চলিতাম, যদি আত্মার পথে কিংবা অনাত্মার পথে, যদি সাত্ত্বিকতার পথে, নয় রাজসিকতার পথে, নয় তো বা তামসিকতার পথে চলিতাম, তবে এক দল না এক দল অবশ্যই পাইতাম। কিন্তু চলিয়াছি দলাদলি রহিত প্রাণের পথ ধরিয়া। কে আমার সঙ্গে দল না বাঁধিবার পথে আসিবে? দলাদলি ছাড়া, কোনও এক ব্লকে যোগদান না করা ছাড়া মন এক পা'ও চলিতে পারে না। তাই কেহ আমার সঙ্গে আসে না, আসিবেও না। তবু আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। সবদল এক হইয়া পুরুষোত্তমের ভজনা করিবে, কে এই সাধনা নিবে? তাই আমি একা, বড় একা। তুমি আছ আমার সঙ্গী। সকালে ১১টায় প্রতিভা নারায়ণপুর হইতে আসে...। দলাদলির মধ্যে সর্বদল সমন্বয়ের বারতা কে শুনিবে? দল ছাড়া মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতে পারে না। কেবলে কেবলে দল করার মত কঠিনতম সাধনা লইয়া আমি পড়িয়াছি। তাই নাজেহাল হইতেছি। তবুও বাঁচিব; প্রাণ আমার সহায়।...

৬ই মার্চ

প্রাণবল্লভ নিত্যগোপাল আমার, এ কূলে ও কূলে আপনার বলিতে আমার কেহ নাই—আত্মার কূল অনাত্মার কূল আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। আমি আজ দুকূলত্যাগিনী, একমাত্র মধ্যম প্রাণ-প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছি। কে আমার শরণ? 'শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও দুটী কমল পায়'! মধ্যম প্রাণের খোঁজ পাইয়াছি তোমার চরণতলে! এই প্রাণের মধ্যে বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন সব মহানির্বাণ

দেখিব, শুনিব ও মনন করিব। মনের দ্বন্দ্ব পাপবিদ্ধতা আমার জীবন হইতে মুছিয়া যাউক। সত্যব্রতের চিঠি নিয়া সিমলাই আসে। ৮০ টাকা দেই।...ঠাকুরের মুখের দিকে তাকাইয়াই চলিব। যে দায়িত্ব তিনি 'সম্প্রতি' পূর্ব্বক রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা যথাযথ পালন করিবার জন্য প্রাণপণ করিব। ইহা শুরুতর কঠিন কাজ বলিয়াই মানুষ আগাইয়া আসে না। ইহার মধ্যে তো হুজুগের স্থান নাই, মনের এ-কূল ও-কূলের স্থান নাই: তাই মানুষের প্রাণ মানিলেও মন বুদ্ধি সায় দেয় না। প্রাণ ও মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে বলিয়াই প্রাণের কথামত মন-সর্বস্ব বর্ত্তমান সমাজের মানুষ চলিতে পারে না। ইহার জন্য কাহাকেও দোষ দিয়া লাভ নাই। ঠাকুর এই প্রাণের পথ দিয়া অনেক দূর তো আমাকে আনিয়াছেন বাকী পথও নিবেন ইহাই তাঁহার অচ্যুত ধর্ম্ম। আমাকে তিনি ছাড়েন নাই, আমিও ছাড়িতে পারি নাই। ছাড়িবার মত অনেক ঘটনাই তো ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার কৃপায় ছাড়া হয় নাই। আজও তাঁহার চরণে পড়িয়া আছি। ৮৯ পর্যন্ত পাঠ হয়। পুলিনের ঘর-ভাড়া বাবদ আজ ৫৲ টাকা দেওয়া হয়।...ঠাকুর, আমাকে ঝড়ের মত আগাইতে দেও। সব ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন সৃষ্টির বীজ বপন করিব। ওগো আমার চিরসঙ্গী, তুমি স্থাণু ভুলা এই বিশ্বের শরীরে প্রাণ সিঞ্চন করিয়া গিয়াছ: ইহাতে কি ফলফুল প্রকাশিত হইবে না?

৭ই মার্চ

বিশ্ব আজ মনের বিকল্প—ঐ একান্ত আত্মধর্ম একান্ত অনাত্ম ধর্ম ছাড়িয়া সর্বহারা; প্রাণ তুমি, তোমার পরশ ছাড়া কে এই সর্বহারা বিশ্বকে সর্বপূর্ণ করিবে? তুমি আসিয়াছিলে লুকাইয়া আত্ম:-অনাত্মার ফাঁক দিয়া গলিয়া; লুকাইয়াই গেলে। কেহ মন বুদ্ধিদ্বারা তোমাকে ধরিতে পারে নাই। কেন তুমি আমার কাছে, আমার মত সর্বতোভাবে রিক্ত একটি ছোট মানুষের কাছে ধরা দিলে? আমি যে তোমাকে নিয়া বিপন্ন। কেমন করিয়া আমি তোমার ব্রহ্ম হইব, যজ্ঞ হইব, লোক হইব?...আমি কি তোমার সেই আরব্ধ কর্মকে পূর্ণতার পথে আগাইয়া দিতে পারিব? তাই যেন হয়, ঠাকুর। 'প্রজ্ঞাবাদাং চ তাবদে'র ব্যাখ্যা হয়। প্রজ্ঞাবাদের ভাষাই 'এক' 'পূর্ণ' প্রভৃতি শব্দকে static করিয়াছে, 'abstracting of universals from the infinite multiplicity of appearances'। সর্ব বিশেষকে বাঁচাইয়া রাখিয়া 'এক' হওয়ার দর্শন প্রজ্ঞাবাদ দিতে পারে নাই। পুত্রের প্রতি মায়ের বিশেষ টান যেমন সত্য, বিশ্বপুত্রের জন্য আকর্ষণও তো মিথ্যা নয়। তাই পুরুষোত্তম সর্ববিশেষ ঘনিত, সর্ববিশেষ সমন্বিত। সঙ্ঘের ভিতরেই সর্ববিশেষের সমন্বয় সম্ভব। তাই অদ্বৈতবাদের চরম প্রতিষ্ঠা হইতেছে সঙ্ঘে। ছয়টার একটু পরে মহেন্দ্র দত্তের বাড়ী মনোহর-পুকুর রোডে রেণুসহ যাই ...দুর্গামোহনবাবু সভাপতি হন। হীরালাল দাশগুপ্ত প্রণাম করে ও সাদর সম্ভাষণ জানায়। কিছু আলাপ হয়। যোগেশ বাগলের সঙ্গে দেখা। সে পিরোজপুরে সর্বপ্রথম আমার বক্তৃতা শোনে। সেই বক্তৃতা নাকি ৪ ঘণ্টা হইয়াছিল কালী-বাড়ীতে। আমাকে সহ সভাপতি করা হয়। আপত্তি করি নাই। রেণু আবার যাইয়া নিয়া আসে।...

৮ই মার্চ

ঠাকুর, এতদিনকার চেনা জগৎ আজ অচেনার মত হইয়াছে, আমি অচেনার মত, অপরিচিতের মত ইহার বুকে চলিয়াছি, কবে তোমার চরণ-চিহ্নাঙ্কিত জগৎকে তোমার বলিয়া চিনিব? আমার বিশ্ব, প্রত্যেকের বিশ্ব নির্বাণ লাভ করুক, সকলের সকল মনঃকল্পিত বিশ্ব তোমার জীবনে জীবন লাভ করিয়া বাঁচিয়া উঠুক। এই বিশ্বের প্রতিটি ধূলিকণাও যে নিত্য, তাহার বুকে রহিয়াছে অনন্তের কান্না। এ কান্না তো মায়া নয়। এ কান্না ব্রহ্মেরই মত সত্য। ব্রহ্মজ্ঞানেও এ কান্না রহিয়া যায়। এই কান্নারই ঘনরূপ শ্রীরাধা—উন্মুক্ত জীবনপ্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছে অনন্ত জীবনের অভিসারে। গতিমূর্তি শ্রীরাধা অন্তর্যুক্ত হউন।...ঠাকুরের দর্শন লইয়া সমাজের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবার জন্য প্রাণ ছটফট করে। কিছুতেই তো আগাইতে পারিতেছি না।...মন মন না হইলে আগাই কি করিয়া? প্রাণের উপাসক কি এখনও আসে নাই।

যাহারা প্রাণের এক প্রান্তের বা অপর প্রান্তের উপাসক, আমি তাহাদের কে? তাহারা আমাকে আপনার মনে করিবে কেন? আমাকে কোন্ একাকিত্বের দিকে ঠাকুর নিয়া চলিয়াছেন?···চিঠির ভিতর প্রাণের স্পর্শ পাই না। সকল প্রাণ দিয়াই তো চাহিয়াছিলাম, আমার জীবনের সকল দায়িত্ব তো দিতে চাহিয়াছিলাম। নিল কই?···

২রা মার্চ

ঠাকুর, তোমার জীবন ও দর্শন আমার সকল দেহ-প্রাণ-মন নিংড়াইয়া গড়িয়া উঠুক, সৃষ্ট হউক। আমি তোমাকে ধারণ করিব, বিশ্বের সামনে প্রকট করিব। পরম প্রেমযোগে আমি রাধা-ভাবাপন্ন, রাধা-স্বভাবাপন্ন হইব, তোমার সঙ্গে জীবনে জীবনে এক অদ্বৈত হইব—সারা জীবন তো ইহাই চাহিয়াছি। তোমার বিশ্ব-বিজয় অভিযান সার্থক হউক আমার জীবনে। তোমার চরণ স্পর্শে ধরার ধূলি ব্রহ্মধূলি হউক, ধরার মানুষ ব্রহ্মমানুষ হউক।···বৈকালে নকুলেশ্বরবাবু আসেন, আকৃতা (বজরার লাইনে) গ্রামে একটী জায়গা কিনিবার প্রস্তাব লইয়া আসেন। চারুবিকাশ তাঁহার জামাতার সঙ্গে দেখা করিবার কথা বলেন। তাহার পর অনেক কথা হয়। ৮।৯টার পর যান। গুরুর প্রয়োজন আছে কি না প্রথমে এই জিজ্ঞাসা নিয়া কথা আরম্ভ হয়। ঘুরিয়াছেন অনেক স্থানে, শুনিয়াছেন অনেক কথা। কিন্তু কোথাও মন বসে নাই। বলিলাম, বর্তমান যুগের যাহারা একটু চিন্তাশীল, তাহাদের মধ্যে সব মতবাদের মূল কথাগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে, প্রত্যেকেই যে যাহার নিজস্ব মূল্যে অস্তিত্ব দাবী করিতেছে, কোথাও গিয়া স্থির হইবার সুবিধা আজ আর নাই। বিচারের পথেই যখন চলিতে হইতেছে, তখন বিচারের ক্ষেত্র আরও ব্যাপক করিয়া তাহার মধ্যে সব মতবাদকে, সব এলোমেলো চিন্তাধারাকে গুছাইয়া লইতে পারিলেই প্রাণতত্ত্বের স্ফুরণ হইবে, শান্তি আসিবে। বিশ্ব খুঁজিয়া মানুষ আজ মনের গুহা ভিঙ্গাইয়া প্রাণের সন্ধানী হইয়াছে। অথচ, প্রাণ-দর্শনকে সকল দেহ প্রাণ মন দিয়া গ্রহণ করিবার সামর্থ্যও আসিতেছে না। আমি এই ভিন্ন ভিন্ন ভিন্নটা মেরা করিতে পারি বলিয়া আমি ধরি। জিনেটারলীপ বর্তমান যুগে অচল। বুঝিয়া সুঝিয়া নিতেই হইবে। 'বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ'—বুদ্ধি দ্বারা প্রাণকে বুঝিবার দিন আজ আসিয়াছে। এই আলোচনার জন্য পাঠ আর হয় নাই।···

১০ই মার্চ

ঠাকুর, তোমার জীবনের ছাঁচে আমার জীবনকে এমনভাবে গুছাইব, সাজাইব যাহাতে তোমার বসিবার আসন রচিত হইতে পারে। আমার দেহমনপ্রাণে এমন একটী একতান সুর ধ্বনিত হইবে যাহা বাঁধা থাকিবে তোমার বাঁশীর সুরের সঙ্গে। তোমার বাঁশী বাজিত রাধা নামে। বৃন্দাবনে যে কান্না তুমি রাধারাণীকে কাঁদাইয়াছ, নদীয়ায় তুমি সেই কান্না কাঁদিয়া গেলে 'রাধা' 'রাধা' বলিয়া রাধারাণীর মান প্রতিষ্ঠায় লাগিয়া। আমার জীবনে তুমি ফুটিয়া ওঠ, প্রতিষ্ঠিত হও।···ঠাকুরের জীবন ও দর্শনের মত এত বড় জীবন ও দর্শন পাইয়াও বিশ্ব আজ 'সর্বহারা'—এই দুঃখ বড়ই মরমে বাজে। ঠাকুর, ইহার কি কোনও উপায় নাই? কেন তুমি আসিয়াছিলে? বিশ্ব কি তোমাকে নিবে না? বিশ্বকে কি তোমার মত জীবন নেওয়ানো যাইবে না? আমার প্রাণ যে কেমন করে, ঠাকুর, তুমি কি দেখ না? আমাকে তো কিছু দাও নাই প্রাণ ছাড়া? আমার ধন নাই, জন নাই। ঝড়ের মতন ছুটিতে চায় প্রাণ, একটা প্লাবন আনিতে চায় প্রাণ যেমনটী অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমার জীবনে আসিয়াছিল। সেই ছবি তো আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে। মনে হয় যেন প্লাবন আসিলেই হয়, একটা প্লাবন যেন চতুর্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, ঠিক আসিতেছে না। প্লাবনের, জলস্রোতের গর্জনও যেন শুনি। এই যেন কাছে। কিন্তু কাছের জিনিষকেও ঠিক কাছে পাইতেছি না। কি করিব আমি তোমাকে নিয়া? তোমার শতশত জন্মবর্ষ আসিয়া পড়িল। কে সে জন্ম বসিয়া আছে? মাথা ঘামাইতেছে? ঠাকুর, আমাকে পথ দেও। আমি তোমারই।···

১১ই মার্চ

ঠাকুর...তুমি আলো আমি আলো...তুমি আর আমি

নাই—'ছাড়াতপরোরিব'। আমি কি বিষয় তোমাকে সৃষ্টি করিতে পারিব না? তুমি কি লুকাইয়াই থাকিবে, কাঁথা মুড়ি দিয়াই থাকিবে? আমি তোমাকে আমার জীবনে প্রকট করিবার জন্য ব্যাকুল, ওগো স্ব-প্রকাশ, আমি তোমার স্ব হইব, তুমি তোমার স্ব রূপ আমাতে প্রকাশিত কর। আমি তোমার স্ব, তুমিও আমার স্ব। তোমার আমার পরম প্রকাশের ভিতর দিয়া বিশ্ব নূতন রূপে প্রকাশিত হউক।...

১২ই মার্চ

ঠাকুর, প্রায় ১০০ বৎসর হইল, তুমি ধরার বুকে পা দিয়াছিলে। অজ্ঞাতই রহিয়া গেলে, অবজ্ঞাত তুমি। তুমি প্রাণ, মহাপ্রাণ, বিশ্বপ্রাণ, তাই বুদ্ধিমানদের বিশ্বে তোমার স্থান কোথায়? অথচ প্রাণবল্লভ তুমি না হইলে মন-বুদ্ধি কেহই তো দাঁড়াইতে পারিবে না। তোমারই পরাশক্তি শ্রীরাধা মহাযোগিনী শক্তি, সমগ্রের শক্তি। এই শক্তি স্রষ্টা-সৃষ্টকে, ভোক্তা-ভোগ্যকে, ব্রহ্ম-মায়াকে এক সমন্বয়ের মধ্যে যুক্ত করিতেছে। কবে তোমার বিশ্বকে তোমারই ছাঁচে গড়িয়া তোমার চরণে নিবেদন করিব? আমাকে কি সেই অধিকার দিবে না? সুযোগ দিবে না? তুমি কায়া, আমি তোমার ছায়া—এক ও অদ্বৈত তুমি আমি।...বিমলকুমার দাশগুপ্ত গত ২০শে ফাল্গুন সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছেন,...। বিমল বিশেষ বন্ধু ছিল। অনেক সেবা করিয়াছে। স্বরাজসেবক সঙ্ঘে দীর্ঘদিন তাহার স্ত্রী, 'বুড়ী' নামে, ।৵০ টাদা দিয়াছে। উপবাসের পরে ছানা খাওয়াইয়াছে। অনেক সময় অনেক কিছু সাহায্য করিয়াছে। যখন বরিশাল যাইতাম, আদর করিয়া খাওয়াইত। এখানে আসিয়াও অনেক দিন আসিয়াছিল। আমিও প্রাণ খুলিয়া উহাদের সঙ্গে মিশিয়াছি। বিমল 'সত্যব্রত সমিতি'র সভ্য ছিল। তাহার বাড়ীতেও আলোচনা হইত। বারবার তাহার শ্রাদ্ধে যাইবার ইচ্ছা হওয়া সত্ত্বেও যাওয়া হইবে না।...

১৩ই মার্চ

ঠাকুর, তুমি ছাড়া আমার বাঁচিয়া-থাকা, আমার জানা-শুনা, আমার আনন্দের কোনই সত্তা নাই। তুমি আমার সর্বস্ব। তুমি আছ তাই আমি আছি, তোমার জ্ঞানেতেই আমার জ্ঞান, তোমার অহঙ্কারেই আমার অহঙ্কার, তোমার মননেই আমার মনন। তোমার বাহিরে আমি মিথ্যা। তোমার আমার ভিন্ন দর্শনের মহানির্বাণ হউক—তুমি আমি এক অদ্বৈত—এক তত্ত্ব, এক প্রাণ, এক মন, এক বিজ্ঞান, এক আনন্দ। তোমার অবতরণের প্রয়োজনকে আমি সকল দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি অহংকার দ্বারা সার্থক করিব—আমার জীবনের ইহাই ব্রত, ইহাই লক্ষ্য, ইহাই সাধনা।...সে-ও কাছে আসে নাই, আমিও কোন কথা বলিতে পারি নাই। কি আমি বলিব? আমার সকল কথা ফুরাইয়া গিয়াছে। ভাবিয়াও কোন কথা পাই নাই।...মহানির্বাণ মঠে নামি। আরতি শেষ পর্যন্ত ঠাকুর ঘরের বারান্দায় বসি। ফিতীশ ও রমাপতি উৎসবে বক্তৃতা কোন্ দিনে হইলে ভাল হয় আলোচনা করে।...বিমল নিতাগোপালের জীবন ও দর্শন। ঠাকুর ঘরের বারান্দায় মনে হইতেছিল—শতবার্ষিকী উপলক্ষে একবার পশ্চিমবঙ্গে tour করিব, এক হাজার কপি 'শ্রীনিতাগোপাল জন্ম শতবার্ষিকী স্মৃতিপূজার প্রস্তুতি ছাপাইবার কথা মনে হইল। বাহির হইলে বিক্রয় হইবে সাক্ষাৎভাবে ঠাকুরের সেবা তো বক্তৃতাদ্বারা করি নাই ঠাকুর, আমাকে বল দেও, সুযোগ দেও। আমার ধন জন কিছুই তো নাই অথচ তাহা ছাড়া কি করিয়া তোমা কথা ছড়াইয়া দিব।...আমি আজ বয়সে মনে অ একেবারেই পঙ্গু। তুমি ইচ্ছা করিলে পার।...কোন্ দিন যে ইহারা আমার সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাহা ইহাদে চাল-চলন দেখিলে মনে হয় না। কত পৃথক ইহারা হই পড়িয়াছে? আমি কেমন করিয়া ইহাদের সঙ্গে সম্প বজায় রাখিব? আমি সম্পর্ক ছিন্ন করি নাই, করিব না ইহারা যদি ছিঁড়ে, কি আমি করিতে পারি? পাঠ হয়।

১৪ই মা

ঠাকুর, তোমাকে বুকে লইয়া আমি আজ নির্জ প্রান্তরে দাঁড়াইয়াছি, উপরে নীল আকাশ, নীচে বিশা ধরণী। সংসার আমি ছাড়ি নাই, প্রাণপণে আঁকড়াই রাখিতেই চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সংসার আমাকে ছাড়ি

যাচ্ছে। বেশ হইয়াছে। আজ তুমি আমি মুখোমুখী দাঁড়াইয়াছি। তোমার শ্রীচরণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিব। ভিখারিণীর আর কি সম্বল আছে? আজ তোমাকে তোমার মত করিয়াই চিনিয়া লইব, বিশ্বের নাথ বলিয়া চিনিব। অনাদরে চলিয়া গিয়াছ; তুমি যশোদার আদরের ধন, ব্রজবালকদের প্রাণবন্ধু, রাধার পরাণ-বঁধু; তোমাকে আদর আমি করিব।...পাঠে নির্বিশেষ মানুষ ও সবিশেষ মানুষের কথা আলোচনা হয়। মানুষ-দ্রৌপদীর বিশেষ রাখার কথা বাদ দিয়া অর্জুনের দুর্যোধনাদির জন্ম কাঁদাতে কি নির্বিশেষ মানুষ তৃপ্ত হন? মানুষের বৈশিষ্ট্যকে মর্যাদা দিয়া যে নির্বিশেষ, তাহাই গীতায় সম্মানিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যগোপাল ইহাই প্রচার করিতে আসিয়াছেন। মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে যে বহু শক্তি ও সময় মানুষের অপচয় হয়, তাহার ঠিকানা নাই। মানুষের জীবন যদি সহজ, সরল, সুস্থ হয়, কত সময় তাহার হাতে আছে। ঘরের ফ্যাসাদ মিটাইতে মানুষের প্রচুর সময় ও শক্তির বাজে ব্যয় হয়, বাহিরের কাজ করিবে কখন? তাই নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবানের ভজন করিবার কথা নারদ শুনাইয়াছেন। গৌর সাহা ও নচিকেতাবাবু আসে···পবিত্র আসে। যাদববাবুর ছাত্র অমরেন্দ্রবাবু আসে। গ্রাহকের ৪৲ টাকা দিয়া যায়।

১৫ই মার্চ

ঠাকুর, আমার বিচ্ছিন্ন মন-বুদ্ধি যে জাল আমার চতুর্দিকে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা ছিন্ন করিয়া তোমার চরণ-তলে আমিকে নিবেদন করিব—এই লালসার মনের পিছনে কখনও ছুটি নাই, মনের Either-orকে মানিয়া কখনও চলি নাই, দুই পক্ষকেই তুল্য মূল্য দিয়াছি। আমার মন তোমাতে মহানির্বাণ লাভ করুক। আমার দেহ তোমার হউক, মন তোমার হউক, বুদ্ধি তোমার হউক, আত্মা তোমার হউক। আমার যা কিছু সব তোমাকে দিয়া, তোমার সব কিছু লইয়া তোমার সংসারে বিচরণ করিব। আমার বিচ্ছিন্ন মন বুদ্ধি তোমার সংসারে অচল। তাই তো সেই রাবণরাজার পেট কাটিয়া সোনার ডিম বাহির করিবার প্রচেষ্টার গল্প। এ দেশের ব্রহ্মজ্ঞানীরাও কি ইহাই করেন নাই? অনাত্মা প্রকৃতি তাহার creative process-এর ভিতর দিয়া নিত্য নূতন তত্ত্ব সৃষ্টি করিবেন। কিন্তু এক দিনে একই সময়ে সমস্ত বস্তু জানিবার অত্যাগ্রহে মূঢ়া প্রকৃতিকেই বিশ্লেষণ করা হইল, পেট কাটিয়া ফেলা হইল। প্রকৃতি মরিয়া গেলেন, ব্রহ্মও শূন্য হইলেন। প্রকৃতিই ব্রহ্মবস্তু, পরমাত্মবস্তু। ভগবদ্-তত্ত্বকে প্রসব করিবে অনন্ত কাল ধরিয়া। হঠাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে যাইও না, কালকে স্বীকার করিয়া চল, কালের বুকেই ব্রহ্মকে নূতন করিয়া অনন্ত কাল পাইবে। ইহাই dynamic philosophy।...সমস্ত দিনটা রাতের উদ্বেগে কষ্ট পাইয়াছি।...সন্ধ্যার পর আমার ঘরে পাঠ হয়। ভগবানের অযাচিত করুণার মধ্য হইতে, তাঁহার আমাদের জন্ম ব্যাকুলতা হইতেই যে আমাদের সাধনার আরম্ভ, ঠাকুরের সমগ্র লীলার মধ্যে ইহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভক্তগণ যে তাঁহার ইষ্ট, ইহা তিনি বার বার ঘোষণা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার ইষ্ট—ইহা বুঝিবার জন্ম আমাদের চিন্তা প্রণালীর মধ্যে যাহা যাহা বদলানো দরকার, তাহাই তো সাধনা পদবাচ্য। তিনি আমাদের ইষ্ট—ইহা লইয়া এতদিনকার সাধনার আরম্ভ। বর্তমান যুগের সাধনার আরম্ভ হইবে 'আমরা তাঁহার ইষ্ট'—এই মহা সত্য হইতে। সাধনায় তাই আকাশ-পাতাল পার্থক্য হইয়াছে।

১৬ই মার্চ

শ্রীরাধা আমার,...বিশ্বে তুমি চির অনাদৃতা, কলঙ্কিনী বলিয়া অবহেলিতা, অথচ তুমিই বিশ্ব-প্রকৃতির চরম সার্থকতা। কি দিয়া তোমাকে আদর করিব? তোমার প্রতিষ্ঠান তো বিশ্বের বুকে গড়িয়া তুলিতে পারিলাম না? যেরূপ করিয়া প্রকৃতিকে গুছাইলে সেখানে পুরুষোত্তম-বস্তু গড়িয়া উঠিতে পারিতেন, তেমন করিয়া গুছাইবার জন্মই প্রাণপণ করিলাম। তুমি নিত্যগোপাল-রূপে আসিয়াছ। তুমি 'আমি' হইয়াও দেখা দিয়াছ...।...

সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া দিতে হইলে সব করিতে হয়। চেষ্টা করিব। প্রাণ দিয়া যতদূর সাধ্য ঠাকুরের দর্শন এই শত বাধিকীর মধ্যে ঘনাইবার চেষ্টা করিব।

১৭ই মার্চ

রাধারাণী, তুমি পরস্পর বিরুদ্ধধর্মবহা। তোমার যুক্ত জীবন-প্রবাহে আসক্তি-অনাসক্তি মিলিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। তুমি সকল গুণে বিচরণ করিয়াও গুণাতীত। তুমিই সংসার বারিতে স্নানান করিয়াও দেহ ভিজাও নাই। আমি এমন জীবনের সঙ্গে এক হইব দেহে প্রাণে মনে বিজ্ঞানে আনন্দে-আত্মায়। পরম প্রেমযোগে আমিই রাধা, রাধাই আমি। তাহাই তো তুমি আমাকে দেখাইয়াছ। তুমি আমার স্বরূপ, আমার বিশ্বরূপ। আমি তোমার সঙ্গে উন্মাদিনী হইয়া ছুটিব এই বিশ্বকে তোমার রূপে রসে গড়িয়া তুলিবার জন্য, পুরুষোত্তমচরণে নিবেদন করিবার জন্য। ঠাকুর, তোমার বিশ্ব তোমারই হউক। রেণু ১টায় বাহির হইয়া ...টায় ফেরে।...কিন্তু তাহার অযোগ্যতার জন্য বিমর্ষ। আমি জানি, যোগ্য একমাত্র ভগবান। যে যতখানি ভগবানের সঙ্গে যুক্ত, সে ততখানি এই সংসারে বিচরণ করিয়া সংসারের যোগত্যা লাভের অধিকারী হয়। 'তস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বম্ এব বিজ্ঞাতম্'। ভিখারীর মত দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া কি তুমি জানিবে? তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া কি তুমি জানিবে? মানুষ কি জানে কি তাহার ভবিষ্যৎ? গোপা কি তাহার নিজের অবস্থা জানে? একটা আবরণ মানুষের চতুর্দিকে ঘিরিয়া আছে। অহং লইয়া সে আবরণ কি ছিন্ন করিতে পারিবে? অথচ এতদিন সেই প্রচেষ্টাই চলিয়াছে। আমার চতুর্দিকে আবরণ করিয়া আছে অনাত্মা প্রকৃতি, গর্ভস্থ সন্তানের চারিদিকে রহিয়াছে জরায়ু। আজ বুঝিতে হইবে যে, একই জীবনীশক্তির দুইটী প্রকাশ ঐ সন্তান ও তাহার চতুর্দিকের জরায়ু। ইহাই ঠাকুরের আত্মানাত্ম সম্বন্ধের গূঢ় তাৎপর্য। জরায়ু সন্তানকে আবরণ করিয়া রাখে বহির্জগতের রূঢ় স্পর্শ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই। যখন সে বাহিরের আবরণ করিয়া দেখ, মুক্ত করিয়া দেয়। যতদিন মাতৃগর্ভে থাকে, ততদিন নাড়ীর যোগে মায়ের শরীর হইতে রক্তমাংস আহরণ করে। সংসারের সবকিছু positive বাঁধা দিবার জন্যই বসিয়া নাই: সবই creative। আমার ঘরে পাঠ হয় ঠাকুরের জীবনী। নলহাটির বই আরম্ভ করা হয়।

১৮ই মার্চ

ঠাকুর, তুমি আদর করিয়াছ, মধুর বচনে আহ্বান করিয়াছ, হাত পরিহাস করিয়াছ, হুগলী মঠে ছানার পোলাও হইলে 'ও হরি, পরং যাইবে না' বলিয়া দুঃখ করিয়াছ, বিশ্বন্ধুর উৎসবে তাহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলে, 'তোমার দিদিমণি (অর্থাৎ আমি) যে আজ যাইতেছে তাহার কি করিবে'? আমার ইহার চেয়ে আর গৌরবের কি আছে? কি আমার মূল্য আছে তোমার স্নেহ পাওয়া ছাড়া? মায়ের কাছেই সন্তানের মূল্য, মায়ের কাছে সন্তান রাজা। কোথায় থাকিত ব্রজমোহন স্কুলের ৪০৲ মাহিনার মাস্টার আমি, তোমার সঙ্গে যদি যুক্ত না হইতাম? যাহা-কিছু তোমার, সবই আমার। তোমার যোগ্যতা আমার, আবার আমার কি স্বতন্ত্র পাওয়ার আছে; তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কি আমি পাইব? তোমার সঙ্গে যুক্ত থাকাই আমার সর্ব প্রথম যোগ্যতা; তাহার পর অন্য যোগ্যতা যা হয় আসিবে। তোমার স্নেহই আমার ধ্যানের বস্তু। তুমিই আমার ভাবনা; আমি আমার পাওয়া না-পাওয়ার প্রশ্ন লইয়া তোমার কাছে ধৃষ্টতা করিব না। যা আমায় পাইতে হইবে, তুমি দিও আমি কি জানি কি আমার পাইতে হইবে, কি আমায় হইতে হইবে? অতীত সামনে নাই, ভবিষ্যৎও নাই তোমাকে বুকে লইয়াই চলিব। ৮টার পর মন্মথনিংহো বঙ্কিম কাব্যতীর্থ আসেন; কত কথাই হয়। ১১টায় যান। নীহারের মৃত্যুতে আমি বিহ্বল হইয়াছিলাম কি না, সে আর্থিক সাহায্য সে করিয়াছিল তাহা বন্ধ হওয়ায় আমি দুর্গতির মধ্যে পড়িয়াছি কি না, এখানে আসায় এত বড় দায়িত্বের চাপে মুষড়াইয়া পড়িয়াছি কি না—প্রশ্ন করেন

হই নাই। Static ব্রহ্মের চর্য্যা একরূপ এবং dynamic ব্রহ্মের চর্য্যা অন্যরূপ, বর্ত্তমান নাম-রূপ ঠিক পথে চলিতেছে না—'অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি' ইত্যাদি শ্লোক, ধর্ষিতা নারীদের কথা, পাকিস্থানে বেতা না খাওয়ার কথা আলোচনা হয়। পণ্ডিত বেশ উদার। এতক্ষণ কথা বলিবার লোক বেশী নাই।...এমন ঠাকুর পাইয়া যেন ব্যর্থ না হই, পাওয়ার মাত্রা লইয়া অশান্তি না পাই। পাইয়াছি, ধরা দিয়াছেন —ইহাই যথেষ্ট। অনন্ত কাল বসিয়া পাইব। মোটে তো পাওয়ার এই সুরু। হাঁসের পেট কাটিয়া সোনার ডিম পাইবার বুদ্ধি যেন কোন দিন না হয়।...

১৯শে মার্চ

ঠাকুর, ওগো নর-নারায়ণ আমার, তুমি নরের মূল্য নারায়ণের মূল্যে এবং নারায়ণের মূল্য নরের মূল্যে সমন্বয় বিধান করিয়া অদ্ভুত নর-নারায়ণ। তুমি ঈশ্বর, তুমি মধুর। তোমাতে ঐশ্বর্য ও মাধুর্য সমন্বিত রহিয়াছে। এমন তোমাকে পাইলাম, অথচ তোমাকে দিয়া বিশ্বকে আবিষ্ট করিতে পারিলাম না। বড় বাধা আমার। তোমাকে পাইয়াছি, এই মাত্র জানি। কতখানি পাইয়াছি সে প্রশ্ন আমার নাই। অনন্ত জীবন ধরিয়া তোমাকে পাইব। তোমাকে পাওয়া তো ফুরাইয়া যাইবে না। সকল ব্যষ্টির জীবনে, সকল বিশ্ব-জীবনে তোমাকে পাইব। বিশ্বের জ্ঞান-ধারা ও অজ্ঞান-ধারা তো তোমারই সমগ্র জীবন-ধারার দুই বিকাশ। জ্ঞানের বিকাশ অজ্ঞানতা। তাই তুমি লিখিয়াছ, 'নিত্য জ্ঞানও ভাল, নিত্য অজ্ঞানও ভাল'। তুমি আমার সর্ব্বস্ব। মা গৌরী, তোমার নিত্য-গোপাল আমার হউক।...৮টায় শিশির আসে। ২ জন গ্রাহকের টাকা ও ৩ জনের ভি, পি করিবার জন্য নাম দিয়া যায়। এখানের ঠাকুর সেবার জন্য ১০৲ টাকা দিয়াছে, চাহিয়া রাখি। ১০ টায় পর যায়।...৪৷৷০টার পর আমি রেণু গোপা মঠে যাইবার জন্য বাহির হই।... ৮টায় পাঠ হয়। ঠাকুরের যোগ্যতা ছিল সকল দিকে—শরীরে ছিল অসীম বল, উৎকৃষ্ট রান্না করিতে পারিতেন, খাইতেও পারিতেন প্রচুর, স্মৃতিশক্তি ছিল অদ্ভুত, শাস্ত্রপাঠও ছিল প্রচুর, লোকের সঙ্গে ব্যবহার-নিপুণ তাঁহার মত কয়জন আছেন? শৃঙ্খলা-বোধ উজ্জ্বল, অথচ বৈরাগ্যের চরম উৎকর্ষ তাঁহার ছিল।...

২০শে মার্চ

কমলা:

মৃত্যু

॥ শ্রীভাস্কর দাশগুপ্ত ॥

হাজার মৃত্যুর দ্বার পার হয়ে এসে—
হঠাৎ পেলাম মনে অমৃতের আশ্বাস।
চকিত স্বপ্নের ঘ্রাণে বুক ভরে টেনে নেই
হৃদয়-হরীণ্ কবা সবুজ নিশ্বাস;
মৃত্যু নব জীবনের অসীম আকাশ।

মৃত্যু আছে যুগে যুগে, কালে কালে
সৃষ্টির আদিম উষা হতে
মৃত্যু আছে মনের সুধায়।
মৃত্যু আছে স্বপ্নের, আদর্শের
আনন্দের অমেয় সুধায়।

মৃত্যু আসে শান্তি নিয়ে
সুপ্ত হৃদয় দেয় ভ'রে।
দুহাতে উজাড় করে সমস্ত স্নেহের ধারা
পরম আদরে,
করুণ বৃষ্টির মত—
সহস্র চুম্বন নামে তৃষিত অধরে।

আনন্দ পেতে হ'লে, হে জীবন!
বেদনাকে বোঝ
বৃথাই প্রয়াস তব সুখের সন্ধানে।
মাটিতে, আকাশে, জলে—
আকাঙ্ক্ষা মেলে দিয়ে,
হৃদয়ে হৃদয় যোগ কর;
মৃত্যু আছে তাই আছে জীবনেরও মানে।

সাময়িকী

ভগবান বুদ্ধ : বৈশাখী পূর্ণিমার শুভ মুহূর্তে ভগবান বুদ্ধদেবকে আমাদের প্রণতি নিবেদন করি। ভারতবর্ষের বুকে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন আড়াই হাজার বৎসরের বেশী হয়ে গেল। অথচ আজও আমাদের মত ক্ষুদ্রতম মানুষেরাও তাঁকে স্মরণ করছি! কী অদ্ভুত কথা! সংসারে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক জন্মগ্রহণ করছে, মরে যাচ্ছে, কে তাদের স্মরণ করছে! অথচ এদেরই মধ্যে কেউ কেউ আসেন যারা কালের বুকে অক্ষয় হয়ে থাকেন। তাহলে তাঁরা নিশ্চয় বিশেষ কিছু সঙ্গে নিয়ে আসেন যা আর লক্ষ মানুষ আনে না। অথচ এই লক্ষ মানুষদের প্রবৃত্তি হচ্ছে ঐ যে বিশেষ কিছু নিয়ে যারা আসেন তাঁদের স্বীকার করতে না চাওয়া। তারা প্রাণপণে বলতে চায় তিনিও তাদেরই একজন—কিন্তু কালের বুকে বেঁচে থেকে তাঁরা দেখতে পায় না যে কে বেঁচে রইল থাক্, দেখা গেল ভগবান বুদ্ধদেব কোটি কোটি মানুষের মধ্য থেকে কালকে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে রইলেন।

তাহলে কি তিনি নিয়ে এসেছিলেন? বুদ্ধদেব সম্বন্ধে আরও একটি বিশেষ কথা এই যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেও বুদ্ধদেব ঠিক ভারতবর্ষের বুকে বেঁচে নেই—যে স্থান তাঁর এখানে হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি—ভারত বর্ষের চিত্তে গৌণ হয়ে গিয়ে মুখ্য হয়ে রইলেন তিনি তিব্বত, চীন, জাপান, শ্যাম, মালয়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশগুলিতে।

কেন এমন হল? ভারতবর্ষে তাঁর স্থান হল না কেন?

এর পরের কথা হল বর্তমান ভারতের আত্মা যে-আত্মা বিকশিত হয়ে উঠতে চেয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও পণ্ডিত নেহরুর মধ্য দিয়ে সেই আত্মা বুদ্ধদেবকে আহ্বান করছে। তাহলে আমাদের ভাবতে হয়, যে-বস্তু সঙ্গে করে আনবার ফলে আড়াই হাজারেরও অধিক বর্ষ পরে আজও তাঁকে স্মরণ করতে হয় তা-ই বা কি, আর কেনই বা ভারতীয়-চিত্ত তাঁকে নির্বাসন করে দিয়েছিল, আজ আবার কেনই বা তাঁকে ফিরে পেতে চাইছে।

সাধারণ ভাবে বলা যায় ভারতীয় চিত্ত স্থিতিশীল অমর অক্ষয় বস্তুর উপাসক, ক্ষণে ক্ষণে যার বদল হয় তাকে কোন পারমার্থিক মূল্য দিতে ভারতীয় প্রচলিত সংস্কৃতি নারাজ এবং এই চিত্তবৃত্তিই প্রধান হয়ে আছে ভারতীয় সমাজে। যা চিরন্তন, যা কালের অধীন নয় তারই জন্য আমাদের আকুতি। কিন্তু বুদ্ধদেব বললেন, সত্য ক্ষণে ক্ষণে নিজেকে প্রকাশ করে যাচ্ছে, সেইটেই সত্যের সত্যকার রূপ—চিরন্তন বস্তু বলে যে কোন বস্তু আমরা কল্পনা করতে চাইছি তাই-ই মিথ্যা। অর্থাৎ ক্ষণবিজ্ঞান-বাদী বুদ্ধদেব গতিধর্মময়, ক্ষণিকের মেলা এই বিশ্বে অহিংসা মৈত্রী নিয়ে সঙ্ঘ-জীবনে বাস করাটাকেই শ্রেষ্ঠ বলে সিদ্ধান্ত করলেন—চিরন্তন বলে কিছুকে মানলেন না, ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব রইলেন, বেদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করলেন না। অথচ ঈশ্বর না মানলে ভারতীয় চিত্ত সোয়াস্তি পায় না, আর বেদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার না করলে তো ভারতীয়-ই হওয়া সম্ভব নয়। স্থিতিশীল ব্রহ্ম উপাসক ভারতবর্ষ বাস্তব জীবনটাকে কখনও পারমার্থিক সত্যতা দেয় না, তাই সঙ্ঘ-সাধনা তার নেই—সে বাস্তব জীবনটাকে কোনমতে দায় সারা সেরে 'মনে বনে কোণে' বসে চিরন্তন যা তাঁরই ধ্যান করে। অর্থাৎ বুদ্ধদেবের জীবন-ধারণা তথাকথিত ভারতীয় জীবন-ধারণা থেকে একেবারে বিপরীত হয়ে পড়েই ভারতবর্ষে স্থান লাভ করতে পারে নি—সেই সঙ্গে বেদ ও ঈশ্বরের স্পষ্ট স্বীকৃতি তাঁর মতবাদে না থাকাও তাঁর ভারতবর্ষে স্থান না পাওয়ার কারণ। এই সব কারণে মহৎ সত্যকে ধারণ করে থাকলেও বুদ্ধদেব ভারতবর্ষের বুকে থাকতে পারলেন না।

কিন্তু বুদ্ধদেব যা নিয়ে এসেছিলেন আজকের দিনে আবার তার প্রয়োজন বিশেষ করে কারো কারো মধ্যে অনুভূত হচ্ছে এই জন্যই যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সম্মেলনের ফলে ভারতীয় স্থিতিশীল জীবন-চেতনা যে আমাদের সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারছে না, আমরা যে

তথাকথিত ভারতীয়ত্ব থেকে অনেক দূরে সরে আসছি এটা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করতে পারছেন। জীবনের গতিধর্মের দিকটি নানাভাবে প্রকাশ পাচ্ছে—তাই গতি-ধর্মের প্রবর্তক—'Father of Dynamism'—ভগবান বুদ্ধদেবকে আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বহু ঘটনায় গতিধর্মী ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ এসে গেছে। তার পরিচয় আমাদের সাহিত্যেও রয়েছে—শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' সে পরিচয়ের স্পষ্টতম নিদর্শন। আমাদের সমাজপতিগণ আজ আর আমাদের সমাজ-জীবনের বিধায়ক নন, আজ রাষ্ট্রই সমাজেরও নির্মাতা ও ধারক বলা যায়। সেই রাষ্ট্র ক্ষেত্র থেকে আজ ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার উপরে যে সকল বিধান জারী করা হয়েছে যেমন অস্পৃশ্যতা বর্জন, নর-নারীর বিবাহ সম্পর্কিত বিধান-গুলি ইত্যাদি—সেখানেও গতিধর্মাত্মক এই বৌদ্ধ দর্শনেরই খোঁজ পাওয়া যাবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে ভারতীয় ব্যক্তি ও সমাজ-চিত্ত মূলতঃ যে বিশেষত্বে গঠিত তা রাষ্ট্রীয় নয়—তাই সেখানে রাষ্ট্রের বিধানই সর্বাংশে কার্যকরী হবে না এবং কালের বুকে জয়লাভ করাও সে বিধানের পক্ষে কঠকর হবে। অস্পৃশ্যতা রাষ্ট্রক্ষেত্রে অপরাধ হলেও আমার ঘরের দুয়ারে পুলিশ নেই, আমি মুচি মেথরকে তার প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা থেকে যদি বঞ্চিত করি, আমি ব্রাহ্মণকেই যদি শ্রেষ্ঠ জাতি বলে বিবেচনা করি—আমাকে কেউ বাধা দিতে পারছে না। তাই আমাদেরকে আজ অনেক কথা বুঝতে হবে। তাই বুদ্ধদেবকে বুঝতে হবে, আবার তাঁর গতিধর্ম বা ক্ষণবিজ্ঞানবাদকে একান্ত করে ভুললে চলবে না—শংকরাচার্য যে স্থিতিশীল জীবন-দর্শন দিয়ে গেছেন তাকেও সমগ্র সত্তার অপরার্ধ বলে বুঝে উভয়ের সম্মেলনে এক নূতনতর জীবন চেতনার খোঁজ পেতে হবে। এই নূতন চেতনা-বোধকে রবীন্দ্রনাথ নানা-ভাবে প্রকাশ করেছেন, শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত তাঁর শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যগোপালকে অনুসরণ করে তৎপ্রণীত বেদান্ত দর্শনের অবধূত ভাষ্যে বৌদ্ধ বেদান্ত সমন্বয়ের অভিনব চিন্তাধারা রেখে গেছেন। তাঁর বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যে এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, 'ক্ষণিকবাদের জগৎ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহারই অপরার্ধ ঐ কার্যকারণ-সম্বন্ধ, সাততাধারা (continuity) স্থিরতা ও তাদাত্ম্যকেও তাহার সাথে সমন্বিত করিয়া এক অখণ্ড পুরুষোত্তমদর্শন আস্বাদন করিতে হইবে। জীবনের বাহির একান্ত বাহ্য ও একান্ত অন্তরতর দ্বারা, একান্ত জড় বা একান্ত চৈতন্য-দ্বারা 'সমুদয়' সৃষ্টি সম্ভবই নয়।·· এক প্রান্তে রহিয়াছে ভূতভৌতিক বিরাট বিশ্ব, অপর প্রান্তে চিত্তচৈত্তিক স্বরাট্ চেতন জগৎ। এই দুইকে সমন্বিত করিয়া যোগসূত্ররূপে সঞ্চিতে রহিয়াছে জীবন্ত atomic microcosm ঐ পুরুষোত্তম-লীলা-তরঙ্গ।·· পুরুষোত্তম জীবনের পরম প্রয়োজন হইতেছে স্বরাট্ চৈতন্য ও বিরাট জগৎকে সমষ্টি দর্শনদ্বারা পুরুষোত্তমবিষে গড়িয়া তোলা'। রবীন্দ্রনাথ এরই আভাষ দিচ্ছেন যখন বলেন—

'অচঞ্চলের অমৃত বরিষে
চঞ্চলতার নাচে
বিশ্বলীলা তো দেখি কেবলই যে
নেই নেই করে আছে।
ভিৎ কেঁদে যারা তুলিছে দেয়াল
তারা বিধাতার মানে না খেয়াল
তারা বুঝিল না অনন্তকাল অচিরকালেরই মেলা।
• • •
অনিত্য তারা তব ইতিহাসে
নিত্য নাচন নাচে।'

আমরা আজ ভগবান বুদ্ধের এই শুভ আবির্ভাব দিনটীতে তাঁর তত্ত্বঘন জীবনটী ধ্যান করি—বিশ্বের বুকে তিনি যা দিতে এসেছিলেন তা দেশকালপাত্র ভেদে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে মূর্ত হয়ে উঠুক।

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
ফি লিপি ইণ্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, ৩৬।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

UNIVERSITY OF CALCUTTA
CENTRAL LIBRARY

উদ্বোধন

আষাঢ়, ১৮৮৭ শকাব্দ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ

১৮শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৪৭)

অনন্ত হতে হবে ; মা সন্তানকে পেটে ধরে বলেই তার পথের কাজগুলি সেরা হয়।···অহংকারীর কর্ম কৃষ্ণে পৌঁছয় না—মাঝখান থেকে অসুরেরা খেয়ে যায়।···সেবার কর্ম মধুর, শৃঙ্খলাপূর্ণ···। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, তুমি আমার থেকে কাজ আরম্ভ কর—সর্বারম্ভ-পরিত্যাগী হও—তোমার নিজের আরম্ভ রেখো না—যুদ্ধ আমি আরম্ভ করেছি—আমার আরম্ভকে তুমি চালিয়ে যাও, শেষ কর।···যেটা আমি করতে পারি, না করতে পারি, অন্যথা করতে পারি—এ তিনের কর্তা যখন আমি, তখন সেটা সেবা হতে পারে না।···আমাদের কাজ স্ত্রীর কাজ—স্বামীর বীর্য ধারণ করে তাকে ফুটিয়ে তোলা···শরণাগতি এই সাধনার একমাত্র কথা।···তুমি সৃষ্টি করতে পার না—মম যোনির্মহৎ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্···মরণ দিয়ে ভক্তের নিজ আমিকে পেতে হবে···নৈষামিতি তর্কেন আপনীয়াৎ···। তুমি দেশ কাল চেন না—তাঁকে কষবে তুমি বিচার ?··· তাঁর কর্ম আমি করব—এই আমাদের সংকল্প হোক।··· নিত্যগোপালকে লাভ করার অনুকূল যা তা আমি নেব, প্রতিকূল বর্জন করব···। যেখানে সেখানে সে ঢুলে পরে না।···তুমি যদি নিজেই সব শিখতে পার, তবে গুরুর দরকার কি ? তিনি যে তোমার রক্ষা করবেন এজন্য তাঁকে গোপ্তা হিসাবে বরণ করতে হবে ; তিনি রক্ষা করবেন এ কেবল বিশ্বাস করলে হবে না, রক্ষক হিসাবে তাঁকে বরণ করতে হবে।...জীবনে দীনতা রাখতে হবে···তাঁর কাজ আমার কাজ···। গীতার শেষ কথা—করিষ্যে বচনং তব ···যদি মাং যাং প্রপন্ন,' করিষ্যে বচনং তব—আমাকে শাসন কর, আমি তোমার প্রপন্ন, আমি তোমার বচন করব—এই কথা বলতে শেখ।···তৎ ক্রিয়াস্থ আত্মনিক্ষেপঃ—শ্রীনিত্যগোপালের জীবন-দর্শন দিয়ে লেখা আমার বেদান্ত মানুষের কাছে পৌঁছানই আমার মানুষের সেবা। উপনিষদে আছে সম্প্রস্তির কথা —মৃত্যুপথগামী পিতার সব কিছু পুত্রের গ্রহণ···। শরণাগতি ভাবুকতা নয়···আমি দিনরাত্রি বিচার করি আমি শরণাগত কি না···। তোমাদের কথা আমি বলব না, সে তোমরা বিচার কর...।...সংসারের স্ত্রীর সবল দিতে হয় না—ব্রহ্মবীর্য ধারণ করতে হলে সবল দিতে হয় ···।

১৬.১০.৫৬। গীতায় ভগবান অর্জুনকে বলছেন, 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া, মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'।—মানুষ পারে না, মানুষের অহংকারের সাধ্য নাই যে নিজেই মায়ার হাত থেকে রেহাই পাবে। এতই জটিল, এতই মোহিনী এই মায়া যে, মানুষকে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়তেই হবে—কিন্তু যার মায়া তাঁর প্রপন্ন হলে এর মোহে কি করে না পড়া যায় তা জানা যাবে। প্রকৃতিকে মায়া বলে জানবে ; এই মায়ার যিনি পতি—মহেশ্বর—তিনি মায়ার সঙ্গে যোগী হয়েও, যুক্ত হয়েও কোন্ যোগে আটকে পড়েন নি, তা তাঁর কাছেই শিখতে হবে।·· মায়া বড় সাধারণ জিনিষ নয়—ব্রহ্ম যে চক্ষে মায়ার দিকে তাকাতেন, যে চোখে তাকাবার ফলে তাঁর চোখে নেশা লাগতে পারে নি, সেই

চোখ তাঁর কাছ থেকেই শিখতে হবে। মায়া কি রকম বস্তু? শোন এক গল্প—নারদ ও কৃষ্ণের গল্প। কৃষ্ণের জল পিপাসা পেয়েছে, নারদকে বললেন এক গ্লাস জল আনতে। নারদ জল খুঁজতে বহু দূর চলে এলেন, সেখানে এক রমণীর সঙ্গে দেখা, তাকে বিয়ে করে সংসার পাতলেন, ছেলেপুলে নিয়ে সংসার করছেন—হঠাৎ একদিন মনে পড়ল কৃষ্ণ তাঁকে জল আনতে পাঠিয়েছিলেন। ...অনেক মানুষ সাধনার জন্য বের হয়, উদ্দেশ্য নিয়ে রওনা হয়—কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না—মায়ার জালে জড়িয়ে পড়ে।...অহংকার থাকতে তুমি মায়ার সাধ্য পারবে কেন? মায়া বিভীষণের বেশ ধরেও আসে, গীতাপাঠের মধ্য দিয়েও মায়া আসে...বিবেকের রূপে আসে—মায়াকে চিনবার ক্ষমতা মানুষের নাই। তাই তিনি বললেন মায়ের যে প্রপঞ্চে মায়ামেতন্ তন্নিবন্ধে...। মায়া তো তোমার কথা শুনবে না—অহংকার নিয়ে গেলে আসক্তি অনিবার্য...। শরণাপন্ন হও—কৃষ্ণ বহির্মুখীকে মায়া গলায় দড়ি বাঁধবেই। কৃষ্ণ-শরণাপন্ন হলে মায়াকে চিনবার কৌশল দেখা যায়।...কত সাধক তপনা হয়েছিল...এই মায়াই বুদ্ধের ভাষায় মার...একদিন ঘর ছেড়ে বেরিয়েও আবার ঘরে আসক্ত হয়। কিন্তু মায়া এত slowly সে বিয়ক্রিয়া সম্পন্ন করে যে, তোমার অজানিতেই তুমি অনেকদূর চলে যাবে—যখন পিছন ফিরে তাকাবার প্রবৃত্তি আসবে, তখন দেখবে অনেক দূর এসে গেছ, আর ফেরবার পথ নেই। দুর্গে নামবার সময় ধীরে ধীরে নামতে হয়—বুঝতেই পারা যায় না নীচের দিকে নামছি—অনেক পরে দেখা যায় অনেক দূরে এসে গেছি। ...গুরুর জীবনে অদ্বৈত হয়েই চলতে হবে—অদ্বৈতবুদ্ধি টাকে রেখেই মায়ার সঙ্গে সমন্বয় করতে হয়...। দামবানি চাল যখন দামখানি তেল হয়ে যায়—সেটা মায়া... ব্রহ্মমায়া সমন্বয়ের লোকের একাগ্র হওয়া দরকার।... পঞ্চাননের ভূতের কৌটার গল্প শোন—শয়তান বলে, আমাকে লোকে দোষ দেয় কেন? আমি তো আর কিছুই করি না—শুধু একটা ভূতের কৌটা দিয়ে রাখি—আর তো আমি কিছু করি না।...যাকেটুকু করে মায়া। কিরকম করে মায়া আসে? গুড দেখলে পিঁপড়া আসবে—পিঁপড়া আসলেই ঝবুতর আসবে—ঝবুতর আসলে বেড়াল তাকে ধরতে আসবেই—তখন ঝবুতরের মালিকে আর বেড়ালের মালিকে লাঠালাঠি।...সমন্বয় অত সহজ নয়। সমন্বয় creative—যে আবেষ্টনকে বদলাতে না পারবে, সে পুরাণো আবেষ্টন রেখে সমন্বয়বাদী থাকতে পারবে না। মায়াবাদীরা সংসারকে ভয় করে পালায়, সমন্বয়বাদী সৃষ্টি করতে যদি না পারে, তবে সংসার থেকে দূরে অবশ্যই থাকবে।... বিশ্বনাগরিক না হলে সমন্বয় হবে না—বিশ্বকে বাদ দিয়ে, নিজের ছেলের সাথে পরের ছেলের পার্থক্য করে সমন্বয় হয় না—বিচ্ছিন্ন হয়েছ কি মায়ার খপ্পরে পড়বে। বিচ্ছিন্নতাই মায়া। সমগ্রকে মানলে মায়া হয় না—সমগ্র থেকে একটাকে বিচ্ছিন্ন করে টান দিতে যাওয়াই মায়া... ...নূতন করে সৃষ্টি করে তুলতে যদি সংসারকে না পার, তবে দূরেই থাক—সমন্বয়বাদী হিসাবে আমি স্পষ্ট করে সাবধান করে দিচ্ছি।...কেমন করে মায়া-ব্রহ্মের সমন্বয় হয় সে সম্বন্ধে খুব সচেতন থেকো।...স্ত্রীকে নিয়ে রাজনীতি করেছি... সমগ্রতা নষ্ট করি নি...তাই মায়া আমাকে ধরে নি...। তবু গর্ব আমি করব না.. শিব পর্যন্ত যেখানে মোহিনীর পিছনে ঘোরেন—ব্রহ্মাদিও যেখানে মায়ার হাতে নাস্তানাবুদ হন,...যেখানে একমাত্র কৃষ্ণ ছাড়া কেউ পার হয় নি—সেখানে গর্ব করার কিছু নেই।.. সাবধান, সাবধান।...কৌপীনকে আস্তে...না হয়। এক কৌপীনের মধ্যে বিশ্ব সংসার জড়িয়ে আছে—কৌপীনকে ধরে ধরেই সমস্ত মায়ার আবরণ সৃষ্টি হবে।... কৃষ্ণের পক্ষে বৃন্দাবন কি ছিল—অত প্রেম, অত স্নেহ.. অক্রূরের রথ এল—এক মুহূর্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেলেন। রথ সবাইকেই ডাক আসে—মধুরার ডাক, দ্বারকার ডাক আসে।...ডাকবার সাহস যার নেই, এক মুহূর্তে ভেঙে দেবার বীর্য যার নেই—সে যেন সমন্বয়ের মধ্যে না যায়...। একজন মানুষকে অবলম্বন না করলেও সমন্বয় সম্ভব নয়—তুমি নিজে সমন্বয় করতে পারবে না।... নিত্যগোপাল ব্রহ্ম-মায়ার এই সমন্বয় নিয়ে এসেছেন...।

এই পথ অতি দুরূহ পথ—আমি বার বার সাবধান করছি —এ পথ ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া—যে কোন দিকে ঝোঁক বিপদ অনিবার্য - টাকে টাকা সমাধি একমাত্র নিত্যগোপালেই সম্ভব···।

১৭.১০.৮০ ।···শ্রীনিত্যগোপাল নিজের সম্বন্ধে নিজে ঐ পরিচয় লিখে গেছেন—তিনি কি করতে এসেছেন তাও আছে। তিনি একটা বিরাট তত্ত্ব নিয়ে এসে সেটা ছড়িয়ে দিতে এসেছেন। মনে পড়ছে পাতঞ্জলের একটা সূত্র—মুক্তি কাকে বলে? 'দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানো-নামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ'। জন্ম—বিশেষ কোন আবেষ্টনে আসা জন্ম...দুঃখ বদলাতে হলে আবেষ্টন বদলাতে হবে—আবেষ্টন বদলাতে ধর্মাধর্ম (প্রবৃত্তি) বদলাতে হবে —হিন্দুর আবেষ্টন মুসলমানের আবেষ্টন নয়। ধর্মাধর্ম এল রাগদ্বেষ থেকে—অর্থাৎ আসক্তি বিদ্বেষ থেকে ; আসক্তি বিদ্বেষ এল মিথ্যাজ্ঞান থেকে—তত্ত্ব-জ্ঞানাৎ মিথ্যাজ্ঞানাপায়ঃ —তাই দুঃখ পাওয়ার শেষ কথা মিথ্যাজ্ঞান দূর করতে হবে। বস্তু সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান হলেই, পারিপার্শ্বিককে হজম করতে পারলেই মিথ্যাজ্ঞান দূর হয়ে দুঃখ দূর হবে,··· সংসারকে ব্রহ্ম বলে জানলে দুঃখ দূর হবে।... বাধনালক্ষণং দুঃখঃ—এতদিনের কথা ছিল যা বাধা দেয় তা দূর কর—স্ত্রী বাধা দিচ্ছে—স্ত্রীকে দূর কর, কিন্তু আজকের কথা হচ্ছে, স্ত্রী বাধা দিচ্ছে স্ত্রীকে পরিপাক কর —স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে অপরার্ধ বলে মনে করে এক হলেই দুঃখ যাবে। মিথ্যাজ্ঞান হলেই আসক্তি আসে— তোমার পুত্র মনে করলেই দুঃখ দেবে—পুত্র ভগবানের হয়ে তোমার। তুমি তাকে ভগবানের থেকে সরিয়ে এনে নিজের বলে মনে করার মিথ্যাজ্ঞান রেখে কিছুতেই দুঃখ দূর করতে পারবে না। ইংরেজ যদি ভারতবর্ষকে ভোগ করতে যাওয়ার মিথ্যাজ্ঞান না রাখত, তাকে যেতে হতো না।...শত্রুকে পাব একথা মহাপ্রভু বলেন—শত্রুকে সরিয়ে দিতে চাইলে দুঃখ দূরের সম্ভাবনা নাই।·· হরিনাম দিয়া হৃদয় শোধিব···। যে সর্বকে অন্তররূপে দেখে সে দুঃখ পাবেই,—আমার স্বার্থ অন্য থেকে আলাদা করে নিয়েছি বলেই দুঃখ পাই··· অন্তরের তত্ত্বজ্ঞানকে জাগ্রত করে, মিথ্যাজ্ঞান দূর করে সব স্বার্থ হও, দুঃখ থাকবে না, বিশ্বরূপ হও, দুঃখ থাকবে না।···ন্যায়দর্শনে বাৎস্যায়ন লিখছেন, যদ্যপি বেদাৎ প্রবর্ততে দুঃখং হাতুমি ন মুচ্যেত।...দুঃখকে বেষ করলে দুঃখ ছাড়াতে পারবে না... দুঃখ যার অঙ্গের ভূষণ তার দুঃখ কোথায়? বলতে শেখ —এস দুঃখ, এস কষ্ট—আর দুঃখ থাকবে না। দুঃখ যে রস, সংসারে এত দুঃখ তবু কেউ সংসার ছাড়ে না— রস আছে যে।...শুদ্ধজ্ঞান নিয়ে অবতার এসেছেন—তাঁর কাছ থেকে শুদ্ধজ্ঞান শিখতে হবে—নয়তো he take rice যে চুন, তা আমি বুঝব কেমন করে?···আসক্ত হয়ে পড়লেই দুঃখ।...মায়ার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে।...কৃষ্ণ-নারদের গল্প—মায়ার একটা connecting link আছে—শয়তানের গুড়ের কৌটার গল্প—একটা ঘটনা যে পরপর কতকগুলি ঘটনাকে টেনে আনে সেটা জানা থাকলে মায়া চেপে ধরে না—link ভেঙে ঘটনাবলীর মধ্য থেকে একটা ঘটনাকে নিতে চাই যখনই তখনই আসক্ত হই, তখনই মায়া আসে।···অর্জুনের বিপদ কোথায়? রাজা সুরথ হাতীর জন্য কাঁদে কেন? ...মায়া হল বহু ঘটনাবলীর মধ্য থেকে বিশেষকে pick up করে নেওয়া—স্বামী অর্থ স্বামীর বাপ মা, স্বামীর ভাই বোন...স্বামীর সমাজ—এতখানি জানলে মায়া থাকে না—বিচ্ছিন্নভাই মায়া।··· ভগবান এত বড় জগৎ চালাচ্ছেন—তিনি তো কোন একটা ঘটনা নিয়ে নেই···। তুমি চাইছ ভোগ করতে, তাই একটা ঘটনাকে সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে চাও;...ভোগ করতে চাইলে প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য—সংঘর্ষে এলেই দুঃখ দেবে— প্রকৃতিকে স্বীকার কর—এই দর্শন নিয়ে নিত্যগোপাল এসেছেন।···সব সুখ-দুঃখ হয়ে দুঃখ দূর করতে হবে... আপনাকে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবশ্য পরে...।

ক্রমশঃ

সিনেমা পাপ কেন ?

সিনেমা ও আর্ট

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

[আজ থেকে ৩৪ বৎসর আগে জনসাধারণের টাউন হল (ধরিপাদে) সিনেমা কোম্পানীকে ভাড়া দেওয়ার প্রতিবাদে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ৪৫ দিন উপবাস করিয়াছিলেন। সেই সময় উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিটি তিনি লিখিয়াছিলেন। কালের হাত হইতে রক্ষা করিয়া উহা আমরা এইখানে উজ্জীবনভারতের গ্রাহকদের নিকট উপস্থিত করিলাম। উঃ ভাঃ সম্পাদিকা]

হাসিতে আর্ট আছে, চোখের জলেও আর্ট আছে ; জীবনে আর্ট আছে, মরণেও আর্ট আছে ; ফুল-শয্যায় আর্ট আছে, শ্মশানেও আর্ট আছে। কিন্তু সব সময় সব দেশে সব পাত্রে সব আর্ট শোভা পায় না। স্বামীর বেঁচে থাকবার দিনে নারীর যে আর্ট, তা যদি সে স্বামীর মরণের দিনেও আস্বাদন কর্ত্তে যায়, তবে হয় সে উন্মাদিনী, নয় ত ব্যভিচারিণী। তোমাদের রামকৃষ্ণ, দীনেশ—জানি তাদের পন্থা ভুল, তবুও তারা দেশের ছেলে, মাকেই ভালবাসতে চাইত যেদিন মা' মা' ব'লে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরেছিল, সেদিন যদি ফাঁসিকাষ্ঠের পাশে দাঁড়িয়ে আর্ট উপভোগ করে থাক, তাতে কি জাতির মর্ম্মন্তুদ বেদনায় চীৎকার করে ওঠেনি ? জাতি আজ দিশেহারা, আত্মহারা—ওগো তোমরা তার হৃদয়ের বেদনাকে হাসির নেশায় উড়িয়ে দিয়ে আর আত্মহত্যার পথে ছুটিয়ে দিও না। ঘর থেকে পুত্রশোক ভুলতে দেখেছি, ভারতও কি তাই নেশার ভিতরে সকল শোক ভুলবার চেষ্টা কচ্ছে ?

পরাধীন জাতির অধিকার নেই, শক্তিও নেই যে, সে ভোগের পথে আর্টের আস্বাদন করে ; তার জন্য প্রয়োজন —তপস্যার ও বৈরাগ্যের আর্ট। মহাযোগী শুকদেব রাসলীলার আর্ট বর্ণনা কর্ত্তে পারেন, আর মরণের কোলে বসে মরণকে সকল প্রাণ-মন দিয়ে বরণ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ রাসলীলার আর্ট আস্বাদন কর্ত্তে পারেন। তোমরা কি এ আদর্শ মেনে নিতে রাজী আছ ? বঙ্গের পক্ষে প্রথমে আর্টকে যোগের পথে নিতে হবে, মুক্ত হলে তবে ঘটে অধিকার হবে হাসির পথে আর্টকে পাবার। আর্ট পরাধীন জাতিকে আরও পরাধীন করে। বঙ্গের হাসি-খেলা সবই প্রেতের হাসির মত বিড়ম্বনাময় বস্তুতন্ত্রহীন ; সামান্য দুঃখের সামনে সে হাসি বিলীন হয়ে যায়। বঙ্গের জীবন সার্থক হয় ত্যাগ-বৈরাগ্যে। মহামানবের উপাসক তোমাদের লেনিন দীর্ঘকাল ঘর ছেড়ে পথে পথে সাধা বয়কের মাঝে আর্ট খুঁজেছিলেন ; তাই না আজ তার দেশে সিনেমার আর্ট প্রসারিত হচ্ছে ? যখন শুনতে পাই —ইংলণ্ড আর্জ্জেণ্টী প্রভৃতি দেশ যুদ্ধও করে, আমোদ-প্রমোদও করে—তখন কি ভুলে যাই না যে তারা আমাদের মত পরাধীন নয়, তারা আর একটা জাতির পায়ের তলে এমনি করে জুতো খেয়ে দিন কাটায় না ? বিজ্ঞান তাদের গোলাম ; তাই তারা বিজ্ঞানের সাহায্যে অন্য জাতির রক্ত শোষণও কর্ত্তে ও সঙ্গে সঙ্গে হাসির ফোয়ারা ছুটতে পারে। ভারতবর্ষ কি ইংলণ্ড না আর্জ্জেণ্টী ? বিজ্ঞান তোমার কাছে বিজ্ঞান নয় অজ্ঞান। পরাধীন জাতির বিজ্ঞান, অর্থ, শিল্প, কলা কিছুই নেই। তাই যদি বিজ্ঞান শিখতে হয় তবে প্রথমে শিখতে হবে মরণ-বিজ্ঞান—মরণ-কলা। মহাত্মাজী লিখ্‌ছেন—"Art kills life, art gives life"। বর্ত্তমান দুঃখ-বেদনার মাঝে হাসি শুধু কান্নাকেই বাড়িয়ে তুলবে। মরণকে উড়িয়ে দিতে গেলে জাতি পাবে বীভৎস মরণ, মরণকে বরণ করলেই তার মরণ জীবন

হয়ে ফুটে উঠবে। উপনিষদ্ ঐ শোনাচ্ছেন—

"বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যা অমৃতমশ্নুতে।"

মরণ দিয়ে মরণ পার হতে হবে—তবে বটে জীবনের সব কিছু সম্ভব হবে ও অমৃতের আস্বাদন মিলবে।

স্বাধিকারপ্রমত্ত পাশ্চাত্ত্য প্রকৃতিকে লুট করছে, তাতে সে ভাবতের চেয়ে অধিকতর দক্ষ হলেও অচিরাৎ প্রকৃতির সামনে তাকে তার মাথা হেঁট করতে হবে। প্রকৃতির প্রতিশোধ তার দর্প চূর্ণ করবে। প্রকৃতির সর্বোচ্চ বিলাসই আর্ট। কিন্তু সে প্রকৃতিকে বিশ্বেশ্বরের কিম্বা বিশ্বের সেবায় না লাগিয়ে নিজের ভোগে লাগাবার জন্ত মানুষ যখন বদ্ধপরিকর হয়, তখন সে প্রকৃতির উপর ব্যর্থ বলপ্রয়োগই করে, সে প্রকৃতিকে অসতী বানাতেই চায়। প্রকৃতি দীর্ঘকাল তার কাম জোটায় না; তার রুদ্রাণীমূর্ত্তি একদিন তার সকল বিজ্ঞানকে ভেঙেচুড়ে একাকার ক'রে দেয় এবং সেই শ্মশানের উপরে সে সেবাময় বিজ্ঞান স্থাপন করে। নারীত্বের যেমন ব্যবসা চলা উচিত নয়—জগৎ যত সভ্য হবে, আর্টের ব্যবসাও তত চলবে না। ইংলণ্ড, জার্মাণী যতই সভ্যতার দাবী করুক, ভারতীয় আদর্শের কাছে তারা শিশু। আর্ট মানুষের মধুরতম প্রবৃত্তিকে সেবার জন্ত উদ্বুদ্ধ করবে, তবেই সে সতী, সে সর্ব্বমঙ্গলা; তাকে নীচে নামিয়ে কেবল দু'মুঠো অন্নের জন্ত কিম্বা পরের রক্ত শোষণ করবার জন্ত কিম্বা আর একটা জাতিকে নেশায় মাতাল ক'রে রাখবার জন্ত প্রয়োগ করে আর্ট ব্যভিচারিণী হয়। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মত কদাচিৎ (Artist) দ্বিতীয়টী নেই; তিনি আর্টকে শোষণের পথে না লাগিয়ে ত্যাগের পথে—মরণের পথে লাগাতে পেরেছিলেন। যা সত্য আর্ট, তাতে শোষণের গন্ধ থাকবে না, থাকবে শুধু পোষণ। যারা আর্ট নিয়ে ব্যবসা করছেন আর যারা সেই ব্যবসায়ের খোরাক যোগাচ্ছেন উভয়েই তুল্য অপরাধী। আর্টকে অমনতর বাজারে নাচাতে নেই, যা সরস্বতী নাচতে পারেন ভগবানের সামনে, ভগবৎ-সেবার জন্ত, কারও কোন ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্ত নয়। Science এবং Art এর একটা মোটা দিকও আছে, যাকে মানুষ আত্মসুখের জন্ত লাগালে লাগাতে পারে, কিন্তু যা মানুষের সব চেয়ে উন্নততম উজ্জ্বলতম প্রকৃতি তাকে কখনও বিশ্বের সেবা ব্যতীত অ কোথাও লাগালে তা পরিষ্কার ভগবদ্রোহ, বিশ্বদ্রোহ দেশদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নয়। মহাত্মাজী যেদি খদ্দরের বাণী শোনাচ্ছিলেন তখন এমনিতর একদল লো "আর্ট গেল—আর্ট গেল" ব'লে চীৎকার আরম্ভ করেছি তাদের চীৎকার আজ থেমে গিয়েছে, বর্ত্তমানের চীৎকার থেমে যাবে আমরা জানি। তাই এই মরণের চিতা দাঁড়িয়ে আমি সকলের পায়ে প'ড়ে অনুরোধ জানাচ্ছি- তোমরা অবহিত হও, সিনেমার অমঙ্গল স্পর্শ পরিত্যা কর, বেদনাকে আরও তীব্র ক'রে তোল; বেদনার চিতা আত্ম-সাক্ষাৎকার মিলবে, জাতি মুক্তির আস্বাদন ক' কৃত কৃতার্থ হবে।

সিনেমা

অধ্যাপিকা শ্রীরমা রায়

সিনেমার বয়স খুব বেশী দিন নয়। এর মধ্যে 'আর্টিফিস' বা কৌশলের অংশ এত বেশী যে বহু শিল্প-রসিক মনীষীই একে আর্টের মর্য্যাদা দিতে বা সবিশ্বাস ভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। এত নব নব পরীক্ষা নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে সিনেমাকে আজো অগ্রসর হ হচ্ছে যে সম্ভবত এর সম্বন্ধে চূড়ান্ত রায় দেবার দিন আ আসে নি।

সে যাই হোক্, সিনেমার ব্যাপক আত্মপ্রসার এ

জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে মতদ্বৈধের কোন কারণ নেই। অর্থনৈতিক দিক থেকে সিনেমা অত্যন্ত সুলভ আমোদ, এত সুসংবদ্ধ সস্তায় এত বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে অন্য কোন 'তামাশা'কেই পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়, অন্ততঃ এতাবৎকাল সম্ভব হয় নি। বিজ্ঞানের প্রসাদে টেলিভিশনের মত সিনেমার কোন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আমাদের দেশেও আত্মপ্রকাশ করবে তিনা বলা যায় না। মোটকথা ওই সুলভতা এবং আমাদের দর্শক সাধারণের অপরিণত রুচি, এদেশী সিনেমার এ দুটিই মস্ত পিলার। এ'খানেই তার জিৎ।

আজকাল স্থানে স্থানে ফিল্ম্ সোসাইটি গ'ড়ে উঠছে, শুধু কলকাতায় নয়, বাইরেও। মুষ্টিমেয় বিদগ্ধ জনের অধিকতর মনোরঞ্জন কিভাবে সিনেমাকে দিয়ে করানো যায় শুধু সেই চিন্তা করেই কিন্তু এই সংস্থাগুলো আজ থাকছে। সেই অজ্ঞ নিরক্ষর অগণিত ইতর সাধারণের কথা এরা মনে রাখছে না যাদের চিত্ত-বিনোদন এবং শিক্ষালাভের একমাত্র মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে সিনেমা।

সিনেমাকে দিয়ে অনেক কাজই করানো যেত যা করা হয় নি। উপরন্তু এর নিষ্ঠুরতায় সিনেমাকে লাভের ব্যবসায়ে পরিণত করবার জন্য বিবেকের বালাই রাখেন নি। যে দেশে শুয়োর কেয়াল চলে, সেখানে আমার যাদের কেয়াল চলবে, sex ও crime বীভৎস আকৃতিতে সিনেমাকে জুড়ে বসবে, এতে আর বিচিত্র কি?

ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিত্ব ও নৈতিক চরিত্রের ওপর সিনেমার প্রভাব বিষময়, এ সম্বন্ধে আমাদের যুগের গুরুজনরা সচেতন ছিলেন। খুব সম্প্রতি উচ্ছৃঙ্খলতা আজ ক্রমবর্দ্ধমান, সরকার চেঁচাচ্ছেন, আমরা (মাষ্টারেরা) চেঁচাচ্ছি—'ছেলেমেয়েরা অসভ্য হয়ে যাচ্ছে', কিন্তু কুরুচি ও উত্তেজনার যোগান দিয়ে চলেছে যে, সেই সিনেমার বিরুদ্ধে আজ আমাদের কণ্ঠ নীরব। সরকার না হয় সিনেমা-শিল্প-পতিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে সাহসী নন, তাই সব জেনে বুঝে ও চোখ বুঁজে আত্মপ্রতারণা করছেন আর আধুনিক তারুণ্যের নৈতিক বিকারের মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে beating about the bush করে চলেছেন। কিন্তু অভিভাবক-সমাজের নির্বিকার ঔদাসীন্য বড় বিস্ময়কর। 'সিনেমার অতিকর প্রভাব ছেলেদের ওপর পড়ে পড়ুক, গা সওয়া হয়ে গেছে', নাকি আধুনিকতার মোহে ধরেছে তাঁদের? 'প্রগ্ প্রভৃতি, দেকেলে' ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত হওয়া বড় লজ্জার, তাই কি তাঁরাও এই 'যৌবন জল-তরঙ্গে' গা ভাসিয়ে দিয়েছেন?

সিনেমার (আমি সিনেমা বলতে হিন্দি সিনেমাই বলতে চাইছি) প্রথম অভিযানের যুগে তার ভবিষ্যৎ বিপুল প্রতাপ আমাদের কল্পনায় আসে নি, কেবল ঘৃণা-মিশ্রিত অবজ্ঞার চোখে তার দিকে চেয়েই ক্ষান্ত থেকেছেন দেশের গুরুজনরা। দেখতে দেখতে আজ সে সর্বগ্রাসী রূপের ধারণ করেছে—কারণ এর পিছনে আছে বণিকের লোভের প্রচণ্ড তাড়না। আজ হয়তো বড় দেরী হয়ে গেছে, তবু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে একবার শেষ চেষ্টা করতে হবে লড়াইএর। সিনেমার উচ্ছেদ কাম্য নয়, আদৌ নয়। কাম্য একে সুস্থ সুষ্ঠু সুরুচি করা, যাতে এর আক্রমণে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা মেরুদণ্ড ব্যক্তিত্ব-চরিত্রহীন ব্যাধিগ্রস্ত অমানুষ বনে না যেতে পারে। জানি, আমাদের জাতীয় চরিত্রের অবনতির আরো বহু কারণই বিদ্যমান। কিন্তু এই সব কারণগুলির মধ্যে 'বাজাসন' হিন্দী সিনেমারই প্রাপ্য। গান্ধীজী যদি আজ থাকতেন, তাহলে দোকানে পিকেট করার আগে 'হিন্দি সিনেমা হটাও' আন্দোলন তুলতেন, এই আমাদের বিশ্বাস; কারণ মদ প্রবর্ধমান, সুকুমার, বিকৃতোন্মুখ, impressionable চিত্তকে তত বিক্ষুব্ধ, তত মোহাবিষ্ট, প্রলুব্ধ করতে পারে না, তত মন্ত্র-চৈতন্যকে বিষাক্ত করতে পারে না, যত পারে হিন্দী সিনেমা।

হিন্দী সিনেমার হিন্দীত্ব সম্বন্ধে আমার প্রতিবাদ নয়, প্রতিবাদ তার বক্তব্য ও প্রকাশ ভঙ্গির বিরুদ্ধে। হিন্দী সিনেমা এবং সেই অর্থে বহু হলিউডী সিনেমাকেও এ অপরাধ দেয়া যায়, দেয়া যায় গোটা কতক বাংলা বইকেও। তবু 'বেশী ক'রে বাংলা বই দেখুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন' এ ধরণের জিগীরেরও একদিক থেকে মূল্য আছে বই কি। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি।

সিনেমা যুগের পূর্বেও under-world-এর অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু সমাজ-দেহের বিশেষ অঙ্গে স্থান বিশেষে, চিহ্নিত হ'য়ে মুখ লুকিয়ে থাকত সে। আজ পর্দায় পর্দায় স্পন্দিত বিজ্ঞাপনে রং চং মেখে মোহময় হ'য়ে, বাহাদুরীর মুখোশ পরে যে-পরোক্ষ দোকানে আত্মপ্রকাশ করতে সে লজ্জিত হচ্ছে না। আমাদের শিক্ষার দৈন্য ও আদর্শের অভাবের সুযোগে, যেহেতু nature abhors vacuum, মনের শূন্যতা ভরাবার ভার নিয়েছে সিনেমাই। অনুকরণযোগ্য অপর কিছুর কথা আমাদের জনসাধারণ জানে না, শিক্ষা থেকে তাদের আমরা বঞ্চিত রেখেছি, তাই কুশিক্ষাকেই সাগ্রহে বরণ করে নিচ্ছে তারা। অত সুন্দর বাড়ীতে ঢুকে অমন ঝলমলে আলোয় তলায় সুবেশ দুই-জনের সঙ্গে চেয়ারে বসাটাই যাদের কাছে পরম ভাগ্যের, পাপের মোহন বলয়িত মূর্তিকে অনুকরণযোগ্য মনে না করা, বিহ্বল, আবিষ্ট, অভিভূত না হওয়া কি তাদের পক্ষে সম্ভব? সিনেমার কুশিক্ষার প্রভাব resist করতে পারার মত কোন্ আত্মিক চেতনার বর্ম তাদের আমরা পরিয়ে রেখেছি? এদের রুচিকে ব্যঙ্গ করা সোজা, কিন্তু রুচি-বিকার ঘটাচ্ছে কে? আমরা (শিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজ) নিজেরাও কি আজকাল sensation-ভক্ত হ'য়ে উঠি নি? ভাবি নি কি, পশ্চিম যেহেতু গতিকে, উত্তেজনাকে পূজো করছে, আমাদেরও আত্মসমাহিত ধ্যান-জীবনকে পরিহার করতে হবে? তার মধ্যেই life, তার মধ্যেই আধুনিকতা?

আমাদের রুচির যাহোক একটা standard ছিল আগে। জনসাধারণের একটা অংশ খেউড় ঝুমুর উপভোগ করেছে বটে, আর এক বৃহত্তর অংশ কিছু কথকতা শুনেছে। ব্যাপক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ছিল যাত্রা প্রমুখ নানা art-form। লোকে অন্ধকারকে অন্ধকার বলেই জেনেছে বুঝেছে। আলো আঁধারীর মধ্যে তাদের বাস করতে হয় নি।

অনেকের মুখে শুনেছি 'যারা মদ্য হবার সিনেমা না দেখেও হবে'। কিন্তু একথা কি তাঁরা আর একটু তলিয়ে দেখেছেন, যাদের মদ্যের দিকে প্রবণতা তাদেরকে প্রবৃত্তি অনুযায়ী পরিবেশ দিলে তাদের পতন হবে দ্রুততর, নিশ্চিততর, ব্যাপকতর এবং গভীরতর? এবং যে মদ্য নয়, মদ্য দেখে দেখে সেও মদ্য হ'তে শেখে? পরিবেশকে অগ্রাহ্য করা, অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করার মত মনোবল কটা মানুষের থাকে? অধিকাংশই তো দুর্বলতা-স্বাতন্ত্র্য-চারিত্র ও দার্ঢ্যবর্জিত অনুকারক।

পরিবেশ মানবচিত্তকে ভাঙে গড়ে। মদ্য হবার জন্যই নিয়তি নির্দিষ্ট হয়ে কেউ জন্মায় না। প্রলোভন, বিকৃত পরিবেশ, কুদৃষ্টান্ত, কুসংসর্গ এগুলো যদি সত্যি সত্যি ক্ষতিকারকই না হবে তাহ'লে শিক্ষা জিনিসটার অর্থ কি? যার ভালো হবার সে তো আপনি হবে, যার গোল্লায় যাবার সে তো নিশ্চিত যাবে, এই যদি ব্যাপার হয়, তাহলে সন্তানদের ইতর প্রাণীর শাবকদের মত যদৃচ্ছ চরে বেড়াতে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। কেন মিছে কাদেলা পুইয়ে তাদের জন্য সুন্দর আদর্শ পরিবেশ রচনার প্রয়াস করতে যাবে অভিভাবক!

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন গড়েছিলেন নিজের একটা উদ্ভট খেয়ালকে চরিতার্থ করতে নয়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, নগর-সভ্যতার কুশ্রীতা, বিকার ও গ্লানি থেকে বালকদেরকে বহুদূরে সরিয়ে এনে তপোবনের শান্ত সরল পুণ্যময় আবহা পরিবেশে তাদের সুকুমার প্রাণকে বিকশিত ক'রে তুলতে হবে, প্রকৃতির কোলে রেখে তাদের সৌন্দর্যবোধকে ও ধ্যানদৃষ্টিকে উন্মীলিত করতে হবে। এ সমস্তই কি তাহ'লে মূর্খতা? এত পুঙ্খানুপুঙ্খ করবার কিছু দরকার নেই।

প্রখ্যাত মনোবৈজ্ঞানিক অনাদি ঘোষাল বারংবার সিনেমার বিরুদ্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ ক'রে চলেছেন। মুনিঋষিরাও জানতেন,—বাল্য ও কৈশোর, ব্রহ্মচর্যকাল ও প্রথম যৌবন হচ্ছে ক্ষেত্রকর্ষণ ও বীজবপনের ঋতু। তখন চিত্তস্থৈর্য্যের সাধনা, একাগ্রতার, ধ্যান-রসের, আত্মস্থতার সাধনা, স্থিতধী হবার সাধনা করতে হবে। সাধকের যা কিছু পরিপন্থী, মানসিক প্রশান্তিকে যা কিছু উদ্বেল করতে পারে, ছাত্রের পক্ষে সে সবই বর্জনীয়,

ভারত-বন্ধুদের এই হ'ল অভিমত। আধুনিক মনো-বৈজ্ঞানিক বলছেন—পশুপ্রবৃত্তিগুলোকে নানা ছলায় কলায় অহরহ উত্তেজিত করছে সিনেমা, সিনেমার বিজ্ঞাপন ও সিনেমা সাহিত্য। প্রভাবিত হচ্ছে অবচেতন চিত্ত-তলের দিবারাত্রির ভাবনা কামনা। আমাদের যুব-সমাজকে কোন্ সৌম্য সুন্দর আদর্শ পরিবেশে আমরা রাখছি যে তাদের উন্মার্গগামিতার জন্য আমরা অভিযোগ করতে পারব?

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র দুঃখ করতেন বাংলার টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে, অবাঙালীরা লুটে নিচ্ছে ব'লে। হিন্দী সিনেমার যত অকৃত্রিম, স্থূল, crude, খেলো জিনিস শিল্প-চেতনা ও সূক্ষ্ম অনুভূতি-গর্ব্বী বাঙালীর গালে চড় মেরে পয়সা নিচ্ছে, তার আর্টের ক্ষুধাকে তৃপ্ত করছে, এ দেখলে তিনি কি বলতেন অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

যে পয়সা আমরা বাঙালীরা হিন্দী সিনেমার পদমূলে দিচ্ছি, সে অর্থে স্থায়ী থিয়েটার গৃহ নগরে নগরে গড়া কি যায় না? শুনেছি লণ্ডনে শত শত থিয়েটার ভবন আছে। নন্দন শাস্ত্র মতে,—নাটক হচ্ছে দৃশ্য-কাব্য, অর্থাৎ তার মধ্যে সাহিত্যের সকল গুণই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বর্ত্তমান।

প্লেটো তাঁর আদর্শ রিপাব্‌লিক থেকে যেসব ধরণের কাব্য ও সঙ্গীত মানুষকে দুর্ব্বল ও নারীভাবাপন্ন ক'রে ফেলে সেগুলিকে নির্ব্বাসিত করতে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। হায় প্লেটো! 'Thou should'st be living at this hour!'

'সন্তুষ্ট হবার উপায়'

॥ শ্রীদেবাশীষ পাল ॥

'স্বাস্থ্যই মানুষের পরম সম্পদ' উপরোক্ত মন্তব্যটীতে স্বাস্থ্যকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে জানা না গেলেও, আজকাল স্বাস্থ্য বলতে আমরা শুধু দৈহিক স্বাস্থ্যকেই বুঝি না, মানসিক স্বাস্থ্যও উহার মধ্যে অন্তর্গত। সভ্যতার ক্রমবিবর্ত্তনে আমরা যতই এগিয়ে চলেছি আমাদের জীবন ততই জটিল থেকে জটিলতর হয়ে পড়ছে। নানা রকমের সমস্যা আমাদের কাছে আসছে। অনেক সময় উপযুক্ত সমাধানের অভাবে তারা আমাদের মধ্যে অসন্তোষ ব'য়ে নিয়ে আসে।

আমাদের জীবনে প্রধান লক্ষ্য হ'ল সুখী হওয়া। তাই অসন্তোষ কাটিয়ে সন্তুষ্ট হওয়াই হ'ল আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে সন্তুষ্ট হওয়া একান্ত প্রয়োজন; আর এটা আমার কথা যে আমরা ইচ্ছা এবং চেষ্টা করলে সন্তুষ্ট হতে পারি।

এই প্রবন্ধে সন্তুষ্ট হওয়ার উপায় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে চাই।

প্রথমেই সন্তোষ কি এই সম্বন্ধে পরিষ্কার হওয়া দরকার। ব্যক্তিগত চাহিদা, ইচ্ছা পূরণে অথবা অপরের সুখের জন্য স্বার্থত্যাগ করা, এই সবের মধ্য দিয়াই সন্তোষ আসে। আপনার সময়টা ভাল যাচ্ছে বলে যে আপনি খুব সন্তুষ্ট, তা কিন্তু মোটেই না। আপনি প্রকৃতই সন্তুষ্ট হবেন যখন আপনার ভেতরের চাহিদাগুলি সামাজিক স্বীকৃতি লাভের মধ্য দিয়াই মিটবে। আত্মবিশ্বাস এবং আত্মনির্ভরশীলতা হ'ল সন্তোষ লাভের গোড়ার কথা।

কোন কোন ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্য পরনির্ভরশীল হতেই হবে, যেমন ধরুন ভালবাসা, আদর-যত্ন, আপনার পরিচয়, সমাজে স্বীকৃতি লাভ ইত্যাদি। কিন্তু সব চাহিদা পূরণের জন্য আপনি যদি পরনির্ভরশীল হ'ন তাহ'লে

কোনদিনই সন্তুষ্ট হতে পারবেন না, বরং দুঃখ পেতে হবে। যারা মনে করেন যে তাঁরা ঠিকমত সন্তুষ্ট হ'তে পারছেন না, তাদের জন্য কতকগুলি উপায় বলে দেওয়া হচ্ছে যার অনুশীলনে যথেষ্ট উপকার পেতে পারেন।

১। আপনি কি কোনদিন নতুন কাজে নেমেছেন? নতুন কাজ নানা রকমের হতে পারে যেমন ধরুন দেশ ভ্রমণ, ক্লাব ইত্যাদি সংগঠন করা অথবা কোন কাজ হাতে নেওয়া ইত্যাদি। উপযুক্ত বুদ্ধি ও প্রয়াস থাকলে বাড়ীতে বসেই ঐ রকম কাজ করতে পারেন, যথা ভাই-বোনদের পড়ানো, বাগান করা ইত্যাদি। ঐগুলি আপনার সন্তোষ আনয়নে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

২। আপনি কি পড়তে ভালবাসেন? পড়ার মধ্যে আপনি যথেষ্ট আনন্দ পেতে পারেন। আনন্দ পেতে হ'লে যে আপনাকে কোন নির্দিষ্ট বই পড়তে হবে, এমন কোন কথা নেই। চিত্তাত্মক, humorous, হাল্কা ধরণের অথবা নানা রকমের উত্তেজনামূলক বই, যা আপনার পছন্দ তাই পড়বেন। জ্ঞান অর্জনে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে, নূতন কাজে প্রয়াসী হতে বই পড়া আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে এবং সত্যিই তা আনন্দদায়ক।

৩। আপনি কি নতুন কিছু করবার জন্য কোনদিন চেষ্টা করেছেন? নিজের পছন্দমত নতুন কিছু করলে আপনি নিশ্চয়ই আনন্দ পাবেন। নতুন কিছু করা মানে আপনিক ঘর অথবা ঐ রকমই একটা কিছু করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। যে কোন কাজ যেমন কাঠের কাজ, সেলাইর কাজ ইত্যাদির মধ্যেও নতুন নক্সা করে আনন্দ পেতে পারেন। যদি আপনার মধ্যে লেখার অভ্যাস থাকে, তাহলে ত আরও ভাল। যে কোন কাজের মধ্যেই ব্যক্তিকত্বের ভাব কাটিয়ে নিজস্ব কিছু যদি দিতে পারেন, সন্তুষ্ট হবেন।

৪। আপনার কি কোন hobby আছে? অবকাশ সময় ব্যয় করবার জন্য hobby একটি চমৎকার উপায়। নানা কর্তব্যের মধ্যে আমরা প্রায় সব সময় জড়িয়ে আছি। তাই অবসর সময়টুকু ব্যক্তিগত ইচ্ছাপূরণের জন্যই ব্যয় করা উচিৎ। তবে এর মধ্যেও কথা আছে, এমন কোন কাজ করবো না যা অসামাজিক, কেননা মানসিক সু-স্বাস্থ্য মানে ব্যক্তিগত চাহিদা এবং সামাজিক চাহিদার মধ্যে একটা সমতা রক্ষা করা।

৫। বন্ধু করার এবং বন্ধু হওয়ার গুণসকল অর্জন করার চেষ্টা করুন। জীবনের বেশীর ভাগ সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা নির্ভর করে অপরের সঙ্গে আপনার ব্যবহারের পদ্ধতিতে। বন্ধুই আপনাকে সবচেয়ে বেশী দুঃখ দিতে পারে আবার তারাই আপনাকে সবচেয়ে সুখী করতে পারে। জীবনে ত নানাবিধ সমস্যায় তারাই আপনাকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসে। সেইজন্যই বন্ধুই (আপনার পরিবারের লোকজনও এর অন্তর্গত) আপনার জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি এবং ঐ জন্যে তাদের সঙ্গে আপনি ব্যবহার করবেন। বন্ধুত্ব একটি আর্ট এবং তা রক্ষা করা বড়ই শক্ত। সব সময় একটু প্রয়াসের দরকার যা খুব কম লোকের মধ্যেই আছে। মনে করবেন আপনি বন্ধুর কাছ থেকে যে ব্যবহার প্রত্যাশা করেন, বন্ধুও সেই রকম করে।

প্রবন্ধটি শেষ করার আগে আবার একই কথা বলছি যদি মনে করেন আপনি অসন্তুষ্ট, উপরে লিখিত পন্থাগুলি নিজের মধ্যে আনবার চেষ্টা করুন। নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট এবং সুখী হবেন।

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় জন্যই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে, দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেইজন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়-নির্দ্দেশিত "সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

প্রায় সমস্ত অদ্বৈতমত-প্রতিপাদক গ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সেই সংস্কৃত ভাষা ত দেহস্থ আত্মা হইতেই স্ফুরিত হইয়া থাকে। অতএব সেইজন্য অদ্বৈত মত দেহস্থ আত্মা হইতেই স্ফুরিত। অতএব সেইজন্য অদ্বৈতমত প্রতিপাদক সমস্ত গ্রন্থে যে আত্মজ্ঞানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সে আত্মজ্ঞানও দেহস্থ আত্মা হইতেই স্ফুরিত হইয়া থাকে। ২।

দেহেই আত্মা বিকাশিত। সেই দেহস্থ আত্মাতেই আত্মজ্ঞান বিকাশিত হইয়া থাকে। অদেহস্থ আত্মা হইতে ত কখনই আত্মজ্ঞান বিকাশিত হয় না। দেহ ত পরিমিত, তন্মধ্যস্থ আত্মা সেই দেহ অপেক্ষা বৃহৎ, তাহাও ত বোঝা যায় না। তুমিই যথার্থ বল দেখি যে, তোমার দেহ যত বড়, তন্মধ্যস্থ আত্মাকে কি তাহা অপেক্ষা বৃহৎ বোধ কর? আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, তাহা তুমি কখনই বোধ কর না। তোমার দেহে আঘাত করিলে তাহারা তুমি-আত্মা কষ্ট বোধ কর। কিন্তু তোমার পার্শ্বস্থ কোন শূন্যে আঘাত করিলে ত তোমার কষ্ট বোধ হয় না। তবে তুমি-আত্মাই সর্বত্রে আছ, ইহা কি প্রকারে অবধারিত হইতে পারে? ৩

এক দেহের আত্মায় আত্মজ্ঞানের স্ফুরণ দেখিতে পাই। কিন্তু অন্য দেহের আত্মায় তদ্রূপ আত্মজ্ঞানের স্ফুরণ দেখি না। সর্ব দেহে একাত্মারই বিদ্যমানতা থাকিলে সর্ব দেহেই আত্মজ্ঞানের স্ফুরণ বুঝিতাম। তাহা হইলে কোন দেহে অনাত্মজ্ঞানী আত্মা এবং কোন দেহে আত্মজ্ঞানী আত্মা থাকিতেন না। ৪

দেহ অবলম্বনে আত্মা হইতে আত্মজ্ঞান বিকাশিত হইয়া থাকে। দেহ অবলম্বনে আত্মা হইতে আত্মপ্রেম বিকাশিত হইয়া থাকে। দেহ অবলম্বনে আত্মা হইতে শুদ্ধ ভক্তি বিকাশিত হইয়া থাকে। দেহ অবলম্বনে আত্মা হইতে কত শক্তিই বিকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং সেই দেহকে তুমি অপ্রয়োজনীয় বলিতে পার না।

[ক্রমশঃ]

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৩—

(৪৮)

ঠাকুর, তোমার 'আশা' আমি যেন আমার জীবনে সার্থক করিতে পারি। আমার মস্তক তোমার চরণে লাগিয়া থাকুক। 'বনত বনত বনি যাই'। তুমি আমি কি পরম প্রেম যোগে এক হইব না? তোমার জীবন ও দর্শনের বিশ্বের বড় প্রয়োজন ছিল! জাগো আমার জীবনে নিত্যগোপাল। তোমাকে বুকে লইয়া কি আমি আগাইতে পারিব না? আমার আবেষ্টন কি অনুকূল হইবে না? সারা জীবন তো কড় ঠেলিলাম। অসক্ত হইয়া পড়িবার মত ঘটনার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আটকাইয়া যাই নাই। তোমারই কৃপা তাহা। 'সিনান করিবি কেশ না ভিজাবি'—তোমার আশীর্বাদে জীবন দিয়া কিছুটা বুঝিয়াছি। ঠাকুর, ঠাকুর, জাগো।··· ৮-এ রাসবিহারী এভিনিউ হইয়া মঠে যাই।···মঠে গিয়া শ্যামসুন্দরানন্দের ওখানে যাই।···মন্দিরের লোহার সিঁড়িটা নষ্ট হইয়া যাইতেছে, দোষ নাকি ট্রাইবের। বলিলাম, 'ভাগের মায়ের গঙ্গাপ্রাপ্তি হয় না'—এই নীতি আমি বুঝি না। কংগ্রেসের কাজে নিজেই আগাইয়া গিয়াছি, কেহ আসিয়াছে কিনা দেখি নাই। আমার মায়ের সেবা আমি করিব, অন্য ভায়েরা পারুক আর না-পারুক। আমার ঠাকুরের কাজ আমি করিব—divided responsibility প্রেমে নাই। প্রতিটি মানুষ এখানে সমগ্র। কালনার সারদানন্দের সঙ্গে কথা হয়।··· সারদানন্দ উদ্বোধন আফিসে গিয়াছিল। বলিল সম্পাদক উজ্জ্বলভারতের প্রশংসা করিয়াছেন।

২১শে মার্চ

অন্নপূর্ণা পূজা

ঠাকুর আমার, জীবন সর্বস্ব আমার, তুমি আসিয়াছিলে বিশ্বকে মনের স্তর হইতে প্রাণের স্তরে উন্নীত করিবার জন্য। প্রাণের পথ তোমার পথ। প্রাণই সর্ব সমন্বয় সর্বস্ব। এ বিশ্বে কিছুই তোমার অনন্য নাই। তুমি সর্বদর্শন সমন্বয়, সর্বজাতি সমন্বয়। তোমার জীবনে সে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রতিটী মানুষ আজ পরস্পর বিরুদ্ধ চিন্তবৃত্তির সঙ্ঘর্ষে শ্রান্ত, ক্লান্ত; কে তাহাকে উদ্ধার করিবে প্রাণ তুমি ছাড়া? বিশ্ব আজ প্রলয়পয়োধি জলে নিমগ্ন। তুমি বেদ রাখিয়া গিয়াছ, জীবন রাখিয়া গিয়াছ তোমার জীবনে জীবন লাভ করিব, মন-বুদ্ধি তোমার ভাবে ভাবিত হউক। তোমাকে বুকে লইয়া আমি তোমার শরণাগত। তোমার চরণে চন্দন-বিন্দুর মত আমি লাগিয়া রহিব, তোমার সঙ্গে সংলাপরত থাকিব। তোমার বিশ্বকে জয় করিবার জন্য তোমার এই বিশ্ববিজয়াভিযান সফল হউক। ৮টার পর আমি প্রতিভা রেণু গোপা লীনা ও তাহার পুত্র কন্যা মঠে যাই। অধ্যা ৯।০টার পর আসে, সুধাংশুও আসে। কমলা আসে নাই।·····রে ফিরিয়া আসে প্রায় ১২টায় জ্ঞানবাবুসহ।···৩।টার পর মাঠে যাই।···৫টার পর বক্তৃতা আরম্ভ হয়। সভাপতি হই আমি। প্রথমে পরমানন্দ গান গায়। পরে বিজ্ঞানানন্দ, তাহার পর প্রকাশানন্দ, তাহার পর আমার ভাষণ হয়। মণি সেন বাতাস দেয়। লালু আসিয়াছিল মনের স্তরের সঙ্ঘর্ষকে পরিপাক করিয়া কেমন করিয়া নিত্যগোপাল-জীবনে প্রাণ-তত্ত্ব অমিয়া উঠিয়াছিল, কত ভুবন মুচি, কত বেশ্যা তাঁহার শ্রীচরণে স্থান পাইয়াছিল দার্শনিকদের মহারাস প্রবর্তন করিতে নিত্যগোপাল আসিয়াছেন—ইত্যাদি বলি। তিনি আদর করিয়াছেন আমরা আদর করি নাই—এই ব্যথায় খুব কাঁদি। জনরঞ্জনবাবু আগাগোড়া ছিলেন। গুরুভাইগণ বিশেষ করিয়া সন্ন্যাসী গুরুভাইগণ তেমন উপস্থিত ছিলেন না

উপেন ঘর বন্ধ করার পূর্ব হইতেই উপস্থিত ছিল।

২১শে মার্চ

ঠাকুর নিতাগোপাল, গৌরীদুলাল, মায়ের কোলে কি তোমার ভুবনমোহনরূপের শোভা। চাঁদের জ্যোৎস্না গায়ে মাখিয়া তুমি আসিয়াছ। খলখল হাসি, তোমার অঙ্গের দোলনি ভুবনমোহন। তোমার স্পর্শ আর তো পাইব না। ধ্যানে তুমি আসিতে পার, কিন্তু তোমার জড় দেহের স্পর্শ তো আর পাইব না, তোমার রক্ত-মাংসের মুখের স্নেহ-আহ্বান তো আর শুনিব না। সে ব্যথা অহরহ বাজিতেছে। আজ তুমি পটের ঠাকুর। তোমায় যে পাদপদ্ম একদিন আমার বক্ষকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি, সেই পাদপদ্মকে আজ শুধু মনে মনে ভাবিতে আমার কি ভাল লাগিবে বল? ওগো আমার 'বর্তমান' ঠাকুর আমার, তোমার নিত্য বর্তমান রূপই আমার আকর্ষণের বস্তু। গলাটা ভাঙিয়াছে, শরীরটাও ক্লান্ত। ...জনরঞ্জনব্যাধির কি আমার আলোচনার উপর একটা স্নেহ-দৃষ্টি পড়িয়াছে?...মঠের প্রসাদ নিয়া বহু লোকের নানা প্রাণহীনতার অভিযোগ।...ঠাকুরের জীবনী পাঠ, নরহাটির আদি লীলা, শেষ হয়। আজ জন্মমেলার উৎসব মঠে হইয়াছে—বাৎসরিক সভাও হইবার কথা।...

২৩শে মার্চ

ঠাকুর, তোমার সংসার আমাকে নানা ভাবে বিব্রত করিতেছে। আমি মনকে প্রাণের ছন্দে ছন্দিত করিতে চাহিয়াছি, সকলের ভাগোর সঙ্গে নিজ ভাগ্য এক বলিয়া একাত্ম হইতে চাহিয়াছি, সকলকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিতে চাহিয়াছি, পারিলাম কৈ? সকলেই তো দূরে দূরে থাকিতে চায়। কি কাজ আমি করিব? কাহাকে লইয়া করিব? কি দিয়া করিব? তোমার জীবন-কথা কহিবার জন্য ব্যাকুল ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাহার জন্য যে বন্দোবস্ত দরকার, কে তাহা করিবে? কি দিয়া করিব? তোমার জন্য স্থলীতে সভা সমিতি হওয়া দরকার। কে তাহার বন্দোবস্ত করিবে? এই সব ভাবিয়া আমি বিহ্বল হইয়া পড়ি। অথচ বুকভরা বাসনা!...মানুষের কি সেবা করিতে পারিলাম? শক্তি সামর্থ্য আমার কি আছে?...ঠাকুরের উপদেশ পাঠ আজ হইতে আরম্ভ হয়। পিতা-মাতা ও সন্তানদের ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ বলিয়া প্রত্যেকেরই 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' ভগবানের শরণাগত হওয়া উচিত, ভগবানকে মাঝখান হইতে সরাইয়া দিলে পিতা-পুত্রের মধ্যে যে সম্পর্ক, তাহা শুধু সংস্পর্শজ ভোগ বলিয়া দুঃখযোনি। পিতা যদি বিশ্বরূপ হয়, পুত্র যদি বিশ্বরূপ হয়, তবেই উহারা পরস্পরকে পাইতে পারে। সারাজীবন তো এই পাওয়ার জন্য প্রাণপণ করিলাম। প্রতি মানুষকে বিশ্বরূপের ঘরে উন্নীত করিয়া পাইবার জন্য কী না করিয়াছি! যতদূর পারিয়াছি মানুষের মর্যাদা দিয়াছি।...

২৪শে মার্চ

ঠাকুর, আমার দেহ-প্রাণ-মন সব তোমার, আমিও তোমার। তোমার শ্রীচরণাশ্রিত পথ ধরিয়াই আমি যেন চলিতে পারি। 'মদ্গতং তব'-বাণী আমার জীবনে সার্থক হউক। তোমাকে বিশ্বাস করিব, তোমার উপর নির্ভর করিব। নিরঞ্জন হইলেই না মানুষ তোমার সঙ্গে 'পরমং সাম্যম্ উপৈতি'? আমি নিরঞ্জন হইব। শরণাগতির ভিতর দিয়া যখন প্রাণের স্তরে উপনীত হইব, তখনই 'তুমি আমি - আমি তুমি' বলিতে পারিব। মনের স্তরে ঐরূপ বলা বা ভাবা ধৃষ্টতা মাত্র। মনের স্তরে তুমি প্রভু, আমি তোমার সেবক। আমি তোমার সঙ্গে অদ্বৈত হইব—আমার এই আকাঙ্ক্ষা সার্থক কর। তোমার জয় হউক।...৭টার পর আমার ঘরে ঠাকুরের উপদেশবাণী পাঠ হয়: ভগবানকে পাইবার জন্য চাই বিশ্বাস একাগ্রতা ও সাহস—এই কথাগুলি খুব ভাল লাগিল। আর ভাল লাগিল—তুমি আমি ভেদে আত্মার প্রকারতা ও তাহার পরই তুমি আমির একাত্মতা। আত্মা ঠাকুরের মধ্যে সর্বোপাধিমুক্ত ও সর্বোপাধি-যুক্ত। প্রত্যক্ষকে তিনি স্বীকার করেন, কাজেই যেমন তেমন করিয়া আত্মাকে এক বলা ঠিক নয়। তোমার দেহ আমার দেহ এক নয়, তোমার ক্ষুধা আমার ক্ষুধা এক নয়, তোমার ক্ষুধা দূর হইলেই আমার ক্ষুধা দূর হয় না। তবে তো আত্মার বহু প্রকারতা স্বীকার

করিতেই হয়। অথচ আত্মা আত্মা হিসাবে একই। কেমন করিয়া প্রত্যক্ষের এই বহু-দেখা ও যুক্তির এক-দেখাকে এক করা যাইবে, তাহাই জিজ্ঞাস্য। সেই কাজ আমাকে করিতে হইবে নূতন যুগের নূতন দর্শন, নূতন লজিক, নূতন পদার্থবিদ্যার সাহায্যে।...

রবিবার মাঠে

ঠাকুর, তোমাকে বিশ্বাস করিব, তোমাতে একান্ত হইব, সাহস করিয়া তোমার এই বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইব। আমাকে বিশ্বাস দেও, একাগ্রতা দেও, সাহস দেও। যে ভাবে সকল সংসারের সঙ্গে বিপ্লব করিয়া চলিয়াছি, সংসার আমাকে ছাড়িবে কেন, পথ আগলিয়া না রাখিবে কেন? হয় আমি আগাইব, না হয় পিছনে ঠেলিয়া নিয়া যাইবে, সকলের নীচে ফেলিয়া দিবে। আমার দুর্জয় সাহস না থাকিলে চলিবে কেন? তোমাতে, বিশ্বাস ও একাগ্রতা না থাকিলে বুকে সাহস আসিবে কেন? আজ রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র কিয়দংশ পরেশবাবুর চিঠি পাঠ হয়। সাধারণ সমাজের উপরে না উঠিতে পারিলে সমাজ নিজের জোরে পিছনে ঠেলিয়া দিবে। আমার জীবন তো তাই। যাহারা কংগ্রেসের ডাকে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিলেন, তাহারা ঘরে গিয়া বাঁচিয়াছেন। আমি আজিও পথে দাঁড়াইয়া আছি—অথচ পিছনে ঠেলিয়া ফেলিতে পারে নাই সমাজ। সে তোমারই দয়া ঠাকুর। না হইলে কোথায় ভাসিয়া যাইতাম। খুব বড় ঠেলিয়া চলিলাম।...আমরা বেদ ঈশ্বর সম্বন্ধে 'pre existing knowledge or cherished prejudice'-এর বিরুদ্ধে আলোচনা করি, কিন্তু আমরা বেদ ও ভগবানকে create করার কথাও বলি।...আজ মঠ কি অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! হায় ঠাকুর, তুমি না প্রাণ লইয়া আসিলে! কেহই তো মঠের উপর খুশী নয়, কি বেদনার কথা! কাহারও মর্যাদা কি সেখানে রক্ষিত হয়? সেখানে কি কেহ কাহারও খোঁজ নেয়। আমি দুই বেলাই তো গিয়াছিলাম। বৈকালে জনরঞ্জনবাবু ছাড়া আর কেহ কি প্রসাদ পাইবার খোঁজ নিয়াছে? কে তার খোঁজ করে।... ২৬শে মার্চ

ওগো শ্রীগৌরসুন্দর, তুমি তো শ্রীনিত্যগোপালরূপে দ্বিতীয়বার আসিয়াছিলে। শ্রীনিত্যগোপাল মতে তুমি পুরুষস্বভাববিশিষ্ট, নারীস্বভাববিশিষ্ট, তোমার জীবনেই নরনারী সমন্বিত। নারী তোমার জীবনে পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছে, পুরুষ 'যেহি পদপল্লবমুদারম্' বলিয়া নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বাঙ্গলা তোমার এই জীবনকে, এই জীবনাদর্শকে বুকে লইয়া পরস্পর-বিরুদ্ধের সমন্বয় করিয়া নূতন জগৎ গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যাকুল। শ্রীনিত্যগোপাল, তুমি দার্শনিকভাবে সর্বপ্রথমে পুরুষ-প্রকৃতির সমমূল্য, সম অনন্তত্ব স্বীকার করিয়া গেলে। তোমার জয় হউক। শ্রীরাধাই অনন্ত প্রকৃতি, পরা প্রকৃতি। তাঁহারই চাপে বিশ্ব গড়িয়া উঠিবে।... ঠাকুরকে 'আমি' বলিয়া ভাবিতেই ভালবাসি, তাঁহার বিশ্বকেও। কাহাকে 'আমি' ছাড়া কোনও রূপ পৃথক্ বুদ্ধিতে ভাবিতে শিখি নাই। ইহা ছাড়া আর আমার সাধনার কি থাকিতে পারে?...ঠাকুরের লেখা পাঠ হয়। আমি আমার কাছে 'আমি', কাহারও কাছে 'তুমি', কাহারও কাছে 'তিনি'। ব্যবহার ক্ষেত্রেই আমি তুমি-তিনির সমন্বয়, আমি flexible, relative। এই হিসাবে আমি 'অদ্বৈত', আবার আমি শিবও। আমি আমি থাকিয়াই শিব, যেমন লৌহ লৌহ থাকিয়াও অগ্নি হইতে পারে। আবার আমি নাই, তুমি নাই, আপনি নাই, জীব নাই, শিব নাই, সোঽহং বলাও নাই। আছেন শুধু কেবলাত্মা। 'আছেন' বলিয়া বোধও তখন নাই। 'আছেন' এই বোধ হয় যখন সত্তা সাজিয়া জাগ্রৎ অবস্থায় ফিরিয়া আসে। দুই-ই তুলারূপে নিত্যগোপাল জীবনে ও দর্শনে সত্য। ব্যবহারিক অদ্বৈতবাদ, স্বপ্নের অদ্বৈতবাদ ও সুষুপ্তির অদ্বৈতবাদের সমন্বয় প্রচার করিয়াই তিনি প্রকৃত অদ্বৈতবাদী। ঠাকুর, আমি তুমি হইব তোমার বিশ্ব হইব; কিছুই হইব না, আবার সব হইব—তোমার শ্রীচরণস্পর্শে আমার এই দিব্য জ্ঞান দিব্য প্রেম হউক। মাখনবাবু আসেন সন্ধ্যার পর।...

২৭শে মা

'তোমারেই প্রাণের কথা কহিব। সুখে দুঃখে শোকে

আঁধারে আলোকে চরণে চাহিয়া রহিব। কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে তুমি তা জান প্রভু গো। তোমারি আদেশে রহিব এ দেশে সুখ দুঃখ যাহা দিবে সহিব। যদি বনে কভু পথ হারাই প্রভু, তোমারি নাম লয়ে ডাকিব। বড়ই প্রাণ যবে আকুল হইবে, তোমারই চরণে হৃদয় রাখিব। তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব, তোমারি কার্য যা সাধিব। শেষ হয়ে গেলে ডেকে নিও কোলে বিরাম আর কোথা লভিব।' কুসুম সরোবরে আদেশ দিয়াছিলে, 'যা বাঙ্গলায়, কাজ আছে, এতদিন পরে আবার দেখা হইবে'। শুনিতে আমি চাহিয়াছিলাম না, তীব্র অবের ভিতর বলিয়া উঠিলাম, 'আমি কি এখানে মরিতে আসিয়াছি'? তখন আসা স্থির করিলাম। আবার তোমার ডাকের প্রতীক্ষায় রহিব, কাণ পাতিয়া রহিব। ডাক আসিলে চলিয়া যাইব। সুখদুঃখ আদর অনাদর আঘাত ও অবিশ্বাস সব সহিতে প্রাণপণ করিব। আঘাত কাহাকেও করিব না, আঘাত সহিয়া যাইব। ৮টার পর প্রাণহরি সিংহ আসে, অনেক কথা হয় ঠাকুরের জীবনদর্শন সম্বন্ধে, আমার জীবনের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে। তাহার অবস্থাও শুনিলাম। সে অনেক কিছু করিয়াছে, কিন্তু শেষ সামান দিতে পারিল না। ঠাকুরকে সে 'দাদু' বলিয়া ডাকে, ঠাকুরের জন্য নবদ্বীপের কাছে সে স্থান করিয়া দিল। সেখান হইতে বড় বড় কুমড়া আনিয়া দিত। কেন জানি না, আজও ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে। এরূপ দর্শন নাকি কোথাও সে শোনে নাই। তাহাকে মুড়ি দুধ খাইতে দেওয়া হয়। দুপুরে খাইয়া যাইতে বলিলাম। ওখানে বক্তৃতার কথা বলিল। তাহাকে উদ্বোধন ১ম, ২য়, ৩য় বর্ষ ও বর্তমান বৎসরের ৩ সংখ্যা দিয়া দেওয়া হয়।...প্রতিভা নারায়ণপুর যাইবার কথা বলে। তাহার শরীর মন ভাল নয়। তাই এখন মানা করি। আমার কোথাও যাইবার স্থান নাই। বিপদে আপদে পড়া ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা করে না। কিরকম বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। মন্থর ওখানে পূজার পর আর যাই নাই। আশ্রয়। উমাঙ্গিনী আজ আসে নাই। সে তো বৈশাখের প্রথমেই মন্থর ওখানে যাইবে। দূরে গেলে দেখা হওয়া সহজ হইবে না। কাহাকেও কাছ ছাড়া করিতে চাই নাই। সবলেই কাছ ছাড়া হইবে—ইহাই বুঝি আমার ভাগ্য বিধান।

২৮শে মার্চ

ঠাকুর, সর্বাশ্রয় আমার, তুমিই আমার পিতা মাতা, তুমিই আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা। কাহাকে আশ্রয় করিব? তুমিই আমার গতি কর্তা প্রভু সাক্ষী নিবাস শরণ সুহৃৎ প্রভব প্রলয় স্থান নিধান ও অব্যয় বীজ। আমার নিত্য স্থান তোমারই শ্রীচরণ-প্রাপ্তি, আমার দাঁড়াইবার ও জুড়াইবার একমাত্র 'স্থান' তুমি। তোমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব? সকালে Physics and Philosophy বইটি পাঠ করি—Appearance and Reality অধ্যায়। 'We may picture the world of reality as a deep flowing stream, the world of appearance is its surface, below which we cannot see. Events deep down in the stream throw up bubbles and eddies on to the surface of the stream...Our phenomenal world consists of the activities of matter and photons; the theatre of this activity is space and time. Thus, the walls of the cave in which we are imprisoned are space and time; the shadows of reality which we see projected on the walls by the sun-shine outside are the material particles which we see moving against a back-ground of space and time, while the reality outside the cave which produces these shadows is outside space and time.

Many philosophers have regarded the world of appearance as a kind of

আঁধারে আলোকে চরণে চাহিয়া রহিব। কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে তুমি তা জান প্রভু গো। তোমারি আদেশে রহিব এ দেশে সুখ দুঃখ যাহা দিবে সহিব। যদি বনে কভু পথ হারাই প্রভু, তোমারি নাম লয়ে ডাকিব। বড়ই প্রাণ যবে আকুল হইবে, তোমারই চরণে হৃদয় রাখিব। তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব, তোমারি কার্য যা সাধিব। শেষ হয়ে গেলে ডেকে নিও কোলে বিরাম আর কোথা লভিব।' সুসুম সরোবরে আদেশ দিয়াছিলে, 'যা বাঙ্গলায়, কাজ আছে, এতদিন পরে আবার দেখা হইবে'। শুনিতে আমি চাহিয়াছিলাম না, তীব্র জবের ভিতর বলিয়া উঠিলাম, 'আমি কি এখানে মরিতে আসিয়াছি'? তখন আসা স্থির করিলাম। আবার তোমার ডাকের প্রতীক্ষায় রহিব, কাণ পাতিয়া রহিব। ডাক আসিলে চলিয়া যাইব। সুখদুঃখ আদর অনাদর আঘাত ও অবিশ্বাস সব সহিতে প্রাণপণ করিব। আঘাত কাহাকেও করিব না, আঘাত সহিয়া যাইব। ৮টার পর প্রাণহরি সিংহ আসে, অনেক কথা হয় ঠাকুরের জীবনদর্শন সম্বন্ধে, আমার জীবনের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে। তাহার অবস্থাও শুনিলাম। সে অনেক কিছু করিয়াছে, কিন্তু শেষ সামাল দিতে পারিল না। ঠাকুরকে সে 'দাদু' বলিয়া ডাকে, ঠাকুরের জন্য নবদ্বীপের কাছে সে স্থান করিয়া ছিল। সেখান হইতে বড় বড় কুমড়া আনিয়া দিত। কেন জানি না, আজও ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে। এরূপ দর্শন নাকি কোথাও সে পোনে নাই। তাহাকে মুড়ি দুধ খাইতে দেওয়া হয়। দুপুরে খাইয়া যাইতে বলিলাম। ওখানে বক্তৃতার কথা বলিল। তাহাকে উদ্বোধন ১ম, ২য়, ৩য় বর্ষ ও বর্তমান বৎসরের ৩ সংখ্যা দিয়া দেওয়া হয়।...প্রতিভা নারায়ণপুর যাইবার কথা বলে। তাহার শরীর মন ভাল নয়। তাই এখন মানা করি। আমার কোথাও যাইবার স্থান নাই। বিপদে আপদে পড়া ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা করে না। কিরকম বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি! মন্থর ওখানে পূজার পর আর যাই নাই। ইচ্ছাও করে না। ঠাকুর, ঠাকুর, তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়। উষাদিদী আজ আসে নাই। সে তো বৈশাখের প্রথমেই মন্থর ওখানে যাইবে। দূরে গেলে দেখা হওয়া সহজ হইবে না। কাহাকেও কাছ ছাড়া করিতে চাই নাই। সকলেই কাছ ছাড়া হইবে—ইহাই বুঝি আমার ভাগ্য বিধান।

২৮শে মার্চ

ঠাকুর, সর্বাশ্রয় আমার, তুমিই আমার পিতা মাতা, তুমিই আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা। কাহাকে আশ্রয় করিব? তুমিই আমার গতি ভর্তা প্রভু সাক্ষী নিবাস শরণ সুহৃৎ প্রভব প্রলয় স্থান নিধান ও অব্যয় বীজ। আমার নিত্য স্থান তোমারই শ্রীচরণ-প্রান্তে, আমার দাঁড়াইবার ও জুড়াইবার একমাত্র 'স্থান' তুমি। তোমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব? সকালে Physics and Philosophy বইটি পাঠ করি—Appearance and Reality অধ্যায়। 'We may picture the world of reality as a deep flowing stream, the world of appearance is its surface, below which we cannot see. Events deep down in the stream throw up bubbles and eddies on to the surface of the stream...Our phenomenal world consists of the activities of matter and photons; the theatre of this activity is space and time. Thus, the walls of the cave in which we are imprisoned are space and time; the shadows of reality which we see projected on the walls by the sun-shine outside are the material particles which we see moving against a back-ground of space and time, while the reality outside the cave which produces these shadows is outside space and time.

Many philosophers have regarded the world of appearance as a kind of illusion,...Modern physics does not confirm

সুখাস্বাদন করিতেছেন, তাঁহাদের সে সুখ জীর্ণ হইয়া গেলে তবে তাঁহাদের ভগবৎসুধা পান করাইবার চেষ্টা পাওয়া উচিত'। নিত্যধর্ম পত্রিকা, ১ম বর্ষ ১০ম ১৬১ পৃঃ।

৩১শে মার্চ

রাধারাণী, তুমি জীবনে আসিয়াছিলে অযাচিত করুণায়। তোমার সাধনা আমি করি নাই, তোমার কথা কোনদিন ভাবিও নাই। তবুও তো তোমাকে আমার ভাল লাগে। কেন জানি না। ভাবিয়াছিলাম, তোমাকে পাইয়া বিশ্বের এক দল নারী-প্রকৃতিকে পাইব, পরাশক্তিতে গড়িয়া উঠিবে। তাহাদের নিয়া সাধারণ নারীদের পরাপ্রকৃতিতে গড়িয়া তুলিবার জন্য অভিযান করিব। ব্যর্থই বুঝি হইলাম। মেয়েদের সত্ত্বমবোধের অভাবের কথা আজ বেড়াইতে যাইবার পথে মনে হইতেছিল।…শ্রীরাধা আমার সত্ত্বমবোধের মূর্তি। সকালে প্রার্থনার পর আমি ও গোপা চিত্তরঞ্জন পার্কে বেড়াইয়া আসি।…আমার যোগ্যতার দিক হইতে দেখিলে ঠাকুর আমাকে যাহা দিয়াছেন, বলিবার কিছু নাই। কিন্তু কাজ হইল কৈ? তিনি যদি বলেন, বর্তমানে ইহাই যথেষ্ট। ইহা ভাবিয়া শান্তি পাইলে তো ভাল হইত। এক এক মাস করিয়া দিন ফুরাইবে, শতবার্ষিকী উপস্থিত হইবে। কিন্তু কেহ কি সেজন্য প্রস্তুত হইতেছে? তুমি কি গোপনেই রহিবে ঠাকুর? প্রাণ কেন আমার ছটফট করে? মনে হয় এখনই তোমার জীবন ও দর্শন ছড়াইয়া পড়িতে পারে। ছড়াইয়া না পড়িলে মানুষ বাঁচিবে কি করিয়া? মানুষ যে collapse করার অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে। কে উৎসাহ দিবে তুমি ছাড়া? তুমি এস ঠাকুর, তুমি আবার এস। 'Idea on God' পড়ি।…ঠাকুরের প্রতিটি লেখার background-এ যে একটি 'ঝগড়া' ছিল, তাহারই সমাধান তিনি দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত লেখাই প্রতিবাদমূলক, অথচ গঠনাত্মক। সকল গোড়ামির অবসান তিনি দিয়া গিয়াছেন। দর্শনে, সাধনায়, লৌকিক ব্যবহারে Law of excluded middle যে আর চলিবে না, প্রতি লেখার মধ্যে তাহাই আছে। প্রতিটি সাধনায় তিনি সমর্থন ও অসমর্থন, প্রতিবাদ ও অপ্রতিবাদ দুই-ই করিয়াছেন।

১লা এপ্রিল

রাধারাণী, তুমিই বিশ্বের continuity ও immanence মূর্তিমতী। এতদিন continuity খুঁজিয়াছে দার্শনিকগণ বহুর ওপারে বহুকে ছাড়িয়া ফেলিয়া। পরা প্রকৃতি তোমার আবির্ভাবে সেই continuity আজ immanence-এর বুকে। তুমি বিশ্বের সব relatedness-এর বিগ্রহ। তোমাকে পাইয়া আমি কৃতার্থ: কিন্তু তোমার আসন রচনা করিতে পারিলাম কৈ এই অপরা প্রকৃতির বুকে, mechanical প্রকৃতির বুকে? তুমিই দেখাইয়া গিয়াছ Reality lies ahead, তাই তুমি অভিসারী। Mechanical প্রকৃতির দৃষ্টি পিছনের দিকে, cause-এর দিকে। তোমার দৃষ্টি end এর দিকে, সামনের দিকে। সৎ-এর ভাষায় আনন্দের ব্যাখ্যান যান্ত্রিক প্রকৃতির ধর্ম, আনন্দের ভাষায় সৎ-এর ব্যাখ্যান পরাপ্রকৃতির ধর্ম।…মিনু আজ কাটিং লিখিতে যায়।…যতটুকু আমার সাধ্যে কুলায়, আমি কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া করিব। ৭॥টার পর পাঠ আরম্ভ হয়। ঠাকুরের লেখা বোঝা খুবই কষ্ট। যখন তিনি জীবের 'দাসত্ব' সম্বন্ধে লেখেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, অধিকার ভিক্ষাইয়া মানুষ যখন সোঽহং বলে, তিনি তাহারই প্রতিবাদ করিয়া ঐ লেখা লিখিতেছেন। আবার যখন অদ্বৈতবাদের সমর্থন করিতেছেন তখন দ্বৈতবাদের গোড়ামিরই প্রতিবাদ করিতেছেন। এই রহস্যটুকু না বুঝিলে ঠাকুরের লেখা বোঝাই দুষ্কর হইবে।…

২রা এপ্রিল

ঠাকুর, বিশ্বসৃষ্টির ক্রম-বিবর্তনের পথে তুমি মীন-কূর্ম-বরাহ-নৃসিংহ-বামন-পরশুরাম-শ্রীরাম-হলধর-বুদ্ধ-কল্কি রূপ ধারণ করিয়াছিলে, শ্রীগৌরসুন্দররূপ ধারণ করিয়াছিলে। তুমি ছিলে ও আছ সৃষ্টির সাথী। তুমি যেমন বিশ্বসৃষ্টি করিতেছ, বিশ্বও তেমনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। তাই তুমি যুগ-প্রয়োজনে যুগে যুগে কত কত রূপ ধারণ করিয়াছ। 'God and the world'—ইহাই আমার ধ্যানের বস্তু। 'অগদেব হরিঃ হরিরেব জগৎ'। বর্তমান যুগ-

উপযোগী তোমার নিতাগোপাল-রূপ কি বিশ্বের বুকে পৌঁছাইয়া দিয়া যাইতে পারিব না? সুযোগ করিয়া দেও, ঠাকুর। লেকে বেড়াইতে গিয়া তারকেশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা। কথাবার্তা হয় কিছু কাল। আজ যীশুর crucification-এর দিন। ভগবান যীশুর এই ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ভিতর দিয়া কি মানুষের নৃশংসতার অবসান হইবে না? যীশু, যীশু, তোমার জীবনে কি বিশ্ব জীবন লাভ করিবে? অত্যাচার কি শুদ্ধ হইবে না? Judas-এর দল কি আজও শিক্ষালাভ করিবে না? প্রতিভা আজও আসিল না। বুধবার আসিবে বলিয়া গিয়াছে, আজ শুক্রবারও গেল। কোন পত্রও নাই। ভাল থাকিলেই বাঁচি। সকালে মখেনবাবু···সন্তোন বয় আসে। তাহার কাছে রাণাঘাটের নরেনের বইর কথা বলি।···সাময়িকী ভূদান যজ্ঞ লিখিতে আরম্ভ করি···ঠাকুরের মুখের দিকেই তাকাইয়া থাকিব। হয় আমি অযোগ্য, অযোগ্যকে দিয়া যতদূর হইবার তাহা হইয়াছে, নয় কাল এখনও আসে নাই। যাহাই কেন সত্য হউক না, আমি দুঃখ করিব কেন? মানুষ পাই নাই বলিয়াই বা দুঃখ কেন? আমি যেমন যোগ্য, তাহার বেশী তো পাইব না। আমার কোনও ধরাবাঁধা জীবন যাপন-প্রণালী নাই, লোক আসিবে কেন?

৩রা এপ্রিল

শ্রীনিতাগোপাল আমার, তুমি গৌরগোপালরূপে মানুষের জীবনের অন্তর্নিহিত অনন্তের জন্য সর্বেন্দ্রিয়ের কান্নাকে রূপায়িত করিয়া গিয়াছ, মানুষকে বুঝিবার সুযোগ দিয়া গিয়াছ যে মানুষ-বস্তুতঃ অনন্তের জন্যই পাগল, স্ত্রীপুত্রাদির জন্য কান্না তাহার অনন্তের কান্নাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য। সান্ত অনন্ত সমস্তই তো সত্য, এক indivisible whole। সান্ত তাই অনন্তের জন্য কাঁদে; অনন্তেরও কি কম ব্যথা সান্তকে বুকে পাইয়া whole হইবার জন্য? তুমি বর্তমান যুগে আসিয়াছ সেই কান্নার ছন্দকে সব-সমন্বয়ের ভিতর দিয়া প্রকট করিতে। তোমাকে বুকে লইয়া ছুটিতে চাই। আমায় বল দেও। আমার জীবনের প্রতি স্পন্দনে তুমি প্রকাশিত হও। তোমায় ছড়াইয়া দিয়া আমি জুড়াইতে চাই। সকালে গোপালদা হরিগোপালবাবুদের বাসার দিক দিয়া 'পূর্ণমিত্র প্রেস' দিয়া ঘড়ীঘরের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া আসি। সকালে প্রুফ দিয়া যায়।····পাঠ হয়—আত্মা অপুরুষ, আত্মা অপ্রকৃতি। আত্মার বন্ধন নাই, মুক্তি নাই। আত্মার সাধন নাই, সাধ্য নাই। আত্মা দ্বৈত নয়, আত্মা অদ্বৈত নয়। আবার লিখিয়াছেন, 'আত্মাই পুরুষ, আত্মাই প্রকৃতি'। সব না-এর ভাষায়, সব হাঁ-এর ভাষার যিনি ব্যাখ্যাতা, তিনিই আত্মা continuity। Continuity ও immanence-ই আত্মা। প্রকৃতির সব পরিণাম পরিপাক করিয়া, ভিজাইয়া যিনি ছুটিয়া চলিতে পারেন, তিনিই আত্মা। সকল আত্মা ব্যাপিয়া যিনি, তিনিই পরমাত্মা। আত্মাই পরমাত্মা। Abstration-এর চরম ইহা।···

৪ঠা এপ্রিল

শ্রীগৌর আমার ধূলায় লুটায়, গোলোকের ঠাকুর আজ ধরার ধূলায়, অচৈতন্যের বুকে চৈতন্য আজ গড়াগড়ি দেয়, ধরার মান বাড়াইতে, প্রকৃতির গর্ব প্রকটিতে, বাধার ঋণ শোধিবারে শ্রীগৌর আমার ধূলায় লুটায়। আকাশের চাঁদ আজ ধরার ধূলায়। আমার হৃদয়াকাশের নিত্য চন্দ্র, আমার ছুটিতে দেও ধরার ধূলিতে গোলোকের শোভা ছড়াইয়া দিবার জন্য। বর্তমান বিশ্বের সমস্ত সমস্যার সমাধান রহিয়াছে শ্রীরাধাকৃষ্ণজীবনে—ইহা আজি আলোচনা হয় তারকবাবুর সঙ্গে লেকে। ব্রজ পরকীয়ের দেশ। কৃষ্ণ নন্দের পরকীয় পুত্র, ব্রজ-বালকদের পরকীয় সখা। সাধারণ পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও যে এই পরকীয় সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং তাহা আস্বাদন করিলেই যে ঘরে ঘরে ব্রজধাম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা আলোচনা করি। আশ্রমে পৌঁছিতে একটু বেলা হয়।···৪৷৷০টার পর পাঠ আরম্ভ হয়। আজ বিশেষ ভাবে 'মাত্রাস্পর্শাঃ' শ্লোকটি আস্বাদিত হয়। বোকা বস্তুর কাছের জয় হওয়া ও জয় ছাড়াইবার পথাই এতদিন সাধনার ক্ষেত্রে সংসার-তাপ জুড়াইবার ব্যাপারে প্রযুক্ত হইয়াছিল। বাহিরের উত্তাপ ও শরীরের উত্তাপ যেমন এক নয়, জীবনের ক্ষেত্রের

ত্যাগ ও বাহিরের ত্যাগও এক কথা নয়। বর্তমান যুগে nature organic। Man is organic to nature. Mechanical বৈরাগ্য তাই অচল। বৈরাগ্য তো চাই-ই ; কিন্তু তাহা হইবে organic।

৯ই এপ্রিল

রাধারাণী, বিশ্বপ্রকৃতির কি ছবি হইলে তাহা সার্থক ছবি হয়, তাহাই তো তোমার জীবনে দেখিয়াছি। তুমি সেইরূপেই তো আমার জীবনের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলে। আমি তো তোমার সেই রূপই দেখিতে চাহিয়াছি পরিবারে সমাজে। তোমার ব্রজলীলার সামাজিক উপযোগ কোথায়, তাহা আমি বুঝিয়াছি, কিংবা আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছ। তোমার রক্ত মাংসের বাস্তব রূপ কি আমি দেখিব না? তোমার চিন্ময় রূপ বুকে লইয়াই কি সারা জীবন চলিব? চিন্ময়ী কি মৃন্ময়ীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে না? আমাকে ঝড়ের মত সব ভাঙিয়া চুরিয়া তোমাকে গড়িয়া তুলিবার শক্তি দাও।...

৭।৮টার পর ঠাকুরের লেখা পড়া হয়। সাম্প্রদায়িক বিরোধের বিরুদ্ধেই ঠাকুরের অভিযান। শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীকালী, শ্রীকালী যে শ্রীকৃষ্ণ, শিবই যে রাধা, রাধাই যে শিব, রাধাকৃষ্ণ যে অভেদ—ইহা প্রমাণ করিবার জন্য কত শাস্ত্র-প্রমাণই না উদ্ধার করা হইয়াছে। কি উদার প্রেম। সকল ধর্মমত, সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে তিনি কি সহৃদয় সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন! তিনি আস্তিক, তিনি নাস্তিক, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, খৃষ্টান, মুসলমান সব। এমন মানুষের শরণ লইব না তো কাহার শরণ লইব? ...'দিব্য দৃষ্টি'-র কথা হয়—যে দৃষ্টি দ্রষ্টা বা দৃশ্য কাহারও সঙ্গে আটকাইয়া যায় না, যে দৃষ্টির ভিতরে সকলের সকল বাধা ফুটিয়া উঠে, কোনও দিকই চাপা পড়ে না বা কোনও দিকই অতিরিক্ত মূল্য পায় না, সেই দৃষ্টিই দিব্য। এমন দৃষ্টিই তো লাভ করা চাই যে দৃষ্টিতে নিজের কথাও বড় নয়। নিজেকে না ভিজাইলে দিব্য দৃষ্টি লাভ হয় না।

৬ই এপ্রিল

গৌরসুন্দর, তুমি কাঁদিতে আসিয়াছিলে, কাঁদিয়াই গেলে। প্রেমের প্লাবন লইয়া তুমি আসিয়াছিলে—ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ একাকার করিলে! সংসারের ধার ধার নাই, পর নাই। দিন রাত অঝোর নয়নে কাঁদিয়াছ। কত জগাই মাধাই, কত চাপাল গোপাল, কত শ্রীধর তোমার প্রেম-প্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছে। সেই তুমিই আবার আসিলে শ্রীনিত্যগোপালরূপে। শ্মশানে শ্মশানে বোপ-জঙ্গলের ধারে তুমি না যাইয়া কাহার খানে বিভোর থাকিতে? কত গোলাপ গন্ধরাজী, কত অমৃত-খুকী তোমার বাতুল চরণের পরশ বুকে মাখায় পাইয়াছে! আদর তুমি করিয়াছ, কিন্তু আদর তুমি পাও নাই। তোমার চোখের জল আমাদিগকে গলাইতে পারে নাই। যে প্লাবনের ছবি আমার হৃদয়ে আঁকিয়া দিয়াছ, তাহা কি বাস্তবে রূপায়িত হইবে না? আমাকে বল দেও, সুযোগ দেও, বীর্য দেও। গোপালদা লেকে যাই।... আমার কাছে সকলেরই মন খারাপ হয়। কি আমি করিতে পারি? নিজের অন্তর বিশ্লেষণ করি নিজের উপর কোনও ধরামাত্রা না রাখিয়া। আমি পারত পক্ষে অবিচার করিব না। রমেন্দ্র ঘোষের সঙ্গে ছিল সম্পর্ক, তাহারই জন্য তাহার পরিবারের সঙ্গে খোলা প্রাণে মিশিয়াছি, তাহার স্ত্রীকে মা বলিয়া ডাকিয়াছি, তাহার হাতে পান্তা ভাতও খাইয়াছি, তবুও কি তাহাদের পাইয়াছি? কি আর আমি করিতে পারিতাম? সতীশ দাসের সঙ্গে ছিল সম্পর্ক। তাহার পরিবারের সকলের সঙ্গেই প্রাণ খুলিয়া মিশিয়াছি, তাহার মাকে মন্ত্র দিয়াছি, তাহার হাতে খাইয়াছি। সে আমাকে খুব আপন মনে করিত বটে, কিন্তু আর কেহ কি আসিয়াছে? উমেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে প্রাণ ছাড়া তো কিছু ছিল না। আজ কোথায় তাহারা? যাহাদের মধ্যে ছিলাম, তাহাদের সকলকেই আমি স্মরণ করি। নিশীথ মুখুকে আপন মনে করিয়াছিলাম, তাহার মেয়ের বাসায় গিয়াছি, তাহার দিনাজপুরের বাসায় গিয়াছি। কিন্তু কই সে আজ?

ক্রমশঃ

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

অবধূত ভাষ্য সমেত

॥ শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

শান্তি পাঠ

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রথম শীক্ষাবল্ল্যাধ্যায়

প্রথম অনুবাক্

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। ১।১

[যাহাতে ব্রহ্মবিদ্যার শ্রবণ, ধারণা ও সম্প্রদান সব অবাধ, সহজ হয়, তজ্জন্য মিত্রাদি দেবতার আনুকূল্য প্রার্থনা করিতেছেন] শং [কল্যাণময়] (হউন্) নঃ [আমাদের নিকট] মিত্রঃ [প্রাণ ও দিবসের সূর্য্য-দেবতা] শং বরুণঃ [অপান ও রাত্রির দেবতা বরুণ] শম্ নঃ অর্য্যমা [চক্ষু ও আদিত্যমণ্ডলের দেবতা অর্য্যমা] শং নঃ ইন্দ্রঃ [বলের দেবতা] বৃহস্পতিঃ [বাগিন্দ্রিয় ও বুদ্ধির দেবতা এবং দেবগণের পালক বৃহস্পতি] শং নঃ বিষ্ণুঃ [বিষ্ণু] উরুক্রমঃ [পাদদ্বয়ের দেবতা ; উরু ক্রম যাহার তিনি উরুক্রম ; ক্রম অর্থ চলন, শক্তি ইত্যাদি। প্রচুর, বিস্তীর্ণ পদ-ক্ষেপনকারী জগদ্ব্যাপক দেবতা] নমঃ [নমস্কার] ব্রহ্মণে [পরোক্ষরূপী সূত্রাত্মা বায়ুকে] নমঃ তে বায়ো [হে বায়ু, তোমাকে নমস্কার ; বায়ু প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক মুখ্য প্রাণরূপী বায়ুদেব] ত্বম্ এব [তুমিই] প্রত্যক্ষম্ [সন্নিহিত ও অপরোক্ষ] ব্রহ্ম অসি [ব্রহ্ম] ত্বাম্ এব [তোমাতেই] প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম [প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম] বদিষ্যামি [বলিব] ঋতং ["সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য মনেতে করিয়া ঐক্য" যে সুনিশ্চিত যথার্থ বাস্তব বস্তু] বদিষ্যামি [বলিব] সত্যং [বাক্য ও শরীরদ্বারা প্রতিপাদ্য] বদিষ্যামি [বলিব] তৎ [সেই প্রত্যক্ষ সর্ব্বাত্মা বায়ুরূপ ব্রহ্ম] মাম্ [আমার শিষ্যকে] অবতু [রক্ষা করুন] তৎ [তিনি] বক্তারম্ [বক্তাকে আচার্য্যকে] অবতু [রক্ষা করুন]। আদরার্থে দ্বিবচন সব আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক বিঘ্ন বিনষ্ট হউক। এই সব দেবতারা 'ব্রহ্মপুরুষ', 'স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপাঃ' স্বর্গলোকের দ্বারপাল বলিয়া (ছান্দোগ্যের ৩।১৩।৬ সম্মানিত ; ব্রহ্মের দ্বার রক্ষকরূপে অঙ্গের দৃষ্টিতে বায়ু ব্রহ্মপদবাচ্য হইয়াছেন। সায়নাচার্য্যের মতে মিত্রে অর্থ ভক্তের যিনি মিত্র ; বরুণের অর্থ ভক্তদিগকে বরণকারী, অর্য্যমার অর্থ ভক্তের প্রতি গমনকারী।

মিত্রদেব আমাদের কাছে সুখদায়ক হউন, বরুণদেব কল্যাণদায়ক হউন, অর্য্যমা সুখবিধায়ক হউন, ইন্দ্র বৃহস্পতি আনন্দদায়ক হউন, বিস্তীর্ণপাদক্ষেপনকারী বিষ্ণু মঙ্গল বিধায়ক হউন। ব্রহ্মরূপী পরোক্ষ বায়ুকে নমস্কার হে প্রত্যক্ষ বায়ু, তোমাকে নমস্কার। তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব, ঋতস্বরূপ বলি তোমাকে সত্যস্বরূপ বলিব। সেই ব্রহ্ম আমাকে র

করুন, সেই বক্তাকে রক্ষা করুন। আমাকে রক্ষা করুন, বক্তাকে রক্ষা করুন। শান্তি হউক, শান্তি হউক, শান্তি হউক।

দ্বিতীয় অনুবাক্

ওঁ শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ।

(ব্রহ্মবিদ্যাধন উপনিষদে অর্থের মুখ্যত্ব এবং শব্দাংশের গৌণত্ব থাকিলেও শব্দের উচ্চারণ যথাযথ বিহিত না হইলে বিপরীত ফলও প্রসব করিতে পারে। কিন্তু উচ্চারণ তো কিছুতেই বিশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, বর্ণে বর্ণে, স্বরে স্বরে, মাত্রায় মাত্রায় এত ফাঁক রহিয়াছে যে সেই ফাঁকের ভিতরকার পরিপূর্ণ বিজ্ঞান লাভ না হইলে উচ্চারণ দুষ্ট হইবেই। এই পরিভ্রষ্টতা, মাত্রাহীনতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রয়োজন সেই ফাঁকের দেবতাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহাকে দিয়া সব পূর্ণ করিয়া লওয়া। এই ফাঁকের দেবতাই আকাশ দেবতা, সন্ধিদেবতা, উপনিষদ্ পুরুষ। যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রা-হীনঞ্চ যদ্ ভবেৎ। পূর্ণং ভবতু তৎ সর্বং তৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বর। তাই উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য পুরুষকে ধরিয়া কোন্ কৌশলে সব বর্ণ-বিজ্ঞান, স্বর-বিজ্ঞান, মাত্রা-বিজ্ঞান বিশুদ্ধ হইতে পারে তাহারই জন্য এই শিক্ষাশাস্ত্র আরম্ভ হইতেছে) শীক্ষাম্ [শিক্ষা, যাহাদ্বারা বর্ণাদির শিক্ষা করা যায়, অথবা শিক্ষনীয় অকারাদি বর্ণ-সমূহ এবং নিয়মিত-ক্রমবদ্ধ বর্ণ-সমূহ, শব্দসমূহ, পদসমূহের শিক্ষা] ব্যাখ্যাস্যামঃ [ব্যাখ্যা করিব] (শিক্ষনীয় বিষয় কি কি ?) বর্ণঃ [অকারাদি বর্ণ] স্বরঃ [উদাত্ত, (উচ্চস্বর) অনুদাত্ত (নিম্নস্বর), স্বরিত (মধ্যমস্বর)] মাত্রা [হ্রস্বাদি মাত্রা, হ্রস্বস্বর একমাত্রা, দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্রা, প্লুতস্বর ত্রিমাত্রা, ব্যঞ্জনবর্ণ অর্ধমাত্রা] বলম্ [শব্দের উচ্চারণ প্রযত্ন] সাম [সমতা অর্থাৎ মধ্যবৃত্তি অবলম্বনে প্রকরণাদি সামঞ্জস্য করিয়া উচ্চারণ] সন্তানঃ [সংহিতা অথবা নিয়মিত ক্রমবদ্ধ পদ বা বাক্য] ইতি [এই ভাবে] উক্তঃ [বলা হইল] শীক্ষাধ্যায়ঃ [শিক্ষাবিষয়ক অধ্যায়। বর্ণ যে শুধু বর্ণই নহে, বর্ণের স্বর-মাত্রা-বল-সাম ও সন্তানের ফাঁকে ফাঁকে কেমন করিয়া উপনিষদই রহিয়াছেন, ব্রহ্মবস্তু রহিয়াছেন এবং বর্ণসমষ্টি শব্দ, শব্দসমষ্টি পদও যে পুরুষোত্তমযোগেই কোন্ কৌশলে রহিয়াছে, সেই উপনিষদই যে লোকে জ্যোতিষে, বিদ্যায়, প্রজায়, শরীরে ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহারই শিক্ষা শ্রুতি বলিতেছেন। বর্ণ, বর্ণসমষ্টি শব্দ, শব্দসমষ্টি পদ, পদসমষ্টি বাক্য সম্বন্ধিত এবং শব্দশাস্ত্র ও জীবনশাস্ত্র, যে একই উপনিষদ্ পুরুষ-শাস্ত্র, ইহাই শিক্ষনীয় বিষয়। যাহা বর্ণে, শব্দে, পদে, বাক্যে, তাহাই ইহলোকে, তাহাই পরলোকে, সর্ব অধিকরণে। আজ স্বাধ্যায় পুরুষোত্তমাপিত হইয়া জীবনে গড়িয়া উঠিবে, শব্দ-ব্রহ্মসমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। সমস্ত শব্দশাস্ত্র আজ উপনিষদ্‌শাস্ত্রে রূপায়িত (transformed)।

শিক্ষাবিষয় ব্যাখ্যা করিব—বর্ণ, স্বর, মাত্রা, শব্দ-উচ্চারণ প্রযত্ন, সমরূপে উচ্চারণ এবং নিয়মিত ক্রমবদ্ধ পদ বা বাক্য—এইরূপে শিক্ষনীয় বস্তুবিষয়ক অধ্যায় কথিত হইল। ১।২

তৃতীয় অনুবাক্

সহ নৌ যশঃ। সহ নৌ ব্রহ্মবর্চসম্। অথাতঃ সংহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ। পঞ্চস্বধিকরণেষু। অধিলোকমধিজ্যৌতিষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্মম্। তা মহা-সংহিতা ইত্যাচক্ষতে। অথাধিলোকম্। পৃথিবী পূর্বরূপম্। দ্যৌরুত্তররূপম্। আকাশঃ সন্ধিঃ, বায়ুঃ সন্ধানম্ ইত্যধিলোকম্। ১

সহ [যুগপৎ] নৌ [আমাদিগকে ; শিষ্য-আচার্যকে] যশঃ [তপশ্চর্যা গুণ যশঃ, সংহিতার ছন্দে ছন্দে সুপ্তায়িত ব্রহ্মজ্ঞানকে খুঁজিয়া লাভ করারূপ যশঃ] (হউক) সহ নৌ ব্রহ্মবর্চসম্ [ব্রহ্মতেজ] (হউক)। অথ অতঃ [অনন্তর অতএব ; শিষ্য-আচার্য দুইয়ের মাঝে দুই গলিয়া গিয়া একীভূত হওয়ার অনন্তর, দুই দুইকে একই জীবনের দুই বিচিত্র আস্বাদনরূপে ফিরিয়া পাইবার ফল স্বরূপ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির প্রভাবে] সংহিতায়াঃ [সহোচ্চারিত বর্ণসমূহের, শব্দসমূহের, পদসমূহের, বাক্যসমূহের সন্নিকর্ষের

রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে ব্রহ্মোপনিষৎ লুকাইয়া রহিয়াছে, সেই] উপনিষদঃ [দর্শন] ব্যাখ্যাস্যামঃ [আমরা শিষ্য-আচার্য্য সহভাবে যুগপৎ ব্যাখ্যা করিব ; উপনিষদ্-ব্যাখ্যানও যুগপৎই সম্ভব] পঞ্চসু অধিকরণেষু [পাঁচটী অধিকরণে, পাঁচটী আধার অবলম্বনে] (কোন্ কোন্ আধারে ?) অধিলোকম্ [পৃথিব্যাদি লোকবিষয়ক দর্শন] অধিজ্যৌতিষম্ [অগ্ন্যাদি জ্যোতিবিষয়ক দর্শন] অধিবিদ্যম [বিদ্যাসম্বন্ধীয় শিষ্য-আচার্য্যাদিবিষয়ক দর্শন] অধিপ্রজম্ [পিতাপুত্রসম্বন্ধবিষয়ক দর্শন] অধ্যাত্মম্ [শরীর সম্বন্ধী জিহ্বাদি বিষয়ক দর্শন] তাঃ [এই পঞ্চবিষয়ক মহাসম্মেলনের ফল স্বরূপ দর্শনকে] মহাসংহিতা ইতি [মহাসংহিতা বলিয়া] আচক্ষতে [বলিয়া থাকেন] অথ [এখন] অধিলোকম্ [লোকবিষয়ক দর্শন] (বলা হইতেছে) পৃথিবী [পৃথিবীদেবতা] পূর্ব্বরূপম্ [সহোচ্চারিত বর্ণদ্বয়ের পূর্ব্ববর্ণের স্বরূপ, ঐ পূর্ব্ববর্ণের ভিতর যে উপনিষৎ রহিয়াছে, তাহাকেই পৃথিবীতে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, কেননা পূর্ব্ববর্ণই পৃথিবী] দৌঃ [দ্যুলোক] উত্তর রূপম্ [পরবর্ণের স্বরূপ ; পরবর্ণের ভিতর যে উপনিষৎ রহিয়াছে, তাহাকেই দ্যুলোকে দেখা যায়, দেখিতেও হইবে।] আকাশঃ [আকাশময় আকাশ] সন্ধিঃ [উভয় বর্ণের সঙ্গমস্থল, সন্ধীয়তে অস্মিন্ ইতি সন্ধি, যাহাতে উভয় বর্ণ মিলিত হয়। মধ্যবর্ত্তী ফাঁক, এই ফাঁকে যিনি তাহাকেই অন্তরীক্ষে অন্তরীক্ষ দেবতা রূপে দেখিবে] বায়ুঃ [বায়ু, যিনি যোজনেন] সন্ধানম্ [সন্ধি, সম্বন্ধ, সন্নিকর্ষ ; সন্ধীয়তে অনেন ইতি সন্ধানম্ ; অর্থাৎ যৎসহায়ে উভয়ে মিলিত হয়। এই বায়ুর দৌত্যেই উভয়বর্ণ, উভয়শব্দ সংহত হয়, ভ্রমে, অর্থ ফুটিয়া বাহির হয় ; এই বর্ণ-সন্ধি শব্দ-সন্ধি ও পদ-সন্ধিতে যিনি, তিনিই সর্ব্বলোকসন্ধি-মূর্ত্তি] ইতি অধিলোকম্ [এইরূপে লোকবিষয়ক দর্শন বলা হইল। সংহিতার পূর্ব্ববর্ণ ও উত্তরবর্ণ, উহাদের মধ্যস্থল এবং মিলনসূত্র—এই কয়টী জিনিষের মধ্যে যে রহস্য নিহিত রহিয়াছে, পৃথিব্যাদিতেও তাহা রহিয়াছে ; যাহা বর্ণশাস্ত্র, শব্দশাস্ত্র, পদশাস্ত্র, সংহিতাশাস্ত্রে, তাহাই বিশ্ব শাস্ত্রে নিহিত। একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। "ইষে ত্বা" এই যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্র পাঠ কালে 'ইষে'র 'এ'-কারের সহিত "ত্বা" এর 'ত' সম্মিলিত হইবে। এই সম্মিলন সম্বন্ধীয় জ্ঞানই এখানে বলা হইতেছে। 'এ' কারই পূর্ব্ববর্ণ পৃথিবী, 'ত' কারই পরবর্ণ দ্যুলোক। "এ" ও "ত" এর মধ্যস্থান অন্তরিক্ষ। 'ইষে ত্বা' উচ্চারণ করিবার সময়ে 'ইষেৎত্বা' এইরূপ শ্রুত হয়, এই 'ৎ'-এর দ্বারাই উভয় বর্ণ মিলিত হইতেছে। সুতরাং উহাই সন্ধান ; ইহাই লোকে "বায়ু"। বর্ণ তাহার অন্তরে অনেক কিছু লইয়াই 'বর্ণ', অন্তরের এই অনেক কিছুর খবর সাধারণ বর্ণ উচ্চারণকারী রাখে না। সেই অনেক কিছুকে ধরাইয়া দিয়া সেই 'কিছু'ই যে সর্ব্বলোকের অন্তরে রহিয়াছে তাহাই উপনিষৎ খুলিয়া দেখাইতেছেন। এইভাবে সর্ব্বশাস্ত্র সম্বন্ধই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই ঔপনিষদ পঞ্চ অধিকরণেই লাভ করিতে হইবে। বর্ণে বর্ণে, স্বরে স্বরে, মাত্রায় মাত্রায় শব্দে শব্দে, পদে পদে, সন্ধিদ্বারা, সংহননদ্বারা, সংহিতা দ্বারা যে উপনিষদের সুর-'সন্ধান' মিলিয়াছে, সেই এক মহান সর্ব্বরসাকর্ষী, প্রাণ মাতানো, জাতিকুলশীল কাড়িয়া লওয়া সুর কেমন করিয়া, লোকে লোকে, জ্যোতিষ্কে জ্যোতিষ্কে, শিষ্য আচার্য্যে, পিতাপুত্রে শরীরের প্রতি স্পন্দনে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, সুরে সুরে এক সুরের নেশা সৃষ্টি করিয়াছে, রাস-ক্রীড়াকে জমাইয়া তুলিয়াছে। তাহাই উপনিষদ দেখাইতেছেন]।

আমাদের উভয়ের শিষ্য আচার্য্যের যশ যুগপৎ বিস্তৃত হউক, আমাদের উভয়ের ব্রহ্মতেজ সমভাবে ফুটিয়া উঠুক এইরূপে যোগ্যতা লাভের পর এবং সেই যোগ্যতা হেতু আমরা অধিলোক, অধিজ্যৌতিষ, অধিবিদ্য অধিপ্রজ ও অধ্যাত্ম এই পঞ্চ অধিকারে সংহিতা অর্থাৎ বর্ণসমূহের সন্নিকর্ষের সন্ধির ভিতর ফুটিয়া উঠিয়াছে যে ঔপনিষদ পুরুষের 'সুর' তাহাই ব্যাখ্যা করিব। এই পঞ্চ বিষয়ক সম্মিলিত দর্শনকে (মেধাবীগণ) মহাসংহিতা বলেন অনন্তর লোকাধিকারে দর্শন বলা হইতেছে—পৃথিবী পূর্ব বর্ণস্বরূপ, দ্যুলোক উত্তর বর্ণস্বরূপ। অন্তরিক্ষলোক সন্ধি। বায়ু সম্বন্ধ, সন্ধান—এইরূপে অধিলোক দর্শ

বলা হইল। ১।৩।১

অথাধিজ্যৌতিষম্। অগ্নিঃ পূর্ব্বরূপম্। আদিত্য উত্তরঃ রূপম্। আপঃ সন্ধিঃ। বৈদ্যুতঃ সন্ধানম্। ইত্যধি-জ্যৌতিষম্ ॥ ২

অথ [অনন্তর] অধিজ্যৌতিষম্ [জ্যোতি বিষয়ক দর্শন বলা যাইতেছে] অগ্নিঃ [অগ্নি] পূর্ব্বরূপম্ [পূর্ব্বরূপ] আদিত্যঃ [সূর্য্য] উত্তর রূপম্ [উত্তর রূপ] আপঃ [জল অর্থাৎ জলময় চন্দ্র] সন্ধিঃ [মিলন ক্ষেত্র] বৈদ্যুতঃ [বিদ্যুৎ] সন্ধানম্ [সন্ধান] ইতি অধিজ্যৌতিষম্ [ইহাই অধিজ্যোতিষ]

অনন্তর জ্যোতি বিষয়ক দর্শন বলা হইতেছে—অগ্নি পূর্ব্ববর্ণরূপ, সূর্য্য উত্তরবর্ণরূপ, জল মিলনস্থল এবং বিদ্যুত তাহাদের সম্বন্ধ—এইরূপে অধিজ্যৌতিষ দর্শন বলা হইল। অগ্নি-আদিত্য-জল-বিদ্যুতের ফাঁক দিয়া তাহাদের অতীতে ঔপনিষদ্ পুরুষকে দর্শন করিলেই অধিলোক দর্শন পূর্ণ হইবে। ১।৩।২

অথাধিবিদ্যম্। আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপম্। অন্তেবাস্যুত্তর-রূপম্। বিদ্যা সন্ধিঃ। প্রবচনম্ সন্ধানম্ ইত্যধিবিদ্যম্ ॥৩

অথ [অনন্তর] অধিবিদ্যম্ [বিদ্যাধিকারে দর্শন বলা হইতেছে] আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপম্ [আচার্য্য পূর্ব্বরূপ] অন্তেবাসী উত্তর রূপম্ [শিষ্য উত্তর রূপ] বিদ্যা সন্ধিঃ [উভয়ের মিলনস্থল বিদ্যা] প্রবচনম্ সন্ধানম্ [গুরু শিষ্যের বেদোচ্চারণ। "ন হি প্রবচনেন লভ্য"—ঔপনিষদ্ পুরুষ প্রবচনের দ্বারা লভ্য নন্—এই বাক্য তখনই সত্য হয় যখন সন্ধিদেবতার স্পর্শ না মিলে, গুরুশিষ্য-বিদ্যা প্রবচনের সন্ধিতে স্থিত সেই অবকাশ দেবতার সঙ্গে যোগ না সাধিত হয়] ইতি অধিবিদ্যম্ [ইহাই অধিবিদ্য দর্শন]

অনন্তর বিদ্যাবিষয়ক দর্শন বলা হইতেছে। আচার্য্য পূর্ব্ববর্ণরূপ, শিষ্য উত্তর বর্ণস্বরূপ, বিদ্যা মধ্যস্থল স্বরূপ, বেদোচ্চারণ তাহাদের সম্বন্ধ—এইরূপে অধিবিদ্য দর্শন বলা হইল। ১।৩।৩

অথাধিপ্রজম্। মাতা পূর্ব্বরূপম্। পিতোত্তররূপম্। প্রজা সন্ধিঃ। প্রজননং সন্ধানম্। ইত্যধিপ্রজম্ ॥৪

অথ অধিপ্রজম্ [প্রজাধিকার বলা হইতেছে] মাতা-পূর্ব্বরূপম্ [মাতা পূর্ব্ববর্ণ স্বরূপ] পিতা উত্তররূপম্ [পিতা উত্তরবর্ণস্বরূপ] প্রজা [সন্তান] সন্ধিঃ [মিলন ক্ষেত্র ; মাতা পিতা দুই এক হয় সন্তানে] প্রজননম্ [সন্তানোৎ-পত্তি] সন্ধানম্ [সম্বন্ধ, এই প্রজনন ক্রিয়াও পবিত্রতম যদি সকল অবকাশের মধ্যে পুরুষোত্তম-দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়।] ইতি অধিপ্রজম্ [ইহাই প্রজাধিকরণ দর্শন]

অনন্তর সন্তানাধিকার দর্শন বলা হইতেছে—মাতা পূর্ব্ববর্ণ স্বরূপ, পিতা উত্তরবর্ণস্বরূপ, সন্তান মধ্যস্থল। সন্তানোৎপত্তি উভয়ের সম্বন্ধ, এইরূপে অধি প্রজদর্শন বলা হইল। ১।৩।৪

অথাধ্যাত্মম্। অধরা হনুঃ পূর্ব্বরূপম্। উত্তরা হনুঃ উত্তররূপম্। বাক্ সন্ধিঃ। জিহ্বা সন্ধানম্। ইত্যধ্যাত্মম্ ॥৫

অথ অধ্যাত্মম্ [শরীরাধিকারে দর্শন বলা হইতেছে] অধরা হনুঃ [নিম্ন ওষ্ঠ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত অবয়ব] পূর্ব্বরূপম্ [পূর্ব্ব রূপ] উত্তরা হনুঃ [উর্দ্ধ ওষ্ঠ হইতে নাসিকা পর্য্যন্ত] উত্তর রূপম্ [উত্তর রূপ] বাক্ [বর্ণোচ্চারণক্ষম তালুপ্রভৃতি] সন্ধিঃ [সন্ধি] জিহ্বা সন্ধানম্—ইতি অধ্যাত্মম্।

অনন্তর শরীরাধিকারে দর্শন বলা হইতেছে—নিম্ন হনু পূর্ব্ববর্ণ স্বরূপ, উর্দ্ধ হনু পরবর্ণ স্বরূপ, বর্ণোচ্চারণক্ষম তালু প্রভৃতি মধ্যস্থল, জিহ্বা তাহাদের সম্বন্ধ স্বরূপ—এইরূপে অধ্যাত্ম দর্শন বলা হইল। ১।৩।৫

ইতীমাঃ মহাসংহিতাঃ। য এবমেতা মহাসংহিতা ব্যাখ্যাতা বেদ। সন্ধীয়তে প্রজয়া পশুভিঃ। ব্রহ্মবর্চ সেনান্নাদ্যেন সুবর্গেণ লোকেন।৬

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়োঽনুবাকঃ।

ক্রমশঃ

সাময়িকী

হিন্দুর ধর্মান্তর গ্রহণ : রাওলপিণ্ডি হইতে ২৭শে জুন ১৯৬৫-তে পি, টি, আই খবর দিয়েছেন যে, পাকিস্তান ন্যাশনাল এসেম্ব্লীকে সেখানকার পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী হামিদ রেজা গিলানী জানাইতেছেন, বিগত পাঁচ বৎসরে ২১০০ জনের অধিক পাকিস্তানী হিন্দু খ্রীষ্ট ধর্ম অবলম্বন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই হরিজন। ঐ সংখ্যার মধ্যে ২৪৭৯ জন পূর্ব পাকিস্তানের, বাকি ২৪৩ জন পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধুদেশের অধিবাসী। পি, টি, আই আরও লিখিতেছেন যে একজন মুসলমানও খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করে নাই।

সংবাদটি প্রণিধানযোগ্য। স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দু কেন পরধর্ম গ্রহণ করে? পাকিস্থান বলিয়াই যে ইহা সম্ভব হইয়াছে, সে কথা সত্য নয়। ভারতবর্ষের বহু বহু শতাব্দীর ইতিহাসই এই যে, হিন্দুর কোল হইতে অগণিত মানুষ খ্রীষ্টান হইয়াছে, মুসলমান হইয়াছে, ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে; এবং দীর্ঘ দিন ধরিয়া এইরূপ হইয়াছিল বলিয়াই পাকিস্থান হওয়া সম্ভব হইয়াছে। আর এ ধর্মান্তর গ্রহণ যে ভারত ইউনিয়নেও হইয়া থাকে, তাহাও আমরা জানি। তাই হিন্দু কেন ধর্মান্তর গ্রহণ করে সমস্যা সেই গোড়ায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে হিন্দু এত উদাসীন যে, ইহা যে তাহার নিকট কোন সমস্যা তাহাই মনে হয় না। ইহা কি উদারতা? কেহ কেহ তাহাই মনে করেন বটে। কিন্তু কখনই নহে—ইহা উদারতা নয়—ইহা ক্লৈব্য। ক্লৈব্য বলিয়াই এজন্য আমাদের কোন বেদনা নাই। উদারতা হইলে এ ঔদার্য আত্মঘাতী, এ ঔদার্য বন্ধন—এ ঔদার্যে হিন্দুরও কল্যাণ নাই, বিশ্ববাসী কাহারও কল্যাণ নাই। যে নিজেকে বাঁচাইতে পারে না, সে অপরকেও কোনদিন রক্ষা করিতে পারিবে না। সে ক্লীব বিশ্বশান্তির বিঘ্নকারক। বিশ্বশান্তির সে-ই পরিপন্থী নয় যে আত্মরক্ষা করিয়াই পরকে ভালবাসিতে পারে, পরকে রক্ষা করিতে পারে। আত্মস্বাতন্ত্র্য লোপ করিয়া অপরের মধ্যে বিলুপ্তি আধিকার দিনের ধর্ম নয়; নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইবে, অপরেরও স্বাতন্ত্র্য ও মান মর্যাদা রক্ষিত হইবে অথচ পরস্পরে মিলিত হইব—ইহাই আধিকার দিনের মিলন-তত্ত্ব। সে কি ব্যক্তির ক্ষেত্রে, কি সমাজের ক্ষেত্রে, কি রাজনীতির ক্ষেত্রে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের মিলন হইবে, অথচ কেহ কাহারও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবে না, কেহ কাহাকেও নস্যাৎ করিতে চাহিবে না—কি করিয়া ইহা সম্ভব আজ তাহারই খোঁজ করিতে হইবে। অংশই আমার যে বৈশিষ্ট্য রক্ষায় অপরের সহিত মিলন অসম্ভব হইয়া পড়ে, সে বৈশিষ্ট্য রক্ষা চলে না। আসলে সে বৈশিষ্ট্য মানুষের সত্যকারের ধর্মও নয়—উহাই কুসংস্কার। এজন্য আমরা organic দেহযন্ত্রের দিকে তাকাইতে পারি—একটা সমগ্র দেহযন্ত্রে চোখ কান নাক মুখ প্রত্যেকের কাজ ও ধর্ম আলাদা, অথচ তাহারা প্রত্যেকে নিজের নিজের কাজ করিয়াও সমগ্র দেহযন্ত্রকে রক্ষা করিতেছে। সর্বসমন্বয়ের তথা বিপরীতেরও সমন্বয়ের ব্যাখ্যাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত বলিতেছেন, স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও পরস্পরের মিলন হইতে পারে যে তাহার দৃষ্টান্ত আমরা অঙ্কশাস্ত্রের এল্, সি, এম্, (L. C. M.)-এর মধ্যে পাই। ১, ৩, ৫, যদি ১৫ হয়, তবে সেই ১৫-র মধ্যে ১, ৩, ৫ ১, ৩, ৫ থাকিয়াও তাহার আরও কিছু। মানুষও এইভাবে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও এমন বড় হইতে পারে যেখানে সে অপরেরও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা-করিয়া মিলিতে পারে। প্রতি মানুষ, জাতি ও দেশকে আজ এইরূপ বড় হইতে হইবে।

হিন্দু খ্রীষ্টান বা মুসলমান হয় কেন? অর্থ-নৈতিক বা অন্যান্য কারণ বাদ দিয়াও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু হিন্দু থাকার মধ্যে তাহার নিজস্ব মান মর্যাদা সম্মান ও স্বাতন্ত্র্য কিছুই পায় না—বর্ণহিন্দুর কাছে সে সাধারণ মর্যাদাটুকুও কোনদিন পায় নাই। অথচ আত্মমর্যাদা-বোধের জাগৃতিই বর্তমান যুগধর্ম। তাহাদের নিপীড়িত আত্মা মর্যাদা চায় বলিয়াই হিন্দুত্বের কোল ছাড়িয়া যায়। তবে ভারত ইউনিয়ন তাহার সংবিধানে জাতিধর্মবর্ণ

নির্বিশেষে প্রতি মানুষকেই মানুষ হিসাবে স্বীকার করিয়া, তাহার মূল অধিকারকে মানিয়া লইয়া যে মানবিকতার পরিচয় দিয়াছেন, এক দিক হইতে উহা জাতির রক্ষা কবচ হইলেও হিন্দুর রক্ষার পক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিই সবখানি কথা নয়। হিন্দুর যে ধর্মীয় ব্যবস্থা তাহার সামাজিক জীবনের ব্যবস্থাপক—সেখানে তো মানুষকে—যে হরিজন আজ হিন্দুত্ব ছাড়িয়া যাইতেছে তাহাকে, মানুষ হিসাবে আজও মর্যাদা দেয় নাই। যে ব্যবস্থায় হরিজন হরিজন, নিম্নশ্রেণী, অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ—সে ব্যবস্থা তো সেখানে বদল করা হয় নাই। তাহা হইলে সত্যিকারের উন্নতি হইল কোথায়?

হরিজন অস্পৃশ্য হইয়াছিল কোন্ চিন্তাধারায়? বর্ণাশ্রমীয় চিন্তাধারায় তমোগুণই নিকৃষ্ট, তমোগুণই বন্ধনের কারণ; তাই তমোগুণের কাজ যাহারা করে, তাহারা কোন উচ্চ জীবন লাভের, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারীই নয়। সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই তমোগুণকে নিকৃষ্ট বলিয়া ছাপ মারিয়া দেওয়া অবৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ত্ব-বিরোধী—পুরুষোত্তমদর্শন এই কথাটিই বলিতে চায়। শুধু সাত্ত্বিকতা দ্বারা মানবিক অস্তিত্ব ও জীবন যাপন কোনটাই সম্ভবই নয়। জীবনটাকে তিন গুণ মিলিয়া মিশিয়া চালাইয়া লইয়া যাইতেছে। ইহাদের কাহাকেও চিরকালীন কুলীন ও কাহাকেও চিরকালীন অন্ত্যজ করিয়া রাখা চলে না। এই কথা মানিয়া লইতে পারিলেই ছোট বড় কুলীন অকুলীন সব কিছুকেই যথামূল্য দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে। বিশে ক্ষুদ্র তৃণেরও তাহার যথাস্থানে একটা নিজস্ব মান ও মর্যাদা আছে ইহা আজ স্বীকার করিতেই হইবে। হিন্দুকে যদি ধরে রাখিতে হয় তাহা হইলে কুলীন অকুলীন বর্ণ হিন্দু অন্ত্যজ অস্পৃশ্যের ভেদ শাস্ত্রীয়ভাবে ভাঙিয়া দিতে হইবে—ভাঙিয়া দিতে হইবে এই চিন্তাধারা লইয়া যে জীবনের মধ্যে প্রতিটি গুণেরই এবং সেইজন্য প্রতিটি গুণাবলম্বী লোকেরই যথাস্থানে স্বতন্ত্র মর্যাদা ও প্রয়োজন রহিয়াছে এবং গুণকর্মের ভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে বড় ছোট করিবার প্রয়োজন নাই।

এইভাবে সত্যিকারের মর্যাদা পাইলেই সহস্র সহস্র হরিজনের পক্ষে হিন্দুত্বের কোল ছাড়িয়া যাওয়া বন্ধ হইতে পারে। এ তো অপর ধর্মকে ভালবাসিয়া ধর্মান্তর গ্রহণ নয়—এ উপযুক্ত মর্যাদা না পাইয়া কোভে ধর্মান্তরে মুক্ত হওয়া। এ ক্ষোভ বন্ধ করার দায় বর্ণ হিন্দুর, বর্ণাশ্রমীয় ব্যবস্থার। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের ভেদ আজও যে প্রচণ্ড আকারে হিন্দুর সমাজ ও ধর্মবোধের মধ্যে বিদ্যমান, তাহার লজ্জাজনক আধুনিক নানা দৃষ্টান্ত উল্লেখ অবান্তর মাত্র! কিন্তু ইহাই তো হিন্দুত্ব নয়। দুঃখ এই, বিশ্বের লোক এই হিন্দুত্বকেই চেনে অপরকে যে হজম করিতে পারে না—বহু হজমের ফলে যাহার ঘরের সহস্র সহস্র লোক আজও ধর্মান্তর গ্রহণ করে। কিন্তু সত্যিই এই হিন্দুত্বের কথা উপনিষদ, গীতা, ভাগবত বলেন নাই; বলেন নাই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, এই সেদিনের মহাপ্রভু, আজকের দিনের শ্রীনিত্যগোপাল, শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ। শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার 'জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন'রূপ সামাজিক 'জাতীয় একতত্ত্ব' সম্বন্ধীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "...ব্রহ্মত্ব সম্বন্ধে চারি বর্ণেরই সমত্ব। চারি বর্ণই ব্রহ্মপুত্র, চারি বর্ণেরই ব্রহ্মগোত্র, চারিবর্ণই ব্রহ্মবংশীয়, চারি বর্ণই ব্রহ্মার অঙ্গ, চারি বর্ণই সেই ব্রহ্মার আত্মজ। অতএব আমাদের বিবেচনায় চারি বর্ণের মধ্যে কেহই হেয় নহে, কেহই অবজ্ঞেয় নহে। চারি বর্ণের কারণান্বেষণ করিলে চারি বর্ণেরই এক কারণ বলিয়া, চারি বর্ণই একেরই চারি প্রকার বিকাশ বলিয়া চারি বর্ণই একবর্ণ, চারি বর্ণই এক জাতি। তবে জাতীয় বিরোধ কেন?"—এই চিন্তাধারা প্রচলিত থাকিলে, সমাজের প্রত্যেকে এইভাবে জানিলে কেহই আত্মাবমাননা বোধ করিয়া হিন্দুত্বের কোল হইতে চলিয়া যাইত না—অতীতেও না, বর্তমানেও না। এই জাতি সম্বন্ধের চিন্তাধারা সমাজের সর্বস্তরে ঢুকাইয়া দিতে না পারিলে কেবল সাংবিধানিক স্বীকৃতিদ্বারা হিন্দুর ক্ষয়ও নিবারণ করা যাইবে না, হিন্দুত্বের বৃহৎ-ধারণা যাহা উপনিষদ্ গীতা ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রভু প্রভৃতিগণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাও বিশ্বের নিকট উপস্থিত করা যাইবে না।

শ্রীভেদু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

উদ্বোধন

শ্রাবণ, ১৮৮৭ শকাব্দ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ

১৮শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৪৮)

১৮-১০-৪৬। "ওঁ নমঃ তত্ত্বমূর্তয়ে ভক্ত-ভগবতে নিত্য-গোপালায় জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তুরীয়-তুরীয়াতীতায় ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবৎ পুরুষোত্তমায়"। উপনিষদ্ এক জায়গায় লিখেছেন—'মনঃ এব মনুষ্যাণাং বন্ধমোক্ষকারণম্'—মানুষ মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যখন নিজের—তখন সে বদ্ধ, এই মনই যখন ভগবানের তখনই সে মুক্ত। ··ভগবানের মন দুটী উল্টো দিককে সামলত্ত করতে পারে। মানুষের মন দুটো নিয়ে থাকতে পারে না—ভগবান কিন্তু সংসারী হয়েও সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী হয়েও সংসারী।···মানুষের বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত মন কিছুতেই ভবনদী পারি দিতে পারবে না।···তাকে বলতেই হবে—মন-মাঝি তোর বৈঠা নে রে আমি আর বাইতে পারলাম না, দিবানিশি বাইলাম বৈঠারে এ নদীর কূলকিনারা পাইলাম না।·· বৈঠা হল মনের বৃত্তি...আমার মন যখন তাঁর মন হবে, তখনই ভব-সমুদ্র আর সমুদ্র থাকে না···। কাজেই সতর্ক করে দিচ্ছি মুক্তি যদি চাও, মন গুরুকে দিতেই হবে।···নিত্যগোপালে মন দিবার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করলাম।···সংসার বড় ভীষণ স্থান—এ নদী তুমি পাড়ি দেবে তোমার মন দিয়ে?—সুতোর জড়িয়ে পড়ার মত একবার জড়িয়ে পড়লে আর রক্ষা নাই—আর বেরোবার সামর্থ্য হবে না। তাই কৃতমনা হতেই হবে। ···তোমার মন দিয়ে পাড়ি দেবে? অসম্ভব।···মনের সাধ্যি নেই যে সমস্তটাকে সবখানি দেখে···মানুষ তার মন দিয়ে এক-চক্ষু হরিণের মত দেখে···। ভোগ করতে হলে ত্যাগ করতেই হবে।···ভালবাসা পাপ নয়—কিন্তু কতখানি ভালবাসব, কেন ভালবাসব, কেমন করে ভালবাসব, কাকে ভালবাসব—এই এতগুলি বিচার করবার সামর্থ্য রাখে না মানুষের মন, পাপ সেইখানে।...খাব, খাদ্য আমাদের অপরিহার্য; কিন্তু কতটুকু খাব, কেমন করে খাব, কখন খাব, কি খাব, এই সব বিচার করেই তবে খাওয়া।... তত্ত্ব হচ্ছে যে যা তাকে তা বলে জানা তত্ত্ব...আমার পেটের হজম করবার ক্ষমতা আধসোয়া—আমার পেট সম্বন্ধে এটা তত্ত্ব—এ তত্ত্ব জানতে হবে খাওয়ার আগে···। আবার পেটকে হজম করতে সাহায্য করতে বাইরে থেকে খানিকটা এগিয়ে দিতে হবে—তাও সেন্ধ করে দিতে হবে ···খাদ্য সম্বন্ধে সেটাও তত্ত্ব।···আসক্তির হাতে ধরা পড়ছে মানুষ, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ভোগ্য বস্তুর কাছে মানুষ ধরা পড়ে যাচ্ছে···। যার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়া যায় তাকে অপমান করা হয়, অকল্যাণ করা হয় তার। চোরের মাসির গল্প জান না?—কেমন করে তত্ত্ব না জানার জন্য মাসি চোরকে চোর করে তুলেছে···মাসির বস্তুজ্ঞান থাকলে হতো না···। খাওয়া-চলাবলা-মায়া এ সব যদি তত্ত্বযুক্ত না হয়, তবে এ সবই বন্ধন হবে—সময়মত খাওয়া, শুদ্ধ খাওয়া—তাই প্রসাদের ব্যবস্থা···। মন ভগবানে দাও।···মন দিলে কি হয় তা মন না দিলে বুঝবে না···গোবিন্দের মন দিয়ে সংসার কর।···নিত্য-গোপাল অযাচিত করুণায় দুয়ারে দাঁড়িয়েছেন—তাঁকে মন দাও—সত্যি তিনি নিত্য-ব্রহ্ম-সনাতন···খেয়াকে

চলো না তোমরা···সত্যি সত্যি নিতাগোপাল বল···মন গোবিন্দে না দিলে আসক্তি থেকে রক্ষা পাবে না।··· চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে বললে, এই মন গোবিন্দে দিলে সার্থক হতো—চিন্তামণির এক কথায় বিল্বমঙ্গলের জীবনের গতি ফিরে গেল।···মন গোবিন্দে দিলে এপার ওপার একপার হয়ে যাবে—সংসার-সমুদ্র তখন গোষ্পদতুল্য—নইলে ঐ দিগানিশি বাইলাম বৈঠা এ-নদীর কূলকিনারা পাইলাম না হবেই।···পরমাগত মন নিজের বৈঠা তাঁর হাতে তুলে দিতে পারে—তখন ধরার ধূলি হয় ব্রহ্ম ধূলি, ধরার মানুষ হয় ব্রহ্ম-মানুষ।···নিতাগোপাল, প্রাণবল্লভ··· এসেছ যদি দয়া করে আমার দেহ, আমার মন, আমার প্রাণ তুমি গ্রহণ কর।···আমি তো আর পারছি না—সঙ্ঘ গড়বার জন্য প্রাণপণ করলাম, প্রত্যেক বস্তুর যথাস্থান চিনতে বললাম···কেউ তা শিখল না।···যেখানকার জিনিষ সেখানে রাখা শৃঙ্খলার একটা বিশেষ কথা···ছোট বেলায় ভাঙা নষ্ট করলে ভাত পাওয়া যায় আশ্রমে ছোট যারা আছ তারা এসব শেখ···। তত্ত্বজ্ঞান লাভ কর, সংসারের সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান লাভ কর। তোমাদের মন আমাকে দাও—যা কিছু তোমাদের তা-ই আমার হোক।···নিতাগোপাল, তোমার চলার ছন্দ আমার হোক; নিতাগোপাল, জগৎকে তুমি এমন করে গড়ে তোল যাতে সেখানে তুমি থাকতে পার।···আমি সংসারকে গড়তে পারলাম না—এবার আমায় বিদায় দাও, আমায় ছুটি দাও, বড় কষ্ট···।

১৯-১০-৪৬।···আগে যে লেখাটুকু পড়া হল (শ্রীনিতাগোপালের আত্মজ্ঞান) একটা শ্রীনিতাগোপাল নিজের সম্বন্ধে নিজে লিখে গেছেন।···নিরুপম মানে যার তুলনা নেই।···মহাভাব সম্বন্ধে তিনি লিখছেন, যে কোন ভাব (শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর) যখন উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহা মহাভাব। এতদিন শুধু মধুর ভাবকেই পরম উৎকৃষ্ট বলা হইত···। শান্ত সব চেয়ে কম···পর পর হয়ে মধুর সর্বশ্রেষ্ঠ।···ভক্তিযোগদর্শনে তিনি লিখেছেন যে যদিও মধুরাচার্যগণের মতে মধুর রসই সর্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় যে কোন রসেরই উৎকর্ষতা প্রাপ্তি সম্ভব···।···মাটির ভিতরে জল-তেজ-বায়ু-আকাশ দুই আনা করিয়া আছে এবং মাটি আট আনা—এমনি প্রত্যেকটিতে সেই বস্তুটি আট আনা অন্যগুলি দুই আনা করিয়া। মাটির ভিতরের জল দিয়ে কি পিপাসার কাজ চলে? এইরকম সব ভাবের ভিতরেই আট আনা সেইটে, এবং অন্যগুলি দুই আনা করিয়া।...মধুর ভাবের অন্তর্গত দুই আনার মাতৃত্ব দিয়ে কি মাতৃত্বের আস্বাদন মিটে?···যাকে পেতে হলে যেখানে মাতৃত্ব আট আনা, সেইখানে যেতে হবে।···পায়স সব সময় ভাল? মুক্ত, তেতো, পাটশাক—এগুলির কি কোন উপযোগিতা বা স্বাদের বৈশিষ্ট্য নেই? অবশ্যই আছে। তাই তো বলতে হয় centre everywhere, circumference no where।···কিন্তু অহংকারকে নিয়ে রওনা হলে যে কোন একটাকে বড় করে দেখতেই হবে.. অহংকারের সাধ্য নাই সবগুলিকে সমান মূল্য দেয়...। ব্রাহ্মণকে অর্থাৎ সত্ত্বগুণকে তো শ্রেষ্ঠ করে সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থাস্ত ব্যবস্থা হল...কিন্তু রাত্রে ভাল তমো গুণের কাজ (ঘুম) না হলে কি দিনের সত্ত্বগুণ জিয়ায় না?...অ্যারিস্টটেলের animal is an unfinished man এ নয়...।··· গোপাল ভাঁড়ের গল্প জান তো?···গোপাল ভাঁড়কে রাজা বললেন পৃথিবীর কেন্দ্র স্থির করে দিতে হবে। গোপাল ভাঁড় সম্মতি জানিয়ে রাজার কাজ থেকে কয়েক মাসের সময় এবং খরচপত্র বাবদ বহু টাকা কড়ি নিয়ে গ্রামে বাড়ীতে বসে থাকল। নির্দিষ্ট সময় অন্তে নিজের বাড়ীতে খুঁটি গেড়ে বলল, এইটেই পৃথিবীর কেন্দ্র।···যে কোন স্থান, যে কোন বস্তুই কেন্দ্র হতে পারে...গরু থেকেও ব্রহ্ম যতদূর, মানুষ থেকেও ব্রহ্ম ততদূর।...প্রত্যেকে independent—স্বাধীন, আবার প্রত্যেকে পরাধীন inter-dependent ...। কোথায় কৌলীন্য?...চন্দনে?...বিষ্ঠা যখন উৎকৃষ্ট সার হয়, তখন সেটার মূল্য কম? তোমার মানদণ্ডে শুধু বিচার কর কেন? তোমার খাদ্য না হলেই তা নিকৃষ্ট হবে, তা হতে পারে না।...এদেশের তান্ত্রিকেরা মলমূত্র খেতেও চেষ্টা করে দেখেছে।...আমার বিষ্ঠা কুলীন, অন্যেরটা ঘৃণ্য—এ-ও হয় না।...একটু শব্দার্থগত বলেই দেখা যায় কোন

বস্তুই কুলীন নয়, কোন বস্তুই ঘৃণ্য নয়...কে যে আজ ছোট আর কে যে বড় আজ তার ঠিক নেই।...ছোটকে ব্রহ্ম বলে বুঝবে না?...কৃষ্ণ কোন্ জায়গায় দাঁড়িয়ে বললেন পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং? তিনি তো রসগোল্লা সন্দেশ প্রভৃতি কুলীন বস্তু চাহেন নাই?..ভক্তিপূর্বক শাকান্নও শ্রেষ্ঠ...দুর্গা শাক খান।...ছোটকে যার ভাল লাগে সে-ই বড়, ছোটকে যে কোল দিতে পারে সে-ই বড়।...জ্ঞান যতদিন পর্য্যন্ত না কর্মে রূপ পাচ্ছে ততদিন সে জ্ঞান জ্ঞান নয়।...শান্তভাব ভিত্তি—শান্তভাব না হলে মধুরকে সামলে দিতে পারবে না—কাম আসবে; যার বুকে শান্তি সেই সে কি মধুর ভাবকে সামলাতে পারবে? তবে নারীত্বের পাঁচটা স্তর - নারী (১) দাসী, (২) কন্যা, (৩) স্ত্রী, (৪) মাতা, (৫) দেবী। যে বাঁশ জলে থেকে সাইনালী না হয়, সে বাঁশে ঘুণ ধরে। তেমনি যে নারী কর্ম-জীবন (দাসী ও কন্যা) ভিত্তিক নয়—সে নারীর কামের ধাক্কায় সংসার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এমনি পুরুষের পক্ষেও...। প্রত্যেকেরই ভিত্তিতে শান্তভাব না থাকলে জীবনের কামুকতাকে সামলান যাবে না।... যৌবনের আবেগকে কল্যাণপ্রদ করতে হলে যৌবনের প্রারম্ভে বিপুল কর্ম-জীবন দিতে হবে। . Love is static, service dynamic...। ভালবাসা যদি সেবারূপে কর্ম-রূপে পরিণত না হয়, তবে ভালবাসার কোন অর্থ নেই, সে ভালবাসা ক্লীবত্ব এনে দেবে...। কর্ম জ্ঞানে, জ্ঞান কর্মে, প্রেম সেবায়, সেবা প্রেম-জ্ঞানে মণ্ডিত হলে তবেই সবকিছু করা হবে কৃষ্ণকর্ম...। নিত্যগোপাল, তোমার নয়নে নয়ন মিলাইয়া জগৎকে দেখিব...। সে দেখা কি রকম?...ব্রহ্ম জগতের বড়, জগৎও ব্রহ্মের বড়—সমন্বয় মানে সমান ভাবে পরস্পরের পরস্পরকে অনুগমন—সম্ পূর্বক অনুপূর্বক ই ধাতু অচ্...। মস্তকের কৌলীন্য তখন থাকবে যখন সে পায়ের কাছে মাথা ঠেকাতে পারবে।... তৃণাদপি সুনীচকে...ভগবৎ প্রণামের ভূমৌ আশ্চতলা...। তৃণকে ঘৃণা করো না, তুচ্ছ মনে করো না...। যাকে পদদলিত করেছ, স্বাধিকার প্রমত্ত তার দ্বারাই তোমাকে আজ অপমানিত হতে হবে...অপমানে হতে হবে আজি তোমে তাহাদের সবার সমান।...ছোটকে কোলে তুলে নেওয়াই বড়র ধর্ম...। চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ...। চণ্ডালের সব নামই ব্রহ্ম...। একদিন ঘৃণা নামই জপ করলাম—ঘৃণা ছেলেই খুন। কেন? ভগবানের এক নাম ঘৃণা, এক নাম কচু—সব কিছু তাঁতেই প্রতিষ্ঠিত করছে। এ জ্ঞান যখন হল, তখন সর্বত্র ব্রহ্ম।...অহংকার থাকলে ব্রাহ্মণই বড়, সাত্ত্বিকতাই শ্রেষ্ঠ, শূদ্র ছোট, তমোগুণ নিকৃষ্ট। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি দিয়ে জগৎকে দেখলে এ ছোট বড় করার প্রয়োজন হয় না।...নিত্যগোপাল, বুঝতে দাও বিশ্বের সব তোমারই বিকাশ—বিড়ালী শিবানীর চক্ষুর মধ্যেও তোমারই চক্ষু...সর্বতঃ চক্ষুপাণিপাদম্...। নিত্য গোপাল, আমি শরণাগত, মাটির ব্রহ্মত্ব, ধূলির ব্রহ্মত্ব আস্বাদন করবার সৌভাগ্য আমার লাভ হোক।...

২২-১০-৫৬।...শ্রীনিত্যগোপাল জড় ও অজড়ে সমন্বয়ের অভিনব বার্তা পৌঁছেছেন...। এতদিনে বৈষয়িক জড়কে অতিক্রম করে, সঙ্কুচিত করে...অজড়কে চেয়েছে, সে চিন্তা আজকে আর নয়। জড়ের ক্ষেত্র হবে মোটামুটি অন্নের ক্ষেত্র...। এবার ধরে নিয়েছেন জড়কে একদিনে ছাড়তে পারা যাবে না—অল্পে অল্পে কমাতে কমাতে ক্রমে ছাড়তে হবে।...কেননা জড়ের ক্ষেত্রেই আমরা নানা ভাবে বদ্ধ...। নিত্যগোপাল এসে বললেন, জড় অজড়ে সম্বন্ধ এমন নয়—জড়ের ভিতরে যতগুলি উপাদান আছে তাকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনলে অজড় হয়—H, O-proportion—মাত্রা—ঠিক হলে জল হয়। জীবনে তেমনি—মাত্রা ঠিক রেখে চলতে পারলেই জড়ের মধ্যে চৈতন্যের সঞ্চার হয়।...জীবনীশক্তি অন্নে আছে—কি আমার পেটের সঙ্গে তার কোন্ রকম যোগ হলে অন্নে জীবনীশক্তি আমি লাভ করতে পারি, তা আমার জানা লাগে? সেইটে স্থির করে নিতে হবে...জড়কে গুছিয়ে চলতে হবে।...বিশ্বের সঙ্গে আমার যোগ, বিশ্বের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমি একলা দাঁড়িয়ে নেই

ক্রম

চৈতন্য-লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস

॥ ডক্টর শ্রীজয়ন্ত গোস্বামী ॥

শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি-কর্ণপুর পরমানন্দ সেন তাঁর "গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা" গ্রন্থে দ্বাপরের অবতার-চক্রের সঙ্গে কলির অবতার চক্রের একীকরণ ঘটিয়েছেন। এর পর থেকে বৈষ্ণব ভক্তদের ধারণায় একটি অবতার-চক্রের জন্ম হয় এবং তার ভিত্তি ক্রমে দৃঢ় হয়। এই অবতারচক্র অনুযায়ী শ্রীচৈতন্য ভাগবতের কবি বৃন্দাবন দাস বৈপায়ন ব্যাসদেবের অবতার।

বৃন্দাবন দাসকে ব্যাসদেব বলবার পক্ষে দুটি ধারণা সক্রিয় ছিলো। প্রথমতঃ ব্যাসদেব যেমন শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছেন, বৃন্দাবন দাসও তেমনি শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচনা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ ব্যাসদেবের জন্মের মধ্যে যেমন একটি অস্বাভাবিকতা আছে, বৃন্দাবন দাসের জন্মের মধ্যেও তেমনি অস্বাভাবিকতা অস্বীকার করা যায় না।

শ্রীচৈতন্যের লীলা প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণেরই লীলা। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের লীলা নিয়ে অপর একটি ভাগবত রচনা সম্ভবপর। বৃন্দাবন দাস সেই ভাগবতই রচনা করেছেন। চৈতন্যলীলা মনুষ্যলীলা হলেও শ্রীকৃষ্ণের সর্বরূপেই যে লীলার ঐক্য আছে, তা কবির ধারণায় বহিঃদৃষ্টিও রক্ষা করে। এই প্রবণতা থেকে গ্রন্থকার ভাগবতের লীলা দ্বারা শ্রীচৈতন্যের লীলার বিচার করেছেন এবং ভাগবতের লীলার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তার ঐতিহাসিকতাকে ক্ষুণ্ণ করেছেন। কিন্তু বাঙালী ভক্তি-রস-পিপাসু এবং এই ভক্তির আধার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু ক্রমে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণতে রূপান্তরিত হলেন। তাছাড়া শ্রীচৈতন্যভক্তের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণভক্তিতে কোনো বাধা ছিলো না। তাই ভক্তচিত্ত ক্রমে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাদৃশ্য অনুসন্ধান করেছে। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিকতা নির্মমভাবে দলিত হলেও বাংলাদেশের পাঠক-সাধারণ তাতে ক্ষুব্ধ হয় নি। তাই এ লীলাকে যিনি ভাষাবদ্ধ করেছেন, সেই বৃন্দাবন দাসকে ব্যাস আখ্যা দেওয়া স্বাভাবিক।

বৃন্দাবনদাসের পৌরাণিকতার প্রতি প্রবণতা ছিলো এবং শ্রীচৈতন্যজীবনকে তিনি সেই ছাঁচে ঢালাই করেছেন। পৌরাণিকতার প্রতি প্রবণতার মূলে ছিলো তাঁর পুরাণ বিষয়ে অভিজ্ঞতা। তিনি যে বহু পুরাণ পাঠ করেছিলেন, বিভিন্ন শ্লোকের উদ্ধৃতির মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ শ্রীচৈতন্যভাগবতের স্থানে স্থানে এমন ভাবে দেখা যায় যে, অনেকে অনুমান করেন ভাগবত তাঁর কণ্ঠস্থ ছিলো।

পূর্বে উল্লিখিত কবি কর্ণপুরের "গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা" গ্রন্থটির রচনাকাল ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ। ২১৩টি শ্লোকের এই ক্ষুদ্র কাব্যটির একস্থানে বলা হয়েছে,—

"বেদব্যাসো য এবাসীদ্ব্যাসো বৃন্দাবনোঽধুনা।
সখা যঃ কুসুমাপীড়ঃ কাব্যভক্তং সমাবিশৎ॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচনা যে কালেই হোক না কেন, এই সময় থেকেই শ্রীচৈতন্যভাগবতের খ্যাতি এতদূর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো যে তাঁকে ব্যাসের অবতার বলা হয়েছে।

এই যুগে বৈষ্ণবব্যতিরিক্ত ধর্মীয় সাহিত্যে অনেকেই নিজেকে অবতার বলে গ্রন্থে প্রচার করেছেন। বৃন্দাবন নিজেকে আদৌ ব্যাস বলে কোনোরকম উল্লেখ করেন নি। তাঁর ধারণা তাঁর পদ্যক্ষেপ যেহেতু প্রথম, অতএব তা পূর্ণাঙ্গ নয়। তাঁর চেয়ে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন অনেক কবি পরে পূর্ণাঙ্গ চৈতন্যজীবনী পুরাণাকারে লিখতে সক্ষম হবেন। অতএব বেদব্যাস আখ্যার অধিকারী তাঁদেরই একজন কিংবা অনেকে।—

"যথাখণ্ডে আছে আর কত কোটি লীলা।
বেদব্যাস বর্ণিবেন সে সকল লীলা॥"

কিংবা,—"যৈছে ইহা কোটি কোটি মুনি বেদব্যাসে
বর্ণিবেন নানামতে অশেষ বিশেষে।"

কবির এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর কথা ছেড়ে দিলেও নামকরণের দিক থেকে দু রকম মত আছে। প্রেম-বিলাসের মতে,—

"চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের মহান্তরা ভাগবত আখ্যা দিল॥"

আবার, জনশ্রুতিতে জানা যায়, লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গলের অনুরূপ নাম থাকায় বৃন্দাবন-মাতা নারায়ণী নামপরিবর্তনের অনুরোধ করেন এবং তদনুযায়ী নাম পরিবর্তন হয়; এবং বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে "শ্রীচৈতন্য ভাগবত" রাখা হয়।

বৃন্দাবনের মাতার নাম নারায়ণী এবং গ্রন্থের মধ্যে তিনি শুধু আত্মপরিচয় দিয়েছেন।

"সর্বশেষখণ্ডের ভাঁন বৃন্দাবন দাস
অবশেষ পাত্র নারায়ণী গর্ভজাত।

"গৌরাঙ্গের অবশেষ পাত্র" নারায়ণীর প্রসঙ্গে বৈষ্ণব বিরোধীরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। বৃন্দাবনের জন্মের অবৈধতা সম্পর্কে সমসাময়িক কালেই যথেষ্ট রটনা হয়, তাই এই বর্ণনাপ্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস বৈষ্ণবীয় ধৈর্য হারিয়ে অবিশ্বাসী-দের প্রতি কটূক্তি করেছেন। "সত্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত।" গৌর-পদতরঙ্গিণী গ্রন্থের ভূমিকায় জগবন্ধু ভদ্রের কাহিনীটি বিষয়কে আরও জটিল করে তোলে। চৈতন্যবিরোধীরা শ্রীচৈতন্যকেও এই জন্য বিষয়ে দায়ী করেছেন এবং নিত্যানন্দকে শ্রীচৈতন্যের দোষ ঢাকবার অঘন্যতম প্রয়াসের জন্যে দায়ী করেছেন। জগবন্ধুর ভাষায়,—"মহাপ্রভুর চর্বিত তাম্বুল ভক্ষণ করিয়া নারায়ণী ঠাকুরাণী গর্ভবতী হয়েন", এবং উদ্ধব দাসের (গৌরপদ তরঙ্গিণী) ভাষায় "প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা, বালিকা গর্ভিনী হৈলা"। আধুনিক অনেক ঐতিহাসিক ঘোটনায় পড়ে মন্তব্য করেছেন, চৈতন্য পরিবারের কুকীর্তিতে একদিকে যেমন চৈতন্যভক্তরা শ্রীচৈতন্যের অলৌকিকতায় দোহাই দিয়ে কুকাবশেষ গ্রহণের ঘটনা উপস্থাপিত করেছেন, তেমনি আবার চৈতন্যবিরোধীরা এই অলৌকি-কতার দুর্বলতা গ্রহণ করে শ্রীচৈতন্যের সম্পর্কে অযথা ধারণা পোষণ করেছেন। নিত্যানন্দের কাজীগৃহে গমনের ঘটনাটিতে নিত্যানন্দের বিজয়া যাই হোক না কেন, তাঁর বৈতসিকতাকে অনেকে সন্দেহজনক মনে করছেন। তাছাড়া আরও কারণ আছে। তবে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রবন্ধকারের রুচিহীনতারই পরিচয় দেবে। শুধু ব্যাসপ্রসঙ্গে অমলাদৃষ্টকে সামান্যভাবে উপস্থাপিত করবার জন্যেই এই প্রসঙ্গের অবতারণা। এজন্যে বৈষ্ণব ভক্তের কাছে প্রবন্ধকার ক্ষমার প্রত্যাশী।

বৃন্দাবন দাস নিমাইকে শ্রীকৃষ্ণরূপে কল্পনা করেই তাঁর বাল্যলীলার বর্ণনা দিয়েছেন। নিমাইয়ের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এবং চৈতন্যের (সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গ) সঙ্গে রাধাভাবই সাদৃশ্য। সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের জীবন সম্পর্কে নবদ্বীপের অনেকেই খবরাদি রাখতেন। এই সময়ে তাঁর বাহ্যিক রসিক জীবনের সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে উপস্থাপিত শ্রীকৃষ্ণ লীলার সাদৃশ্য পাওয়া কঠিন। বরং ভাবের দিকে দৃষ্টি পাত করলে বিরহিণী শ্রীরাধিকার সঙ্গে যথেষ্ট মিল পাওয়া যাবে। স্বরূপ দামোদর চৈতন্যের তত্ত্বনির্ণয়ে যা উপ স্থাপিত করেছেন কিংবা বৃন্দাবনের গোস্বামী-বৃন্দ তাঁদের সাহিত্যে যা অভিব্যক্ত ও প্রচার করেছেন, সেই তত্ত্ব শ্রীচৈতন্যদেবের বাহিরঙ্গিক জীবনের বর্ণনায় ঐতিহাসিক বৃন্দাবনদাস রাধাভাব যে দেখান নি তা নয়, তবে শ্রীকৃষ্ণের ভাবটিকেই উপস্থাপন করা ছিলো তাঁর মূল উদ্দেশ্য। শ্রীচৈতন্য ভাগবতকে আমরা এজন্য অনেকক্ষেত্রে অনৈতিহাসিক দৃষ্টিসঞ্জাত বলে মন্তব্য করি। কিন্তু এই অনৈতিহাসিক কবিদৃষ্টিই গ্রন্থখানিকে একদিকে যেমন প্রিয় করে তুলেছে, তেমনি তাঁকে ব্যাসদেব রূপে প্রচারেও সহায়তা করেছে। যথার্থই "চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।"

ডমদোহা

॥ শ্রীভারতী ॥

পেটের খিদের মত মানুষের চোখের খিদেটাও কিছু কম মারাত্মক নয়। এই খিদের তাড়নাতেই মানুষ তার নিত্য নৈমিত্তিক জীবনকে পেছনে ফেলে মাঝে মাঝে বাইরের জগৎটাতে বেরিয়ে পড়ে। প্রকৃতি তার অফুরন্ত সৌন্দর্যকে চারদিকে মেলে ধরেছে, দুটি মাত্র চোখ তার কতটুকুই বা ধরে নিতে পারে। তবুও মানুষ পাহাড়ে যাচ্ছে, সমুদ্রে যাচ্ছে, যাচ্ছে দেশ বিদেশের স্থাপত্য ভাস্কর্য এবং অপূর্ব ও বিচিত্র সব সম্পদকে দুটি চোখের দর্পণে প্রতিবিম্বিত করে নিতে। এ দেখার শেষ নেই, এ এক দুর্বার নেশা।

এই দেখার লোভেই একদিন মন বলল, বেরিয়ে পড়। না, দূর দূরে নয়, তবে নতুনত্বের হাতছানিটুকুই আকর্ষণের পক্ষে যথেষ্ট। সহরে জীবনের বাঁধাধরা গণ্ডীর বাইরে একেবারে উদার উন্মুক্ত আকাশের তলায় খোলা জমিতে মিহিদামের এক অজ্ঞাত অখ্যাত সামন্ত ছোট্ট গ্রাম, নাম ডমদোহা। বাংলার একেবারে শেষপ্রান্ত এটা। এখান থেকে কয়েক পা এগিয়ে সরু সুতোর মত একটুখানি জলরেখা পেরোলেই এসে পৌঁছন যাবে বিহারে। ট্রেনে চিত্তরঞ্জন। ট্রেনে নেমে রিক্সা চড়ে অফুরন্ত ধুলোবালির সমুদ্র ঠেলে যেখানটাতে এসে আমরা নামলাম সত্যি বলতে কি প্রথম দৃষ্টিতেই তার রূপে দুচোখ যেন জুড়িয়ে গেল। মনে হচ্ছিল ছোট জায়গা থেকে বুঝি এক বিশাল জগতে এসে পৌঁছলাম।

গ্রাম বাংলার ছবি কিছু কিছু দেখেছি এর আগেও। কলকাতার সহরতলী গুলোতে গ্রামের আমেজ এখনো কিছু কিছু পাওয়া যায়। তাছাড়া দেখেছি পুব বাংলার বাঁশবাড়, হাজামুজা নদী, পুকুর ভরা জল, কলাবাগান, আম কাঁঠাল গাছের সারি, মেঠো পথ আর খড়োঘর, বিস্তীর্ণ সমতলজমিতে পাট ও ধানের চাষ। কিন্তু এ যেন এক বিস্তৃততর জগৎ। এমন দিগন্তবিশারী পট-ভূমিতে উঁচু-নীচু এড়ো-খেবড়ো জমির একটা নূতনতর রুক্ষ সৌন্দর্য মন ও চোখকে নতুনভাবে খুশি করে তোলে। শ্যামা বাংলার পাশে এ যেন এক পেরুভাষিণী বৈরাগিনীর মূর্তি। পাথরে, কাঁকরে, লালমাটিতে, বালিতে এ জগৎ বাংলাতে থেকেও যেন বাংলা থেকে স্বতন্ত্র।

পৌষ মাস, ভরা শীত। ধান কাটা শেষ হয়ে গেছে। শস্যহীন বিস্তীর্ণ ক্ষেতগুলো এখন শূন্যবক্ষে দিক্‌বিদিকে ছড়িয়ে আছে। আলের উপর দিয়ে যত ইচ্ছে হেঁটে চলে যাও, নির্বাধ স্বাধীনতা। উঁচু নীচু ধান ক্ষেত গুলোকে একটু দূরে থেকে দেখলে মনে হয় যেন থাকে থাকে অনেকগুলো সিঁড়ি উঠে নেমে চলেছে। যে জমি যত নীচু ফসল সেখানেই তত বেশি ভালো হয় কারণ জল জমতে পায় সেখানে ; তাই ইচ্ছে করেই এখানকার চাষীরা যে যতটা পারে নিজের নিজের জমিকে গভীর করে নিতে চেষ্টা করে। আমাদের দেশীয় চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী সরু আলের বেষ্টনীতে টুকরো টুকরো ভাবে নিজেকে চিহ্নিত রেখে রেখেই ক্ষেতগুলো চলে গেছে দূর থেকে দূরে। তারপরেই আবার অনেকটা জমি উঁচু ও সমতল অর্থাৎ একেবারে ধূসর ও বিস্তৃত মাঠ। এখানে কোনো ফসল জন্মাতে পারে না। চেহারা দেখলে মনে হয় এ মাটি বুঝি বন্ধ্যা ; কিন্তু জল পেলে এখানেও সবুজ তার আস্তরণ বিছাতে ভুল করেনা। দু চারটে শাল মহুয়ার দেখাও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। এখান থেকে খুব কাছেই দামোদরের বাঁধ। বাঁধের কল্যাণে বরাকরের জল এদিকটাতে এসে গেছে এবং নদীর মতই ভরা সৌন্দর্য টলটল্ করছে। ওখান থেকে আশেপাশে একটু জল সেচের ব্যবস্থা হলেই এই রুক্ষ ও অনুর্বর জমিগুলো যেমন শস্যশ্যামলা হয়ে উঠতে পারে

তেমনি চাষীর কঠোর পরিশ্রমেরও অনেক লাঘব হয়। ট্রাক্টর যোগে সমবায় পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থায় আমরা করে পৌঁছব জানিনা, এদিকে আমল গাছপালার বঞ্চিত শুষ্ক শীর্ণ ও আকারে ছোট বলদগুলোরও প্রাণপণ অধ্যবসায় এখানে খুব ফলপ্রসূ হয় না। পাথুরে জমিগুলো যেমন শুকনো তেমনি শক্তও।

না, এখানে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মাতৃরূপের গানে মানুষের গলায় সেজে উঠবে না। বাজালে বাজাতে পারো বৈরাগী বাউলের একতারা। কিন্তু সেও কি এর লোভনীয়? প্রয়োজনকে বাদ দিয়ে যখন আমরা শুধু প্রকৃতির বিচিত্র বৈভবকে দেখি তখন তার প্রতিটি সুরই আমাদের মনে অনুরণন তোলে, চোখকে করে বিস্মিত, করে আনন্দিত। কিন্তু তবু মানুষ প্রয়োজনের দাস, চোখের তৃপ্তির আগে চাই তার উদরের তৃপ্তি, চাই তার মাথা গোঁজবার ঠাঁই। সেই কঠোর বাস্তবের দাবীকেই বা অস্বীকার করি কি করে? তাই মনে হয় পূর্ববাংলার ঘরছাড়া মানুষদের কথা। মনে হয় এখনো কত গৃহহীন মানুষ একটু আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না, আর এদিকে কি সীমাহীন জায়গা খালি পড়ে আছে। মনে হয় সহর কলকাতার ছেলেমেয়েরা খেলবার জন্যে একটুখানি খোলা মাঠ পায় না, এত বড় বড় মাঠ যদি ওরা পেত!

যাক্‌গে, যা বলছিলাম—এই শস্যক্ষেত্রের উঁচু ও অনুর্বর প্রান্তরের সীমায় সীমায় গড়ে উঠেছে কয়েকটা ছোট ছোট গ্রাম। 'মহলবনা', 'শিউলিবাড়ী', 'ধাড়ুরী', 'কানগুই' 'ভমদোহা' প্রভৃতি। দূরে কাছে ছোট ছোট পাহাড় বা টিলা, সাঁওতালেরা বলে ঢিবি। প্রকৃতির হাতে গড়া মনোহর সম্পদ; কিন্তু এ সৌন্দর্যও মানুষ থাকতে দেবে না বলেই যেন মানুষ পণ করেছে। মানুষের যে হাত সৃষ্টি করে সেই হাতই আবার সৃষ্টিতে বসে প্রকৃতিসৃষ্ট ভাণ্ডারটিকে লুটে নিয়ে তাকে শ্রীহীন করে দিতে এতটুকুও দ্বিধা করে না। সেদিকে অনুর্বর পাথর, ছোট বড়, কালো সাদা, রাশি রাশি ইতঃস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। কোথাও বা একটার পর একটা বিরাট পাথর এবড়ো খেবড়ো ভাবে উপরে উঠে গেছে, মনে হয় এক একটা কালো কালো বিশাল ভালুক বুঝি শুয়ে শুয়ে বসে আছে, কোথাও বা এমন মাথা উঁচু করে এরা দাঁড়িয়ে আছে যে মনে হয় যেন ঘোষণা করছে আমি বিরাটের অংশ, আমাকে ক্ষুণ্ণ কোরো না, ক্ষুণ্ণিত কোরো না। আমি আছি, আমি থাকব। এদের উপরে উঠে দাঁড়ালে পূর্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণের সমগ্র দৃশ্যপট এবং বিশাল দিগ্‌বলয় রেখা দৃষ্টিতে অপরূপ হয়ে ধরা দেয়। কিন্তু সভ্যতা তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে এ-গুলোকেও গ্রাস করে নিচ্ছে। ফল ধরেছে আশে পাশে, চলছে জোর আওয়াজ তুলে। ডিনামাইট্‌ দিয়ে দুদ্দাম্‌ করে পাহাড় ভাঙ্‌ছে, তুলছে পাথরের পর পাথর আর দিনের পর দিন ওগুলোকে টুকরো করে চলেছে। সাঁওতাল কুলী কামিনরা খাটছে প্রাণপণে। গ্রাম ভেঙে সহর তৈরী হবে, তৈরী হবে রাস্তাঘাট। সৌন্দর্যের চেয়ে প্রয়োজন এখানেও বড়; তাই এক ভেঙে আর গড়ে উঠছে, উপায় কি! তবু মন খারাপ না হয়ে যায় না।

হোক খারাপ; তবুও ভমদোহার ভোরবেলাকার আকাশ এখনো রঙে-রঙে ভারী একটা মোহ বিস্তার করে, কত তার বিচিত্র বর্ণ আর কতটরা তার রূপবদল। আবার পড়ন্ত বেলাতেও রক্তবর্ণ গোলকটি তার রক্তস্রোতের সম্বরণ করে স্নিগ্ধ আবীর গোলা রঙের স্রোতে সারা আকাশটাকে ভরিয়ে তোলে; বরাকরের ছলছলে জলের মধ্যে সেই সোনা রংএর ছায়া টলমল করে কাঁপতে থাকে, আর তার কিছুক্ষণ বাদেই জলের ধারে নামতে নামতে সেই আলোর দেবতাটি অকস্মাৎ মেঘের আড়ালে চুপ্‌ করে অদৃশ্য হয়ে যান। অন্ধকারটা কিন্তু নেমে আসতে তখনো যেন ভয় পায়, আলোর রেশ মিলিয়ে যেতে বেশ অনেকটা দেরী হয়। দিনান্তের এবং দিনান্তের এই মায়াভরা রূপটি দীর্ঘসময় পর্যন্ত চোখকে আটকে রেখে দেয়। কিন্তু আলোর পরে ছায়া এই নাকি জগতের নিয়ম, তাই আমরাও ধীরে ধীরে নেমে আসি রাত্রির বিষণ্ণ ছায়ায়। আলোহীন শান্ত নীরব গ্রাম। সোধূলির অর্ঘকে পরিপূর্ণ ভাবে ছুটিয়ে তুলে গরু ও মোষের দল পায়ে পায়ে ধূলো ছিটিয়ে ফিরে এসেছে ঘরে। কাজ

শেষে সাঁওতাল মেয়েরা সমবেত কণ্ঠে হাসি আর গানের লহর তুলে একটু আগেও সামনের মাঠটা দিয়ে ঝলকলিয়ে যাচ্ছিল, এখন তাও শান্ত। লণ্ঠনের স্তিমিত আলোতে ঘরবন্দী আমরা গুটিকয় মানুষ। এই সময়টাতে হঠাৎ হঠাৎ কোনো কোনো দিন মনে পড়ে যায় আমরা সহরে মানুষ। আজকের নগর জীবনে অত্যন্ত মানুষ চায় একখানা মনের মত লাইব্রেরী, চায় ভালো রাস্তাঘাট ও দোকানপাট, চায় প্রচুর যানবাহন ও আলোঝলমলে সুলভ জীবন, চায় স্কুল কলেজ ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি কতকিছু। এই নির্জন গ্রাম্য জীবনকে সে কতদিন ভালোবাসতে পারে? তাই ডমবোহোর এই অবারিত প্রকৃতির আকর্ষণ সত্ত্বেও শিক্ষিত ভদ্র শ্রেণী বলতে যে দলটাকে বোঝায় তাদের কেউই এখানে বাস করে না। আগাগোড়াই এর গ্রাম্য পরিবেশ আর গ্রাম্য জীবনযাত্রা।

স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কিছু বাঙালী আর কিছু সাঁওতাল। লোকসংখ্যা একেবারেই অল্প; তবে বাড়ছে এবং ভবিষ্যতে যে আরো বাড়বে তার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে কারণ প্রায় বাড়ীতেই এক এক মায়ের সাত আটটি করে ছেলেমেয়ের দেখা পাওয়া যায়। সাঁওতাল ও বাঙালীতে এরা প্রায় ঘেঁষাঘেষি করেই বাস করছে। জীবনযাত্রার ধরণে এবং বাংলা বলার ধরণেও উভয়ের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। সাঁওতালদের ভাষা অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু কাজে কারবারে, হাটে বাজারের প্রয়োজনে এবং একত্র থাকার ফলেও স্থানীয় বাঙালীদের ভাষা ওরা একরকম আয়ত্ত করে নিয়েছে। উভয়েরই প্রধান পেশা চাষবাস। মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন। তেল নুন কাপড় প্রভৃতি কয়েকটা জিনিস ছাড়া আর বিশেষ কিছুই এরা বড় একটা কেনেনা। ভাত ঘুরি প্রধান খাদ্য, এগুলো নিজেদের ক্ষেতের ধান থেকে নিজেরাই তৈরী করে নেয়। সকলেরই বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে কিছু তরি তরকারী হয়, খুব ভোজনবিলাসী এরা নয় কাজেই ঐ দিয়েই বেশ চলে যায়। প্রতি বাড়ীতেই একটা করে ঢেঁকি, একটা গরুর গাড়ী এবং কম বেশী গরু ছাগল মুরগী ভেড়া (শূয়র শুধু সাঁওতালদের বাড়ীতেই) প্রভৃতি আছে। খামার আছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, গোয়ালঘর বা গরুদের ঘর নিজেদের শোবার ঘরের সঙ্গেই লাগানো। একটা করে কুয়ো আছে সব বাড়ীতেই। স্নান পান সেচের কাজ সবই ওর জলে চলে, অধিকন্তু মাঝে মাঝে কিছু পুকুরও আছে তবে তার জল এসে একেবারে তলানীতে ঠেকেছে, বর্ষার হয়ত ভরে ওঠে। একটা ব্যাপার দেখে খুব অবাক লাগলো—কোনো বাড়ীতেই পাইখানা বলে কোনো বস্তু নেই। মেয়ে পুরুষ সবাই মাঠেই কাজ সেরে আসে।

এখন ধান কাটা শেষ হয়ে গিয়েছে। ধুনি ঠেঙানী (স্থানীয় ভাষায়) চলছে খামারে খামারে, তার সঙ্গে চলছে ঢেঁকির শব্দ। ধানের পাট মোটামুটি সারা হতেই সুরু হয় এদের উৎসব। সাঁওতাল এবং বাঙালী পুরুষেরা সবাই মিলে পৌষ সংক্রান্তি শিকার করতে বেরোয়। কাছেই পাহাড় জঙ্গলে বরা বরা একটা কিছু শিকার পেলেই ওরা মহা খুশি। মনে পড়েছিল রাজপুত কাহিনীতে পড়া ভীলদের শিকারের কাহিনী। সম্ভবতঃ আদিবাসীদের সকলেই এটা চিরাচরিত প্রথা হিসেবেই এখনো পালন করে আসছে। যাই হোক শুয়র পরিমাণ বর্ত্তমান যুগে স্বভাবতঃই স্বল্প, তাই এক এক গ্রাম মিলে দলবদ্ধ হয়ে অন্য গ্রামকে টেক্কা দিয়ে আনন্দ উপভোগ করে।

পৌষ সংক্রান্তির পাঁচদিন আগে থেকে সুরু হয় সাঁওতালদের বাদনা পরব। শেষ হয় ঠিক সংক্রান্তি দিনে। পুজোও হয় কোনো এক দেবতার, তবে এ পুজো বাইরের লোককে দেখতে দেওয়া হয়না। গভীর রাত্তে ঘরেই এই অনুষ্ঠান হয়। পরব উপলক্ষে এ কদিনই বাড়ীতে বাড়ীতে মদ মাংস খাওয়ার ঘটা পড়ে যায়। শূকরী আর মুরগীই প্রধান মাংস। চালের গুঁড়ি দিয়ে পিঠে তৈরী করেও খায়। মদ খেয়ে নাচ গান হুল্লোড় খুব চলে। পুরুষেরা মাথায় পালক পরে মাদল বাজায় আর মাতাল হয়ে বেতাল চলে। মেয়েরাও মদ খায় তবে পরিমাণে অল্প। এরা সবাই মিলে গোল হয়ে হাতে হাত বেঁধে নাচে, পায়ের কাজও চলে তালে তালে, আর

চলে সমবেত কণ্ঠে সংগীত। আট দশ বছরের মেয়ে থেকে সত্তর বছরের বুড়ী অবধি সব মেয়েরাই এই নাচে অংশ গ্রহণ করে। আমাদের যেমন দুর্গাপুজোর সময়ে শাড়ী গয়না পরে মেয়েরা সাজগোজ করে তেমনি এই পরব উপলক্ষে সাঁওতাল মেয়েরাও যার যা ভালো শাড়ি গয়না আছে তা পরে। গয়না রূপোর আর শাড়ির জমি প্রায়ই শাদা হয়।

দেখে মনে হল ওদের এই বাদ্‌না পরবে গরুর একটা বড় স্থান আছে। গোমাতা নয়, বলদ। ফসল ফলানোর কাজে এরাই প্রধান ভূমিকা নেয়, তাই ফসল ঘরে তোলার পরে এই উৎসবে বলদকে এরা খুব সম্মান দেয়। প্রতি বাড়ীর দোর গোড়াতেই সকালবেলা একটা করে বলদকে একটা লম্বা বাঁশের খোঁটায় বাঁধা হয়। এরপরে বাড়ীর মেয়েরা এসে সেই বলদকে প্রণাম করে। এদের প্রণাম করার ভঙ্গীটিও বেশ আলাদা ধরণের, (মানুষকেও) কোমর নীচু করে দুহাতের আঙুল মাটিতে ছুঁইয়ে দিলেই প্রণাম সারা হয়ে গেল; কপালে আর হাত ঠেকাতে হয় না কিম্বা ভূমিষ্ঠও হতে হয় না। প্রণাম পর্ব শেষ হয়ে গেলে ছেলেরা ঢাক পিটিয়ে বাদ্যি বাজিয়ে এক একটা বলদকে ঘিরে নাচতে নাচতে ওদের সঙ্গে খেলা করতে থাকে। এসব হুল্লোড়ের শেষে বাড়ীর প্রধানা মহিলা এসে বলদের পায় জল ঢেলে পা ধুইয়ে দেয়, তখন বলদটা ছুটি পায়।

আমাদের পাশের বাড়ীর এক সাঁওতাল বুড়ীকে জিজ্ঞেস করাতে বলল, বছরে দুবার ওদের ছুটো বড় পরব হয়। একটা এই বাদ্‌না পরব আরেকটা চৈত্র মাসে যখন শাল মহুয়া গাছে ফুল ফোটে তখন আবার ওদের মধ্যে আনন্দোৎসবের ঘটা পড়ে যায়।

সরস্বতী পুজোর সময়ে মাইথনে বড় মেলা বসে। তাছাড়া ফসল শেষে এখানে ওখানে মেলাটেলা করে ওরা অবসরের আসরটাকে বেশ জমিয়ে তোলে। সরস্বতী পুজো প্রধানতঃ বাঙালীদের পুজো। স্থানীয় বাঙালীরা একে বলে 'সিজান'। এই দিনে ওদের অরন্ধন পর্ব। আগের দিন যার যতটা সাধ্য করার তারা মাছ তরকারী রেঁধে রাখে, (পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরে) পরদিন বাসি ভাত দিয়ে সবাই তাই খায়। গ্রামের পাঠশালায় ছেলেদের নিয়ে একটি ছোট্ট সরস্বতী পুজোও এখানে হল দেখলাম।

আমাদের প্রতিবেশিনী সেই সাঁওতালবুড়ীর কাছে একটা মজার ব্যাপার জানতে পেলাম। এ গাঁয়ের সাঁওতালদের পদবী হল হাঁসদা। এরা হাঁস বা হাঁসের ডিম খায় না, হাঁস পোষেও না। এমন কি যে-সব পুকুরে হাঁস চরে বেড়ায় সেই পুকুরে স্নান কিম্বা অন্য কোনো কাজেও তার জল কিছুতেই ব্যবহার করে না। রাজহাঁস যে পথ দিয়ে যাবে সে পথে ওরা পা ছোঁয়াবে না কারণ হাঁস নাকি ওদের পূর্ব পুরুষ। মনে পড়ল সেই একেবারে আদিম দিনের মানুষদের নাকি এক একটা গোত্রের টোটেম ছিল এক একটা পশু বা পাখী। ভেবে খুব অবাক লাগল যে এই বিংশশতকের শেষার্ধেও সেই আদি মানবের মনোবৃত্তি ও সংস্কার এদের মধ্যে এখনো টিঁকে আছে। স্বল্প সন্তুষ্ট সরল এই খেটে খাওয়া মানুষগুলোর কাছে এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানের কোনো আলোই এসে পৌঁছয় নি। হয়ত আরো দীর্ঘদিন এরা তাদের পূর্বতন ঐতিহ্য বহন করেই চলবে।

এর কাছেই আরো জানলাম ছেলের বিয়ে ঠিক হলে কনে'র বাড়ীতে ওদের তিনটে টাকা তিনটে কাপড় আর একটা গরু দিতে হয়। সহজ ব্যবস্থা। স্থানীয় বাঙালী চাষীদের কিন্তু অন্যরকম। ওদের দিতে হয় বরপণ। ভালো পাত্র অর্থাৎ বেশ জমিজায়গাওয়ালা বাপের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলে দু তিন শো টাকা তো বটেই কোথাও কোথাও আরো বেশী নগদ টাকা এবং সাইকেল ঘড়ি প্রভৃতি বেশ কিছু জিনিসও দিতে হয়। দশ বারো বছর বয়সেই বাঙালী মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়, নইলে সমাজে ওদের নিন্দে হয়। তবে বিয়ের পরও যতদিন না উপযুক্ত বয়স হয় ততদিন এরা বাপ মায়ের কাছেই থাকতে পায়। সাঁওতালদের সম্ভবতঃ অত কড়িন নিয়ম কিছু নেই, বড় বড় অবিবাহিতা মেয়েও ওদের ঘরে দেখেছি।

চমৎকার ওদের স্বাস্থ্য সম্পদ। শিশুর মত অসংকোচ কথাবার্তা, হাসি গান ও চলাফেরায় এরা ভারী সহজ সুন্দর ও সাবলীল। কর্মশক্তিও এদের অফুরন্ত। বাঙালী ললনারা তো এদের কাছে নিতান্তই দুর্বলা। তবে হাটে বাজারে বেচাকেনা করতে অবশ্য বাঙালী চাষীদের মা বৌয়েরাও যায়, কিন্তু কল-কারখানার ভারী কাজ মনে হয় শুধু সাঁওতাল মেয়েদেরই একচেটিয়া। শিল্পবোধও এদের প্রখর। হাতের কাছে ফুল পেলেই এরা খোঁপায় গুঁজে নেয়। দরিদ্র কুটিরের অধিবাসী এরা হয়তো কোনো কোনোদিন শুধু বেগুনপোড়া ভাত ছাড়া আর কিছু আহারও বড় একটা জোটাতে পারে না, কিন্তু সৌন্দর্য পিপাসায় কবি শিল্পীদেরই ওরা সমগোত্রীয়। ওদের চমৎকার করে লেপাপোছা পরিচ্ছন্ন মাটির ঘরগুলো দেখলে সত্যিই মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। হাতের এক একটি পোঁচে বা আঙুলের টানে সৃষ্টি হয়েছে একরকমের দৃষ্টি-লোভন সৌন্দর্য। কোনো কোনো বাড়ীর মেটে দেয়ালে ছবিও এঁকে রেখেছে। বেশীর ভাগ সাঁওতাল বাড়ীতেই দেখা যাবে উপরদিকের দেয়ালটা সাদা বা লাল মাটি দিয়ে লিপা আর তলাকার দিকটা কালো মাটি (গোবর ও কালি মেশানো) দিয়ে নিকানো। এতে বেশ একটু বৈচিত্র্য এসেছে। এত সুন্দর আর সমান কাজ এদের যে এসবের কাছে সিমেন্টের কাজও হার মানে। ওদের খামার উঠোন এসবও খুব পরিষ্কার আর চমৎকার ভাবে নিকানো।

রাঁচিতে আদিবাসীদের মধ্যে কোলদের দেখেছি, শান্তিনিকেতনে সাঁওতালও দেখেছি এর আগে কিন্তু এমনভাবে ওদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ কখনো পাইনি। সাঁওতাল পল্লীর প্রায় গায়ে গায়েই লাগানো আমাদের বাড়ী। ডানপাশে একঘর স্থানীয় বাঙালী আর বাঁ পাশে একসারি সাঁওতালের বাড়ী। সভ্য বা অসভ্য বলতে সাধারণতঃ যাদের আমরা বুঝি এখানে তারা অনুপস্থিত। আমার ভাই নির্জনতা-প্রিয় বলে এই গ্রামে এসে বাড়ী বেঁধেছে। মাঝে মাঝে কখনো সখনো এসে থাকে। এবারে আমরাও দু-বোন এসেছি বেড়াতে। সাঁওতাল ও বাঙালী সকলের বাড়ীতেই মনের আনন্দে আমরা ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি, সংকোচ বোধ করবার কোনো কারণ ঘটেনি। একেবারে আপন আত্মীয়ের মত এরা আপ্যায়ন করেছে, আলাপ করেছে। যাবার সময় সাঁওতালদের কাছ থেকে পরব দেখবার আমন্ত্রণ পেলাম। মেয়েদের বললাম, নিশ্চয় যাব, কিন্তু কি খাওয়াবি আমাদের। একটি মেয়ে প্রসন্ন হাস্যে বলে উঠলো,—কেনে মদ, মদ খাওয়াব তুদের। প্রচুর হেসে-ছিলাম সেদিন। দুমাস বাদে যখন ফিরে আসি—তখন দেখা করতে গেলাম, বলল, কেনে যাবি। ইখানেই থাক্। তুরা থাকলে আমাদের ভালো লাগছে। কি সাঁওতাল আর কিবা বাঙালী—দুদিক থেকে পেয়েছি আন্তরিকতার চোঁয়া। ভাবতে ভালো লাগে যে মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধন কত সহজে ও অনায়াসে গড়ে উঠতে পারে। প্রদেশ, জাতি, ধর্ম ভাষা কোনো বাধাই সেখানে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। একটি মাত্র পরিচয়েই সে আপন, কারণ আমরা সবাই মানুষ। ভদ্রতা অভদ্রতা প্রকাশ পায় মানুষের আচার আচরণে, রুচির প্রকাশ তার সৌন্দর্য-নিষ্ঠায়। সভ্যতার মুখোস আঁটা জীবনের বাইরে এই অকৃত্রিম সাহচর্যকে হৃদয়ের গভীরে একটি বড় জায়গা না দিয়ে কেউই হয়ত থাকতে পারে না।

স্থানীয় বাঙালীদের মধ্যেও দেখলাম বহু কুসংস্কার এখনো বদ্ধমূল হয়ে আছে, আছে জাতিবিচারের ছোট বড় বোধের প্রাবল্য। এখানেই শিক্ষার প্রয়োজন যে কত বেশি তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। তবে একটু একটু করে হলেও এরা লেখাপড়ার মর্যাদাটাকে সম্ভবতঃ বুঝতে শিখছে। দু এক ঘর এদিক থেকে একটু অগ্রসর হয়েও চলেছে। গ্রামেই আট দশটি ছেলেমেয়ে নিয়ে গাছতলায় একটা পাঠশালা চলছে, অবশ্য সামান্যই কাজ হয় তাতে। পাশের গ্রাম খাড়ুরী অপেক্ষাকৃত বড় গ্রাম, সেখানে একটা স্কুল আছে, গবর্ণমেণ্টের কিছু সাহায্য পায়, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের খুবই অভাব। একটু বড় ছেলেমেয়েদের মধ্যে দু চার জন চিত্তরঞ্জনের স্কুলেও যায় কিন্তু এ সংখ্যা প্রায় ধর্তব্যেই মধ্যেই নয়। কারণ সংসারের কাজে ছোট

ছেলেমেয়েদের সাহায্য না পেলে বাপ মায়ের চলে না। ঢেঁকিতে ধান কোটা, হাটে বাজারে যাওয়া, ছোট ছোট ভাইবোনদের দেখেশুনে রাখা এবং 'বাগাল' করা (গরু-বাছুর ছাগল ভেড়া প্রভৃতিকে চরিয়ে বেড়ানোকে এরা 'বাগাল' বলে) প্রভৃতিতেই এরা ব্যস্ত থাকে। ছেলেরা বাপ খুড়োদের সঙ্গে চাষ আবাদের কাজ, গরুর গাড়ী চালানোর কাজও করে কাজেই লেখাপড়ার অবকাশ বা তাগিদ কোনোটাই নেই ওদের জীবনে।

আমরা শুনি এবং নিজেরাও এই জীবনের দিকে তাকিয়ে ভাবি কখনো কিখনো, বেশ তো আছে এরা। সহরে জীবনের ক্লেদ ও মালিন্য, বিলাস ও নিত্য অভাবের তাড়নায় এরা অসুস্থ নয়। নিজের ঘরের মোটা ভাত খেয়ে আর দুখানা মোটা কাপড় পরে ছড়ির খাটিয়ায় কিংবা খড়ের গদি পাতা বিছানায় শুয়েই দিব্যি সন্তুষ্ট আছে এরা, কি হবে শিক্ষা ও সভ্যতার ছোঁয়াচ ঢুকিয়ে দিয়ে এদেরও বিক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট জীবনের মধ্যে টেনে আনবার! কিন্তু তবুও মনে হয় লেখাপড়ায় বঞ্চিত এতো অতি ছোট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ এই যে জীবন, বৃহৎ কোনো স্বাদের আস্বাদও যারা পায় না; পূর্বতন নানা প্রথা ও সংস্কারের বস্তু জাঁটুনিতে যারা এখনও শক্ত করে বাঁধা, তারা আরও একটু মুক্তি আরও একটু স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার মধ্যে যদি পৌঁছুতে পারে তবে ক্ষতিটাই বা কি? দেখেছি ঘোর শীতের মধ্যেও কচি কচি ছেলে-মেয়েগুলো উদ্‌লা গায়ে কিম্বা সামান্য একটু বস্ত্রখণ্ড গায়ে দিয়ে সকাল সন্ধ্যা কাটিয়ে দিচ্ছে। ধান সেদ্ধর জন্য উনুনের ধারে খোলা উঠানে বসে ছেলে বুড়ো সবাই শীতকে কাবু করতে চেষ্টা করছে! দারিদ্র্য এদের নিত্য সঙ্গী। এদের ঘরণীরা বিশ্রাম কাকে বলে জানে না। শেষরাত থেকে সুরু হয় ঢেঁকির শব্দ আবার ওদিকেও অনেক রাত অবধি চলতে থাকে তার আওয়াজ। এর সঙ্গে আছে গরু ভেড়া ছাগলের কাজ, সব্জী ক্ষেতের সেবা যত্ন, পুত্রকন্যার ঝামেলা এবং ঘরে খাওয়ার ব্যাপার। উদয়াস্ত ওরা খেটেই চলেছে। এই জীবনকে চিরস্থায়ী করে রাখবার কথা কল্পনা করতেও ভয় হয়।

তবে খুব ধীর গতিতে হলেও চাকা এখানেও ঘুরতে সুরু করেছে। সভ্যতার আবেদন, যন্ত্র-দেবতার আহ্বান এই কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রার মধ্যেও একটু একটু অদল বদল ঘটাতে সুরু করেছে। কাছে ঘুরে গড়ে উঠেছে, উঠছে নানারকমের কল কারখানা। রাত্রির অন্ধকারে দক্ষিণের রেল রাস্তাটাতে দাঁড়ালে সামনের গোলার্ধ জুড়ে গোটা পাঁচ ছয় কারখানার আলো চোখে পড়ে। কুলটি বার্ণপুর, মাইথন প্রভৃতি এখান থেকে কিছু কম বেশী দূরে ঘুরে ঘুরে। কাছেই চিত্তরঞ্জনের কারখানা, তাছাড়া আছে একটা বৈদ্যুতিক তার তৈরীর কারখানা আর পাথর ভাঙ্গা কল তো আছেই। মাইথনের বাঁধ মাত্র সাত আট মাইল দূরে, কল্যাণেশ্বরীর মন্দির আছে ওখানে; তাই ওটা নামের স্থান, এবং ঐ নাম থেকেই মাইথন নামের উদ্ভব। স্থানীয় লোকদের এতকাল শুধু চাষবাসই সম্বল ছিল, এখনো বেশীর ভাগেরই তাই; তবুও বর্তমানে এসব কল কারখানার কল্যাণে গ্রামের কিছু কিছু পুরুষ ও মেয়েরা এসে এস্তরোতে যোগ দিয়েছে। মেয়েদের মধ্যে অবশ্য সাঁওতাল মেয়েরাই যায়। কৃষকেরা আস্তে আস্তে পরিণত হচ্ছে শ্রমিকে। গ্রামের গণ্ডী ছাড়িয়ে বাইরে জন জীবনের সঙ্গেও ক্রমে যোগ ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাষীর ঘরেও বেকারের সৃষ্টি হচ্ছে, তাছাড়া আর্থিক প্রয়োজন এবং সভ্যতার অনিবার্য চাহিদাই এদেরও টেনে আনছে বিস্তৃতর জীবনের দিকে। চলমান জীবনের স্রোতে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে বৃহত্তর পৃথিবীর দরজায় এরাও এসে একদিন দাঁড়াবে, কিন্তু এখনো তার অনেক দেরী।

পুরো দু মাস ভরে মুগ্ধ দু চোখ মেলে তমদোহাকে দেখলাম। ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি ওর খোলা আকাশের তলায় বাধাহীন পাহাড়ের প্রান্তরে। মন ভরে কুড়িয়ে এনেছি সকলের ভালোবাসা। মনে থাকবে এখানকার প্রকৃতির অবারিত দাক্ষিণ্য, মনে থাকবে সভ্য-জগতের বাইরের এই প্রাণখোলা মানুষগুলির আন্তর-সম্পদকে। বিদায় তমদোহা। চিত্তরঞ্জন থেকে ট্রেন ছাড়ল; আসছি, ফিরে আসছি অন্য এক জীবনে, আসছি কচি কচি হাতের

কোমল বাঁধনের মধ্যে ; তবু তমসোহপি হারিয়ে যাবে না। চোখে বিদায়রূপের অশ্রু। মনে পড়ছে বেরী'র বউয়ের দেখতে পাচ্ছি ছোট সাঁওতাল মেয়ে মাধুর সাদা আঁচল ম্লান মুখের বিদায় সম্ভাষণ। হলধরের গরুর গাড়ী পথের বাতাসে উড়ছে, দেখতে পাচ্ছি বাঙালী ছেলে মনোরঞ্জনের বাঁকে মিলিয়ে গেল। ট্রেন চিত্তরঞ্জন ছাড়িয়ে ছুটেচলেছে।

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় জন্যই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে, দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেইজন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়-নির্দ্দেশিত "সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

সুতরাং সেই দেহে যেন তোমার অবজ্ঞা না হয়। এক দেহস্থ আত্মজ্ঞানী আত্মা অন্য দেহস্থ অনাত্মজ্ঞানী আত্মাকে আত্মজ্ঞান বিষয়ক যে সকল উপদেশ দিয়া থাকেন, সে সকল ত দেহ অবলম্বনেই দিয়া থাকেন। যিনি সেই আত্মজ্ঞানীর উপদেশ সকল শ্রবণ করেন, তিনিও ত দেহ অবলম্বনেই শ্রবণ করেন। এক দেহী-প্রেমিক আত্মাই ত অন্য দেহী-প্রেমাস্পদ আত্মার প্রতি প্রেম করিয়া থাকেন। এক দেহী-ভক্তাত্মা ত অন্য দেহী-ভক্তিভাজনাত্মার প্রতি ভক্তি করিয়া থাকেন। তবে দেহ তোমার পক্ষে হেয় হয় কেন? দেহ অবলম্বনে আত্মা আত্মজ্ঞান বিষয়ক উপদেশসকল পাঠ ও শ্রবণ করেন। দেহ অবলম্বনে আত্মা আত্মজ্ঞান বিষয়ক উপদেশ দিয়া থাকেন। দেহ অবলম্বনে এক দেহস্থ আত্মা-প্রেমিক অপর দেহস্থ প্রেমাস্পদ-আত্মার প্রতি প্রেম করিয়া থাকেন। দেহ অবলম্বনে এক দেহস্থ ভক্তাত্মা অপর দেহস্থ ভক্তি-ভাজনাত্মার প্রতি ভক্তি করিয়া থাকেন। সকল কার্যই দেহ অবলম্বনে হইয়া থাকে। কত পুরাণ, তন্ত্র, কত শাস্ত্রানুসারে পরমেশ্বরও দেহ অবলম্বনে সৃজন পালন নানা প্রভৃতি কতই অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কত আত্মজ্ঞানী পরমহংসাত্মা মহাপুরুষগণও দেহী, তাঁহারা দেহ অবলম্বনেই কত অনাত্মজ্ঞানী দেহস্থ আত্মাকেই আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ সকল প্রদান করিয়া

থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই দেহ অবলম্বনেই 'সোঽহং' বা 'শিবোঽহং' বলিয়া থাকেন। তবে তোমার মতে দেহ অসত্য কেন? ৫

কোন কোন উপনিষৎ, বেদান্তদর্শন, বেদান্তসার এবং পরমহংসাচার্য প্রভৃতি মহাত্মগণের গ্রন্থাবলী মতে আত্মাতে আত্মজ্ঞান স্ফুরিত না হইলে অবিদ্যাকে অসত্য বোধ হয় না, এবং সেই আত্মজ্ঞান ব্যতীত সর্ব বন্ধনমুক্তও হওয়া যায় না। সমস্ত অদ্বৈত মতের গ্রন্থ হইতেই জানা যায় যে দেহস্থ আত্মা হইতেই আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হইয়া থাকে। সে সকল গ্রন্থ হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, কখনই অদেহস্থ আত্মা হইতে আত্মজ্ঞানের স্ফুরণ হয় না। বেদান্তোক্তসারে আত্মাই ব্রহ্ম। তবে ব্রহ্মের দেহ নাই কি প্রকারে বলিতেছ? ঐ যে পরমহংস যিনি বারম্বার 'সোঽহং' বলিতেছেন, যিনি আপনাকেই ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, যিনি আপনি ব্যতীত অন্য স্বতন্ত্র ব্রহ্ম আছেন স্বীকারই করেন না, ঐ দেখিতেছ না তাঁহারও যে দেহ রহিয়াছে। তাঁহার দেহ রহিয়াছে, অথচ তাঁহার দেহকে যদি কল্পিত ও অসত্য বলা হয়, তাহা হইলে তিনি যে আছেন বোধ করিতেছেন, তাহাও অসত্য বলা হয় না কেন? কারণ তাঁহাদেরই ত অদ্বৈতমতে নির্দেশিত হইয়াছে যে, যে অহঙ্কার দ্বারা নিজের অস্তিত্ব বোধ হয়, তাহাও মায়িক। সুতরাং সেই মায়িক অহংকার যাহা নির্বাচন করে, তাহা সত্য কি প্রকারেই বা বলা যাইতে পারে? ৬

ব্রহ্মের সহিত আপনাদের অভেদত্ব যাঁহারা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাঁহাদেরও ত দেহ ছিল। ব্রহ্মের সহিত আপনাদের অভেদত্ব যাঁহারা প্রতিপাদন করিতেছেন, তাঁহাদেরও ত দেহ আছে। অথচ তাঁহাদের মতে রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতির দেহ কল্পিত ও অসত্য কেন বলা হয়, তাহাও বুঝিতে পারি না। যিনি বেদান্ত অনুসারে আপনাকে ব্রহ্মের সহিত অভেদ প্রতিপন্ন করিতেছেন, তাঁহার দেহ সত্য হইলে রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতির দেহও সত্য বলিতে হইবে। ৭

তুমি রহিয়াছ যে অহঙ্কারদ্বারা নির্বাচিত হইতেছে, সেই অহঙ্কারদ্বারাই তোমার দেহ রহিয়াছেও নির্বাচিত হইতেছে। তুমি আছ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তোমার দেহ আছেও সত্য। উক্ত যুক্তিদ্বারা তোমার দেহ আছে প্রতিপন্ন হইল। উক্ত যুক্তিদ্বারাই রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতিরও দেহ আছে। তাঁহাদেরও যে দেহ সত্য, ইহাই বা প্রতিপন্ন হইবে না কেন? যাহাদ্বারা এক সত্য নির্বাচিত হয়, তাহা দ্বারাই অন্য সত্য নির্বাচিত হইতে পারে। ৮

অষ্ট সিদ্ধান্ত

আত্মজ্ঞান যাঁহার আছে, তাঁহার আত্মজ্ঞান এবং তিনি আত্মা, ইহা তাঁহার নিশ্চয়ই বোধ আছে। সুতরাং আত্মজ্ঞানীর অহঙ্কার এবং মমতা নাই, কি প্রকারে বলিব? কারণ তাঁহার আত্মজ্ঞান—তাঁহার বোধ আছে, এইজন্য আত্মজ্ঞানের প্রতি তাঁহার মমতাও আছে বলিতে হইবে। তিনি আত্মা—তাঁহার বোধ আছে, এইজন্য তাঁহার অহঙ্কারও আছে বলিতে হইবে। অথচ বেদান্তমতে আত্মজ্ঞানীর অহঙ্কার ও মমতা থাকে না বলা হয়। আত্মজ্ঞানীর নিজে আত্মা বোধ থাকে এবং তাঁহার আত্মজ্ঞান ইহাও তাঁহার বোধ থাকে। সুতরাং তাঁহার অহঙ্কার ও মমতা থাকে না, কখনই বলা যায় না। ১

নিজের অস্তিত্ব বোধ না থাকিলে অন্য কিছুর অস্তিত্ব বোধও হয় না। নিজের অস্তিত্ব-বোধ অহঙ্কারদ্বারা হইয়া থাকে। বেদান্তমতে অহঙ্কার মায়িক। সে মতে যাহা মায়া কিংবা মায়ার অংশ অথবা মায়িক, তাহাই অসত্য। অতএব সেইজন্য মায়ার বিকাশ অহঙ্কারও অসত্য। অথচ সেই অসত্য অহঙ্কার স্ফুরিত না থাকিলে আত্মজ্ঞানী যে নিজে আত্মা, তাহাও বোধ করেন না। তাঁহার আত্মজ্ঞান, তাহাও তিনি বোধ করেন না।

ক্রমশঃ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৩—

(৪৯)

রাজনীতি কি প্রাণ অপেক্ষাও বড়? সে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। আমি তাহাকেও পরিত্যাগ করি নাই, করিতে পারিব না। ৮টার পর পাঠ হয়।···

৭ই এপ্রিল

নিত্যগোপাল, পিতা আমার, মাতা আমার, ধন আমার, জন আমার, সহায় আমার, সম্পদ আমার, তোমাকেই নিখিলময় খুঁজিলাম। কোথায় যাইব তোমাকে ছাড়িয়া? মানুষের মধ্যে তোমাকে পাইতে চাহিয়াছি। যাহাকে চাহিয়াছি, তাহার সবখানি সহিতই তো চাহিয়াছি, তাহাদের ভাইবোন আত্মীয়কে পর্যন্ত চাহিয়াছি যাহাতে সে সব দিয়া আমাকে ভালবাসিতে পারে। তাহার আবেষ্টন বাদ দিয়া কোনও মানুষকেই তো চাহি নাই। অথচ আমিই পাইলাম না। তুমি আছ আমার কেবল। কেবল আমি কেবল তোমাকে পাইব—নিত্য-গোপাল, নিত্যগোপাল আমার। 'Intuition' সম্বন্ধে রাসেল-এর History of Western Philosophy হইতে বার্গসঁ-র লেখা পড়ি।···আরতির সময় ঘরিপালের গোপাল গুপ্তের পুত্র শঙ্কর আসে। গত বৎসরের ৪টাকা দিয়া যায়। উপেন ধর আসে, তাহার ও তাহার কাকার বাকী ৪৲ টাকা ও মাসিক ১৲ টাকা দিয়া যায়। রেণু 'গোরা' পড়িয়া শুনায়। 'গোরা' আমার পর হইতে আনন্দময়ীর 'সমাজ' বদলাইয়া গেল। গোরাকে পরিপাক করিবার জন্য সমাজের ঊর্দ্ধে উঠিতে হইয়াছে, স্বামী কৃষ্ণদয়ালের সঙ্গ পর্যন্ত ত্যক্ত হইয়াছে।···আবেষ্টনের re-arrangement ঘটাইয়া নূতন ঘটনাকে assimilate করিতে হয়। ভগবান যে immanent, তাই ঘটনার সঙ্গে নূতন ঘটনা যোগ করিয়া কখনও কখনও ঘটনাকে পরিপাক করিতে হয়। যাহারা এই কৌশল জানে না, তাহারা ঘটনার উপরে উঠিয়া ঘটনার চাপ হইতে মুক্ত হইতে চায়। পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের সঙ্গে ঘটনাকে যুক্ত করিয়া, ঘটনার পরিধি extend করিয়া ঘটনাকে পরিপাক করিতে হয়। বিশ্বের দুঃখের সঙ্গে নিজ দুঃখকে যুক্ত করিতে পারিলে দুঃখ হজম হয়। গোরা জেলখানায় থাকিতে দুঃখকে এইভাবেই পরিপাক করিয়াছিল! পাঠ হয়। শঙ্কর এটালীতে নিজেদের জন্য দালান করিয়াছে। আমি শুনিয়া বলিলাম—আমি যাইব। সে তো যাইতে বলে নাই। আমার এই আগাইয়া যাইবার প্রকৃতিরও বুঝি বদল করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। দুঃখ আর কিছুর জন্য করিব না। যাহা ঠাকুরের ইচ্ছা, তাহাই হইবে। আমি শুধু মুক্ত আছি কিনা তাহাই দেখিব। ঠাকুর যথেষ্ট করিয়াছেন। এখানের সকলেই অসুস্থ। সকলেরই প্রায় শুইয়া শুইয়া থাকিবার অবস্থা। তবুও তো কাজ একরূপ চলিতেছে। রেণুর যেরূপ শরীর, সে-ও তো একরূপ কাজ চালাইয়া যাইতেছে।

৮ই এপ্রিল

ঠাকুর, তোমার ও আমার নিবিড় যোগের মধ্যে, fusion-এর মধ্যে, identification-এর মধ্যে আমার সকল বিকল্প, বিতর্ক ও বিচার লুপ্ত হউক। আমার জীবনের সকল সমস্যার নির্বিকল্প, নির্বিতর্ক ও নির্বিচার সমাধান বা সমাধি হউক। তুমি আমির ফাঁকের মধ্যেই না বিকল্পের উদ্ভব? আমার অর্থ তুমি, তোমার অর্থ আমি ও বিশ্ব। আমি নিরপেক্ষ তুমি ভাবুকতা, তুমি নিরপেক্ষ আমি ভাবুকতা। তুমি আমি যখন দিব্য ধ্যানযোগে, দিব্য জ্ঞানযোগে, দিব্য প্রেমযোগে, দিব্য কর্মযোগে এক, অদ্বৈত, তখনই সেখানে ভাবের বুক চিরিয়া উদ্ভূত হয় রস, বিশ্বের সকল ভাবুকতাকে রসে

গড়িয়া তুলিবার জন্যই তুমি আসিয়াছ। তোমার আবির্ভাবে বিশ্বে সর্বক্ষেত্রে complete objectivity আসিয়া উঠিবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'মো বিষয়ে গোপী-গণের উপপতিভাবে। যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে। খুঁজিয়া বাহির করি। এই সংসারে বৈধ পতি-পত্নী সম্পর্ক যে তাহাদের মধ্যে সত্য সত্য প্রেমের দ্বন্দ্ব স্থাপন করিতে পারে না, বিধিমার্গে যে পরস্পর পরস্পরকে অভিসন্ধি নিয়াই ভালবাসে, সেখানে যে উপপতিভাব অর্থাৎ স্বাধীনে স্বাধীনে মিলনের ভাব প্রতিষ্ঠা করা দরকার —তাহাই ব্রজলীলায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাহারও সঙ্গে যে 'বিধির' সম্পর্ক নাই, আছে 'রাগে'র সম্বন্ধ—তাহাই ব্রজলীলার শিক্ষা। আমার এখানে সকলেই অভ্যস্ত। আশ্চর্য্য। ঠাকুরের কাছে যাহারা ছিলেন, কি bardy ছিলেন তাঁহারা! মা-ঠাকরুণ কতদূর হইতে প্রত্যহ কলসী ভরিয়া জল আনিতেন? একদিন নয়, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।·· ৯টার পর শিশির তরফদার আসিয়া উপস্থিত।...গোপাকে নিয়া লেকে বেড়াইতে যাই। সেখানে জিতেন দত্ত ও নীলকণ্ঠ গুহঠাকুরতার সঙ্গে দেখা হয়।···

৯ই এপ্রিল

শ্রীগৌরসুন্দর, তুমিই বিশ্বের বুকে 'রাগমার্গ' সর্ব-প্রথমে প্রকট করিলে, স্রষ্টা-সৃষ্টির পরম সাম্য প্রচার করিলে, 'সখাস্কন্ধ সখ্যে বসে স্কন্ধে আরোহণ, তুমি কোন্ বড় লোক তুমি আমি সম।' 'তুমি আমি সম'—ইহা কি বিধিমার্গের উপাসক কোনওদিনই বলিতে পারে, না ভাবিতে সাহস পায়? এই রাগমার্গ এতদিন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সাধনার মধ্যে অনন্ত বিধিনিষেধের স্থান রাগ হইল। ৪৫০ বৎসর পূর্বে এইরূপ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। শ্রীনিত্যগোপাল এইবার রাগমার্গকে সমাজের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবার উপযোগীভাবে ধার্মনিক ও সামাজিক রূপ দিয়া গেলেন। ব্রহ্মের মত অব্রহ্মকেও সত্য বলিলেন। এইবার মানুষ দৈনন্দিন জীবনে আস্বাদন করিবার সুযোগ পাইল, 'বিরজনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি'। আমি ও গোপা সকালে টালিগঞ্জ ডিপোর দিকে যাই। সকালে 'প্রাণের পথ' (২) কিছুটা লিখি—পরকীয় রসের কথা। ৩ টায় আমি ও প্রতিভা অরাদের বাড়ী যাই।··· মঠে নামি। জিতেনের সঙ্গে কথা হয়। যতেন্দ্রবাবু উজ্জলভারতের গ্রাহক হইবেন ঠাকুরের সম্বন্ধে লেখা বাহির হইতেছে বলিয়া। টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে ট্রামে রওনা হই। ট্রামে উঠিবার সময় সত্য ঘোষের সঙ্গে দেখা। সে হোমিওপ্যাথিদ্বারা বস্তির মানুষদের সেবা করে।... পাঠ হয়।

১০ই এপ্রিল

শ্রীগৌরসুন্দর, তুমি বড়দের অপেক্ষা ছোটদের ঠাকুরই বেশী, জনসাধারণেরই ঠাকুর বেশী। আমার শ্রীনিত্যগোপালও ছোটদের জন্য আসিয়াছিলেন, বড়দের হইতে তিনি দূরে দূরেই থাকিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন বড় বড় ঈশ্বরচন্দ্র, মহেন্দ্র সরকার, কেশব সেনদের, কলিকাতার ঠাকুর। আর শ্রীনিত্যগোপাল ছিলেন সব ছোটদের— ভুবনসূচির ঠাকুর, অমৃতের ঠাকুর, গোলাপ গয়লানীর ঠাকুর, বজরাপুর-সধবার ঠাকুর। তাই পরমহংস দেব বলিতেন, 'আমি তাদা গোবরের ঘুঁটে তৈয়ার করতে এসেছি, নিত্যগোপাল পচা গোবরের ঘুঁটে তৈয়ার করবে'। শ্রীঅরবিন্দও ভারতবর্ষের তথা বিশ্বের বড় বড়দের। ভারতের জনসাধারণ, বাঙ্গলার জনসাধারণের সঙ্গে তাঁহার বাহিরের যোগ কতদিন দিয়া বিচ্ছিন্ন।····· বৎসরান্তে একদিন দর্শন দেন···। আর শ্রীগৌরসুন্দর? জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন সর্বসাধারণের মধ্যে, সর্ব-সাধারণের হইয়া। খুব ভোরে আমি ও গোপা বাসে ৮এ-তে যাই নন্দরাণীর জন্য স্পেসিফিক ওষুধ ২২ দিয়া আসিতে। তখনই চলিয়া আসি ট্রামে।···'প্রাণের পথ' (২) কিছুটা লিখি।···মিছ ২ দিন যাবৎ জ্বলেন সর্দি যাইতেছে, তাহার ৩।৪ দিন পায়খানা হয় না, বাতের খুব উদ্বেগ। হাত তুলিতে কষ্ট বোধ হয়। গোপা পাঠ হয়।···

১১ই এপ্রিল

ঠাকুর, বর্তমান যুগের সকল সমস্যার একটী প্রাণপূর্ণ সমাধান দিতে পারে, সর্বসাধারণের অথচ কেবলানন্দ

তুমি ছাড়া এমনটী আর তো কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। অতীত শাস্ত্রের প্রতি তোমার কি বিশ্বাস, অথচ তাহার প্রতিটী বাক্য, প্রতিটী কার্য কি চুলচেরা তাবেই না বিচার করিয়া গিয়াছ? এত শ্রদ্ধা ও এতখানি বিচার-তর্ক কাহারও ভিতর তো দেখিলাম না। তুমি অতীতকে অতীত রাখিয়াই বর্তমানের মানুষ, তাত্ত্বিক মানুষ। তোমার সামনে দাঁড়াইবার মত সাহসী কে আছে? তুমি আসিয়াছিলে আমার জীবনের দুয়ারে; কিছুই তো করিতে পারিলাম না। তুমি বিশ্বের সর্বসমস্যার সমাধান-মূর্তি। তোমাকে না চিনিলে বিশ্ব বাঁচিবে কি করিয়া? ...উদ্বোধনের appreciation-সূচক ২ খানি চিঠি দিয়া শিশির ভবকে পাঠাইয়া দেয় ৯টার পর। পাঠে পুলিন ছাড়া পুরুষ আর কেহ ছিল না। কেহ থাকুক আর না থাকুক, নিত্যকর্মের মত চালাইয়া যাইব। ঠাকুর, ঠাকুর, তোমার দর্শন না নিলে সংসার বাঁচিবে কি করিয়া? অন্তর্দ্বন্দ্বে যে সংসার চূর্ণবিচূর্ণ হইতে বসিয়াছে। কোথায় পথ? তুমি ছাড়া যে বিশ্বের গতি নাই, তাহা তো স্পষ্ট বুঝিতেছি। কেমন করিলে বিশ্ব তোমায় নিবে? কেমন করিয়া মানুষ পুরুষোত্তম-মাত্রায় দৈনন্দিন জীবন চালাইবে? একান্ত সংসার ছাড়া তো আজ অসম্ভব। সংসারও থাকিবে, অথচ তাহার উর্দ্ধেও উঠিতে হইবে—এইখানেই না সব সমস্যার সমাধান সম্ভবপর?

১২ই এপ্রিল

ঠাকুর, তোমার কোন্ প্রয়োজন সাধিবার জন্য আমি আসিয়াছি, তাহা তুমিই জান। তোমার শ্রীচরণ-তলে বসিয়া তাহা জানিয়া লইব, বুঝিয়া লইব। কি আমার প্রয়োজন? সুখে দুখে আঁধারে আলোকে তোমার অধাতীত চরণের দিকে চাহিয়া রহিব। সেবার পথে আদর-অনাদর, অপেক্ষা-উপেক্ষা, সকলের ছাড়িয়া যাওয়া তোমারই সেবার পুরস্কার বলিয়া মাথা পাতিয়া লইব। সেবকের আবার শীত-উষ্ণ, সুখ-দুখ কি? পথ যদি কখনও হারাইয়া যাই, তোমাকে 'নিত্যগোপাল' বলিয়া ডাকিব বা তোমার রাতুল চরণ আমার বুকে মাথায় রাখিব।...বিরজা স্বপ্ন দেখিয়াছে, 'আমি কাঁদিতেছি'। সকলের জন্য আমার যে কি ব্যথা, তাহা আমিই জানি। সকলে আসে, ছাড়িয়া যায়। আমি বসিয়া বসিয়া কাঁদি। আমি তো কাহাকেও পৃথক করিয়া নেই নাই, নিবও না। ছাড়িয়া গিয়াছে অনেকেই। কিন্তু তাহারা আজও আমার বুকের মধ্যে আছে। আচার্য্য শঙ্কর সমাধির মধ্যে সকলের এক হওয়ার কথা বলিয়াছেন, নিত্যগোপাল জাগ্রতের বুকে সকলকে অদ্বৈতজ্ঞানে অদ্বৈতপ্রেমে পাইবার কথা শুনাইয়া গিয়াছেন। তাই আমার সারা জীবন এত ঝঞ্ঝাটময়। ছাড়ি নাই কাহাকেও আমি, অথচ তাহারা ছাড়িয়া গিয়াছে। এই দুইয়ের সামঞ্জস্য যে হৃদয়ের উপরে কি আঘাত হানে, তাহা আমিই বুঝিতেছি। বুক যে ভাঙে নাই, তাহা শুধু ঠাকুরের কৃপায়। আজও আমি চলিয়াছি খাড়া হইয়া—সেই ১৯১৯-এর ৯ই ফেব্রুয়ারী বাহির হইয়াছিলাম। ব্যক্তিগত 'হওয়ার' কথা আমি জানি না। সেই বিচারে আমি কিছু নই, কিন্তু সকলের সঙ্গে নিজ হওয়ার সাধনায় যে বৈরাগ্য তপস্যা আমার জীবনে আছে, তাহা কি ব্যক্তিগত বৈরাগ্য তপস্যারও পরের কথা নয়? কামিনী-কাঞ্চন এড়াইয়া তো আমি বৈরাগী নই। আমি কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে থাকিয়া বৈরাগী। আমার বৈরাগ্য crystallised নয় বলিয়া ইহা দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কিন্তু আমি যে কেমন করিয়া ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া সব সম্পর্ককে ভিজাইয়া আসিয়াছি তাহা কি সত্য নয়? আমার একটী ব্রাহ্মী স্থিতি আছে, আমি 'Becoming'-এর উপাসক। Finished বৈরাগ্য আমার নাই। অনন্ত অপূর্ণতার বুক চিরিয়া আগাইয়া চলিয়াছি—ইহাই আমার সার্থকতা। প্রচলিত বৈরাগ্য, প্রচলিত শান্তি আমার নাই। তবু আমি স্থিত। পাঠ হয়।.....

১৩ই এপ্রিল

বাংলা নববর্ষ/ওঁ শ্রীনিত্যগোপাল

ওঁ পরব্রহ্মরূপী গুরু করুণানিধান। গুরু নিত্যগোপাল, সখা আমার, সাথী আমার, বন্ধু আমার, শরণ আমার, সুহৃৎ-স্বামী আমার, এই অন্ধকারের মাঝে তুমি সঙ্গে সঙ্গে চালাইয়া নিয়া আসিয়াছ, তুমি আমার আলোক-

রেখা। তুমি বলিয়াছ, 'শরৎ, আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি, আবার বলিয়াছ, 'আমি জানি তোমরা আমারই বিকাশ'। তুমি আমাদিগকে 'নিজ' বলিয়া জানিতে, নিজ শরীরের দুষ্ট ব্রণের মত অপরাধী আমাদিগকে লইয়া চলিয়াছ, অনন্ত ক্ষমা করিয়াছ, 'নিতাই', 'নিতাই' বলিয়া কাঁদিয়াছ, তাহাকেও বাছ-ছাড়া তুমি করিতে চাও নাই। তুমি বুঝিয়াছিলে, 'যোঽসৌ অস্মিন্ আত্মনঃ সর্বং বেদ সর্বং তং পরাদাৎ'। আমিও তো তোমার সঙ্গে, তোমার বিশ্বের সঙ্গে প্রথমে একাত্ম হইয়া চলিতে চাহিয়াছি। যাহাদিগের সঙ্গে একদিনের জন্য যুক্ত হইয়াছি তাহাদিগকে বুকে লইয়াই চলিয়াছি। কাহাকেও আমি ছাড়ি নাই সবাই যখন ছাড়িয়াছে। আমার জীবনে যাহার যেটা স্থান, তাহার জন্য তাহাই থাকিবে। ধরিত্রীর মত অনন্ত ক্ষমা দেও, অনন্ত প্রেম যাও। সকলকে বুকে লইয়াই চলিব। সব হারানো ধন আমি বুকে রাখিব।···আমার উপরেই সকলের সব ক্রোধ। আমি তো জীবনে কাহারও যোগাই নাই।···· যোগাল যোগাইলেই যে মানুষকে পাওয়া যায় না, তাহা কাহাকে বুঝাইব? সংসার যখন স্বীকার করিয়াছি, তখন সকলের আসিবার পথও খোলা—যে যাহার যোগাল নিয়া আসিবে, যাইবে। তাহা সামাল দেওয়া এক কঠিন ব্যাপার। এখনও ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে এ পথে চলা সম্ভব হইবে কিনা।

১৪ই এপ্রিল

ঠাকুর, তুমি বলিয়াছিলে, সংসার অতি জীবন্ত, সর্বদা জাগিয়া থাক। ইহা এত জটিল যে ইহাকে মানুষ করিবার চেষ্টা কোনও দিন কেহ করেন নাই। জ্ঞানী যোগী এক কেহই সংসার ঘাটাইতে চান নাই। যতদিন অজ্ঞানতাবশতঃ না থাকিয়া উপায় নাই, ততদিন নাকচোখমুখ বুজিয়া জ্ঞানের সাধনা, ত্যাগবৈরাগ্যের সাধনা করিতে হইবে, যাহাতে একদিন ওপারে যাওয়া সম্ভব হইবে। কিন্তু অজ্ঞান যেদিন হইতে নিত্য অনাদি অনন্ত বলিয়া স্বীকৃত হইল, সেদিন তো যেমন তেমন করিয়া ত্যাগের সাধনা উঠিয়া গেল, অজ্ঞানকে পরিপাক করিবার সাধনা সে স্থান অধিকার করিল। তাই অনন্ত কাল এই process চলিবে, জ্ঞান অজ্ঞানের মাঝখান দিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। ঠাকুর মধ্যপথে দাঁড়াইয়া। আমাকে আশ্রয় দাও। 'In practical affairs all life is a compromise, and most things reside in practically that middle region which the law (of excluded middle) attempts to abolish.' —Physics & Philosophy, P. 95.····না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে; বেদনা পাইয়াছি খুবই। কিন্তু তাহা নিয়া হড়াহুড়ি করি নাই। নানারকমে সে সরিয়া গিয়াছে এবং আমাকে সরাইয়া দিয়াছে। তাই এ বেদনা বিহ্বল করে নাই। সকলের সম্পর্কেই কি একদিন এইরূপ উদাসীন হইতে হইবে? উদাসীন হইবার সাধনা নিয়াছিলাম না। কিন্তু উদাসীন যদি কেহ করিয়া দেয়, আমি কি করিতে পারি? হইতে কতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। তবুও তো তাহাকে চাই।·····

১৫ই এপ্রিল

ঠাকুর, সংসার ও সন্ন্যাসের middle region দিয়া চলিয়াছি বলিয়া সংসারেও আঘাত হানিয়াছে, সন্ন্যাসও আঘাত হানিয়াছে। দুই দিকের অস্ত্রাঘাতে আমি জর্জরিত। তোমার শ্রীচরণ আমাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। আমি তাহা বুঝি। আমি সংসারেরও নই, সন্ন্যাসেরও নই। কেউ আমাকে চায় না। তোমার নির্দেশে সংসারে আসিয়াছি। আমি 'অভিযুক্ত' হইয়াই থাকিব। তাই সব অভিযোগ যেন তোমারই সেবার দান বলিয়া মাথায় তুলিয়া লইতে পারি। কোনও কূলের সঙ্গেই আমি জড়াইয়া পড়িব না। তুমি থাকিলে একদিন হয়তো সব আসিবে। তুমি আমার সব। গোপালদা চিরেতল পার্কে যাই। প্রাণপণে মানুষের জন্য অকপটে যতদূর পারিয়াছি করিয়াছি। সেজন্য কি তাহারা দাবী এতটুকুও কমাইল? তাহাদের দাবী পূরণ করা আমার বয়স ও শক্তির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। কর্তব্য হিসাবে কিছু করি নাই, করিয়াছি স্বেচ্ছায়, প্রাণের টানে। সেই দিক দিয়া কাহারও কিছু দাবী করিবার ছিল না। আমি যে আর পারি না। আমাকে মুক্তি দিলে আমি

আরও অনেক দিন অনেক কিছু করিতে পারিতাম। মুক্তি না দিলে কাহারও জন্য বেশী দিন কিছু করা যায় না। অথচ সংসারের মানুষ দাবী করিয়াই সব আদায় করিতে চায়। পায় না কিছু দাবী করিয়া, দুঃখই শুধু বাড়িয়া যায়।.....পাঠ হয়। সংযমনী যমুনায় ডুব দিতে হইবে মায়ার কূলে সব বসন ছাড়িয়া। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরূপ কেলিকদম্বে বিহার করেন। কদম্ব অর্থ হইতেছে প্রেম। তিনি জীবের 'লজ্জা' হরণ করেন।.....

১০ই এপ্রিল

ঠাকুর, তোমার জীবনে জীবন মিলাইয়া আমি একূল ওকূল ছাড়িয়া সংযমনী যমুনায় ভাসিয়া চলিব। আমি হইব কূলত্যাগিনী। আমার সকল লজ্জাভয়, সকল বিকল্প বসন তুমি কাড়িয়া লও। আমাকে নিরাবরণ কর, উলঙ্গ কর। আমি সহজ স্বচ্ছ জীবন লইয়া তোমার জীবনের সঙ্গে বিহার করিব। ওগো কেলিকদম্ববিহারী, তুমি আমি এই সমগ্র সত্যের দুই দিক। দুই তত্ত্ব এক, দুই প্রাণমন এক। ওগো আমার চিন্তাহরণ, আমার সকল চিন্তা দূর কর। দাবী-দাওয়ার বাহিরে আমাকে লইয়া চল, 'ন মে কর্তব্যমস্তি ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন'। কি বলিয়াই কি আমার উপর এত দাবী করিবার অধিকার কাহারও ছিল? ঠাকুর, তুমি আমার জীবনের সব-কিছু অস্বীকার কর।...৮-এ-র তেতলায় আমার হাওয়ার কথা হয়। আমি যাইব না বলি.....ঠাকুরের লেখা পাঠ হয়: 'ব্রহ্ম যেমন আদি, অনাদি ও অনন্ত, তদ্রূপ তাঁহার শক্তিও আদ্যা, অনাদ্যা ও অনন্তরূপিনী'—নিত্যধর্ম ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। 'ব্রহ্ম জড় চৈতন্য উভয়ই · ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নাই। প্রকৃতিও সেই ব্রহ্মেরই এক প্রকার বিকাশ'—নিত্যধর্ম ঐ। প্রকৃতি ব্রহ্মের বিকাশ ইহা একান্ত অদ্বৈতবাদীরা বলিতে পারেন নাই 'ব্রহ্ম অপেক্ষা ব্রহ্মশক্তি শ্রেষ্ঠও নহেন। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির মাহাত্ম্য তুল্য'—নিত্যধর্ম ঐ। 'শিবই শক্তিমান, শিবই শক্তি। কালীই শক্তিমান, কালীই শক্তি। পরমেশ্বর শিবরূপে শক্তিমান, পরমেশ্বর শিবরূপাধারূপে শক্তি। পরমেশ্বর কালীরূপে শক্তি, পরমেশ্বরী কালী কৃষ্ণরূপে শক্তিমান'—নিত্যধর্ম পত্রিকা ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। প্রত্যক্ষ ব্যতীত আর অন্য কি অভ্রান্ত প্রমাণ হইতে পারে? তোমায় শরীর তুমি দর্শন করিতেছ, তাহা যেমন তুমি ভ্রম বলিতে পার না, তুমি যে বিবিধ গুণসম্পন্ন, তাহাও তুমি অস্বীকার করিতে পার না।' —নিত্যধর্ম ঐ।.....

১১ই এপ্রিল

ওগো আমার কিছু-না অথচ সব-কিছু, এমন তোমাকে বুকে লইয়া সারা সংসারময় আমি বিচরণ করিব, যাহাতে সংসারের মধ্যে সুপ্ত এই নিঃসম্বন্ধ সম্বন্ধ-রস জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারে, 'গ্রন্থিহীন বন্ধনে' মানুষ অহৈতুক সহজ প্রীতিরসে উদ্বেলিত হইতে পারে। সম্বন্ধ-নিঃসম্বন্ধের সমন্বয়ে পরকীয় সম্বন্ধ। এখানে মানুষের সঙ্গে তাহার দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারের সম্বন্ধও যে পরকীয়। এই পরকীয় তত্ত্বই নির্গুণ তত্ত্ব, বুদ্ধের নির্বাণ তত্ত্ব, মহানির্বাণ-তন্ত্র। তাই তুমি বাক-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-অগোচর, অথচ সব কিছুরই গোচর; নইলে কে তোমায় পিতা-মাতা-পুত্র-সখা বলিয়া ব্যবহার করিতে পারিত? তুমি কাহারও কিছু না বলিয়া সকলের সব হইতে পারিয়াছ। তোমার জয় হউক। রেণু ১১টায় বাহির হইয়া...ফেরে ৪টার মধ্যে। শতবার্ষিকীর 'প্রাণের পথ' প্রবন্ধ কিছু লিখি। Physics ও Philosophy বইটি পড়ি।... আমার উপর মানুষের দাবীর আর অন্ত নাই।...সন্ন্যাসী হইয়াও সংসারের মূল্য স্বীকার করিবার জন্য সংসারে আছি বলিয়া কি এত দাবী করিবার অধিকার কাহারও আছে? যতদূর পারিয়াছি সন্ন্যাস রক্ষা করিয়া সংসারের দাবী-দাওয়া, বাধ্য-বাধকতা মানিয়া চলিয়াছি। কত কালে যে সংসারের সাধ মিটিবে, বুঝিতেছি না। আরও বেশীদূর গেলে সন্ন্যাসই যে বিসর্জন দিতে হয়। সে তো আত্মহত্যারই নামান্তর। 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল' কামাড় রাববার সন্ধ্যা ৬টায় সাহু লার রোডে এক সভায় যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করে। রেণুকে দিয়া পত্র পাঠাইয়া দেই—আমার শরীর ভাল যাইতেছে না বলিয়া অত দূর যাইবার সাহস পাই না। ৮টার পর পাঠ হয়। প্রেমের কথা, আত্মপ্রেমের কথা খুব [illegible]

আত্মপ্রেমের মধ্যে রূপ-যৌবন-গুণের স্থান যে বেশী নয়, তাহা বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

১৮ই এপ্রিল

ঠাকুর, তোমাকে 'আমি' বলিয়া ডাকিতে না পারিলে, জীবনে উপলব্ধি করিতে না পারিলে, সকল দেহ-মন-প্রাণ দিয়া 'এক' করিতে না পারিলে আমার কি কোনও অর্থ হয়? কেমন করিয়া পৃথক থাকিয়া আমি বাঁচিব? তুমি আমার 'আমি' হও। আমার 'আমি' তোমার 'আমি'-র ছায়া রূপে তোমাকে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠা করিয়া চলুক। তুমিই আমার আত্মা, পরমাত্মা, ভগবান, সখা, সাথী, বন্ধু, শরণ, সুহৃৎ ও স্বামী। আমি তোমাকে জানিয়া আত্মজ্ঞানী হইব, তোমাতে প্রেম করিয়া আত্ম-প্রেমিক হইব, তোমার কর্ম করিয়া আত্মকর্মী হইব। আত্মা যেমন নিত্য, আত্মজ্ঞানও নিত্য, আত্মকর্মও নিত্য। আত্মার সঙ্গে জ্ঞান প্রেম ও কর্মের কোনও বিরোধ নাই। তুমি আমার 'কিছু-না' হইয়াই 'সব-কিছু'। আমি ও গোপা টালীগঞ্জের বাজারের চতুর্দিকটা ঘুরিয়া আসি।...ঘাটের পর পাঠ আরম্ভ হয়। 'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ নাভাবো বিদ্যতে সতঃ' শ্লোকটী ব্যাখ্যাত হয়। আচার্য শঙ্করের মতে আত্মাই সৎ, অনাত্মাই অসৎ; চার্বাকের মতে আত্মাই অসৎ, অনাত্মাই সৎ; বৌদ্ধ মতেও আত্মা অসৎ, অনাত্মার ক্ষণই সৎ। একই জগতে দুইটী পরস্পরবিরুদ্ধ ব্যাখ্যাযুক্ত সৎ ও অসৎ রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ জগন্নাথ বলিয়া কোন্ স্থানে দাঁড়াইলে দুই-ই তুল্যভাবে সত্য হইতে পারে, তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। একদিকে বেদান্তের 'সৎ', অপর দিকে চার্বাকের 'ভুক্ত, রাজন্'—দুই-ই শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে সমন্বিত। তাই তিনি বলিলেন, 'সদসচ্চাহম্ অর্জুন'। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'-র স্থলে ও 'Eat, drink, be merry'-র স্থলেও তিনি দেখিয়াছেন, তাই তিনি দৃষ্টান্ত। বর্তমান যুগে শ্রীনিতাগোপালই এই দৃষ্টান্ত—একধারে শঙ্কর ও চার্বাক। পাঠের শেষে 'একুলে ওকুলে' পদটুকু গান করি বেদনা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে। সত্যই তো আমার একুল ওকুল ত্যাগ হইয়াছে। কোনও কূলে আমার উঠিবার যো নাই। আমাকে ভাসিয়া চলিতেই হইবে। জীবন-নদীর এক পারে অবিদ্যা মায়া, অপর পারে বিদ্যা মায়া। আমি বিদ্যা-অবিদ্যা দুই-ই ত্যাগ করিয়া মুক্ত জীবন-প্রবাহে গা ভাসাইয়া চলিয়া যাইব। চলিয়া আসিয়াছি, আর কতদূর বাকী?... পাঠে কেহ আসে না। দুকূলত্যাগিনীর দলে কে আসিবে? সকলের কূল আছে। আমারই শুধু কূল নাই, কূল নাই

১৯শে এপ্রিল

গৌরসুন্দর, তোমরা দুই ভাই 'ভূবি-বৃন্দাবন' প্রতিষ্ঠার লাগি আসিয়াছিলে জাতি-কুল-শীলের দম্ভ ভাসাইয়া দিয়া। তাহাকে কার্যকরী করিবার জন্য আবার তুমি আসিলে শ্রীনিতাগোপাল রূপে। শ্রীনিতাগোপাল, তোমার 'স্ব' তত্ত্ব' আমাকে প্রদান কর—'যথৈবৈষ বৃণুতে তেনৈষ লভ্যঃ তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্'। তুমি আমি এক হও হইব। তোমার জীবন-দর্শন কি মুছিয়া যাইবে? ভাবিতেও যে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। তোমার স্নেহে দেহবান হইয়া আমাকে ঝড়ের মত ছুটিতে দাও। সমাজের বুকে আবার আগের মত ঝাঁপাইয়া পড়িবার শক্তি দাও।...ওরা বৌ-মানু তাহার বাসায় যাইবে। উষাদিদীও যাইবে ও থাকিবে। কতদিন থাকিবে জানি না। বেশ বেদনা বোধ হইতেছিল। কোনও দিন তো কাছ ছাড়া করি নাই। এখন এই বয়সে যখন কাছে থাকাই উচিত ছিল, দূরে থাকিবে। সবই আমার বুঝি সহিতে হইবে। আমার কাছে থাকিয়া কেহ সুখও বুঝি পায় না। আমার সম্বন্ধে যে যা অভিযোগ করে সবই এক হিসাবে সত্য। মিথ্যা তাহারা বলে না। 'স্বকীয়' হইয়া থাকিতে পারিলে দলও হইত, লোক আপনও মনে করিত। আমি কারও নই, অথচ সকলের। দল আমার হইবে না। আমি কাহাকেও বাঁধিয়া রাখিয়া অপমান করিব না। আমার দুয়ার খোলা, আসিতেও খোলা, যাইতেও খোলা। মানুষ সহজ জীবন লইয়া আমার কাছে থাকিবে, ইহাই আমি চাই। আইনের বাঁধনে বাঁধিয়া আমি কাহাকেও রাখিব না। দল যাহারা করে, তাহারা প্রবেশ করিবার পথ খোলা রাখে। কিন্তু বাহির হইবার কালে ১৪৪ ধারার প্রয়োগ করে। 'গুরু' না

মানিলে নরকবাস। মানিতেই যদি না পারে, জোরজবরদস্তি মানাইবার কি কোন অর্থ হয়? আমি তাহা পারিব না। স্বাধীন মত আসিবে, স্বাধীন মত থাকিবে, স্বাধীন মত চলিয়া যাইবে। ইহাতে যদি কেহ থাকে, সে-ই আমার। বিধি-নিষেধ কতগুলি দাসদাসী লইয়া আমার চলিবে না। পাঠ হয়।...সুধীর ৫৲ টাকা আমার জন্য পাঠাইয়াছে সাঁওতালপুর হইতে।

২০শে এপ্রিল

বেদমূর্তি নিত্যগোপাল আমার, বিশ্বের সকলের সব বেদনা মথন করিয়া সৃষ্টি করিলে তুমি নূতন বেদ, তাহা লইয়া তুমি বেদনাক্রান্ত হৃদয়ে দাঁড়াইয়া আছ বিশ্বের সামনে। 'ঘৃতবান্ অসি বেদম্'। কেহ তোমার বেদ নিল না, বুঝিল না। আমার শক্তি যাও তোমার বেদ গায়ে মাখিয়া তোমার বেদ বুকে লইয়া বিশ্বময় ইহার ব্যাখ্যা ছড়াইয়া দিব। 'বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্'—তোমার চরিত্র আমাকে দেও। তোমার আচরণ তোমার চরণ অনুসরণ করিয়া আমি চলিব। অতীত যুগের 'চরিত্র' তো নূতন বিশ্বে চলিবে না। ব্রহ্ম, তোমার চর্য্যা আমার চর্য্যা হউক। আমি নূতন যুগের 'ব্রহ্মচারী' হইব। মিথ্যাকে পরিপাক করিয়া যে সত্য, তাহাই তো বাস্তব সত্য। অব্রহ্মকে পরিপাক করিয়া যে ব্রহ্ম, তিনিই তো সত্য ব্রহ্ম। 'তাঁহার চর্য্যাই' ব্রহ্মচর্য্য। মায়া ব্রহ্ম হইতে দ্বিতীয় নয়, মায়া-ব্রহ্ম অদ্বিতীয়। মায়া ব্রহ্মের negative aspect; দুইয়ে এক অদ্বৈত। মায়া ব্রহ্ম হইতে যদি পৃথক, মায়াবশে যদি ব্রহ্ম বিকারী হন, তবে তো মায়াতেই ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিতে হয়। মায়া-ব্রহ্ম এক বলিয়া কেহ কাহারও অধীনও নন, কেহ কাহা হইতে স্বাধীনও নন।.....উপাধিদীরও শেষে আমাকে ছাড়িতে হইল। আমার সঙ্গে থাকিবার বুঝি কেহ নাই। আমি এমনই। 'আসক্তি' মানুষের আছে। আমি 'মাত্রার' কথাই বলি। আসক্তি ত্যাগের কথা বলি না। আসক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে সকলেই দুঃখ পায়। আজকের পাঠে ঠাকুর দুই রকমের কথা বলিয়াছেন—'জীবের মমতা। শিবের মমতা'। শিবের মমতার কথাই আমি বলি। যে মমতা অগ্রগমনের পথে ভবিষ্যতের পথে বাধা সৃষ্টি না করে, সমগ্র জীবনের পথে কণ্টকের সৃষ্টি না করিতে পারে, তাহাই বলি।

২১শে এপ্রিল

পথের ঠাকুর আমার, পথের মাঝেই তোমায় পাইয়াছি। পথই তো আমার স্থান। আমার সঙ্গে যাহারা ছিল, তাহারা আর আমার সঙ্গে পথ চলিতে পারিল না। আজ যাহাদের নিয়া আমার দাঁড়াইয়াছি, তাহাদের কাছেই নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছি, দেখি তোমার কি ইচ্ছা। পথের দর্শন পাইয়াছি, বুকে লইয়া চলিব। আমাকে বল দেও, বুদ্ধি দেও, পথ ছাড়িয়া যেন পথের এ-পারে ও পারে না উঠি। পথ ধরিয়া চলিলেই আমি বাঁচিব। ওগো পথ, প্রাণের পথ, পথের ঠাকুর আমার, আমি তোমার, তুমি আমার, তুমি আমি আমি তুমি।.....গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি না করিলে কি করিয়া চলিবে?.....সন্ধ্যার পরই সন্তোষকুমার নন্দী (প্রেস সিডিকেট) আসেন।.....মিনুর মন খারাপ হওয়ার জন্য। সেবকের যে সংসারে মন ভাল না থাকিলে চলে না, তাহা আজ প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিয়াছেন, পরম প্রেমযোগের মধ্যে তপস্যা বৈরাগ্য সন্ন্যাস লয়যোগ সবই আছে। শ্রীরাধা তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। সেবা যাহার জীবনের ব্রত, তাহার শোকাচ্ছন্ন হইবার, শোকার্ত্ত হইবার অবসর কই? তাহা হইলে তো সেবার ব্যাঘাতই হয়। সেবার মধ্যে কর্ম-জ্ঞান-যোগ ও ভক্তি সব সমন্বিত হইয়াছে। অথচ তাহার জন্য কোন উৎকট কিছু করিবার কিছু প্রয়োজন হয় না। সেবার মধ্যে তপস্যা প্রভৃতি সবই সহজ হইয়া থাকে। পাঠ হয়।.....থাকিবার আমার কি সুখ আছে? রাধারাণীর আসন রচনা করিবার সঙ্কল্প লইয়া বাহির হইয়াছিলাম, সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিল না। প্রথম হইতেই বুঝাইয়া কোনও কাজ করাইতে গেলে বুঝাইয়া আর কূল পাওয়া যায় না। আগে নির্দেশ দিয়া করাইয়া লইতে হয়, পরে সাধনার সঙ্গে সঙ্গে বিচার করাইলে ভাল হয়। শ্রদ্ধা সমগ্রকে গ্রহণ করে, বিচার তাহাকে টুকরা টুকরা করে। বিচার-

যায়। শেষ রক্ষা হয় না, যদি না শ্রদ্ধা তাহার সঙ্গে যুক্ত থাকে।

২২শে এপ্রিল

শ্রীরাধারাণী আমার, অপরা প্রকৃতির সর্বক্ষেত্র হইতে ধ্বনিয়া উঠিতেছে তোমার শ্রীরাধা নাম। বেদনা-মথন-উদ্ভূত তোমার ঐ নাম। অপরা প্রকৃতি কাঁদিয়া কাঁদিয়া পরা প্রকৃতিতে রূপান্বিত হইতে চলিতেছে। আমার অহঙ্কার পর হউক, মন-বুদ্ধি পরা হউক, দেহ-প্রাণ পর হউক, আমার অজ্ঞান পরম অজ্ঞান হউক, সুষুপ্তি পরা হউক। আমি পথের মাঝে বসিয়া আছি, দিন গণিতেছি কবে তুমি সজ্ঞরূপে আসিবে। তোমার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিব ধূলির মাঝে। কে সঙ্গে থাকিবে বা থাকিবে না জানি না। তুমি আছ, তুমি থাকিও। তোমাকে পথেই কুড়াইয়া পাইয়াছি। আমার গোপ-রাজেশ্বর নিতাগোপাল, ভিখারীর ঠাকুর আমার, তুমি আছ তাই আমি আজিও বাঁচিয়া আছি।.....ক্ষিতি-মোহন সেনের বলাকা কাব্য পরিক্রমা বেণু নিয়া আসে। সন্ধ্যার পর উহার ভূমিকা পাঠ হয়। 'গতি' সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা হইয়াছে। ঠাকুরের লেখা পাঠ হয়।...

২৩শে এপ্রিল

ঠাকুর আমার, সারাজীবনের সঙ্গী আমার, আমার সকল সমস্যার সমাধান তুমি। তোমার নির্দেশে সংসারে আসিয়াছি, সকল সম্পর্কের মাঝে দাঁড়াইয়াছি, কিন্তু সব মানিয়া লইয়া সকলের উর্দ্ধে উঠার কৌশল শুধু তুমিই জান। সগুণ-নির্গুণ আত্মা-অনাত্মার সমান মূল্য দিয়া জীবন চালাইবার শক্তি তোমারই আছে। আমাকে সেই শক্তি দেও। তুমিই একবার লিখিয়াছ, 'আত্মা অপুরুষ অপ্রকৃতি', আবার পরক্ষণেই লিখিতেছ, 'আত্মা পুরুষ প্রকৃতি'। অপুরুষ-পুরুষ, প্রকৃতি-অপ্রকৃতি আত্মার আস্বাদন করিবার যোগ্যতা তোমার পাদপদ্মেই শুধু নিহিত। তোমার রাতুল পাদপদ্মের দিকে চাহিয়া চলিব। তোমাকে যেন বিশ্বাস করি। তোমার উপর ভর করি কাহারও উপরে, নিজের উপরেও, যেন নির্ভর না করি। ...বৈশাখ মাসে দেওয়া হয়—নবনারায়ণ আশ্রমস্থ উজ্জল-ভারত কার্যালয়ে প্রতি রবিবার গীতা পাঠ হয় যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের 'ভূম্ন্ রাজ্যম্' এই বাণী বেদান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া আলোচনা হয়।

২৪শে এপ্রিল

শ্রীগৌরসুন্দর আমার, তুমি আসিয়াছ 'ভূমি বৃন্দাবন' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই বিশ্বকে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিতে। এতদিন ছিল নাম রূপ মায়া, অনাম অরূপই সত্য। তুমি বলিলে কৃষ্ণের নাম সত্য, কৃষ্ণের রূপ সত্য। একবার নামরূপকে কোনও রকমে সত্য প্রমাণ করিতে পারিলে বিশ্বের সকল নামরূপকে চিন্ময় নামরূপে গড়িয়া তুলিবার সাধনায় লাগিয়া যাইতে হইবে। এই বিশ্বকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করিতে হইবে—এই সাধনা গ্রহণ না করিলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ ছাড়া গতি নাই। প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তির সমন্বয়ে গড়িয়া তুলিতে হইবে স্বীকার করিলেই তবে প্রবৃত্তিকে স্বীকার করা চলে। ঠাকুর, আমার জীবনে তুমি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি এক করিয়া দেও। তুমি গৌরসুন্দরের আরব্ধ কার্যকে সমাপ্তির দিকে নিয়া যাইবার জন্য আবার আসিয়াছ, আমাকে সকল দেহপ্রাণ দিয়া ধারণ করিয়াছ। তুমি আদর করিয়াছ—ইহাই আমার দাবী।...

১৫শে এপ্রিল

ঠাকুর, এই ঝড়ের মাঝ দিয়া পথ চলায় তুমি সঙ্গে আছ, তাই আজিও আমি ছুটিয়া চলিবার জন্য ব্যাকুল। মানুষ-হারানোর যে দুঃখ আমার বুকে আছে, তাহাতে যদি আমি বিহ্বল হইতাম, আমি এমন করিয়াই কাঁদিতে পারিতাম, এমন করিয়াই মেজাজী হইতে পারিতাম যে আমার আর আগাইবার সামর্থ্য তো দূরের, কল্পনা করিবার শক্তিও থাকিত না। আবেষ্টনের উপর শুধু চটিয়া থাকিতাম, pessimist হইতাম, misanthrop হইতাম

ক্রমশ

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

অবধূত ভাষ্য সমেত

॥ শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

ইতি ইমাঃ [উক্ত পঞ্চধা বিভক্ত এই] মহাসংহিতাঃ মহাসংহিতা বলা হইল] যঃ [যিনি] এবং [এই প্রকারে] এতাঃ মহাসংহিতাঃ [মহাসংহিতাসমূহ] ব্যাখ্যাতা [ব্যাখ্যাত হওয়ার ফলে] বেদ [জীবন দিয়া জানিলেন] (তিনি) সম্বীয়তে [সম্মিলিত হন্] প্রজয়া [প্রজার সহিত] পশুভিঃ [পশুবর্গের সহিত] ব্রহ্মবর্চসেন [ব্রহ্মতেজের দ্বারা] অন্নাদ্যেন [ভক্ষনীয় অন্নের সহিত] সবর্গেণ লোকেন [স্বর্গলোকের সহিত ; প্রজা-পশু-অন্ন-স্বর্গলোক কিছুই ফল শ্রুতি নহে। একটী পরিপূর্ণ বাস্তব জীবনে এই গুলির সহজ লভ্যতা না থাকিলে সে জীবন যাপনের অযোগ্য। ব্রহ্ম জীবন তো দূরের। যিনি ভগবান তিনি তো নিত্যই ভগযুক্ত ; ভগ অর্থে ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-যশ-শ্রী-জ্ঞান-বৈরাগ্য। ঐশ্বর্য্যের অন্তর্গত ঐ প্রজা, পশু, অন্ন ও স্বর্গলোক। প্রজা-পশু-অন্ন-স্বর্গলোকহীন ব্রহ্মবিদ্যা অপূর্ণ, উহা উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য নহে।

উক্ত পঞ্চধা বিভক্ত মহাসংহিতা বলা হইয়াছে। যে কেহ এই সকল ব্যাখ্যাত মহাসংহিতা বিষয় এই প্রকার জানেন, তিনি সন্তান, পশু, ব্রহ্মতেজ, ভজনীয় অন্ন ও স্বর্গলোকের সহিত সম্মিলিত হন্। ১৩৩

চতুর্থ অনুবাক

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোঽধামৃতাৎ সম্বভূব। স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেব ধারণো ভূয়াসম্। শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধয়া পিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায়॥ ১৪।১

লৌকিক জীবন ধারণের জন্য মেধা, উৎকৃষ্ট শরীর, শ্রী, যশ প্রভৃতি যাহা যাহা সাধারণ লোকে কামনা করে, আজ তাহাই পুরুষোত্তম ভাবে ভাবিত করিয়া ঋষি সহজ-সরল ভাবে ব্রহ্ম-ভগবানের কাছে চাহিতেছেন—সবই যে ব্রহ্ম-বিদ্যার অংশ ব্রহ্মবিদ্যাই, ব্রহ্মবিদ্যার আস্বাদনই—ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন। যঃ [যিনি] ছন্দসাং [বেদসমূহের] ঋষভঃ [শ্রেষ্ঠ, 'স এষ বসানাং বসুমঃ'—ছান্দোগ্য] বিশ্বরূপঃ [সর্বরূপ, সমস্ত বর্ণে বর্ণে, স্বরে স্বরে, মাত্রায় মাত্রায় সব বর্ণ-সংহননে, শব্দ সংহননে বাদ সঙ্গতে অবস্থিত] ছন্দোভ্যঃ অমৃতাৎ [অমৃত স্বরূপ বেদসমূহ হইতে] অধিসম্বভূব সারবরূপে প্রকট হইয়া ছিলেন] সঃ [সেই ওঙ্কার স্বরূপ ও ওঙ্কার রূপ] ইন্দ্রঃ [পর দেবতা] মা [আমাকে] মেধয়া [স্বশক্তি মেধাদ্বারা] স্পৃণোতু [তৃপ্ত করুন, বলশালী করুন] অমৃতস্য [অমৃত ব্রহ্ম-পুরুষোত্তম জ্ঞান বিজ্ঞানের] দেব [হে দেব] ধারণঃ [ধারয়িতা, আধার, নিধান] ভূয়াসম্ [যেন হইতে পারি] শরীরং মে [আমার শরীর] বিচর্ষণম্ [বিচক্ষণ ; পুরুষোত্তম ধারণের, যোগ্য, ক্ষমতা] (হউক) জিহ্বা মে [আমার জিহ্বা] মধুমত্তমা [অতিশয় মধুরবিণী] (যেন হয়) কর্ণাভ্যাং [উভয় কর্ণে] ভূরি [বহু ; পুরুষোত্তমের, তাঁহার বিশ্বের অনন্ত ক্রিয়ালীলা কাহিনী] বিশ্রবম্ [যেন শুনিতে পাই] ব্রহ্মণঃ [ব্রহ্মের] কোশঃ অসি [কোশ হও, কোশ—আবরণ, ভাণ্ডার, কৌটা, cell ; ব্রহ্মের ভাণ্ডারী তুমি ; তুমি জীবন কোশের আবরণে অব্যয় বীজকে সর্বদা পুষ্ট করিয়া, অঙ্কুর ফুটাইয়া সর্বলোকের গোচরীভূত করিতেছ। জীবকোষে যেমন আবরণ ও আবৃতের ভেদ

ভেদ নাই, আবরণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জীবন, ওঙ্কার ও পরম পুরুষও তেমনি অভিন্ন] মেধয়া [লৌকিক মেধাদ্বারা] নিহিতঃ [তুমি আবৃত] শ্রুতং মে [আমার শ্রবণলব্ধ দিব্যজ্ঞান] গোপায় [রক্ষা কর]।

যে ওঙ্কার সর্ব্ববেদের শ্রেষ্ঠ, সমগ্র বিশ্ব যাহার রূপ, অমৃত বেদ হইতে যিনি প্রকট হইয়াছেন, সেই ওঙ্কারময় ইন্দ্র ভাগবতী মেধাদ্বারা আমাকে তৃপ্ত করুন। হে দেব, আমি যেন অমৃত পুরুষোত্তম-জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার হই; আমার শরীর যেন যোগ্য হয়, আমার জিহ্বা যেন অতিশয় মধুরভাষিণী হয়, কর্ণদ্বয়ে যেন বহু (পুরুষোত্তম লীলারস কাহিনী) শুনিতে থাকি। তুমি ব্রহ্মের কোষ স্বরূপ ভাণ্ডার; তুমি লৌকিক প্রজ্ঞাদ্বারা আচ্ছাদিত আছ। তুমি আমার শ্রবণলব্ধ জ্ঞান রক্ষা কর। ১।৪।১

আবহন্তী বিতন্বানা কুর্ব্বাণাঽচীরমাত্মনঃ। বাসাংসি মম গাবশ্চ অন্নপানে চ সর্বদা। ততো মে শ্রিয়মাবহ। লোমশাং পশুভিঃ সহ স্বাহা। আ মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বি মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্র মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা॥ ১।৪।২

(হোম ছাড়া কোন-কিছুই লাভ হয় না; হোম-মন্ত্র বলিতেছেন) আবহন্তী [আনয়নকারিণী] বিতন্বানা [বিস্তারকারিণী] কুর্ব্বাণাঃ [সম্পাদনকারিণী] অচীরম্ [অচিরম্—অবিলম্বে, চিরকাল] আত্মনঃ [শ্রীর আত্মভূত] মম [আমার সম্বন্ধে]। বাসাংসি [বহু বস্ত্র] গাবঃ চ [এবং বহু গো] অন্নপানে চ [এবং অন্ন ও পানীয় বস্তু] সর্ব্বদা [চিরকাল] ততঃ [দিব্য মেধা প্রদানের পর, কেন না ঐরূপ প্রজ্ঞালাভ না হইলে এই সব লাভ লোপ-সানেরই হেতু হইবে, পরম-পুরুষ হইতে দূরে সরাইয়া দিবে] মে [আমার জন্য] লোমশাং [লোমবিশিষ্ট পশু সমন্বিতা] শ্রিয়ং [শ্রীকে] আবহ [আনয়ন কর] স্বাহা [স্বাহা; ইহা যে হোমেরই মন্ত্র, তাহা বুঝানোর জন্য 'স্বাহা' শব্দ প্রযুক্ত হইতেছে]। ব্রহ্মচারিণঃ [ব্রহ্মচারিগণ] মা [আমার নিকট] আয়ন্তু [চতুর্দ্দিক হইতে অধ্যয়নের জন্য আগমন করুক] স্বাহা, ব্রহ্মচারিণঃ মা বি-আয়ন্তু [বিবিধ রূপে আসুক বা প্রত্যাবর্ত্তন করুক] স্বাহা, মা [আমাকে] প্র আয়ন্তু [প্রকৃষ্টরূপে বহুসংখ্যক ও যথাশাস্ত্র আগমন করুক] ব্রহ্মচারিণঃ [ব্রহ্মচারীসমূহ] স্বাহা। দমায়ন্তু [শারীরিক সংযমাদি শিক্ষা করুক] ব্রহ্মচারিণঃ। শমায়ন্তু [মানসিক সংযমাদি শিক্ষা করুক] স্বাহা। (যাহারা নিষ্কাম প্রার্থনার ধ্বজা উড়ান, তাঁহারা দেখুন প্রাণের কি সহজ সরল আবেদন ভগবৎ সমীপে ঋষিগণ প্রেরণ করিতেছেন; সিদ্ধি যখন তিনি, সাধনাও যখন তিনি, তখন সাধনার অনুকূল-প্রতিকূল সবই তো তাঁহার চরণে হোম করার সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন করা উচিত।)

হে ওঙ্কার, প্রজ্ঞাসম্পাদনের পর শ্রীর আত্মভূত আপনার জন আমার জন্য লোমযুক্ত এবং অন্যান্য পশুগণে সমাবৃত সেই শ্রীকে আনয়ন কর। যিনি আমার জন্য সর্ব্বদা বস্ত্র সমূহ, বহু গো, অন্ন পানীয় আহরণ করিবেন; ঐ সমস্ত বর্দ্ধিত করিবেন এবং চিরকাল ঐ সকলের সুব্যবস্থা করিবেন; স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ সর্ব্বদিক হইতে আমার নিকট আগমন করুক, ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট বিবিধ রূপে আগমন করুক। স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ যথা শাস্ত্র আমার নিকট আগমন করুক স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ দমযুক্ত হউক স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ শমযুক্ত হউক স্বাহা। ১।৪।২

যশো জনেঽসানি স্বাহা। শ্রেয়ান্ বস্যসোঽসানি স্বাহা। তং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। স মা ভগ প্রবি স্বাহা। তস্মিন্ সহস্রশাখে। নি ভগাহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা যথাপ প্রবতা যন্তি। যথা মাসা অহর্জরম্। এবং মা ব্রহ্মচারিণঃ ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা। প্রতিবেশোঽসি প্র মা ভাহি প্র মা পদ্যস্ব। ১।৪।৩

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থোঽনুবাকঃ।

যশঃ [যশ] জনে [জনসমাজে] অসানি [যেন হয় স্বাহা [আমার জীবন আহুতি হউক] শ্রেয়ান্ [শ্রেষ্ঠ বস্যসঃ [বসীয়সঃ—ধনীদের সমাজে] অসানি [যেন হই স্বাহা [আত্মসমর্পণ হউক] তং ত্বা [উক্ত কোশস্থ তোমাতে] ভগ [হে ভজনীয় গুণ ভগবান] প্রবিশানি

[যেন প্রবিষ্ট হই] স্বাহা [পুড়িয়া ছাই হইয়া নিবিয়া যাই]। স [উক্তরূপ তুমি] মা [আমাতে] ভগ [হে ভগ, ভগবান্] প্রবিশ [প্রবিষ্ট হও ; দুইয়েরই পরস্পর প্রবেশ ঘটিবে সর্বাহুতিদ্বারা কামনা করেন ; ভগবানে একতরফা জীবের প্রবেশ শ্রুতি-প্রতিপাদ্য নয়] তস্মিন্ [সেই তোমাতে] সহস্রশাখে [বহুশাখাযুক্ত নদীরূপী] ভগ [হে ভজনীয়] ত্বয়ি [তোমাতে] নি মৃজে [নিঃশেষে আমার সব বিচ্ছিন্ন মলিন সত্তা-চৈতন্য-আনন্দ ধুইয়া পাখালিয়া পরিষ্কার করিতেছি] স্বাহা [তোমাতে সব হারাইয়া যাউক] যথা [যেমন] আপঃ [জলরাশি] প্রবতাঃ [ক্রমনিম্নদেশ বহিয়া] যন্তি [ধাবিত হয়] যথা [যেমন] মাসাঃ [মাসসমূহ] অহর্জরম্ [সম্বৎসর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়] এবং [তদ্রূপ] ব্রহ্মচারিণঃ [ব্রহ্মচারী সমূহ] ধাতঃ [হে বিধাতা] মাম্ [আমার কাছে] আয়ন্তু [আসুক] সর্বতঃ [সকল দিক হইতে] স্বাহা [তোমাতে আমার সব পুড়িয়া যাউক] প্রতিবেশঃ অসি [তুমি সকলের বিশ্রামস্থান] মা [আমার কাছে] প্রথাহি [প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত হও] মা [আমাকে] প্রপদ্যস্ব [পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হও, প্রাপ্ত হও, "তুমি আমিময় হও" ইহাই শ্রুতির "স্বাহা" মন্ত্রের পরম প্রতিপাদ্য।

জনসমাজে আমি যেন যশপ্রাপ্ত হই। স্বাহা। ধনী সমাজে আমি যেন শ্রেষ্ঠ হই। স্বাহা। হে ভগবন্, কোশস্বরূপ তোমাতে আমি যেন প্রবেশ করি। হে ভগবন্, উক্তরূপ তুমিও প্রবেশ কর। স্বাহা। সেই বহুভেদ বিশিষ্ট তোমাতে হে ভগবন্ সব দুইয়া পাখালিয়া লইতেছি, স্বাহা। হে বিধাতা, জলরাশি যেমন ক্রমনিম্ন দেশ বহিয়া ধাবিত হয়, মাসসমূহ যেমন সম্বৎসর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মচারিগণও সর্বদিক হইতে আমার কাছে আসুক, স্বাহা। তুমি সকলের বিশ্রামস্থল, তুমি শরণাগত আমার কাছে প্রতিভাত হও, প্রপন্ন হও।

পঞ্চম অনুবাক্

ভূর্ভুবঃ সুবরিতি বা এতাস্তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তাসাম্ হ স্মৈতাম্ চতুর্থীম্। মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তে। মহ ইতি। তদ্ ব্রহ্ম। স আত্মা। অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ। ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ। ভুব ইত্যন্তরিক্ষম্। সুবরিত্যসৌ লোকঃ। ১।৫।১

ভূঃ [সপ্রণব ভূর্লোক] ভুবঃ [সপ্রণব অন্তরিক্ষলোক] সুবঃ [সপ্রণব স্বর্গলোক] এতাঃ বৈ তিস্রঃ [এই তিনটী প্রসিদ্ধ] ব্যাহৃতয়ঃ [বি-আ-হৃতি—যাহা বিবিধ অভীষ্ট বস্তু সম্যকভাবে আহরণ করে এবং বিশিষ্টরূপে সব অনিষ্ট হরণ করে। ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ, মহ, জন, তপঃ ও সত্য—সপ্তলোকের বীজরূপী এই কয়টী মন্ত্রকে ব্যাহৃতি বলে। ইহাদের মধ্যে ভূ, ভুবঃ, স্বঃ মহাব্যাহৃতি] তাসাম্ উ হ স্ম [উক্ত ব্যাহৃতি ত্রয়ের আবার] চতুর্থীম্ [চতুর্থ] মহ ইতি [মহঃ নামক] এতাম্ [এই চতুর্থ মহঃ ব্যাহৃতিকে] মাহাচমস্যঃ [মহাচমসের পুত্র] প্রবেদয়তে [জানেন ; কাহার কাছ হইতে কোন্ তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, শ্রুতি কোনও সময়ই তাহার উল্লেখ করিতে ত্রুটি করেন না, কাহারও নিকট হইতে পাওয়া কোনও কিছুকে যেমালুম হজম করিয়া 'নিজের' বলিয়া চালাইবার মত দুর্বুদ্ধির স্থান উপনিষদে নাই] তৎ [উক্ত মহঃই] ব্রহ্ম [বৃহৎ, মহৎ, অসীম, ভূ-ভুবঃ-স্ব-এর কাছে মহঃই ব্রহ্ম। মহঃ—এই ব্যাহৃতিতে হিরণ্যগর্ভ-দৃষ্টি স্থাপন করিবেন, কেননা উভয়ের সাদৃশ্য রহিয়াছে। ব্যাহৃতিটী মহৎ, ব্রহ্মও মহৎ-পদবাচ্য। আত্মা-শব্দের ধাতুগত যৌগিক অর্থ ব্যাপক এবং আত্মাধারাই দেহ ও অঙ্গসমূহ মহীয়ান্ হয়, বৃদ্ধি পায়। মহঃ—ব্যাহৃতিও পূর্বোক্ত ব্যাহৃতিত্রয়কে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সুতরাং মহঃ ব্যাহৃতি শরীরে ব্রহ্মের আত্মা বা মধ্যভাগ] সঃ [মহঃই] আত্মা [ব্যাপক, দেহমধ্যভাগ] (মহোব্যাহৃতিকে হিরণ্যগর্ভের মধ্যভাগ বোধে গ্রহণ করিতে হইবে] অঙ্গানি [বিভিন্ন অবয়ব] অন্যাঃ দেবতাঃ [অপর দেবগণ] ভূঃ ইতি বৈ অয়ং লোকঃ [এই পৃথিবী লোকই ভূঃ] ভুবঃ ইতি অন্তরিক্ষং [অন্তরিক্ষলোকই ভুব] সুবঃ অসৌ লোকঃ [ঐ দ্যুলোকই স্বর্]।

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—এই তিনটি সুপ্রসিদ্ধ ব্যাহৃতি।

ইহাদের মধ্যে আবার মহঃ নামক চতুর্থ ব্যাহৃতিটিকে ঋষি মাহাচামস্ত প্রবেদন লাভ করিয়া ছিলেন। উক্ত মহঃ ব্রহ্ম এবং উহাই আত্মা। অপর দেবগণ উক্ত মহাব্যাহৃতির অবয়ব। এই পৃথিবী লোকই ভূঃ, অন্তরিক্ষলোক ভুবঃ [ঐ দ্যুলোক স্বর্]। ১।৫।১

মহ ইত্যাদিত্যঃ। আদিত্যেন বাব সর্বে লোকা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা অগ্নিঃ। ভুব ইতি বায়ুঃ। সুবরিত্যাদিত্যঃ। মহ ইতি চন্দ্রমাঃ। চন্দ্রমসা বাব সর্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা ঋচঃ। ভুব ইতি সামানি। সুবরিতি যজূংষি। ২

মহঃ ইতি [মহঃ এই মহাব্যাহৃতি] আদিত্যঃ [সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী জগৎপ্রাণ আদিত্য, পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত ইহার সম্বন্ধ] আদিত্যেন বাব [আদিত্যদ্বারাই] সর্ব্বে লোকাঃ [সকল লোক] মহীয়ন্তে [সর্ব্বব্যবহারক্ষম হয়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়] ভূঃ ইতি [ভূঃ-ব্যাহৃতি] অগ্নিঃ বৈ [অগ্নিই] ভুবঃ ইতি বায়ুঃ [বায়ুই ভুবঃ] সুবরঃ ইতি আদিত্যঃ [আদিত্যই সুবর্]। মহঃ ইতি চন্দ্রমাঃ [চন্দ্রমাই মহঃ] চন্দ্রমসা বাব [চন্দ্রমাদ্বারাই] সর্বাণি জ্যোতীংষি [জ্যোতির্ময় বস্তু] মহীয়ন্তে [মহিমা প্রাপ্ত হন্] ভূঃ ইতি বৈ ঋচঃ [ঋক্ মন্ত্রসমূহই ভূঃ] ভুবঃ ইতি সামানি [সাম মন্ত্রসমূহই ভুব] সুবর্ ইতি যজূংষি [যজুঃ মন্ত্রসমূহই সুবঃ]

আদিত্যই মহঃ, কেন না আদিত্যদ্বারাই সর্ব্বলোক বর্দ্ধিত হয়। অগ্নিই ভূঃ, বায়ুই ভুবঃ, আদিত্যই স্বর্ এবং চন্দ্র মহঃ—কেন না চন্দ্রদ্বারাই অপর জ্যোতির্ময় বস্তু মহীয়ান হয়, ঋকসমূহই ভূঃ, সামসমূহই ভুবঃ, যজুঃসমূহই স্বর্। ১।৫।২

মহ ইতি ব্রহ্ম। ব্রহ্মণা বাব সর্বে বেদা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বৈ প্রাণঃ। ভুব ইত্যপানঃ। সুবরিতি ব্যানঃ। মহ ইত্যন্নম্। অন্নেন বাব সর্বে প্রাণা মহীয়ন্তে। তা বা এতাশ্চতস্রশ্চতুর্ধা। চতস্রশ্চতস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তা যো বেদ। স বেদ ব্রহ্ম। সর্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি ॥ ১।৫।৩

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমোঽনুবাকঃ

মহ ইতি ব্রহ্ম [ব্রহ্ম অর্থাৎ ওঙ্কারই মহঃ, পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত সম্বন্ধ] ব্রহ্মণা বাব [ওঙ্কারের দ্বারাই] সর্ব্বে বেদাঃ [সর্ব্ব বেদ] মহীয়ন্তে [মহীয়ান্ হন্] ভূঃ ইতি বৈ প্রাণঃ [প্রাণই ভূঃ] ভুবঃ ইতি অপানঃ [অপানই ভুবঃ] সুবর্ ইতি ব্যানঃ [ব্যানই সুবর্] মহ ইতি অন্নম্ [অন্নই মহঃ] অন্নেন বাব [অন্নের দ্বারাই] সর্ব্বে প্রাণাঃ [সমস্ত প্রাণ] মহীয়ন্তে [পুষ্টিলাভ করে] তাঃ এতাঃ বৈ [উক্ত এই সকল] চতস্রঃ ব্যাহৃতয়ঃ [চারিটী ব্যাহৃতি] চতস্রঃ চতস্রঃ [প্রত্যেকটী চারি চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া] চতুর্ধা [চারিপ্রকার হইয়া থাকে] তাঃ [যথোক্ত ব্যাহৃতি গুলিকে] যঃ বেদ [যিনি জানেন] সঃ [তিনি] ব্রহ্মবেদ [ব্রহ্মকে জানেন] [সর্ব্বে] সর্ব্ব দেবগণ [অস্মৈ] ঐ উপাসকের নিকট] বলিম্ [উপহার] আবহন্তি [বহন করেন]

ওঙ্কারই মহঃ, ওঙ্কারদ্বারাই সর্ব্ববেদ মহীয়ান্ হন্। প্রাণই ভূঃ, অপানই ভুবঃ, ব্যানই স্বর্, অন্নই মহঃ—অন্নের দ্বারাই সর্ব্বপ্রাণ পুষ্ট হয়। উক্ত এই ব্যাহৃতিচতুষ্টয়ের প্রতিটী চারি চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে চারি-প্রকার হয়। উক্ত ব্যাহৃতিসমূহকে যিনি বিদ্যায়ত্ত করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন। তাঁহার নিকট সর্ব্বদেবতা উপহার বহন করেন। ১।৫।৩

পঞ্চম অনুবাক্ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অনুবাক্।

স য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ। তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ। অমৃতো হিরণ্ময়ঃ। অন্তরেণ তালুকে। য এষ স্তন ইবাবলম্বতে। সেন্দ্রযোনিঃ। যত্রাসৌ কেশান্তো বিবর্ত্ততে। ব্যপোহ্য শীর্ষকপালে। ভূরিত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুব ইতি বায়ৌ। ১।৬।১

সঃ [সেই] অয়ম্ পুরুষঃ [এই পরম পুরুষ পুরুষোত্তম] যঃ এষ [এই যে প্রসিদ্ধ] অন্তর্হৃদয়ে [হৃদয় পুণ্ডরীকে] আকাশঃ [আকাশ, অবকাশ; আকাশ ও আকাশবৃত্তি-লক্ষণ জীবাত্মা বিবেচনেন—

সাময়িকী

দৈনন্দিন জীবন—যুগে যুগে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চেহারাটা বদলে যায়, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পাঁচ শ' হাজার বছর আগে যেরকম ছিল, আজ তা নেই, এক শ' বছর আগেও যেরকম ছিল, আজ তাও নেই, পঞ্চাশ বৎসর আগেও যেরকম ছিল আজ তা-ও নেই। বিচার করে দেখা উচিত যে, যে বদলটা হল তা সর্বাংশে বা বহুলাংশে ঠিক হল কি না, আগেকার যা ভাল পড়ল তার কিছু কিছু রাখলে কি ও সমাজ-জীবনে কল্যাণ হতো কি না। আরও একটা কথা এই যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে বদলটা হয়েছে তার অনেকখানিই অনুকরণজাত—তাই তা জীবনকে সুস্থ কল্যাণ যতটুকু দিয়েছে, তার থেকে বেশী দিয়েছে একটা ঝাঁপা-ভিত্তিক বিলাসিতা।

নিজের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'রোজ শেষরাত্রে জেগে সূর্যোদয়ের আগে পর্যন্ত নিজের মনকে আমি শান করাই। 'শান্তম' আমার মন্ত্র। রাত্রেও শুতে যাবার আগে আমি খানিকক্ষণ একা বসে থাকি। সেই সময়টা আমার নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার সময়।··· সেইজন্যেই তো ভোরবেলাটা যারা ঘুমিয়ে নষ্ট করে, তাদের উপর আমার রাগ ধরে, বিশ্রী লাগে দেখতে। বাবামশায় যখন ছেলেবেলায় পাহাড়ে আমাকে শেষরাত্রে তুলে দিয়ে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়ে ভোর চারটের সময় ব্রাহ্মধর্মের শ্লোকগুলো আবৃত্তি করাতেন, তখন ভাবতুম উনি এরকম কেন করেন? আর একটু বেলাটুকু কেন আমাকে বিছানায় থাকতে দেন না? কিন্তু এখন কৃতজ্ঞ হই তিনি আমার এই ভোরে ওঠার অভ্যাস করিয়ে দিয়েছিলেন বলে। নইলে দিনের সবচেয়ে ভালো সময়টা আমি বৃথায় কাটাতুম, বুঝতেও পারতুম না যে কতখানি বঞ্চিত হলুম।

তোমরা আশ্চর্য হও এত কম ঘুমিয়েও আমার শরীর খারাপ হয় না দেখে। আমার তো মনে হয় বেশী ঘুমোলেই শরীর খারাপ হয়। ছেলেবেলায় যখন শৈশবে হয় তখন প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল যে দিনে ঘুমোব না—দিবানিদ্রা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। তখন নতুন ব্রহ্মচারী, খুব উৎসাহের সঙ্গেই সব নিয়ম পালন করতুম। ছেলেবেলায় সেই নিয়ম জীবনে বরাবর পালন করেছি, দিনে ঘুমোনো অভ্যাস করি নি। তাই এখন কাউকে দিনে ঘুমোতে দেখলে ভাবি, জীবনের অধিকাংশ সময় এরা ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলে, ভোগ করলে কতটুকু? আমার মনে হয় প্রতি দিনের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে যে সব নিয়ম পালন করতে উপদেশ দিয়েছিল, সেগুলো খুব প্রয়োজনীয়। নইলে শরীর মন দুইয়েরই কি রকম ঝলখলে চেহারা হয়ে যায়, আঁটসাঁট বাঁধন থাকে না। ব্রাহ্মমুহূর্তে গায়ত্রী জপ করবার নির্দেশ, দিবানিদ্রারূপ ব্যসন পরিত্যাগ করা, আহারে সংযম, এ সবই শরীর মন দুটোকেই বেশ শক্ত ঝোরালো করে গড়ে তোলবার জন্যে। আমার বাবামশায়ের এগুলোর প্রতি আস্থা ছিল, তাই তো আমাদের ছেলেবেলায় এত কড়া রকম করে মানুষ করেছিলেন। কোনোরকম প্রশ্রয় দেন নি, অথচ সব বিষয়ে তৈরী করে তোলার দিকে নজর ছিল। আমরা তো ধনী ঘরের ছেলে, কিন্তু আমাদের জন্য কোনরকম বিলাসিতার আয়োজন ছিল না। আজকালকার অতি সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের ছেলেরাও আমাদের চেয়ে বেশী ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ হয়। আমরা ছেলেবেলায় দোলাই গায়ে দিতুম, শীতের দিনে একটা সুতি-শিরাণের উপর আর একটা শিরাণ চড়াতুম গরম-কাপড়ের বদলে। খাবারের ভার চাকরদের উপর ছিল, তারা রান্না করে যা দিত তাই খেতুম। কিন্তু নিয়মিত ভোরে

উঠে খালি গায়ে ধুলোমাটি মেখে পালোয়ানের কাছে কুস্তি শিখতে হতো, ডন ফেলতে হতো। কুস্তি শেষ হবার আগেই মাস্টারমশাই এসে বসে আছেন। এক-জনের পর একজন চলেইছে, সেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আর কোনো ফাঁক ছিল না। সে যে কত রসমের বিচিত্র শিক্ষার ধারা, সে আর কি বলব। একেবারে সর্ববিষয়ে বিশারদ করে তোলবার ব্যবস্থা। এমন কি একটা মানুষের কংকাল নিয়ে একজন মাস্টারের কাছে আমাদের দেহের প্রত্যেকটী হাড়ের নাম পর্যন্ত শিখতে হয়েছিল। সেটা আমার বেশ ইন্টারেস্টিং লাগত। এক সময় আমাদের ক্ষুদ্রতম হাড়েরও নাম আমি জানতুম —কেউ ঠকাতে পারত না।...'

রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাস দেখলাম। আমরা কি করি? আমরা কি ভাবে চলি? আজকের দিনে আমাদের কোন নিয়ম নাই, শাসন নাই, শৃঙ্খলা নাই—যার যা খুশী করি, যার যখন খুশী উঠি, যার যা খুশী খাই বা না খাই। এই যে সব এলোমেলো হয়ে গেল, এতে কি আমাদের কল্যাণ হবে? বন্ধন-মুক্তি ভাল, যে আঁটসাঁট বাঁধনে জীবনের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যায়, ভারতবর্ষ তেমনি হাঁচি-টিকটিকির বাঁধনে নিজেকে বেঁধে ফেলেছিল তা সত্য—কিন্তু সেই কুসংস্কার ছাড়বার পথে তার অনেক কিছু ভালও যে ভেসে গেল, তাকে রোধ করবার পথ কি? বন্ধন যেমন জীবনের অগ্রগতির পথে বাধা, উচ্ছৃঙ্খলতাও তেমনি অগ্রগতির পথে বাধা। এ কথা ভুলে গেলে জাতির সমূহ বিপদ।

বিশ্বতি ব্যক্তি বা সমষ্টির একটা স্বভাবধর্ম। কমবেশী সবলেই ভোলে। কিন্তু নিজের অবস্থা, আদর্শ বা পথ-চলাকে বাঙালী তথা ভারতবাসী যত ভোলে এমন বুঝি বা কেউ ভোলে না। এই যে কিছু কাল আগে দাঙ্গা হয়ে গেল, পূর্ববঙ্গের লাঞ্ছনা তখনও শেষ হয় নি—এরই মধ্যে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ঠিক আগের খাতেই বইছে—কোথাও এতটুকু পার্থক্য ঘটে নি বলা যায়। গোলমাল মিটবার দিন কয়েক মধ্যেই এক ক্লাবের উদ্যোগে এ যেন গ্রামেও এক সিনেমা এল—সেখানে লোকের অভাব হয় নি, পয়সারও অভাব হয় নি। তার দুই পাঁচ দিনের মধ্যেই এক ব্যবসায়ী দিন দশেক ধরে ভাগবত পাঠ কীর্তন মহোৎসব করল—সেখানেও লোকের অভাব হয় নি, ব্যবসায়ীর টাকারও অভাব হয় নি। দিন পাঁচ সাত যেতে না যেতেই এসে পড়ল সরস্বতী পুজো—তাও সমস্ত বাঙ্গলাদেশে সহস্র সহস্র টাকা খরচ করে দিয়ে চলে গেল। এই গত গ্রামেরও কম টাকা খরচ করে দেয় নি। দিন দুই পরই আবার মাইকে ঘোষিত হল আগামী কাল অমুক সঙ্ঘের উদ্যোগে অমুক সিনেমা শো হবে। এমনি পর পর ঘটনা প্রবাহ চলছে। কিন্তু জাতির দুঃখ দুর্দশা সমস্যা মোচনের পক্ষে সংগঠনাত্মক কি হচ্ছে? হিন্দু মুসলমান সমস্যাপীড়িত পশ্চিমবঙ্গের নিজের জন্য ভাবনাই এতখানি হয় নি যাতে সহরের সিনেমা দূরে থাকুক, গ্রামের হলবিহীন স্থানেও সিনেমা বন্ধ হতে পারে, কীর্তন মহোৎসবের জন্য কিংবা সরস্বতী পূজার জন্য সহস্র সহস্র টাকা খরচ বন্ধ করে ঐ টাকা পশ্চিমবঙ্গকে কি করে বাঁচানো যায় তার পথ বের করার কাজে কিংবা পূর্ববঙ্গ থেকে সদ্য আগত নাস্তিতদের জন্য ব্যয় করা যেতে পারে। কয়জনের মাথায় এ চিন্তা আসে? প্রশ্ন হবে যেহেতু দেশে নানারকম সমস্যা আছে সেই হেতু কি আমরা সব আমোদ আহ্লাদ বন্ধ করে দেব? এ প্রশ্ন এখনও আমাদের মনে আসে কেননা আমাদের দেহের পরাধীনতার রক্ত আমরা এখনও শোধন করে নিতে পারি নি। আমাদের জাতীয় চরিত্রের চেহারাটা কল্পনা করতে গেলে শিউরে উঠতে হয়। কোথাও সংগঠনাত্মক কিছুর চেহারা দেখা যাচ্ছে না। ভাঙবে তে বটেই, পুরণো অনেক কিছুই ভেঙে যাবে, সেজন্য আপশো নেই—কিন্তু নূতন কিছু—কল্যাণকর কিছু—তা তো গড়ে উঠতে হবে? এবং সেই গড়ে উঠবার পথে সাবধান থাকতে হবে—তা শুধু নূতন হবে না—তা ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের পক্ষে একটা বৃহত্তর কল্যাণের প্রতীক হয়ে যেন আসে।

কিন্তু কি হচ্ছে চারদিকে? ব্যক্তি ও সমষ্টিগত ভাবে কতদূর আমরা গড়ে উঠেছি, উঠছি?

কোন্ দৃষ্টি সামনে রেখে আমরা চলব? রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন জীবন চলনের মধ্যে কৃত্রিমতার ছিল না—কিন্তু শক্ত বাঁধন ছিল—যা বৃহত্তর কল্যাণের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। এই বৃহত্তর দৃষ্টি শিশু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যিনি দিতে পেরেছিলেন—তিনি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। পশ্চিমের বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক জীবনযাপন রবীন্দ্রনাথের ছিল, অথচ তিনি ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠতেন—সকাল ৭টা পর্যন্ত ঘুমোতেন না। সেই সময় তাঁর দেহকেই শুধু স্নান করাতেন না, তাঁর মনটাকে তাঁর সত্তাটাকে একটা বৃহত্তর চেতনা দিয়ে স্নান করাতেন। যাতে শুতে যাবার আগেও তাঁর এই ব্যবস্থা ছিল। আমাদের আজকালকার দিনের অতি শিক্ষিত মানুষদের দুরস্থান কারোরই এ সব বালাই নেই। আর যারা জপতপ করেন এখনও—করেন অবশ্য বোধ হয় সহস্র সহস্র বাঙালী বা ভারতবাসীই, কিন্তু তাদের জীবন-চেতনা কূপমণ্ডূকের সীমানা ছাড়িয়ে যায় না। নিজেকে বিশ্ব করে তোলা দূরের কথা, বিশ্বটাকে তারা নিজ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলে চলেন। রবীন্দ্রনাথ এদের থেকে আলাদা। জপতপ বা ধ্যান করে বা ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে বা শক্ত বাঁধনের মধ্যে লেখাপড়া করার ব্যবস্থা যেনে চলেও জীবন-চেতনাকে রবীন্দ্রনাথ ছোট করে ফেলেন নি—এ কথা তাঁর সাহিত্য বা তাঁর দার্শনিক রচনা বা তাঁর জীবনের আচরণ সব কিছু থেকেই প্রমাণিত হবে।

যাক্, যে কথা বলছিলাম—কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী সামনে রেখে আমরা চলব? আমাদের দৈনন্দিন জীবনের রকমটা হবে কি? আজ যে ভাবে চলা ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, বসন-ভূষণ চলছে—এই রকমই চলতে থাকবে? আমাদের মতে যেরকম চলছে বা যেরকম চলার ধাত দেখা যাচ্ছে, একেই চলতে দেওয়া বা বেড়ে যেতে দেওয়া চলে না। এটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ, সব বিধি ব্যবস্থা মেনে যাওয়ার যুগ, সেই সঙ্গে শিশু-বৈজ্ঞানিক শিক্ষার যুগ—সব মিলিয়ে একটা বেতাল বিশৃঙ্খলার বিভ্রান্তি শিশু কিশোর যুবক প্রৌঢ় সকলকেই প্রায় দিশেহারা করে দিয়েছে। কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না—সকলেই স্রোতে গা ভাসিয়ে চলবে—যে স্রোত আমাকে, সমষ্টিকে ডোবাবে—এ হতে পারে না। রুখে দাঁড়াতেই হবে। সকলে যা করছে, আমাকে তা-ই করতে হবে কেন? আবেষ্টন মানুষকে সৃষ্টি করে, মানুষও আবেষ্টনকে সৃষ্টি করবে—এটা উভয়তঃ সত্য একথা মনে রাখতেই হবে। আমি নূতন সৃষ্টি করব—ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তিকে রুখে দাঁড়িয়ে গঠনাত্মক মনোভাবকে সৃষ্টি করে তুলব, ক্ষুদ্র গণ্ডীর আবর্তে ব্যক্তি ও সমাজকে বেঁধে না ফেলে আমরা বিশ্বটাকে নিজ গৃহ বলে ভাবতে শিখব, এক-বিশ্ব রচনা করার দায় আমারও এ কথা মনে রাখব, বিদ্যালয়ের আঙিনায় সকলে মিলে সুসৃঙ্খল সুসংবদ্ধ সামঞ্জস্যপূর্ণ সামগ্রিক জীবন রচনা করে তুলবার প্রয়াসে বিশেষ যত্নশীল হব—যাতে মানুষের ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয় সত্তাই তৃপ্ত হতে পারে। ব্যক্তির জন্য সমষ্টি যেন পীড়িত না হয়, সমষ্টির জন্য ব্যক্তি যেন পীড়িত না হয়—এইটে লক্ষ্য রেখে আমরা ব্যক্তিস্বার্থকেও ঐকান্তিক করে সামঞ্জস্য ভেঙে দেব না, সমষ্টি স্বার্থকে ঐকান্তিক করে তুলে ব্যক্তিসত্তা নষ্ট করে দেব না; আমরা স্বার্থকেই জীবনের ভিত্তি করব না, লোভকেই উসকিয়ে তুলে পশুত্বের স্তরে নেমে যাব না, আমরা জীবনের সামগ্রিকতা নষ্ট করব না। এই রকম ভাবে আমাদের নূতন করে ভাবতে হবে। যে রকমভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাচ্ছে—যেরকমভাবে আদর্শ-হীন গৌরবহীন জীবন আমাদের শিশু কিশোর যুবক প্রৌঢ় যাপন করছে, তাকেই স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেব না—ভারতীয় জীবনচেতনার মধ্যে পাশ্চাত্যের অনুপ্রবেশ দ্বারা যাতে জীবনের সামগ্রিকতা নষ্ট না হয়, যাতে সমগ্র জীবনটা আরও সমৃদ্ধ হয় তার চেষ্টা করতে হবে। আমরা যে অতিপ্রত হচ্ছি সে বোধটাই আমাদের নেই। কিন্তু আজ জীবনটাকে আমাদের নূতন করে ভাবতে হবে।

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

উদ্বোধন

ভাদ্র, ১৮৮৭ শকাব্দ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ

১৮শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

'সর্ববাদবিষয় প্রতিরূপশীল'

বিশ্বের আজকের বিবাদটা মতবাদ নিয়ে। জাতিতে জাতিতে যে বিবাদ তার মূলে বিভিন্ন ইজম্-এর দাঙ্গাহাঙ্গামা আর তারই ঢেউ এসে লাগল সমাজে পরিবারে সর্বত্র। আপনি একরকম করে ভাবেন, আমি অন্যরকম করে। বাস করছি একই আকাশের নীচে কিংবা একই ছাদের তলে, তবু ভাবনার এ বিভিন্নতা মেনাতে পারি না আমরা। এক একটা বিশেষ নিয়ে আমরা তাকে এমন শক্ত করে ধরে পড়ি যে, আমার শক্ত আমির সাথে আপনার শক্ত আমির ঘর্ষণ লাগে। আমাদের মনোবৃত্তির এমন নমনধর্মশীলতা নেই যেখানে পরস্পর আমরা মিলতে পারি। এই-ই হচ্ছে সাধারণ। কিন্তু এমন একজন ছিলেন যার জীবনের মধ্যে সকল বাদ মতবাদ বা ইজমের বিষয়বস্তু প্রতিরূপ গ্রহণ করেছিল। আর তাই করেছিল বলেই অত হাজার হাজার বৎসর ধরে বিভিন্ন মানুষ তাঁকে বিভিন্ন রকম করে দেখতে পাচ্ছে। তাই মরদের কাছে তিনি বজ্র, রাজাদের মধ্যে তিনি নরবর, স্ত্রীলোকের কাছে তিনি মূর্তিমান কন্দর্প, গোয়ালাদের তিনি আপন জন, অসৎ রাজাদের তিনি শাসক, পিতামাতার কাছে তিনি কোলের শিশুটী, ভোজপতি কংসের কাছে তিনি মৃত্যুস্বরূপ, অজ্ঞানীদের কাছে তিনি বিরাট, যোগীদের তিনি পরতত্ত্ব, বৃষ্ণিকুলের তিনি পরদেবতা—কল্পনায় এত বড় বিরাটত্বের আর গাম্ভীর্য্যের কোথাও কোন তুলনা নেই। কতখানি বড় হলে আর কতখানি নমনধর্মশীলতা থাকলে পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একই মানুষকে দেখা সম্ভব, এইটী ভাবতেই বড় ভাল লাগে। সেই তিনি, সেই সর্ববাদবিষয় প্রতিরূপশীল পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মানুষের কাছে মানুষ যে কি হতে এবং কতখানি হতে পারে, তারই দৃষ্টান্ত রেখে চির জীবনের জন্য উজ্জ্বল হয়ে আছেন। একজন মানুষের পক্ষে যদি এতখানি বিস্তৃত ও গভীর হওয়া সম্ভব, তবে সে হওয়ার প্রচেষ্টা তো মানুষেরই জন্য তিনি রেখে গেলেন। চারদিকে এত যে বাদ বিসম্বাদ, এত যে অগোছালো বিশৃঙ্খলা এলোমেলো—এরই মধ্যে কেবলি মনে পড়ে নিজেকে যদি প্রতি মানুষ ঐ অপরূপ মানুষটীর দিকে তাকিয়ে কেবলই বড় করতে করতে চলতো; কেমন করে নিজেকে আরও বিস্তৃত ও আরও ব্যাপক করে তোলা যায় এবং সেই বড় হওয়ার সাধনার মধ্যে আর একজনের সঙ্গে কেমন করে মেলা যেতে পারে, মানুষ যদি সেই সাধনা নিত—তবেই তো এই ক্রমবর্দ্ধমান রেষারেষি হিংসা বিদ্বেষ কমে যেতে থাকত। তেমন দিন কি মানুষের সভ্যতায় দেখা দিবে না? নিশ্চয়ই দেবে—নাই যদি দিত তবে সেই পুরুষোত্তম তাঁর জীবনের দৃষ্টান্ত মানুষের কাছে রেখে যাবেন কেন? তাই এ কথা নিশ্চয় করে বলব যে, যেখানে মানুষের সাথে মানুষ মিলতে পারে সেইখানে পৌঁছাবার জন্য মানুষকে একই সঙ্গে বিস্তৃত ও গভীর হতেই হবে, সর্ব মতবাদকে নিজের জীবন দিয়েই প্রকাশ করবার মত নমনধর্মশীলতা জীবনে আয়ত্ত করতে হবেই। তা না হলে মানুষ কি মানুষের সাথে চিরদিন বিবাদ করেই বেঁচে থাকতে চাইবে? পারস্পরিক সহমর্মিতা সৃষ্টি করতে পারলে মানুষের সাথে মানুষ মিলতে পারবে না, এ হতেই পারে না। সেই সুস্থির পুরুষোত্তমকে নমস্কার, যিনি মানুষের সাথে মানুষের মিলনের

এই সংবাদ রেখে গেছেন। তাই জন্যেই তিনি সর্ব্ব কালের সর্ব্ব লোকের ইষ্ট—তিনি দ্বৈতবাদীর ইষ্ট, অদ্বৈতবাদীরও ইষ্ট, তিনি পৃষ্টীয় ইষ্ট, সন্ন্যাসীরও ইষ্ট। তাঁকে নমস্কার।

এই মিলনের বার্ত্তা যিনি রেখেছেন, সেই পুরুষোত্তম সর্ব্বদা 'গোপীগোপসখাবৃতম্', 'রাসমণ্ডলমণ্ডনম্'। তিনি কখনই একক নন—একটা সমষ্টিকে তিনি সর্ব্বদাই নিজের সঙ্গে একাত্ম করে রেখেছেন—পঙ্ক গঙ্গা আর গোপিকা একেবারে যারা সমাজের সাধারণ, তাদের একটা সমষ্টির সাথে তিনি একাত্ম হয়ে চলেন। একেবারে সাধারণের সঙ্গে থাকতে পারেন বলেই তিনি অসাধারণ, একলা না থেকে সকলকে নিয়ে থাকতে জানেন বলেই তিনি অনন্ত। আজকের দিনে আমরা যখন সমস্ত মানুষকে মানুষের মর্য্যাদা দিয়ে গ্রহণ করতে চাই, তখন কেমন করে সকলকে নিয়ে সাধারণের মত সাধারণ হয়ে বাস করতে পারি—সে কথা তো শিখতে হবে। এদিক দিয়ে পথ কেটে রেখে গেছেন সেই সুন্দর পুরুষ পুরুষোত্তম কয়েক হাজার বৎসর আগে। সাধারণ হয়েও অসাধারণ, বহুর মধ্যে ওতপ্রোত থেকেও একক অনন্ত সেই পুরুষোত্তমকে নমস্কার।

সর্ব্ব ক্ষেত্রজ্ঞ সেই পুরুষোত্তম ভারতবর্ষকে পূর্ণতার সাধনা দিয়ে যান নি। সর্ব্ব ক্ষেত্রের যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্ব্ব বাদের যিনি প্রতিরূপ, তিনি জীবনের একটা পরিপূর্ণতার সাধনার খবরই রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর জীবনখানাই ছিল কানায় কানায়—কর্ম্মে জ্ঞানে প্রেমে—একেবারে ভরপুর। প্রকৃতির মূলোচ্ছেদ না করে তাকে বিশ্বরূপের স্তরে উন্নীত করে কেমন করে তাকে ভাগবত রূপ দেওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে সেই খবর রেখে গেছেন। কিন্তু তাঁর সেই পরিপূর্ণতার সাধনা ভারতবর্ষ একদিন ভুলে গেল। দীর্ঘ কালের সভ্যতার এক স্তরে এমন ভুলে যাওয়া খুব বিচিত্র অস্বাভাবিক নয় বটে, কিন্তু ভুল যে হয়েছিল এইটেই আমাদের মনে রাখা দরকার। রবীন্দ্রনাথকে তাই লিখতে হয়েছিল, 'এমনি করে পূর্ণভাবে শান্তি একদিন শূন্যতার শান্তি আকারে ভারতবর্ষের সাধনা ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। সমস্ত বাসনাকে নিরস্ত করে, সমস্ত প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে তবেই পরম শ্রেয়কে লাভ করা যায়, এই মত যেদিন থেকে ভারতবর্ষে তার সহস্র মূল বিস্তার করে দাঁড়ালো, সেই দিন থেকে প্রাচীন তাপসাশ্রমের স্থানে আধুনিক কালের সন্ন্যাসাশ্রম প্রবল হয়ে উঠল এবং উপনিষদের পূর্ণ স্বরূপ ব্রহ্ম শঙ্করাচার্য্যের শূন্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হলেন'। যেদিন থেকে শূন্যতার সাধনা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করেছিল, সেদিন থেকে সে যে এক-চক্ষু হরিণের মত প্রকৃতির মূলোচ্ছেদ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল, তারই প্রতিক্রিয়ায় ভারতবর্ষের গৃহস্থাশ্রম সন্ন্যাসাশ্রম সবই বিকৃতি প্রাপ্ত হলো। আজও তারই জের চলছে। তাই এই দুর্দিনে ঘরে বাইরের বিকৃতি যদি বন্ধ করতে হয় তবে সেই সমগ্র মানুষ, সুন্দর মানুষ, প্রিয় মানুষ সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সাধনা আমাদের নিতে হবে। তাঁর পরিপূর্ণতাকে দিয়ে আমাদের খণ্ডতাকে ভরে নিতে হবে, যেমন করে তিনি রাজনীতিজ্ঞের হয়েও যোগীদের পথপ্রদ হতে পারেন, যেমন করে মল্লদের বন্ধু হয়েও তিনি পিতামাতার কোলের শিশুটি হতে পারেন, তেমনি করে পরস্পর বিপরীতকে মিলিয়ে নিয়ে তাঁর পরিপূর্ণতার সাধনাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এই পরস্পর বিপরীতকে মিলিয়েই তিনি প্রাণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, প্রাণ পুরুষ। সেই প্রাণপুরুষ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার, বারবার নমস্কার।

এই ভাদ্র মাসের অষ্টমীতে তাঁর শুভাবির্ভাব দিনে সেই প্রাণ পুরুষকে নমস্কার, বার বার নমস্কার।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৪৯)

...বিশ্ব সত্য, আমিও সত্য—আইনস্টিনের ভাষায় একে বলে dimension।...অন্নের সঙ্গে জলের সঙ্গে আমার সংযোগটা কি রকম করব?...পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তম বলি—ব্যাপারটা কি?...হজম-শক্তির মূর্ত বিগ্রহ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ—দীপ্তাগ্নির ঘন-বিগ্রহ তিনি—তিনি সব হজম করতে পারেন—কিছুই তাঁর বদ-হজম হয় না।...অন্নকে হজম করলে জীবন বের হয়—বস্তুমাত্রকেই হজম করে তার থেকে জীবনীশক্তি বের করা যায়।...ভারতবর্ষ অগ্নির পূজা করে আসছে—অথচ আজ আমাদের অগ্নিমান্দ্য—কিছুই আমরা হজম করতে পারি না—আমাদের জীবনের আগুনে তেজ নেই।...বাঙ্গালীর শৃঙ্খলা-বোধ নেই—ব্রাহ্মরা এই শৃঙ্খলা জানত...ব্রাহ্ম মনোমোহন চক্রবর্তী—মন্মথ দাস এদের পরিবারে হিন্দু ঘরের থেকে বেশী শৃঙ্খলা ছিল দেখেছি। একঘরে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান হচ্ছে, আর এক ঘরে খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে—শব্দ নেই, গোলমাল নেই, হৈ হৈ নেই। আর হিন্দুর আনুষ্ঠানিক খাওয়াদাওয়ায়? ডাকাডাকি, চীৎকার, চেঁচামেচি সবশুদ্ধ প্রচুর গোলমাল। কেন এমন হয়? বাঙ্গালীর বাড় আর ইংরেজের বাড়ে—তফাৎ কেন?...বাজারে যেতে পথে গল্প, বাজারে গিয়ে গল্প... ; এক পরিবারে বাজারই করা হল তিনবার...। কী বিশৃঙ্খলা। ভগবান বাইরে নেই—ভগবানকে জীবনে সকল কাজের ভিতরে জন্ম দিতে হয়। উপনিষদ্ বলছেন সুকৃতস্য গতিনিব—তিনি আমার ভিতরে জন্মগ্রহণ করেন। ...বিদ্যুৎ সর্বত্র আছে—লোহার ভিতরেও আছে। চুম্বক বের হয় মানে moleculeগুলি এমনভাবে গুছিয়ে আসে যাতে চুম্বকত্ব প্রকাশিত হয়ে ওঠে।...ভোগ করতে গেলে যে ট্রেণিং দরকার, তা আমাদের নেই।...পাশ্চাত্ত্য নারীকে ভোগ করতে জানে, রক্ষা করতেও জানে...জালিয়ানওয়ালাবাগে নারীর অপমানে ইংরেজ জাতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল ...আমরা নারীর সম্মান রক্ষা করতে জানি? সাধারণভাবে ভারতীয় চিত্ত নারীকে অত্যন্ত হেয়, অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করে—অথচ ভোগ করতে তাকে দরকার হয়। নারীর সম্মান মর্যাদা দিতে আমরা জানি না।...পুরুষোত্তম পরিবার করবার জন্য প্রত্যেকের মাত্রা-বোধ থাকা দরকার।...accident বাদ দিয়ে সাধারণ দৈনিক জীবনের ছটিন আগের দিনেই গুছিয়ে নিতে হবে।... চার্বাক বললে, জ্যান্ত বাপকে খেতে দাও, শঙ্কর বলছে, মরার পর শ্রাদ্ধটা ঠিক মত করো।...পুরুষোত্তম বলবেন—দুটোই ঠিক মত মাত্রা রেখে করতে হবে।...আজকাল কারো ভাণ্ডার—ভাঁড়ার ঘর—আর বাড়ীতে নেই—ভাণ্ডার এখন বাজারে।..তোমাদের চলার উপর নির্ভর করবে আমি এখানে থাকব, না দূর দূরান্তরে চলে যাব।... নিত্যগোপাল পরম সংযমের কথা নিয়ে এসেছেন ; তিনি ভোগকে ত্যাগ দিয়ে, ত্যাগকে ভোগ দিয়ে সংযত করেছেন।.. আজ বিশ্বটাকে গুছিয়ে ফেলবার দিন—এরই রাজনৈতিক নাম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান...।...তবু নিজেদের নিয়ে বিব্রত থাকতে কেউ আসে নি...। কালনায় একদিন রাত্রে দেখা গেল একজনের মশারি নেই—অথচ কোনো মশারীতে আর একজনকে ঢোকান যায় না এত ছোট—আমি আগে আমার মশারী তুলে নিলাম—তারপর একে একে সকলের মশারী উঠে গেল—সকলে এক সঙ্গে মশার কামড়ে রাত কাটালাম...। সুখ দুঃখ সব সমান করে বণ্টন করে নিতে হবে—তার নাম সমসুখদুঃখ...। যদি আমাদের বুক চিরে নিত্যগোপাল জন্মগ্রহণ করতেন...! এখানে এসেছ যারা তারা হৃদ নিত্যগোপালকে জন্ম দেবার মত সুসংবদ্ধ জীবন যাপন

কর, নয় চলে যাও···। ছেলেখেলা করবার জন্য এখানে আসি নি।···।

২৩. ১০. ৫৬।···আজ এই স্থানীয় চারটি বিশিষ্ট বন্ধু আশ্রমে এসেছেন, আমি আশ্রমের সেবক হিসাবে তাঁদের সাদর অভিবাদন জ্ঞাপন করি।···তাঁদের কাছে আমার একটু বলবার আছে···। যাঁর বিগ্রহ এখানে স্থাপিত, তিনি কিন্তু অপরিচিত···। (শ্রীনিত্যগোপালের আঙ্গ-ধ্যান পাঠ করা হল)—ঐ লেখাটুকু তাঁর নিজের লেখা। ঐ যিনি বসে আছেন—তিনি আমার গুরু, তিনি আমার ইষ্ট···। পাঁচ হাজার বৎসর আগে পুরুষোত্তম কৃষ্ণ যে জীবন ও দর্শন দিয়ে গিয়েছিলেন, শ্রীনিত্যগোপাল বর্তমান যুগের আবেষ্টনে দার্শনিক ভাষায় সেই কথা রেখে গেছেন।···সংসারকে কি রকম করে গোলোকের ছাঁচে গড়ে তোলা যায়, তারই কথা আছে নিত্যগোপালের দর্শনে। (নারায়ণের অবতরণের কাহিনী, অন্য বিজ্ঞের কাহিনী বর্ণনা করলেন।) অন্য বিজ্ঞের গোলোক থেকে নামতেই হবে—তারা হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ, রাবণ কুম্ভকর্ণ, শিশুপাল দন্তবক্র রূপে তিনবার জন্মগ্রহণ করলেন—নারায়ণ ঐ তিনবারে নরহরি রাম ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হলেন। এই তিন নাম তারকব্রহ্ম নাম।··· বৈকুণ্ঠ থেকে তিনি নেমে এলেন মাটির ভাষায় নিজেকে ব্যাখ্যা করতে—বৈকুণ্ঠ অর্থ মানুষের সুখ দুঃখের ওপারে ···। আমার জোটে না অন্ন, আর লক্ষ্মীপতি তিনি···! এত বড় প্রকাণ্ড ব্যবধান নিয়ে ভগবানের সঙ্গে জীবের কোন সম্বন্ধ চলে না।...বৈকুণ্ঠের ঠাকুর জীবের দুঃখে দুঃখী হতে, জীবের কান্না কাঁদতে···জীবের যা কিছু সব তিনি বরণ করে নেবাতে এলেন কেমন করে চলতে হবে এই জগতের জটিলতার বুকে...। এতদিন উপনিষৎ ছিল আরণ্যক,···গীতা যুদ্ধের মধ্যে নাগরিক জীবনের শাস্ত্র···, গীতার কথা ধর্মক্ষেত্র আজ আর নৈমিষারণ্য নয়, ভারতের শেষ যোদ্ধা পঞ্চপাণ্ডব কর্তৃক কুরুক্ষেত্রের বুকে উচ্চারিত হয়েছিল।...ঝড়ের মাঝে, ঘটনাচক্রের মাঝে উপনিষদ্তত্ত্ব কি ভাবে প্রয়োগ করে চলা যায়, তা-ই শিখতে হবে···হত্যারক্তির মধ্যে তিনি শান্তি নিয়ে এলেন।...তিনি জন্মেছেন, আমরাও জন্মাই—আমাদের জন্ম ব্যর্থ না হয়ে সার্থক হয় কি ভাবে?...কোন্ ভাবে সংসার করলে গায়ে লাগবে না?...বাড়ীতে বর এলে যেমন বাড়ীঘর সব গুছাতে হয়, তেমনি জীবনে তিনি আসবেন—জীবনকে গুছাতে হবে না? যেমন তেমন করে জীবন চালিয়ে গেলে, আসক্তি বিদ্বেষ আর ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন অহং বুদ্ধির বশীভূত হয়ে চললে তিনি সে জীবনে আসবেন কেমন করে?···আজ এইখানে ভগবানকে পেতে হবে···আমারই মত দেহ ধারণ করে তিনি এসেছেন ···রাজরাজেশ্বর তিনি, তবু এসেছেন মানুষেরই মত হয়ে ···। যেখানে ছিল বন্ধন, সেইখানেই মুক্তি আস্বাদন করব। ···নিত্যগোপাল এই তত্ত্ব নিয়ে এসেছেন, তাই তাঁকে এইখানে আমি পূজা করছি···নরনারায়ণ আশ্রম নিত্যগোপালের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার প্রচেষ্টা নিয়েই চলবে।·· জীবনের রথ আজ আটকে গেছে, নিত্য-গোপাল, তুমি সারথি...বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি···। কোন্ ছন্দে চললে নিত্যগোপালের এই তত্ত্ব জীবনে লাভ করা যায় তা শিখতে হবে। ··নিত্যগোপাল বললেন I am a cosmopolitan...আমরাও প্রত্যেকে বিশ্বরূপ।...৭০ বছরের জীবনের এই দীর্ঘ যাত্রায় যার কাছ থেকে যা পেয়েছি, সকলে যদি সকল কিছু ফেরত চায়, আমি যে থাকি না—আমি ফুরিয়ে যাই···। আমরা রূপ স্বীকার করতে পারি না—কিন্তু রূপী ভগবান মানুষের কাছে এসে দাঁড়ালেন। ...যারা গোলোকের ধ্যানে আছ, তারা গোলোকে যাবার আগে বিশ্বের রূপ শোধ করে যাও। প্রহ্লাদ প্রথম বিশ্বনাগরিক...। তিনি বলেছেন, 'প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকাম্য'···ইত্যাদি। মানুষের সেবা করতে হবে। ...রন্তিদেবের কাহিনীও রয়েছে, 'ন কামযেঽহম্ গতিমীশ্বরাৎ পরান্' ইত্যাদি...।...নারায়ণ-সেবার শেষ পরিণতি মানুষের সেবা; পিতাকে খাওয়ানর চেয়ে সন্তানকে খাওয়ালে পিতা অধিক সন্তুষ্ট হন। নিত্যগোপাল নর নারায়ণ...তুমি বিশ্বের সেবার জন্য, বিশ্বকে নূতন গড়ে তোলবার জন্য এসেছ···তোমার জয় হউক...। প্রত্যেক ভারতবাসীকে শোনাতে হবে তুমি

বিশ্ব নাগরিক — ...

২৪, ১০, ৫৬ ।...রবীন্দ্রনাথের গান আছে—নূতন যুগের ভোরে দিন নে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার করে... একটা নূতন যুগ আসছে...নিত্যগোপাল এক নূতন যুগ প্রবর্তন করছেন—তার প্রাতঃকাল এখন। ...এই নূতন যুগের লোকের...কি হবে কি হবে না আর কি হবে কি হবে না বিধাতার মত এ ভাবনা করার অধিকার নেই।.....নিত্যগোপাল নিজের পবিত্র নিজেই দিয়ে গেছেন। পতিতের প্রতি তাঁর অসীম কৃপা—পতিত মানুষ, পতিত বন্ধু। নিজের জীবনের কথাই বলি, ব্রজমোহন স্কুলের চাকরী ছেড়ে দিয়ে এলাম... সেদিন কি হবে আর কি হবে না কিছু বিচার করিনি। ...কেবল একটা বেগ! —সাগর টানে তাই নদীর বেগ—চলার বেগেই পথ কেটে যায়...। আইনষ্টাইন বললেন পথ যে ছোট বড় সেটা পথের মধ্যে নেই... আনন্দের রাত্রি প্রভাত হয়ে যায়, বেগ আছে কি না—দুঃখের রাত্রি কিছুতেই প্রভাত হয় না...অমনোযোগী ছাত্রের পড়া...ঢিমেতেতলা মানুষের কাছে সংসার আর চলে না। ...ভগবান এসে দাঁড়িয়েছেন তাই বেগ—ভগবান না এলে বেগ আসতো না।...বেগ আসবে কোথা থেকে? ঐ নিত্যগোপাল থেকে...। পতিতের প্রতি কৃপা—গোলাপ গয়লানী এলে দোর খুলে দেখা করতেন পতিতের প্রতি ঘৃণা বিনা...গোলাপ একবার চরিত্র-হীনতার জন্ত জেলেও গিয়েছিল, নিত্যগোপাল তাকে জেলেও দেখা দিয়ে ছিলেন। ...নিত্যগোপাল, জীবনে যেদিন চরম বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেদিন তুমি কেমন করে আমায় বাঁচিয়েছ আমি তো তা ভুলে যাই নি...। তীব্র বেগ আমার জীবনে তুমিই এনে দিয়েছ ...আমার ছোট জীবন তবু কত ঘটনা!—ঐ আমার স্ত্রী বসে আছেন...তিনি জানেন কত ঘটনা...। ব্রজ-গোপীরা একদিন ডাক শুনেছিল...নূতন যুগের ভোরে আমরা জন্মেছি—আমরা কি নূতন যুগের ডাক শুনব না? ...এতবড় সমুদ্রের আহ্বান বা বাঁশীর ডাক যদি না শোন জীবন ব্যর্থ হবে। প্রবোধানন্দ বলেছিলেন বিশ্ব গৌর-রসে ভর—আমি বঞ্চিত হলাম। ...নিত্য-গোপাল এতবড় সম্পদ রেখে গেছেন, তাঁর সামনে এসেও আমরা বঞ্চিত হব? ...জীবনের হিসাব নিকাশ কে স্থির রাখতে পেরেছে? বাস্তহারার কোথায় ঘর বাড়ী? ...সমস্ত মানুষই আজ পথে নেমেছে—কোথায় পথ আছে? ঐ যে ধ্রুবতারা নিত্যগোপাল...। নরনারায়ণ আশ্রমে যারা এসেছ তাদের জন্মভূমি তাদের মন্দগতি রেখে আমি পীড়িত...চলো চলো এগিয়ে চল; চরৈবেতি...চলো চলো—আমি চলব। কি হবে কি হবে না তাই হিসেব করতে বসে থাকব না...সুখদুঃখ সব পড়ে থাক পিছে—নিত্যগোপাল, দাঁড়াও আমার সামনে.. Reality lies ahead। ...তোমার ডাক শুনেছি, আমাকে যেতেই হবে...সকল দেশকালপাত্রের বাধা ডিঙিয়ে আমায় যেতেই হবে...পথের বাঁশী পথে পথে তারে যে আজ করেছে চঞ্চল, আনন্দে তাই এক চল তার পৌঁছানো আর চলা...পৌঁছানো আর চলা যার জীবনে এক হয়ে গেছে, যার জীবনে বেগ আছে—নিত্যগোপালকে সেই বুঝতে পারে।...

যে যা গাগল করে, কাজ নেই মা জ্ঞান বিচারে
ঈশানুনা শ্রীচৈতন্ত তোমার প্রেমে অচৈতন্ত
হায় কবে হব মা বন্ধ মিশে তাদের ভিতরে
যে যা পাগল করে।

যারা ভবিষ্যৎ যুগস্রষ্টা তারা অতীতের সব কি হবে কি হবে না কি রবে কি রবে না সব ভাসিয়ে ভবিষ্যতের পথে পা বাড়ান। ...আমি কোন কিছুতেই অভিনব করিনি—আমি প্রাণ ঢেলে কর্ম করেছি, প্রাণ ঢেলে জ্ঞান চর্চা করেছি, প্রাণ ঢেলে চোখের জল ফেলেছি—বাঙ্গালার শত শত গ্রাম চোখের জলে ভিজিয়েছি... নিত্যগোপাল, তুমিই গতি, তোমায় ভাল না বাসলে গতি তো আসবে না...বয়সকে কালকে অস্বীকার করে আমি ছুটব—আমি নূতন জগৎ সৃষ্টি করে তোমার পায়ে অর্ঘ্য দেব। নিত্যগোপাল, তুমি চির নবীন, চির সনাতন। ধরার ধূলি হোক বিশ্বধূলি, ধরার মানুষ হোক বিশ্ব মানুষ। জগন্নাথ নিত্যগোপাল!.. ক্রমশ

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় জন্যই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে, দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেইজন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়-নির্দ্দেশিত "সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

আত্মজ্ঞানের স্ফুরণ কি প্রকার, তাহাও অনুভব করেন না। সেই আত্মজ্ঞানের স্ফুরণ বশত আত্মজ্ঞানী যে আনন্দ সম্ভোগ করেন, তিনি তাহাও বুঝিতে পারেন না। সুতরাং আত্মজ্ঞানীরও অসত্য অহঙ্কারে বিশেষ প্রয়োজন আছে। ২

অসত্য অহঙ্কারের সহিত সত্য আত্মার সম্বন্ধ বশতই সত্য আত্মা নিজে আছেন বোধ করেন। অসত্য অহঙ্কারের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ না থাকিলে তিনি নিজে আছেন পর্যন্ত অনুভব করিতেন না। অসত্য অহঙ্কারের সাহায্যে সত্য আত্মা নিজে আছেন যদি বোধ না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার আত্মজ্ঞানও হইত না। তাহা হইলে তাঁহার আত্মজ্ঞান এ বোধও তাঁহার হইত না। তাহা হইলে তাঁহার আত্মজ্ঞানের স্ফুরণ-বোধও হইত না। তাহা হইলে আত্মজ্ঞান কি তাহাও তিনি বুঝিতেন না। তাহা হইলে আত্মজ্ঞান বশত যে আনন্দ সম্ভোগ হয়, তিনি তাহাও সম্ভোগ করিতেন না। তাহা হইলে তিনি তাহা যে কি, তাহাও বুঝিতেন না। তাহা হইলে তিনি সেই আনন্দের অস্তিত্ব পর্যন্ত অনুভব করিতে পারিতেন না। সেইজন্যই বলি, অহঙ্কারকে অসত্য বলা উচিত নহে। ৩

অসত্য অহঙ্কার যদি আত্মার নিজের অস্তিত্ব-বোধের কারণ হয়, অসত্য অহঙ্কার যদি আত্মার আত্মজ্ঞানের অস্তিত্বানুভব করিবার কারণ হয়, অসত্য অহঙ্কার যদি আত্মজ্ঞান কি তাহা বুঝিবার কারণ হয়, অসত্য অহঙ্কার যদি আত্মজ্ঞান বিকাশিত রহিবার কারণ হয়, অসত্য অহঙ্কার যদি আত্মজ্ঞান-প্রসূত আনন্দের অস্তিত্ব-বোধের, তাহা সম্ভোগ করিবার ও তাহা বুঝিবার কারণ হয়, তাহা হইলে সে অসত্য অহঙ্কারকেও অসাধারণ বলিতে হইবে। ৪।

বেদান্তমতে অহঙ্কার মায়ার অংশ মায়া, সুতরাং

বেদান্তমতে তাহা অসত্য। কারণ বেদান্তে মায়াকে অসত্যই বলা হইয়াছে। বেদান্তে যে অহঙ্কারকে অসত্য বলা হইয়াছে, সেই অহঙ্কারেরই সাহায্যে সত্য আত্মা কি প্রকারে নিজের অস্তিত্ব বোধ করেন তাহাও অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। অসত্য কখনই সত্য নির্ব্বাচন অথবা সত্য বুঝিবার কারণ হইতে পারে না। অসত্য নিজেই নাই, তবে তাহা, আছে যাহা, তাহার অস্তিত্ব-বোধ কি প্রকারে করায়? অসত্য যাহার অস্তিত্ব-বোধ করায়, তাহাও যে অসত্য নহে, তাহাই বা কি প্রকারে তুমি বলিতেছ? বেদান্তমতে অহঙ্কার অসত্য। অথচ তাহা আত্মার অস্তিত্ব-বোধ করায়, তাহা আত্মজ্ঞানের অস্তিত্ব-বোধ করায়, তাহা আত্মজ্ঞান-জনিত আনন্দের অস্তিত্ব-বোধ করায়, তাহা বেদান্তানুসারে অসত্য, এবং তাহা ঐ তিনের অস্তিত্ব-বোধ করায় বলিয়াই ঐ তিনকেও অসত্য এবং মায়ার ত্রিবিধ বিকাশ বলিতে হয়। ৫

সপ্তম সিদ্ধান্ত

তুমি বলিতেছ যে, আত্মজ্ঞানীই অদ্বৈতজ্ঞানী, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাহা নয়। আমাদের বিবেচনায় বেদান্তি যাহাকে অদ্বৈতজ্ঞান বলেন, তাহা প্রকৃত অদ্বৈত-জ্ঞানই নহে। তুমি বলিতেছ, বেদান্তানুসারে আত্ম-জ্ঞানীর অদ্বৈতানুভূতি হইয়া থাকে। আমরা বলি তাহা নয়, যে সময় আত্মজ্ঞানী-আত্মার আত্মজ্ঞান স্ফুরিত নহে, সে সময় আত্মজ্ঞানী-আত্মা নিজে আছেন বোধ করেন। তিনি নিজে আত্মা, তাহাও বোধ করেন। যে অহঙ্কারদ্বারা তিনি নিজে যে আত্মা বোধ করিয়া থাকেন, তখন সে অহঙ্কারেরও অস্তিত্ব-বোধ করেন। সে সময় আত্মজ্ঞানেরও অস্তিত্ব-বোধ করেন। আত্মজ্ঞান কি, তিনি সে সময় তাহাও উপলব্ধি করেন। সে সময় সেই আত্ম-জ্ঞান প্রকাশে তাঁহার যে আনন্দ সম্ভোগ হইয়া থাকে, তাহাও সম্ভোগ করিয়া থাকেন। সে সময় সে সম্ভোগ যা কি, তিনি তাহাও বুঝিয়া থাকেন। সে সময় তিনি যে আনন্দ সম্ভোগ করেন, সে আনন্দেরও অস্তিত্ব-বোধ করেন। তবে আত্মজ্ঞানীর কেবল অদ্বৈত-বোধই থাকে কি প্রকারে বল? আমি তো দেখিতেছি, আত্ম-জ্ঞানীরও বহু বোধ থাকে। তুমি যদি বল, আত্মার আত্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান-জনিত যে আনন্দ সম্ভোগ হয়, সেই আনন্দ এবং যে শক্তি-প্রকাশে আত্মার অস্তিত্ব, আত্মজ্ঞানের অস্তিত্ব ও আত্মজ্ঞান-জনিত আনন্দের অস্তিত্ব-বোধ হয়, সেই শক্তিও আত্মার বিকাশ, আমরা বলি, তাহা বলাও তোমার সঙ্গত নহে। কারণ তোমাদের বেদান্তেই আত্মা নির্বিকার, নিরঞ্জন, সত্য, নিত্য এবং অপরিবর্ত্তনীয় বলা হইয়াছে। তোমাদেরই বেদান্ত-মতানুসারে আত্মা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বলা হইয়াছে। তোমাদের বেদান্তানুসারে আত্মার বহু বিকাশ হয় না। সে মতে আত্মার বহু-প্রকারতা নাই। সে মতে মায়ারই বহু বিকাশ। সে মতে মায়ারই বহু প্রকারতা। সে মতে মায়ারই পরিবর্ত্তন ও বিকার আছে। সেইজন্যই বলি, আত্মা যাহা, তাহা আত্মাই। আত্মা এক প্রকার, আত্মজ্ঞান অন্য প্রকার, এবং আত্মজ্ঞান হইতে যে আনন্দ বিকাশিত হয়, তাহা অপর আর এক প্রকার। সুতরাং আত্মজ্ঞান এবং তজ্জনিত আনন্দের সহিত আত্মার অভেদত্ব আছে বলা যায় না। কারণ একই অদ্বিতীয়, নির্বিকার ও অপরিবর্ত্তনীয় আত্মা তিন প্রকার হইয়া বিকাশিত হইতে পারেন না। সেইজন্যই বলি, আত্মজ্ঞান আত্মার এক প্রকার বিকাশ নহে। আত্মজ্ঞান-জনিত আনন্দও সেই আত্মার অপর আর এক প্রকার বিকাশ নহে। কারণ আত্মা, আত্ম-জ্ঞান এবং আত্মজ্ঞান-জনিত আনন্দ পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঐ তিনই যদি এক হইত, তাহা হইলে ঐ তিনের ত্রিবিধ বিকাশও দেখিতাম না। তাহা হইলে ঐ তিনে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যও দেখিতাম না। আত্মা নির্বিকার অপরিবর্ত্তনীয় ও সত্য যদি বল তাহা হইলে তোমাকে আত্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান-জনিত আনন্দকে মায়ারই দুই প্রকার বিকাশ বলিতে হয়।

ক্রমশঃ

টি, এস, এলিয়ট

শ্রীমধুসূদন দাশ

সাহিত্যে বিষয় বস্তু ও আঙ্গিকের দিকে থেকে গতানুগতিকতার পথ ছেড়ে নূতন ধারার প্রবর্তনে আধুনিকতার যাত্রা সুরু হয়। আধুনিকতার প্রথম পরিচয় অবশ্য তার বর্তমানতা। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যকে আমরা আধুনিক সাহিত্য বলি না। কেন না সে সাহিত্য অতীতের। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যকে আমরা আধুনিক সাহিত্য বলি, কেন না তা বর্তমানের।

আধুনিকতার কোন নির্দিষ্ট ঝোঁক আছে বলে আমি স্বীকার করি না। বাস্তবমুখিনতা ও সমাজ-চেতনাই আধুনিকতার একমাত্র বিশেষত্ব বলে মনে করবার কিছু কারণ নেই। আধুনিক লেখক রোমান্টিক হতে পারেন, আদর্শবাদী হতে পারেন, নিছক আত্মকেন্দ্রিকও হতে পারেন। এমন কি তিনি ঐতিহ্যের মধ্যেও ফিরে যেতে পারেন, তবু তিনি আধুনিক। কেন না তাঁর আলোচিত জীবন-সমস্যা বর্তমান কালের পরিবেশেই উদ্ভূত। তিনি আধুনিক, কেন না তিনি তাঁর কথা বলতে গিয়ে সাধারণতঃ পুরাতন ধারার অনুবর্তন করেন না। সাহিত্যে প্রত্যেক কালের একটা বিশিষ্ট রূপ থাকে, ইংরেজী সাহিত্যে এলিজাবেথান যুগের সাহিত্য ও ভিক্টোরিয়ান যুগের সাহিত্য এই দুইয়ের রূপ আলাদা। আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যও তেমনি একটা আলাদা রূপ নিয়ে গড়ে উঠছে। মোটামুটি ভাবে বলা যায় ইংরেজী সাহিত্যে আধুনিক কালের যাত্রা সুরু হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। টি, এস, এলিয়ট ইংরেজি কাব্য সাহিত্যের দিক থেকে আধুনিকতার মূর্ত প্রতীক। কোন সমালোচক বলেছেন True, it is difficult to grasp the meaning of Eliot's poetry. But it is not so much the meaning of the impression or the passion that he conveys to his readers. ...His own views on the nature of poetry is double important। একথা সত্য আমরা সব সময় এলিয়টের কাব্য বুঝে উঠতে পারি না। তাঁর সৃষ্টিভঙ্গি ছিল মননধর্মী। জগৎকে তিনি শুধু অনুভব দেখেননি। দেখেছেন খণ্ডরূপ হিসাবে, দেখেছেন Waste Land হিসাবে। এলিয়টের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা হল 'The Waste Land'। কবিতাটী প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের চার বৎসর পর। এতদিন পরে প্রতিধ্বনি শুনতে পাই Love Song of Prufrock-এর; কিন্তু Love Song এ ফুটে উঠেছে ব্যক্তি বিশেষের শূন্যতার অনুভূতি, The Waste Land এ ফুটে উঠেছে একটা সভ্যতার শূন্যগর্ভতার কথা, ধ্বংসময়তার ছায়া পড়েছে মানুষের সমষ্টিগত জীবনের উপর। কি রকম যেন যন্ত্রচালিত হয়ে পড়েছে সব বর্তমান সভ্যতার পরিবেশে।

"Out of this stony rubbish, son of man,
You can not say or guess for you
know only,
A heap of broken image. Where the
sun beats.
And the dead tree give no shelter,
the cricket no relief.

You can not say or guess—শুনতে পাই Prufrock-এর প্রতিধ্বনি, Do not ask why :—কি হবে প্রশ্ন করে? তবু প্রশ্ন জেগেছিল Prufrock-এর প্রেম-সঙ্গীতে।

"And would it have been worth after
all,
After the cups, marmalode, the tea,
Among the porcelainx, among some
talk of you and me"

শূন্যতার ছাড়া সম্পাত হয়নি শুধু মনে, শূন্যতার অবয়ব অনুভূতিতে জিজ্ঞাসু মন ভাবে আর কি হবে যেনে। তবু এই মনের গভীরতায় কি এক প্রশান্তি উঁকি ঝুঁকি মারছিল, কি এক প্রশ্নোত্তর চরম মীমাংসার পরম শান্তির বাণী বহন করে আনবে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তাঁর Gerontion কবিতায় ইংগিতে পাই।

"We would see a sign
The word within a word, unable to
speak a word.
Swaddled with darkness in the
juvenescence of the year."

Waste Land এর পরিবেষ্টনী থেকে মুক্তি চেয়েছেন কবি। উদ্গত হয়েছে তাঁর কণ্ঠে সেই আনন্দধ্বনি। একমাত্র ধর্মের মধ্যে পাওয়া যাবে এই মুক্তির সন্ধান। জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে অতীতের মধ্যে, ঐতিহ্যের মধ্যে, কিন্তু এর মুক্তি কিছু দেখেন নি টি, এস এলিয়ট। চরম নৈরাশ্যের মধ্যে তিনি অকস্মাৎ আপনার অন্তরের মধ্যে অনুভব করেন পরম আনন্দের আস্বাদ, যে আনন্দের অস্পষ্ট আভাষ তিনি প্রথম নিজেই পেয়ে এসেছেন। এই আনন্দ ও শান্তির উপলব্ধি তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে ধর্মের পথে, গীর্জার পথে। তাই দেখতে পাই তাঁর পরবর্তী রচনার মধ্যে ধর্মের জয় ঘোষণা করা হয়েছে।

টি, এস, এলিয়টের কবিতার মাধুর্য্য বুঝান যায় না, তাঁর কবিতার লাইনগুলো না পড়লে, আশ্চর্য শব্দ সমন্বয়, পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দের বিমুক্ত ভঙ্গিমা সব মিলে একটা ভাবময় ইঙ্গিত দিয়ে যায়; যেন কতো কাহিনী, কতো অতীত ও অনাগত ভবিষ্যত পাঠকের মনের কাছে উঁকি ঝুঁকি মারে। এ কথা ঠিক খুব ভাল পড়াশুনা না থাকলে এলিয়টের কবিতা বিশদভাবে বুঝা সম্ভব হয় না। যতটুকু বুঝি এবং যতটুকু না বুঝি সব মিলিয়ে একটা রসময় আবেদন জাগিয়ে তোলে তাঁর কবিতা। তাঁর The Waste Land কাব্য সৃষ্টি হিসাবে এক সুন্দর আলেখ্য। সত্যই একথা বলা চলে "It is impossible to give even the barest idea of all that T. S. Eliot wrote in a newspaper article whose purpose is to pay homage to the departed soul. Here his poetic dramas have not even been touched upon. He was the modern poets' poet."

জীবন বিমুখ তুমি ?

॥ শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বক্সী ॥

বিলাস তন্দ্রালু চোখে রোগ শোক জরা ও মরণ
সুতীব্র আঘাত হেনে করেছিল তোমা সচকিত;
ব্যথাহত হৃদয় তাই, সুগভীর ব্যথায় মথিত—
জীবন বিমুখ হল; সৃষ্টি হ'ল দুঃখের দর্শন।

জীবন-বিমুখ, কিন্তু জীব প্রতি কি মহা করুণা
ছাগ বলি রোধিবারে আপনারে বলি দিতে যাও,
ব্যক্তি দুঃখ প্রশমনে সংঘের বিধান রচে যাও
দুঃখী মানুষের দুঃখে ভুলে যাও নির্বাণ-সাধনা।

সুখের পশ্চাৎ পটে দুঃখের প্রকট চিত্রখানি
অন্তরে মুদ্রিত হয়ে সৃজেছিল গভীর ব্যঞ্জনা,
সম্যক্ দৃষ্টিতে তাই জীবনকে দেখা ঘটিল না;
যদিও সংস্কার মুক্ত সত্তা দ্রষ্টা তুমি মহাজ্ঞানী।

জীবন বিমুখ তুমি ? ইহা বাহ্য—সত্য ইহা নয়,—
কে জানে এ যুগে এসে পেয়ে যেতে জীবনেরই জয়!

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৩—

(৪৯)

শুধু তোমার আশীর্বাদ এত আঘাতের মধ্যেও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। কত আঘাত আমার বুকে—তবু তো আমি আগাইতে চাই। ইহা আমার গায়ে লাগে নাই। তুমি আমার সঙ্গে আছ। বেলা ৪।৷০-টার পর পাঠ আরম্ভ হয়। আজিকার আনন্দবাজারে পাঠের খবর বাহির হয়। পুলিন ছাড়া পুরুষ শ্রোতা আর কেহ ছিল না। পাঠের এই অবস্থা আমার জীবনে কোনও দিন হয় নাই। কেন এইরূপ হয়? বর্তমানের আলোচনায় এত psychological analysis থাকে, আসক্তি অনাসক্তির মধ্য পথের আলোচনা এত স্পষ্ট থাকে যে, মানুষ তাহা শুনিতে প্রস্তুত নয়। কেহ তো সত্যিকার জীবন চায় না। শাস্ত্রপাঠ শুনিবার একটা আকাঙ্ক্ষা মানুষের আছে। কিন্তু এখানের আলোচনা জীবনে আনিবার মত আলোচনা। শুনিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না। মানুষ তাহা পারে না। তাই সরিয়া যায়। একাই থাকিব ঠাকুরকে বুকে করিয়া। এই অবস্থারও প্রয়োজন ছিল। এত লোক নিয়াই জীবনে ছিলাম যে আজিকার এই নিঃসঙ্গতায় হাঁপাইয়া উঠি। দুই-ই হজম করিতে হইবে। এইরূপ একা হওয়ার প্রয়োজনও ছিল। ইহারা যদি 'মানুষ' হয়, তবে আগাইতে পারিব। একেবারে তো নিঃসঙ্গ করেন নাই। একান্ত নিঃসঙ্গ হইলে কৈবল্য হইতে পারে, লীলা হয় না, কাজ হয় না। সংস্কারে বদ্ধ মানুষ সর্বসংস্কারবর্জিত জীবনের আলোচনায় হাঁপাইয়া উঠে। বিশেষ কোন সংস্কারকে আঁকড়াইয়া ধরিতে না পারিলে মানুষ দাঁড়াইতেই পারে না। আজ তাই সব দূরে চলিয়া গিয়াছে। আমার জীবনের ভার কেহ গ্রহণ করিতে পারে না। আমি চলিবই। কোথাও আটকাইয়া গেলে আমার চলিবে না। দুকূলত্যাগিনী রাধারাণী আমার জীবনে আসিয়াছেন, তাঁহার জীবন-সঙ্গিনী আমি। আমিও ভাসিয়া চলিব। বাঁধন ছেঁড়া আমি। সকালে বেণু গোস্বা হইতে বিনয়ের কামিনী-কাঞ্চন বিষয়ক উক্তি পড়িয়া শুনায়। একদল ভালোর দিকটাকে, অপর দল মন্দের দিকটাকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। কেহই ষোল আনা সত্য বলে নাই। ৭টার পর গৌর সাহা, নচিকেতা ভরদ্বাজ প্রভৃতি আসে।...

২৬শে এপ্রিল

ঠাকুর, আমার অহঙ্কার বুদ্ধি মন প্রাণ ও দেহ তোমার শ্রীচরণ ছুঁইয়া থাকিবে, আমার মন তোমাতে নিবিষ্ট হউক, প্রবিষ্ট হউক। তোমার সবকিছু আমার জীবনে সঞ্চারিত হউক, আমি তদ্ভাবভাবিত হই, তুমি বলিয়া যাই। তোমার জীবনের ছাঁচে আমার সব কিছু গড়িয়া উঠুক। আমি তোমাকে বহন করিয়া বেড়াইব। আমার জীবনে বিশ্ব তোমাকে দেখিবে—এই অধিকার আমায় দেও। তুমি কি লুকাইয়াই থাকিবে? ওগো বিশ্বপ্রাণ, সমস্তাকুল এই বিশ্বের যে বড় প্রয়োজন তোমাকে দিয়া। তোমার শ্রীচরণ ছাড়া কোথায় পথ? বিশ্ব আজ দিশে-হারা। জাগো তুমি প্রাণ। আমি কি এমন করিয়া ছটফট করিয়াই মরিব? তোমার কথা, তোমার জীবন ও দর্শন বলিয়া বলিয়া বেড়াইব, ইহাই তো ছিল আমার স্বপ্ন। পূরণ তাহা হইল কই? একদিন তুমিই হাত ধরিয়া বাঙ্গালার বুকে দাঁড় করাইয়া ছিলে বরিশাল কনফারেন্সে বক্তৃতার ছলে। আবার কি সেদিন আসিবে না? সকালে অল্প ঘুরিয়াই ফিরি। ৯টার পর প্রাণহরি আসে, এখানে প্রসাদ পায়। ১০।টার পর পানিহাটির যতীন মজুমদার ও তাহার ছোট ভগিনীপতি চারুবিকাশ হইয়া এখানে আসে। তাহারাও এখানে

প্রসাদ পাই, ৪টার পর যাই। একত্র বসিয়া সকলে খাই। আমাদের দর্শন সম্বন্ধে—ব্রহ্মচর্যের বর্ত্তমান রূপ, ধর্ষিতা নারীর সমস্যা, অস্পৃশ্যতা বর্জনের সমস্যা বিষয়ে বহু আলোচনা হয়। ...নন্দরাণীর খুঁপুতে T. B.র বীজাণু পাইয়াছে। ...চিকিৎসা করিতেই হইবে আছি যখন বাঁচিয়া।...উষাদিদীর সঙ্গে ৩০ টাকা দিলাম ...আবার এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল নন্দরাণীর অসুখে।

২৭শে এপ্রিল

ঠাকুর আমার, বন্ধু আমার, তুমি এই যাত্রাপথে সঙ্গী আমার, তুমি সকল ঝড়ের মাঝে আমার স্থির নিশ্চিত আশ্রয়, সকল পরিণামের ভিতরে তুমি অপরিণামী। ঝড় ঠেলিয়া আজিও যে চলিতে পারিতেছি, সে শুধু তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় পাইয়াছিলাম বলিয়াই। তুমি আমার শরণ, সুহৃৎ। তোমাকে বুকে করিয়া চলিব, আগাইব। তোমার আসন বিশ্বের বুকে রচনা করিবার লালসা লইয়াই পথে পথে কত না কাঁদিয়াছি। সে আশা কি আমার সফল হইবে না ?...সত্যব্রতের সঙ্গে ৮-এ-তে যাই।...নন্দরাণীর এবারকার অসুখের মূলে রহিয়াছে বেশী দৌড়াদৌড়ি। আমি বারবার মানুষের কর্ত্তব্য বাতলাইতে গিয়া অপ্রীতিভাজন হই। অথচ মানুষ নির্বোধ, নিজের মত নিজে চলিতে পারে না। আমি সরিয়া দাঁড়াইতে পারিব না। আখিক দিক দিয়া কি আমার এই দায়িত্ব নিবার অধিকার আছে ? শুধু তো প্রাণের দায়ে নিতেছি। নিত্যব্রতের মত অসহায় কেহ নাই। লোকও নাই, অর্থও নাই। তাই আমি আছি। আমি যদি দায়িত্ব না নিতাম, নিত্যব্রতের কি অবস্থা হইত ? পাঠ হয়। উজ্জলভারত হইতে 'শতবার্ষিকীর প্রস্তুতি' প্রবন্ধটী। প্রেস কমিশান হইতে একটি চিঠি আসে ডকুমেন্ট ও স্টেটমেন্ট পাঠাইবার জন্য। রায়েন-বাবুর নিকট হইতে একটি উত্তর লিখাইয়া আনা হয়।

২৮শে এপ্রিল

ঠাকুর, তোমার স্পর্শে আমার জীবনের যে ঘটনাটী বা যে অংশটী তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে, আমার জীবন পথে আগাইবার পথ অনুকূল হইয়া আছে, তাহার সঙ্গে আমি যুক্ত থাকিয়া সেই তীর্থ ক্ষেত্রকে আমার জীবনের উদাসীন ও প্রতিকূল ঘটনাসমূহকে তীর্থক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিব। তোমার জীবনে স্ব-পরভেদ বিজাতীয় ও সজাতীয় ভেদ তিরোহিত, তাই তুমি রাসলীলানায়ক। আমার জীবনে তোমার মহারাসলীলা অমিয়া উঠুক। এমন মানুষ নাই যাহার জীবনের কোনও না কোন অংশ তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে। আমি সেই জীবন তীর্থে যোজ যোজ গড়াগড়ি দিব। 'কঠিন ভূয়ে এ হৃদয়ে তোমার পদচিহ্ন আছে আঁকা'। যত কঠিনই মানুষ হউক না, তোমার পদচিহ্ন বুকে আঁকা আছেই। আমি ও রেণু ৮টার পর বাহির হই। রেণু যায় জ্যোতীশ বাবুর বাসায় প্রেস কমিশানের চিঠিতে লিখিত...অসু। আমি ৮-এ-তে। ১ ঘণ্টা পরে ফিরি।...আমি বলিলাম fatal হইবে না তো ? ধীরেন ডাক্তার বলিল, 'সারিয়া যাইবে'। জটিলতা ব্রহ্মজ্ঞানের ক্ষেত্রেও মানিয়া লইয়াছিলাম বলিয়া কি সব জটিলতা আসিয়া ভিড় জমাইতেছে জটিলতার মধ্যে রাধারাণী আমার, তুমি থাকিও জটিলতা পরিবেষ্টিত শ্রীরাধারাণী আমার, তোমার অমৃত পরশ যেন সব জটিলতা পরিপাক করিবার আরক-রস প্রদান করে। রাধারাণী আমার, পরাণ পুতলী আমার তুমি আমার, আমি তোমার। সকালে ৮-এ-তে গত পার্থ-পত্র 'অ, আ' লিখিয়া দেখাইয়াছে, তাই ৵০ আনা করিয়া দেই। বুঝ শুন হইতে আসিলে তাহাকেও দেই।...

২৯শে এপ্রিল

ঠাকুর, তোমার জীবন ও দর্শনকে ধরার ধূলিতে ছড়াইয়া দিব, তাহার ছাঁচে ব্যক্তিগত জীবন বিশ্ব-জীবন গড়িয়া তুলিব—এই নেশায় বিভোর হইয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম। আর পারিলাম না বুঝি এত ঝড় ঠেলিয়া তোমার যে 'জীবন' আছে, একটী 'দর্শন' আছে যাহা বর্ত্তমান বিশ্বের সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম—এই বোধ কি আমার মনঃকল্পিত ? এত বুদ্ধি আমার নাই যে, আমি দাড়াইয়া পোছাইয়া একটা মতবা

খাড়া করিব। তুমিই তো স্তরের পর স্তর এই দর্শন আমার সামনে প্রকট করিয়াছ। কৃষ্ণ আমি কোনও দিনই চাহি নাই, তুমি কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করিয়াছ, পরে রাধারূপে আসিয়াছ, তাহার পর গৌররূপে। এই সবই আমার খেয়াল? ঠাকুর, আমার পথ পরিষ্কার কর। তোমাকে বুকে লইয়া আমাকে তোমার পথে আগাইতে দেও। সকালে প্রাণহরি আসে।...৩টার পর ৮ এ-তে যাই। নন্দরাণীর জন্ম বৃদ্ধির দিকে।...

৩০শে এপ্রিল

ঠাকুর, এই আশা করিয়া বাহির হইয়াছিলাম যে, এই বিশ্বের বুকে তোমার আসন রচনা করিব, কর্ম-ক্ষেত্রের বুকে প্রেমের ক্ষেত্র গড়িয়া তুলিব। আমার প্রাণের এই 'আশা' তোমারেই কহিব, বার বার কহিব। সুখদুঃখ যাহা পথে মিলিবে, তাহা কর্মফল মনে না করিয়া তোমার হাতের দেওয়া বলিয়া বহিয়া চলিব, অচঞ্চল ভাবে মাথা পাতিয়া নিব। 'বড়ই প্রাণ যখন আকুল হইবে' সংসারের ধাক্কায় ধাক্কায়, 'কই আমার নিত্য-গোপাল, কই আমার সখা সাথী বন্ধু সুহৃৎ স্বামী' বলিয়া ডাকিব। তোমার চরণ বুকে লইয়া চলিব। বড় রুঢ় যে ঠাকুর! আমার আশা কি দুরাশা? ইহা কি তোমার প্রেরণা নয়? আমার পথ চলিবার যাহা কিছু অনুকূল তাহা করিয়া দেও। আমি ও গোপা একটু ঘুরিয়া আসি। রেণু-প্রতিভা-গোপা আজ সারা মাসের জন্য মুদি দোকানের জিনিষ কিনিয়া আনে। দাম প্রায় ২৭ টাকা। রান্নার জন্যও একটী লোক রাখার কথা হয়। এখানে একজন উপস্থিত না থাকিলেই খুব অসুবিধা হয়। রান্না ও বাসনমাজার একজন লোক থাকিলে সকলের শ্রম ও সময় বাঁচে। ৪টার পর আমি ৮ এ-তে যাই।...'কেবল আমি'-র উপলব্ধি না থাকিলে কি মানুষ এই বিশ্বের মধ্যে, এমনকি নিজ দেহ লইয়াই, তিষ্ঠিতে পারে? 'আমি'-র চারিদিকে সব-কিছু তো পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে, এতবড় একটা চঞ্চলতার মধ্যে থাকিয়া সকল চঞ্চলতা পরিহার করিয়া একটা অচঞ্চলতার আস্বাদন না থাকিলে কি করিয়া মানুষ মাথা ঠিক রাখিবে? কাহারও মুখাপেক্ষা করার অধিকার কি কাহারও আছে? স্ত্রী-পুত্রপরিবার, এমন কি নিজের শক্তি, নিজের দেহের অপেক্ষা করিবার অধিকারও কি কাহারও আছে? 'কেবল আমি'-র উপাসনায় এ দেশের প্রাচীনেরা এত করিয়া মূল্য দিয়াছেন। কাহারও উপর অভিযোগ না করিয়া কেবলমাত্র ধ্যানই মানুষ করিবে। আর সব তাহার সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া যুক্ত হইবে। আমি আমার হইলেই তবে সব-কিছু আমার হইলেও হইতে পারে, তখন আমি ও বিশ্ব এক জীবন ধারার অভিব্যক্তি। এই আমিই পুরুষোত্তম 'আমি', আমার সত্তা সার্থক আমি। পাঠ আজ হয়।...

১লা মে

ঠাকুর, আমার প্রাণবল্লভ, আমার সকল কর্ম, সকল জ্ঞান ও সকল আনন্দের স্বামী আমার, আমার জীবন তোমার জীবনে ও দর্শনদ্বারা প্রভাবিত হউক, আমি তোমার আমি বনিয়া যাই, আমি যেন তোমাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্তও না চলি। আমার দেহমনপ্রাণে কি তুমি ফুটিয়া উঠিবে না? ওগো রাজরাজেশ্বর, আর কতদিন ভিখারীর মত সকল রিক্ততা লইয়া চলিব? কেমন করিয়া কাজ হইবে? মানুষ যে ঐশ্বর্যের দাস, প্রেমের মাধুর্যের পিছনে যদি ঐশ্বর্য না থাকে, কেবল মাধুর্যে যে মানুষের মস্তক বিগড়াইয়া যায়। যাহার যাহা পাইবার আমি তো পূর্বেই দিয়া দেই, যাহাতে তাহার সঙ্গে পরিচিত হইতে হইতে মানুষের 'আমি' সহজে গলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু আর তো পারিতেছি না। মানুষ আমার ভালবাসার সততার সুযোগই নিয়াছে, মানুষ হয় নাই। তোমার চরণে মাথা রাখিয়া চলিব—এই আশীর্বাদ কর ঠাকুর। সকালে একটু বেড়াইয়া আসি।...৪টার মনু আসে...।...অনেকদিন পর মনুর সঙ্গে কথা হয়। সেও তাহার মা এখানে নাই বলিয়া আমার সঙ্গেই কথা কয়।...সকালে প্রাণহরি আসে।... তাহার বড় অধিক অনটন। শুনিয়া কষ্ট হয়। কি করিব? ২০।২৫ টাকা মূলধন হইলে সে কিছু ঔষধ বিক্রয় করিয়া পাইতে পারে। তাহাও তাহার নাই।...

তাহার জন্ত আমার বড় বেদনা হিয়। করিবারও কিছু নাই।

২রা মে

ঠাকুর, 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা, এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথ-হারা। 'যেথা আমি যাই না কো, তুমি প্রকাশিত থাক, আকুল নয়নজলে ঢালো সে কিরণধারা। তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে, তিলেক অন্তর হলে না হেরি কূলকিনারা। কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি। অমনি ও মুখ স্মরি সরমে সে হয় সারা।'—তোমার শ্রীমুখ, যে মুখ হইতে সদা হাসি, অভয়বাণী বিচ্ছুরিত হইত, সেই মুখ আমার মনে সদাই জাগিতেছে। তোমার মুখ যেন আমার মনে সর্বদা জাগরূক থাকে। আমার অচঞ্চল ধ্রুবতারা তুমি এই সদা চঞ্চল অনন্ত তরঙ্গ-সঙ্কুল জীবন-সমুদ্রের এই বুকে। তোমার নয়নে নয়ন মিলাইয়া আমি চলিব। উপরের গানটী আজ প্রার্থনায় গাই।...৪-৪০ এ গীতাপাঠ আরম্ভ হয়। বিনাশমব্যয়স্ত ন কশ্চিৎ শ্লোকটী কিছু আলোচনার পর তাহার পরের শ্লোকটী আলোচিত হয়।...

৩রা মে

ঠাকুর, তুমি আমার ধন, তুমি আমার জন। আমার অন্ত ধনও নাই, অন্ত জনও নাই, আমার অন্ত সহায় নাই, সম্বল নাই। 'তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে'। তোমার সেই সস্নেহ আহ্বান, সকরুণ চাহনি আমার মনে জাগিতেছে। উহাই তো আমার সারা জীবনের ধ্যান-জ্ঞান। যেদিন ১৯১৯-এর ১ই ফেব্রুয়ারী পথে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেইদিন হইতে তোমার আঁকা পথে চলিতে চাহিয়াছি। অতীতের সমস্ত পথ আজ বিলুপ্ত। নূতন পথ আজও পাকা হয় নাই। সেই অস্পষ্ট পথ ধরিয়াই তো চলিয়াছি, যাহাতে তাহা ক্রমশঃ স্পষ্টতর হয়। সে সুযোগ তো আমার হইল না। দিন তো গেল। এখনও কি সে সুযোগ দিবে না? পথ হইতে সরি নাই। সে তোমারই আশীর্বাদ বটে। কিন্তু পথ তো বাঁধা হইল না, তোমার প্রতিষ্ঠান তো গড়িয়া উঠিল না, যেখানে আসিয়া মানুষ সত্যিকারের পথের খোঁজ পাইবে। ঠাকুর, ঠাকুর, আমায় সুযোগ দাও। গোপালসহ একটু ঘুরিয়া আসি। রেণু তাহার 'গোরা' (জ্যৈষ্ঠ মাসের) পড়িয়া শুনায়। ৬টায় শিশির আসে।... ঠাকুরের লেখা পাঠ হয়। ইন্দুলেখা ঠাকুরের জন্ত লুচি... দিয়া যায়। পাঠে উপস্থিত থাকে। এইবার পথে আসিয়া কতদূর খোয়াইব, কে জানে? প্রেস হইতে 'নিত্যগোপাল শতবার্ষিকী' ১০০০ ও মাঘ মাসের গীতা রিপ্রিণ্ট পাঠাইয়া দিবে।...

৪ঠা মে

নিত্যগোপাল, কড়ের দেবতা আমার, ঝড়কে পাইমাত্রিক ভাবে স্বীকার করিয়া, তাহাকে পরিপাক করিয়া আগাইয়া যাইব, নূতন যুগের নূতন পথ সৃষ্টি করিবার জন্ত অবতীর্ণ তোমার এই প্রয়োজনকে রূপ দিবার জন্ত প্রাণপণ করিব—ইহাই ছিল আমার সাধনা। পারিলাম না বুঝি, কোনও দিকে কূলকিনারা নাই। তোমাকে বুকে লইয়া চলিব। ঘাবড়াইব না, চলিবই। তোমার স্পর্শে সব কড় নবীন সৃষ্টি আনিয়া দিবে। স্রষ্টা তুমি তোমার শক্তি আমি। গড়িবই। আমায় তুমি সব পুলিন বাজার করিয়া আনে। রেণু প্রতিভাকে দ চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালে যায়...। মিনুর শরীরম বাতবেদনা, কাশিও আছে। মিনুকে দিয়া রান্না করানে ভাল লাগে না। ...সমস্ত দিক দিয়া যেন আবেষ্টে চাপিয়া ধরিয়াছে। এই আবেষ্টনের মধ্যে মিনুকে এখা রাখা যুক্তিযুক্ত হইবে না। আমি তো কাহারো পুরোপু অভিভাবক নই, সকলের সব দায়িত্ব নিবার সাহস নাই। একান্তভাবে সন্ন্যাসী হইতাম, জৈবিক খোঁজখব তেমন করিয়া না রাখিলেও চলিত। উহা তাহাদে অদৃষ্টের উপর ফেলিয়া দিয়া আমি সে সম্বন্ধে উদাসী থাকিতে পারিতাম। কিন্তু যাহার দর্শনে জীবনের সব ঘটনাকে পুরুষোত্তম-ভাবিত করার সাধনা রহিয়াছে তাহার পক্ষে ঐ সব সাধনার কৌশল শিখাইতে হইবে প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে পরিচিত থাকিতে হয়। তা আমি সকলের সব ঘটনার সঙ্গে জড়াইয়া পড়ি। অং মানুষ নিজের সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন। তাহারা মাটি

দিকে দৃষ্টিই দেয় না। আকাশপথে তাকাইয়াই তাহারা চলিতে চায়। এইসব আকাশপথের যাত্রীদের লইয়া আমি নাস্তানাবুদ হইলাম।...গোপাল অধিকারী ও ঈশ্বর প্রামাণিকের পোষ্টকার্ড আসে।

৫ই মে

ঠাকুর, শরণ আমার, চতুর্দিকে দুর্যোগের ঝড় উঠিয়াছে, পথ তো সামনে নাই। আমি শরণাগত তোমার, শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণ ঠাকুর আমার। আমায় পথ দেও, বুকে বল দেও। তোমাকে নির্ভর করিব, তোমাকে বিশ্বাস করিব। তুমি আমার সব। স্বামী আমার, তোমার নাম করিয়াই তো পথে বাহির হইয়া ছিলাম। পথ কি মুছিয়া গেল? সারা জীবন তো হাত ধরিয়া লইয়া আসিয়াছ? কোনও আবেষ্টনই তো আমাকে এতদিন ধরিয়া ফেলিতে পারে নাই। আজ কি ধরা পড়িব? রেণু ৯টায় বাহির হইয়া ফেরে ১টার পর।... আজ সন্ধ্যায় রান্না করিবার জন্য একটি বাধুনী যোগাড় হয়।...মন যে মানবের অধীন নয়, মানবই যে মনের অধীন, মন যে ঈশ্বরের অধীন এইসব কথা আজ পাঠে হয়। তাই ভগবান নিজের মন নিজে দাবী করিয়া বলিতেছেন, 'মযোব মন আধৎস্ব', 'মন্মনা ভব' ইত্যাদি। ভগবানের মন ভগবানকে দিয়া দিলেই সব গোল চুকিয়া যায়। মন লইয়াই তো মানুষ ত্যাসাদে পড়িয়াছে। 'মন এব মনুষ্যাণাং বন্ধমোক্ষয়োঃ কারণম্'। ভগবান বলিতেছেন, 'আমায় মন আমাকে দেও'। তোমায় মন তুমি নেও ঠাকুর। আমার সকল সংকল্প বিকল্প ঘুচিয়া যাক। ৮ এ-তে সোমবার হইতে যাওয়া হইতেছেনা।

৬ই মে

'যদি এ মনে কভু পথ হারাই প্রভু তোমারি নাম লয়ে ডাকিব'—আমি কি পথ হারাইয়া ফেলিলাম? নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল, প্রাণ প্রিয়তম আমার, স্বামী আমার, কোথায় তুমি? আমি তোমাকে স্বামীভাবে চিঠি দিতাম। তুমি তো তাহা মানিয়া লইয়াছিলে। তোমাকে আরও নিবিড় করিয়া একান্ত করিয়া না পাইলে যে আমার আর চলিতেছে না। আমার মন তোমায়। আমার মনকে তোমার মনে গড়িয়া তোল। আমাকে জাগাইতে দেও তোমার কথা লইয়া। এই বিরাট সংসারে কি আমার কেহ নাই, যে তোমার পথে আমার সখার মত সহায় হইবে? রেণু চিত্তরঞ্জনে যায়। প্রতিভার chest free আছে বলিল। সোমবার আবার রক্ত দিয়া আসিতে হইবে পরীক্ষার জন্য। দুটার পর রেণু মিনুকে নিয়া যতীন ডাক্তারের ওখানে কাশির জন্য বুক দেখাইতে যায়। ৪টার মধ্যে ফেরে। বুকে কিছু নাই। রেণুর ডাক্তার বাড়ী যাওয়ার পর ইন্দুলেখা ঠাকুরাণী তাহার ছোট ছেলের বৃন্দাবন হইতে আনা প্রসাদ পাঠাইয়া দেয়। তাহা 'রাধারাণীর দান' বলিয়া মাথায় তুলিয়া লইলাম। যে দুশ্চিন্তা দুই দিন যাবৎ প্রতিভা ও মিনুকে লইয়া ভোগ করিতেছিলাম, পথ যেন একরূপ ঘুছিয়া গিয়াছিল, তাই বুঝি রাধারাণীর 'স্নেহ' আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোট থালাটুকু বারবার মাথায় রাখিলাম। কিছু পরেই বিমলা তাহার নিজের হাতে তৈরী কচুরি প্রভৃতি নিয়া উহাদের গাড়ীতে আসে। ...। [Positive এর ধ্যান, শুচিতার ধ্যান করা উচিত, অশুচির নয়। তিনি সদা শুচি। এই বিশ্বে কোথায় অশুচি? শুচিতাই তো মানুষের স্বরূপ। ...আজ শুচি অশুচি লইয়া বাড়াবাড়ি করার অধিকার কি আছে? ...রেণু আসরী হইতে 'নিবেদিতা' সম্বন্ধে গিরিজা রায় চৌধুরীর একটা প্রবন্ধ পড়িয়া শুনায়।

৭ই মে

'তোমার অসীমে মন প্রাণ লয়ে যতদূরে আমি যাই। কোথাও মৃত্যু, কোথাও দুঃখ বিচ্ছেদ কোথা নাই। মৃত্যু সে যবে মৃত্যুর রূপ ধরে দুঃখ হয় যে দুঃখের কূপ। তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই। হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে, যাহা কিছু সব আছে আছে আছে। নাই নাই ভয় সে শুধু আমারি নিশিদিন কাঁদি তাই'। তুমিই আমার ব্রহ্মসূত্র, তোমার সুতোয় সব গাঁথা বলিয়া কেহই আমার জীবনে হারায় নাই, মৃত্যুও আছে, নিত্যগোপালও আছে, যাহারা দূরে সরিয়া গিয়াছে, তাহারাও আছে। সকলকেই জীবনে উপলব্ধি করি। মালতী

প্রণতি আসে না—তবুও তাহারা আমার জীবনে আছে। সম্পর্কের মর্য্যাদা আমি রক্ষা করিয়াছি, নিজের দিকেও চাহি নাই। তোমার আমার চারি চোখের মিলনের ভিতর দিয়া বিশ্বকে দেখিব। তোমায় বাহিরে আমিও নাই। তোমার বাহিরে সবই মিথ্যা। রেণু সকালেই বাহির হয় ··১টার পর ফেরে। যাহাকে যখন ভালবাসিয়াছি, একান্ত করিয়াই ভালবাসিয়াছি। 'অন্য' বুদ্ধিতে কাহাকেও দেখি নাই। তাহাদের প্রয়োজনের কথা কোনও দিন আমার কাছে কাহাকেও বলিতে হয় নাই, তাহাদের প্রয়োজন যে আমারই প্রয়োজন।···। ঠাকুরের ঐ লেখাই আমি বুঝি, 'শিবের প্রতি জীবের অদ্বৈততা বোধ হইলে শিবের প্রতি জীবের যে ভক্তি হইয়া থাকে, তাহাকেই পরাভক্তি বলা যাইতে পারে'। আমি জীবনে কাহারও সঙ্গে 'মায়ে ঝিয়ে আলাদা মঙ্গলবার' করি নাই। আজ রবীন্দ্রনাথের জন্ম দিন, কিন্তু ভাবি, কয়জনে রবীন্দ্রনাথের প্রাণধর্মনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন? আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রাণধর্মনকে দার্শনিক ভাষায় উপস্থাপিত করিয়া সত্য সত্যই তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছি। ঠাকুরের লেখা পাঠ করি। আমরা ছাড়া কেউ ছিল না। 'শিব-কালী-রাধার সমষ্টি কৃষ্ণ' ইহা কি নূতন কথা! আজিকার পাঠে ইহা পড়া হইল। 'হৃদয়বেদী ভগবান পাইয়াছি' ইত্যাদি—ইহাও আজ পড়া হয়। পাঠের মধ্যে মহেন্দ্র দত্ত আসিয়া খবর দিয়া যায় যে, হরিদাস মজুমদার গত বুধবার হঠাৎ মারা গিয়াছে। আগামী রবিবার বিকাল ৫৪০টায় শীতাভবনে তাহার জন্য শোকসভা হইবে, আমাকে সেখানে পৌরোহিত্য করিতে হইবে।

৮ই মে

ঠাকুর, জীবের সকল দেহ প্রাণ মনের মধ্যে যে অনাদি অনন্ত কান্না রহিয়াছে, তাহার গতি শুধু তোমাকে গড়িয়া তোলা, তোমার বিশ্বকে গড়িয়া তোলা। আমাকে সেই অধিকার দেও। আমি কি তোমাকে বিশ্বাস করি না? বিশ্বাস যদি করি, তবে এত ভাবি কেন? তোমার উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হই না কেন? আবার মনে হয় তবে তো সেই abstraction আসিয়া পড়িল, মানুষের সঙ্গে, ঘটনার সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হইল। প্রার্থনার পরই আমি রেণু ও গোপা ট্রামে বেহালার জন্য রওয়ানা হই ।···ঠাকুর কোন উদ্দেশ্যে কি করেন বুঝা যায় না। একদিন যাহারা একরূপ অস্বীকার করিয়াছে, তাহাদিগকে পথে আনিবার জন্য হয়ত ইহারই প্রয়োজনীয়তা ছিল ।···পাবনা হইতে চিঠিতে লিখিয়াছে...। মানুষের পিছনে পিছনে ছুটিলাম, প্রাণ পাই নাই। বাঙ্গালার সকল ক্ষেত্র হইতে সরিয়া আসিয়াছি। ইহাদের মুখ চাহিয়াই আজ আছি। আর ইহারা আমার প্রাণ বুঝিল না। বেদনায় বুক ভরিয়া উঠে। কোনও দিন তো বড়দের খুঁজি নাই। ছোটদের সঙ্গে তাহাদের ছেঁড়া মাদুরেই শুইয়াছি। তাহারা কি তাহা বুঝিল, না বুঝি বদলাইল? আমার শক্তি বাহিরে গিয়াছে।···

৯ই মে

ঠাকুর, 'তোমা হতে যবে ফিরে নিমুখ আপনার পানে চাই', তখনই মরণ হয় বীভৎস মরণ, দুঃখ হয় অসহনীয় কিন্তু তোমার মুখের দিকে মুখ রাখিয়া যখন দাঁড়াই তখন মরণ মরণ থাকিয়াও অমরণ, দুঃখ দুঃখ থাকিয়াও রস। তখন মরণ দুঃখ জীবনকে রস-হিল্লোলে নাচাইতে থাকে। তোমার চরণ ছাড়া আমার চতুর্দিকে অন্ধকার শুধু জমিয়া উঠে। কেবল negative, কোথায় ে positive তখন লুকাইয়া যায়, তাহার কূল কিনারা থাকে না। তুমিই সকল হাঁ ও না এর সমষ্টিভূত পর 'হাঁ' বা পরম 'না'। সকল negative যখন negativ থাকিয়া যায়, কোনও positiveকে গড়িয়া তোলে ন তখন তাহা বর্জন বা সঙ্কোচ করিতেই হয়, তখ সঙ্কীর্ণতা বা দল বা ব্যক্তিকে লইয়া মশগুল থাকিলে চলে। কেন না সবই যে তখন 'না'। 'না' যখন 'হা হইয়া উঠে, তখনই 'যোগমায়া'। ১১টায় সুধাংশু আসে দুপুরে এখানে প্রসাদ পায়। ৪টায় পাঠ আরম্ভ হ ৫টায় শেষ করি। তাহার পর আমি রেণু ও সুধাং শীতাভবনের জন্য রওয়ানা হই। ৫-১৫ এ পৌঁছাই ৫৫ সভার কার্য আরম্ভ হয়। আমাকে সভাপতি করা হ

…অমৃতস্য পুত্রঃ ইহাদিগকেই আমরা বলি। 'তোমার অসীমে প্রাণমন লহে' গান গাই। ভগবানের দিকে মুখ করিলে মরণ হয় অমরণ, অমৃত। নচিকেতা, অর্জুন মরণের মধ্যে ঐ অমরণের খোঁজ পাইয়াছিলেন। হরিদাস ছিলেন অমৃতের উপাসক। তাঁহার জীবন ছিল সহজ সরল অনাড়ম্বর। ধনী হইয়াও বন্ধুদের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে সহজভাবেই চলিতেন। তিনি বড় বড় অনেক কিছু করিয়াছেন, কিন্তু ছোট ছোট মানুষদের ছোট খাট বেদনার সঙ্গে তিনি যুক্ত থাকিতেন। তিনি প্রজ্ঞাবাদীই ছিলেন, প্রাণবাদীও ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত পরিবারগত, সমাজ ও বিশ্বজীবনে সার্থক হইয়া ছিলেন। নরনারায়ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর ৬ মাস ৪৫৲ টাকা করিয়া বাড়ী ভাড়া দিয়াছেন। সহস্র সহস্র মানুষ তাঁহার সাহায্যে জীবনপথে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন।

১০ই মে

ঠাকুর, তুমিই আমার আজ একমাত্র সঙ্গী, যখন সবাই আমার কাছ হইতে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আমি একান্ত নিঃসঙ্গ—যে একদিন লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে বিচরণ করিয়াছে। আমার বর্তমান আলোচনা definite, psychological, উহার মধ্যে ভাবুকতা নাই। মানুষ ইহার সঙ্গে তাহার পার্থক্য সহজেই ধরিতে পারে। ভাল তাহাদের অন্তরে অন্তরে লাগে, কিন্তু চলিবার কৌশল শেখে নাই। তাই মরিয়া পড়ে। অথচ ইহা ছাড়া অন্য পথও তো নাই। তোমাকে বুকে লইয়াই চলিব, যদি কোনও দিন আসে এই আশায়। তোমার জয় হউক।…ধীরানন্দ (বুদ্ধ মঠের) আসে।… শতশত টাকা খরচ করিয়া হাসপাতালে ভর্তি হইয়া প্রতিকার চিকিৎসা করা সম্ভব হইবে না আমার। যমুনার যাহা সম্বল, তাহাতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ছাড়া অন্য কোনও চিকিৎসা করা সম্ভব হইবে না।…

১১ই মে

ঠাকুর, আমার প্রতি অঙ্গ তোমার দিব্য অঙ্গের সঙ্গে দিব্য মৈথুন যোগে যুক্ত হইয়া তোমাকে গড়িয়া তুলিবার জন্য অনন্ত কান্না কাঁদিতেছে। আমি তোমার মাঝে অমরণ করিব, তুমি আমার মাঝে অমরণ করিবে। তুমি আমি এক হইব। আমি সংসার-পরিত্যক্ত, লাঞ্ছিত, দীন। তুমি দীননাথ। তোমার রাতুল চরণই আমার মাথা গুঁজিবার একমাত্র স্থান। মানুষকে ভালবাসিতে চাহিয়াছি, তাহাদের প্রয়োজনকে নিজ প্রয়োজন মনে করিয়াছি, কিন্তু তাহারা তাহা বোঝে নাই। তাহাদের 'আমি' এতটুকুও নত হয় নাই। তাহাদের দাবী আর তো পূরণ করিতে পারি না।… আমি জানিলেই তো তাহাদের সব জানা হওয়া উচিত ছিল। যা-খুশি খেয়াল আমার যোগাইতে হইবে? ইহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। বেশ। তুমিও কেবল, আমিও কেবল। এইবার কেবলে কেবলে মিলিয়া এক হইব। গোপাকে লইয়া সকালে একটু ঘুরিয়া আসি।…অপরা প্রকৃতির এই ক্ষিপ্ততা কি রাধারাণী, তোমার আগমনে, তোমার স্পর্শে বিশুদ্ধ সত্ত্বে গড়িয়া উঠিবে না? সন্তান-পুত্তলী আমার, পুরুষোত্তম প্রতিষ্ঠার লালসা লইয়া মাইলের পর মাইল চলিয়াছি, কত যে চোখের জল পথে পথে ফেলিয়াছি, তাহা তুমি জান। তোমার পুরুষোত্তমকে কি আমি বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব না? কেন তুমি তবে আমার জীবনে আসিয়াছিলে? আসিয়াছিলে অযাচিত ভাবে। কোন্ প্রয়োজনে আমার জীবনে তুমি আসিয়াছিলে? তোমার আসা কি আমার জীবনে সার্থক হইবে না, আমার জীবন তোমার ভাবে ভাবিত হইবে না? আমি যে আর পারিতেছি না এই দুর্যোগ ঠেলিয়া চলিতে। ওগো অভিসারিণি, আমার এই অভিসার কি তোমার অভিসারে গড়িয়া উঠিবে না? পাঠ হয়। ইন্দুলেখা আসেন।…

১২ই মে

ঠাকুর, 'কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে তুমি তা জান প্রভু গো'। আমার জীবনে তোমার যাহা প্রয়োজন বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহাকে কার্যে রূপ দিবার জন্য প্রাণপণ করিলাম, জীবনের সকল সময় ও শক্তি ব্যয় করিলাম। আমার সেই বুঝ কি ভুল? আগাইতে তো পারিলাম না। চতুর্দিক হইতে সকল দুর্যোগ যেন ভরদায়িত হইয়া

উঠিয়াছে। আমায় বুঝাইয়া দাও আমার প্রয়োজন কি। তুমি যে শ্রীমুখে একদিন হুগলীতে বলিয়াছিলে, 'শরৎ, তোমার যখন যাহা প্রয়োজন ভগবান অন্তর্যামীরূপে তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছেন, তা কি বোঝ না' আমাকে আজ বুঝাইয়া দেও। ' তোমাকে দুর্যোগের ভিতর পথে কুড়াইয়া পাইয়াছি, তোমাকে বুকে লইয়া চলিব। আমায় বল দেও, বুদ্ধি দেও, নির্ভয়তা দেও, বিশ্বাস দেও।···হরিদাসীর বাসায় যাই।···পাঠ হয়। 'অল্প অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ' ইত্যাদি, তিনটী সোনার পুতুল ভাঙ্গিয়া গলাইয়া এক মিশ্রণ হওয়ার কথা, স্থূল হইতে সূক্ষ্ম অব্যক্ত, আবার সূক্ষ্ম অব্যক্ত হইতে স্থূল বৃক্ষ যেমন, তেমন জড় হইতে চৈতন্য এবং চৈতন্য হইতে জড় হওয়ার কথা পড়া হয়।···

১৩ই মে

নিত্যগোপাল, জীবনবল্লভ আমার, জীবনের পাঁচরঙ্গে সকল পরিণামকে পরিপাক করিয়া ওগো অন্তর্যামী, জীবনের ধ্রুবতারা আমার, যখন যে ভাবে থাকি তুমি আমার জীবনে প্রকাশিত থাকিও। যখন অবসাদের সমুদ্রের ধাক্কায় ধাক্কায় আকুল হইয়া পড়ি, চোখের জলে সিক্ত হই। তুমি সেই নয়ন জলে তোমার করুণাধারা ঢালিয়া দেও। তোমার সেই হাসিভরা মুখ আমার মনে সদা জাগে। তিলেক অন্তর হলে সব দিকে আঁধার অধিয়া উঠে। আমার হৃদয় যদি তোমার সমন্বয়ের পথ ছাড়িয়া কোনও একান্ততার পথ ধরিয়া চলে, তোমার সমন্বয়-ঘন মুখ স্মরণ করিয়া লজ্জায় তোমার চরণতলে মাথা নুইয়া পড়ে। ঠাকুর, সকলের আমাকে ছাড়িয়া যাওয়ার মাঝে তুমিই আদর লইয়া দাঁড়াইয়া আছ। তোমার স্নেহ-ভরা সম্বোধন আজও মনে জাগিয়া আছে। তাহাই ধ্যান করিব।···প্রতিভার শরীর খারাপ হইতেছে।··· লক্ষণ ক্রমান্বয়ে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

১৪ই মে

ঠাকুর, তুমি আমার 'পরাগতি'। দীক্ষা পাইয়াছিলাম 'চরৈবেতি চরৈবেতি' মন্ত্রে। ছুটিয়াই চলিয়াছি। প্রকৃতি পটের পর পট পরিবর্তন করিয়া চলিয়াছে। তোমার পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছি। আজ পর্যন্ত আটকাইয়া যাই নাই। প্রকৃতির মধ্যে এতটুকু স্থানও বুঝি নাই, যাহার সঙ্গে identified হইয়া সেখানে একটু দাঁড়াইতে পারি। পায়ের নীচ হইতে সবই যেন সরিয়া যাইতেছে। 'আকাশবৎ নিরালম্বঃ বায়ুবৎ নিরাশ্রয়ঃ' আমি। তাই তুমি আমার শরণ। ঝড়ের বুক চিরিয়া ঝড় পরিপাক করিয়া আমাকে আগাইতে দেও। এখানে যে কয়েকটী মানুষ আছে, প্রত্যেকেই স্থায়ী রোগী। এমন কাহার ভাগ্য হয় আমি ছাড়া? অথচ চলিতে তো হইবে ইহা লইয়াই। ১টার পূর্বে রেণু প্রতিভা চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে যায়।···

১৫ই মে

পরাণপুত্তলী রাধারাণী আমার, তুমি অযাচিত করুণায় আমার জীবনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলে। আমি তোমায় কিছু জানিতাম না। কোনও দিন তোমার কথা ভাবি নাই। তবু তো তুমি এলে। কিন্তু কি রূপে তোমায় পাইলাম? যে-তুমি সেই যুগে ছিলে জটিলা কুটিলা ভয়ে ভীতা, জটিলা-কুটিলাকে এড়াইয়া চাহিয়াছ পুরুষোত্তমকে, আজ তুমি কর্ত্রীরূপে জটিলা-কুটিলাকে পরিপাক করিয়া জটিলা-কুটিলার বুকে পুরুষোত্তম প্রতিষ্ঠা চাহিতেছ ভয়ে এড়ানো এবারকার রাধারাণীর জীবনে তো দেখিতেছি না। তুমি আজ বৈষ্ণবী কর্ত্রাণী। 'যো মাং জয়তি সংগ্রামে'—এই যুদ্ধ-ঘোষণা আজ তোমার মুখে ধ্বনিত হইয়াছে। তুমি জটিলা কুটিলার সঙ্গে আজ যুদ্ধ-ব্যাপৃত। আমি এমন তোমাকেই ভালবাসি। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব। তোমার জয় হউক আমার জীবনে

ক্রম

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

॥ শ্রীঅনিলকুমার সমাজদার ॥

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট (বাংলা ৬ষ্ঠ ভাদ্র ১২৭১) মুর্শিদাবাদ জেলার কাশীমবাজার মহারাজকুমার 'ডেমো' গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা মোগল যুগে অম্বরের রাজা মানসিংহের সঙ্গে বাংলায় এসে বসবাস করতে থাকেন। অবাঙ্গালী হলেও রামেন্দ্রসুন্দর মনে-প্রাণে সম্পূর্ণ বাঙ্গালীই ছিলেন। এঁদের বংশে কেউ কেউ বাংলা নাটক এবং কবিতা রচনা করেছেন। এইরূপ সংস্কৃতির পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে সাহিত্যপ্রীতি লাভ করেন।

পাঠশালা থেকে বিশ্ব-বিদ্যালয় পর্য্যন্ত মাত্র দু'একবার ছাড়া প্রতিবারই তিনি সর্বোচ্চ স্থান লাভ করতেন। ইংরাজী ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। পদার্থ ও রসায়নে এম, এ পাশ করে শিক্ষকতায় জীবন আরম্ভ করেন ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে। রিপন কলেজে প্রথম শিক্ষকতা সুরু করেন (বর্ত্তমানের সুরেন্দ্রনাথ কলেজ)। পরে তিনি এখানকার অধ্যক্ষ হন। শিক্ষক হিসাবে তাঁর যা সুনাম ছিলো তা কম শিক্ষকের ভাগ্যে জোটে। একবার আইন বিভাগ নিয়ে তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মতানৈক্য ঘটে এবং রামেন্দ্রসুন্দরই জয়ী হন। বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন বিরাট আকর্ষণীয়।

বি, এ পড়বার সময় হতেই তিনি সাহিত্য চর্চা শুরু করেন এবং নব-জীবন পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর বয়স যখন ১৪ বৎসর তখন তাঁর পরিজনদের ইচ্ছায় বিবাহ হয়।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অফ্ লিটারেচারের দ্বিতীয় বৎসরে প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যালের প্রস্তাবে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ নাম হয়। এই সময় থেকেই রামেন্দ্রসুন্দর যোগদান করে এই প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় বঙ্গলক্ষ্মীর কথা প্রকাশিত হয় এবং কবিগুরু স্বদেশী মেলার প্রবর্ত্তন করেন, রামেন্দ্রসুন্দর 'অরন্ধন ব্রত' প্রবর্ত্তন করেন। দেশ-প্রেমের সুমহান আদর্শ তাঁর অন্তরের মণি কোঠায় স্থান পেয়েছিল।

এখন আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাব-ভাষায় আপ্লুত কিন্তু সে সময় বাংলা সাহিত্যের রথী মহারথীরা রবি-ঠাকুরের নামে অগ্নিশর্মা ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে সেই সময় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকরূপে প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না, কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বিরাট কীর্ত্তি স্থাপন করেন। এর পর অবশ্য কবি গুরু নোবেল পুরস্কার পান।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে অভিনন্দিত করেন—"তুমি গত বিংশতি বর্ষাধিককাল যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ ও ঐকান্তিক অধ্যবসায় সহকারে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়াছ তাহাতে পরিষদ চিরদিন ঋণী ও কৃতজ্ঞ থাকিবে"।.....

নব জীবন, সাধনা, ভারতীতে তিনি নিয়মিত লিখতেন। তাছাড়া প্রকৃতি, জিজ্ঞাসা, মায়াপুরী, কর্মকথা, চরিত কথা, বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা, বিচিত্র প্রসঙ্গ, যজ্ঞকথা, নানা কথা, শব্দকথা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ কর্মকথা প্রভৃতি প্রবন্ধাবলী রচনা করেন। দুরূহ বৈজ্ঞানিক বিষয় সহজ বাংলায় প্রকাশ করা একমাত্র রামেন্দ্রসুন্দর আর আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুই পেরেছেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথের নাইট (knight) উপাধি ত্যাগের কথা রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে শুনেই তিনি শুব্ধ হয়ে পড়েন, আর এই শুব্ধতার

অবস্থার মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সৌন্দর্য্য-প্রীতি ছিল তাঁর মজ্জাগত বিষয় আর তাঁর নামের সঙ্গে 'সুন্দর' শব্দের সঙ্গে আশ্চর্য্য রকম সামঞ্জস্য ছিল। মোট কথা বাংলার নব জাগরণের সূত্রধরের মধ্যে যাঁরা ছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন তাঁদেরই একজন। মনে প্রাণে বাঙ্গালী না হলে মহামানবের সাগর তীরে এসে দাঁড়ানো সম্ভবপর হয় না। আচার্য্য যদুনাথ তাই বলেন: The Indian Renaissance was possible only because a principle was discovered by which India could throw herself into the full current of modern civilisation in the outer world without totally discarding her past. She could approach the temple of modern art and science not as a naked beggar, not as an utter alien, but as a backward and at present impovarished country cousin of Europe……The ground was prepared for this revolution in thought by the change in our education system which began in Bengal about 1810 and grew with increasing force from 1818 (Bengal will best serve as my illustration). Education through the English language was the lever which moved the mediæval Indian world after centuries of inertia under Muslim rule……

রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা ভাষাতেও অধ্যাপনা করতেন এবং বাংলা ভাষাতে এই বিশ্বাস নিয়ে করতেন যে বিদেশী ভাষার কৃত্রিম প্রচারের মধ্যে যান্ত্রিক শিক্ষাই হয়, এ দিয়ে প্রাণের দাবী মেটানো সম্ভব হয় না। শিক্ষার্থীর চিত্ত-বৃত্তি যাতে আলোকের দিকে প্রসারিত হয়ে যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত হয় তাই ছিল তাঁর মূল এবং প্রধান লক্ষ্য। জন্মভূমি এবং মাতৃ-ভাষার অকৃত্রিম অনুরাগই তাঁর মূল উপাদান। তাঁর সমস্ত জীবনই ঋষি জীবনের ত্যাগ-ধর্ম্মের তেজ তাকের তুলীখা মন্ত্রে অনুরণিত ছিলো।

শ্রেষ্ঠ ছাত্র শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মনীষী আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর স্বরূপত ছিলেন সুন্দরের পূজারী। আমরা জানাই শত সহস্র নমস্কার।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

॥ শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভূতানাং ছিদ্রদাতৃত্বং বহিরন্তরমেব চ।
প্রাণেন্দ্রিয়াত্মবিকাশং নভসো বৃত্তিলক্ষণম্ ॥

ভাগবত ৩।২৬।৩৪

আকাশের লক্ষণ বলিতেছেন—সর্ব্বভূতের ছিদ্র অর্থাৎ অবকাশ দাতৃত্ব, বহিঃ ও অন্তর ব্যবহারাস্পদ, প্রাণ-ইন্দ্রিয়-মনের নাড়ী আদির ছিদ্ররূপে বিকাশ অর্থাৎ আশ্রয়ই আকাশের বৃত্তিরূপ কার্য্যের লক্ষণ; সকল বৈচিত্র্যের স্ব স্ব রূপ লইয়া অব্যাহত থাকিবার পথ করিয়াছে এই অবকাশময় আকাশ; ছিদ্র বা অবকাশ এমনই করিয়া সব-কিছুতে ছড়াইয়া আছে বলিয়াই প্রতিটি স্পন্দন প্রত্যেকের কাছে অবাধ, অথচ কত নিকট; অন্তর বাহিরের আশ্রয় ঐ আকাশ বং খং ব্রহ্ম; দুইটি পরমাণুর মাঝে যে ছিদ্র রহিয়াছে, সেই ছিদ্রকে মুছিয়া ফেলিয়া কোনও দিনই পরমাণু দুইটি এক হইতে পারিবে না। পুরুষোত্তম

আকাশবান্।] তস্মিন্ [সেই হৃদয়াকাশে (অবস্থিত)] মনোময়ঃ [প্রাণ ইন্দ্রিয় ও মনের সর্বপ্রকার মধ্যে পূর্ণ] অমৃত [যত যত ইন্দ্রিয় ব্যাপারে পূর্ণ থাকিয়াও যিনি অখণ্ড, অচ্যুত, অক্ষয় অতএব মরণরহিত] হিরণ্ময়ঃ ["সোণার বরণ"] অন্তরেণ তালুকে [তালুদেশের মাঝে] য এষঃ [এই যে মাংসখণ্ড] স্তন ইব [মায়ের স্তনের মত] অবলম্বতে [লম্বমান আছে] সা ইন্দ্রযোনিঃ [সেই সুষুম্না নাড়ীই ব্রহ্মযোনি; শ্রুতি পরের সিদ্ধান্তটিকে পূর্বে শুনাইয়া পরে তাহাই খুলিয়া বলেন, যাহা effect, তাহাকে পূর্বে স্থাপন করিয়া কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার ভিতর দিয়া পুনরায় স্থাপন করা শ্রুতির একটী সুমহান কৌশল। পূর্বে effect-এর আস্বাদন দেওয়ানোই প্রয়োজন] (তাহার মধ্য দিয়া এবং) যত্র [যেখানে স্তনতুল্য যে মাংসপিণ্ডে] অধো [এই] কেশান্তঃ [কেশসমূহের মূল] বিবর্ত্ততে [বিবর্ত্তিত হইয়াছে] (সেই ব্রহ্মরন্ধ্রে উপস্থিত হইয়া যে সুষুম্না নাড়ী) ব্যপোহ্য [বিভক্ত করিয়া নির্গত হইয়া থাকে] শীর্ষকপালে [মস্তকের দুইটি কপাল খণ্ডকে] সা ইন্দ্রযোনিঃ [সেই সুষুম্না নাড়ী ব্রহ্মমার্গে] (এই পথের পথিক) ভূঃ ইতি অগ্নৌ [ভূঃব্যাহৃতি রূপে অগ্নিতে] প্রতিতিষ্ঠতি [প্রতিষ্ঠিত হন [ভুব ইতি বায়ৌ [ভুবঃ ব্যাহৃতিরূপে বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত হন। ছিদ্রপথেই পরম পুরুষকে খুঁজিতে হইবে; ছিদ্রের এপাশ-ওপাশ, এদিক-ওদিকে সারাজীবন হাতড়াইলেও তাঁহার কোনও খোঁজই মিলিবে না। প্রতি সম্প্রদায়ে এবং সম্প্রদায়-সম্প্রদায়ের মাঝে যে ছিদ্র রহিয়াছে, প্রত্যেক সম্প্রদায় যদি সেই ছিদ্রের খবর রাখিত, সম্প্রদায় টুটিত না, অপর সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধও হইত না। 'ছিদ্র'-পথ ছাড়িয়া সম্প্রদায়ের দিকে পা দিয়াছ তো মরিয়াছ, সম্প্রদায়ও মরিয়াছে, সব অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে, সব বায়ু বিষাক্ত হইবে। সর্ব্বদেবতার কৃপা পাইতে হইলে চাই ঐ ছিদ্রের পানে সর্ব্বদা অপ্রমত্ত দৃষ্টি রাখা।]

হৃদয়পদ্ম মধ্যে এই যে প্রসিদ্ধ আকাশ সেখানে সেই মনোময়, অমৃত, হিরণ্ময় পুরুষ বিরাজিত। তালুদেশের মধ্যে স্তনের ন্যায় ঝুলিয়া আছে যে মাংসখণ্ড উহার মধ্য দিয়া এবং যেখানে কেশের মূল বিভক্ত হইয়াছে সেখানে উপস্থিত হইয়া সুষুম্নানাড়ী মস্তকের কপালদ্বয় ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে, সেই নাড়ীই ব্রহ্মযোনি, ব্রহ্ম-মার্গ; ঐ পথের উপাসক ভূ-ব্যাহৃতিরূপ অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত হন, ভুবঃ ব্যাহৃতিরূপ বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত হন্। ১।৬।১

সুবরিত্যাদিত্যে। মহ ইতি ব্রহ্মণি। আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। আপ্নোতি মনসস্পতিম্। বাক্‌পতিশ্চক্ষুষ্পতিঃ শ্রোত্রপতি-বিজ্ঞানপতিঃ। এতত্ততো ভবতি। আকাশ-শরীরং ব্রহ্ম। সত্যাত্ম প্রাণারামং মন-আনন্দম্। শান্তি সমৃদ্ধমমৃতম্। ইতি প্রাচীনযোগ্যোপাস্স্ব। ১।৬।২

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ।

সুবঃ ইতি আদিত্যে [স্বঃ ব্যাহৃতিরূপী আদিত্যে] মহ ইতি ব্রহ্মণি [সেই ব্যাহৃতিরূপ হিরণ্যগর্ভে] (প্রতিষ্ঠিত হন্) আপ্নোতি [প্রাপ্ত হন] স্বারাজ্যম্ [যেন রাজত্বে স্বরাট্, তদ্ভাবঃ—নিজেকে দিয়াই নিজে দীপ্ত হওয়ার ভাবই স্বারাজ্য, যখন ভূ-রূপ অগ্নিতে, ভুবরূপ বায়ুতে, স্বঃ-রূপ আদিত্যে এবং মহঃরূপ ব্রহ্মহিরণ্যগর্ভে পুরুষ আত্মভাব ভাবিত হন্, যখন জীবের ঘ এতখানি নিয়া বিরাজ করে, তখনই সে ফিরাইয়া পায় তাহার যুগযুগান্তরের হারানো সহজ দীপ্তিতে দীপ্তিমান হওয়ার অবস্থা] আপ্নোতি [প্রাপ্ত হন্] মনসস্পতিম্ [মনের পতিকে অর্থাৎ সকল মনের সকল কামনাকে, মনোজ কামকে যিনি মদনমোহন রূপে পালন করেন, তাহাকে] বাক্‌পতি [বাগিন্দ্রিয়ের পতি] চক্ষুঃপতি [চক্ষুসমূহের পতি] শ্রোত্রপতি [কর্ণ সমূহের পতি] বিজ্ঞানপতিঃ [বিজ্ঞানসমূহের পতি, শির পতি, আত্মপতি] (হন্) ততঃ [ইহা হইতেও অধিকতর] এতৎ [ইহা] ভবতি [হন্] আকাশ-শরীরম্ ব্রহ্ম [আকাশই যাহার শরীর, সকল ছিদ্রপথে বিচরণ করিবার মত যোগ্যতা যাহার শরীরের হইয়াছে; সকলকে অবকাশ দেওয়াই যাহার শরীরধর্ম; আকাশঘন যে শরীর দুনিয়ার সব কিছু বৈচিত্র্য লইয়া অবাধে অসঙ্কোচে সত্তা-চৈতন্য-আনন্দ আস্বাদন করিতে পারে।] সত্যাত্ম [সৎ এবং ত্যৎ অর্থাৎ নিরুক্ত-অনিরুক্ত, নিলয়ন-অনিলয়ন, বিজ্ঞান-অবিজ্ঞান, সত্য-অনৃত সব যাহার আত্মা] প্রাণারামম্

[প্রাণে যাহার আক্রীড়া ; প্রাণ-ক্রিয়াকে যিনি পুরুষোত্তমের শ্বাস-ক্রিয়ায় পরিণত করিবার যোগ্য, তিনিই যোগেশ্বর প্রাণারাম] মন-আনন্দম্ [যাহার মন, মানস কামনা, মনোজ কাম আনন্দরসে বিকাশিত হইয়া নিজের ও দুনিয়ার আনন্দ দানই করে] শান্তিসমৃদ্ধম্ [শান্তিধনে ধনী] অমৃতম্ [অমৃত] ব্রহ্ম [ব্রহ্ম ঘন্] ইতি [এই প্রকারে] প্রাচীনযোগ্য [হে প্রাচীনযোগ্য, সেই অনাদি ব্রহ্মবস্তু প্রাচীন বলিয়া অর্ব্বাচীন, চির নবীনও বটেন, এমন পুরাতন নবীন পুরুষোত্তম বস্তু শাস্ত্রের যোগ্য তুমি] উপাস্স্ব [উপাসনা কর]

স্বয়ম্ভূ আদিত্যে, মহত্তমী ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন্। তিনি স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন্। মনস্পতিকে প্রাপ্ত হন্ ; তিনি বাক্‌পতি, চক্ষুপতি, শ্রোত্রপতি, বিজ্ঞানপতি হন্। তিনি ইহা হইতেও অধিক এইরূপ হন্, তিনি আকাশ-শরীর, সত্যাত্মা, প্রাণারাম, মন-আনন্দ, শান্তি-ধনে ধনী, অমৃত ব্রহ্ম হন্। হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি এইরূপ উপাসনা কর। ১।৬।২

সপ্তম অনুবাক্

পৃথিব্যন্তরিক্ষং দ্যৌর্দিশোঽবান্তরদিশাঃ। অগ্নির্বায়ুরাদিত্য শ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণি। আপ ওষধয়ো বনস্পতয়ঃ। আকাশ আত্মা। ইত্যধিভূতম্। অথ অধ্যাত্মম্। প্রাণো ব্যানোঽপান উদানঃ সমানঃ। চক্ষুঃ শ্রোত্রম্ মনো বাক্ ত্বক্। চর্ম মাংসং স্নাবাস্থি মজ্জা। এতদধিবিধায় ঋষিরবোচৎ। পাঙ্‌ক্তং বা ইদং সর্ব্বম্। পাঙ্‌ক্তেনৈব পাঙ্‌ক্তং স্পৃণোতীতি। ১।৭

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে সপ্তম অনুবাক।

(ব্রহ্ম-উপাসনার আস্বাদনই নানাবিধ উপচারে বলিতেছেন, যেমন আস্বাদন-রসিক পুরুষ একই বস্তুকে রকম-রকম করিয়া প্রস্তুত করিয়া আস্বাদন করেন) পৃথিবী [পৃথিবী] অন্তরিক্ষং [অন্তরীক্ষ] দ্যৌঃ [দ্যুলোক] দিশঃ [পূর্ব্বাদি দিক্] অবান্তরদিশাঃ [অবান্তর দিক্‌সমূহ ; এই পাঁচটী ভূত পাঙক্ত ; পঙক্তি নাম বৈদিক ছন্দে প্রত্যেক চরণে পাঁচটী অক্ষর থাকে। এখানেও পাঁচ পাঁচ পদার্থ একত্র করিয়া লোকপঙক্ত, দেবপঙক্ত, ভূতপঙক্ত, প্রাণপঙক্ত, ইন্দ্রিয়পঙক্ত, ধাতুপঙক্ত—এই ছয়টী বিভাগ করা হইয়াছে। পঙক্তি ছন্দের সহিত এই পাঁচ সংখ্যার সমতা রহিয়াছে। ছন্দের অন্তর্গত পঞ্চাক্ষরাত্মক চরণকেই বিশ্বময় ছড়াইয়া অক্ষর শাস্ত্রকে বিশ্বশাস্ত্রের সঙ্গে এক করিয়া আস্বাদন করিয়া সৃষ্টির ছন্দোময়ত্ব আস্বাদন করাইতেছেন। ইহাদের মধ্যে তিনটী বাহ্য পঙক্ত, তিনটী অধ্যাত্ম পঙক্ত। বাহ্য পঙক্ত ও অধ্যাত্ম পঙক্তকে একীভূত দেখিলে সর্ব্বাত্মা প্রজাপতির সহিত একত্ব সিদ্ধি লাভ হয়] অগ্নিঃ বায়ুঃ আদিত্যঃ চন্দ্রমাঃ নক্ষত্রাণি [অগ্নি বায়ু আদিত্য চন্দ্রমা নক্ষত্রগণ এই পাঁচটী দেব-পঙক্ত] আপঃ [জল] ওষধয়ঃ [ওষধি-সমূহ] বনস্পতয়ঃ [বিনাপুষ্পে ফলপ্রসূ বৃক্ষসমূহ] আকাশঃ [আকাশ] আত্মা [বিরাট পুরুষ—এই পাঁচটি ভূতপঙক্ত] ইতি অধিভূতম্ [এই তিন প্রকার অধিভূত, অধিদৈবত অধিলোক—পাঙক্ত উপাসনা ; মূলে শুধু অধিভূত থাকিলেও তিনটীই বুঝিতে হইবে] অথ অধ্যাত্মম্ [অনন্তর শরীরাধিকারে পাঙক্ত উপাসনা ছড়াইয়া দেওয়া যাইতেছে।] প্রাণঃ ব্যানঃ অপানঃ, উদানঃ সমানঃ [প্রাণ ব্যান অপান উদান সমান এই পাঁচটী প্রাণ পাঙক্ত] চক্ষুঃ শ্রোত্রম্ মনঃ বাক্ ত্বক্ [চক্ষু কর্ণ মন বাক্য ত্বক্ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয় পাঙক্ত] চর্ম মাংসং স্নায়ু অস্থি মজ্জা [চর্ম মাংস স্নায়ু অস্থি মজ্জা এই পাঁচটী ধাতু পাঙক্ত] এতৎ [এইরূপ পাঙক্ত উপাসনা] অধিবিধায় [বেদ ও বিশ্বকে এবই অধিকার বিধানে যুক্ত করিয়া] ঋষি [ঋষি, বেদ] অবোচৎ [বলিয়া ছিলেন] পাঙক্তং [পাঙক্ত পঞ্চাত্মক] বৈ [নিশ্চয়ই] ইদম্ সর্ব্বম্ [এই সব] পাঙক্তেন এব [পাঙক্তদ্বারাই] পাঙক্তং [পাঙ্‌ক্তকে] স্পৃণোতি [পূর্ণ করে, দুই-ই দুয়ের পরিপূরক ; একই আকাশ অন্তর বাহিরে বিরাজমান। দুইকে দুইয়ের মাঝে গলাইয়াই দুইকে পূর্ণ করে]

পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, দিক্‌সমূহ, অবান্তর দিক্‌সমূহ (এই পাঁচটি লোক পাঙক্ত) ; অগ্নি, বায়ু, আদিত্য,

চন্দ্র, নক্ষত্রগণ (এই পাঁচটি দেব পাঙ্‌ক্ত) ; জল, ওষধি সমূহ, বনস্পতিসকল, আকাশ ও বিরাট পুরুষ (এই পাঁচটি ভূত পাঙ্‌ক্ত) ; অনন্তর অধ্যাত্ম পাঙ্‌ক্ত বলা হইতেছে—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান (এই প্রাণ পঞ্চক), চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্ ও ত্বক [এই ইন্দ্রিয় পঞ্চক] ; চর্ম মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা [এই ধাতু পঞ্চক] এইরূপে পাঙ্‌ক্ত উপাসনা বিধান করিয়া ঋষি বলিয়াছেন এই সবই পঞ্চাত্মক। পাঙ্‌ক্তদ্বারাই পাঙ্‌ক্ত পূর্ণ হয়।

অষ্টম অনুবাক

ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্বম্। ওমিত্যেতদনুকৃতির্হ স্ম বা অপ্যো শ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওম শোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি। ওমিত্যধ্বর্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি। ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ওমিত্যগ্নি হোত্রমনুজানাতি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি। ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি ॥ ১।৮

ওম্ ইতি [ওম্ এই শব্দকে] ব্রহ্ম [ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে] ওম্ ইতি [ওম্‌ই] ইদম্ সর্বম্ [এই সব] ওম্ ইতি এতৎ [ওম্ এই শব্দটী] অনুকৃতিঃ হ স্ম বৈ [অনুকৃতি, সম্মতিজ্ঞাপক বলিয়া প্রসিদ্ধ, কেহ কিছু বলিলে অপরে 'ওম্' বলিয়া সম্মতি জানায়] অপি [আরও] ও শ্রাবয় ইতি [যখন যজুর্বেদী অধ্বর্যু অগ্নীধ্রকে বলেন 'ওম্ দেবগণকে শ্রবণ করাও' তখন তিনি] শ্রাবয়ন্তি [শ্রবণ করাইয়া থাকেন] ওম্ ইতি [ওম্ উচ্চারণ করিয়াই] সামানি [সামসমূহ] গায়ন্তি [গান করেন] ওম্ শোম্ ইতি [ওম্ শোম্ উচ্চারণ পূর্বক] শস্ত্রাণি [শস্ত্র অর্থাৎ গীতি রহিত স্তবসমূহ] শংসন্তি [পাঠ করেন] (তখন) ওম্ ইতি অধ্বর্যুঃ [যজুর্বেদী ঋত্বিক্] প্রতিগরম্ ['ও শ্রাবয় দেব',—এই উৎসাহ বাণী] প্রতিগৃণাতি [হোতার উদ্দেশে উচ্চারণ করেন] ওম্ ইতি ব্রহ্মা [সর্ববেদজ্ঞ ও যজ্ঞ পরিচালক ঋত্বিক্ বিশেষ] প্রসৌতি [অনুজ্ঞা প্রকাশ করেন] (যজমান) ওম্ ইতি [অধ্বর্যুকে] অগ্নিহোত্রম্ অনুজানাতি [অগ্নিহোত্র হবনীতে দুগ্ধঢালার অনুমতি প্রকাশ করেন] ওম্ ইতি [ওম্ উচ্চারণ করেন] ব্রাহ্মণঃ [ব্রাহ্মণ] প্রবক্ষ্যন্ আহ [বেদ পাঠ করাইতে বা ব্রহ্ম প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়া] ব্রহ্ম [বেদ বা বেদ প্রতিপাদ্য পরমপুরুষ] উপাপ্নবানি ইতি [লাভ করিতে সমর্থ হইব মনে করিয়া] ব্রহ্ম [বেদ বা ব্রহ্মই] উপাপ্নোতি এব [অবশ্যই প্রাপ্ত হন্]

ওঁ এই শব্দটীকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিবে। এই সমস্তই ওঙ্কার। 'ওম্' এই শব্দটী সম্মতিজ্ঞাপক বলিয়া প্রসিদ্ধ। অধিকন্তু 'ওম্ দেবগণকে শ্রবণ করাও' ইহা বলিলে ঋত্বিকগণ শ্রবণ করাইয়া থাকেন। ওম্ উচ্চারণ করিয়া সামসমূহ গীত হয়। 'ওম শোম্' ইহা বলিয়া শস্ত্র নামক স্তোত্র সকল পাঠ করেন। 'ওম্' উচ্চারণ পূর্বক অধ্বর্যু প্রতিগর উচ্চারণ করেন। 'ওম্' উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মা অনুজ্ঞা প্রকাশ করেন। 'ওম্' বলিয়া অগ্নিহোত্রের অনুমতি দেওয়া হয়। বেদ বা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইব মনে করিয়া বেদাধ্যাপক বা ব্রহ্মোপদেষ্টা ব্রাহ্মণ 'ওম্' উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তিনি অবশ্যই বেদ বা ব্রহ্ম লাভ করেন।

নবম অনুবাক্

তদাহুঃ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। শমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। মানুষঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজননঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্যবচা রাথীতরঃ। তপ ইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায়প্রবচন এবেতি নাকো মৌদ্গল্যঃ। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ ॥ ১।৯

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে নবমোঽনুবাকঃ।

ক্রমশঃ

সাময়িকী

নরনারায়ণ আশ্রম-সঙ্ঘ সংবাদ ঃ নরনারায়ণ আশ্রম-সঙ্ঘের কার্যাবলী সম্বন্ধে কিছু সংবাদ আমরা সঙ্ঘ সম্পাদিকার বার্ষিক বিবরণ হইতে পাইতেছি, তাই উহা এইখানে প্রকাশ করিলাম। ওঁ নমো শ্রীনিতাগোপালায়, শ্রীমৎপুরুষোত্তমানন্দায়। নরনারায়ণ আশ্রম সঙ্ঘের এই বার্ষিক সাধারণ সভায় আমি আশ্রম সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সকলকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করি। আপনাদের সকলের সহযোগিতা সাহায্য ও ভক্ত ইচ্ছাতেই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণ আশ্রম ও আশ্রম-সঙ্ঘের যাবতীয় কাজ চলিতেছে। মাঝে মাঝে সকলে মিলিত না হইলে সকলেরই অসুবিধা—ব্যক্তিগত ভাবে সকলেই অবশ্য কমবেশী যাতায়াত করেন, খোঁজ-খবরও রাখেন—তবু বছরে অন্তত দুই একদিন সকলে মিলিত হইতে পারিলে বড় আনন্দের ও উপকারের কারণ হয়। আমি আপনাদের সকলের নিকট এই আবেদন জানাই যে আপনারা যেন বৎসরে এই একটী দিন অবশ্যই আসেন।

অন্যান্য বছরের ন্যায় গত দুই বছরের ১৯৮০-৬১ ও ১৯৬১-৬২ র হিসাবের অডিটেড রিপোর্ট আপনাদের নিকট উপস্থিত করা হইল।

আশ্রম সঙ্ঘ পাঁচভাবে জনসাধারণের সেবা করিতে প্রয়াস পাইতেছে। (১) গ্রন্থাগার পাঠাগার, (২) ক্রাফট সেন্টার—দুইভাগে বিভক্ত—(ক) মহিলা শিল্প শিক্ষা-কেন্দ্র লেডী ব্র্যাবোর্ণ ডিপ্লোমাসহ এবং (খ) চরকা তাঁত, (৩) নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, (৪) প্রাক্ বুনিয়াদী বিদ্যালয়। (১) গ্রন্থাগার মোটামুটি ভাবে চলিতেছে। গত ১৯৬০-র ৩১ জুলাই পুস্তক সংখ্যা ছিল ২৪১৪, বর্তমানে ১৯৬১-র ৩১শে জুলাই পুস্তক সংখ্যা ২৫৬০। গত ১৯৬১-৬২ বার্ষিক বৎসরে লেণ্ডিং সেকসনে বাহিরে বই পড়িতে দেওয়া হইয়াছে ৩৪১২ খানা এবং ১৯৬২-৬৩ র বার্ষিক বছরে বাহিরে বই পড়িতে দেওয়া হইয়াছে ৩১৫৭ খানা। পাঠগৃহে দৈনিক উপস্থিতির মাসিক গড় গত বৎসর ছিল ১৯'৫, এ বৎসর ১৭। বর্তমান মাসে বাহিরে বই নিবার সভ্য সংখ্যা ৫৯।

(২) ক্রাফট সেন্টার (ক)—মহিলা শিল্পশিক্ষা কেন্দ্রের সাধারণ বিভাগে ছাত্রী সংখ্যা গত বৎসরে মার্চ্চ মাসে ছিল ১৯ জন, এ বৎসর মার্চ্চে ১৫ জন; লেডী ব্র্যাবোর্ণ ডিপ্লোমা ক্লাসে গত বৎসর ১৩ জন ছিল, এ বৎসর ১০ জন। গত দুই বৎসরই লেডী ব্র্যাবোর্ণ পরীক্ষার্থীরা সকলে পাশ করিয়াছেন।

(খ) চরকা-কেন্দ্র গত ১৯৬১-র মার্চ্চ মাসে আরম্ভ করা হইয়াছিল। বুনিয়াদী স্কুলের ছেলেমেয়েরা স্কুলে চরকা কাটা শেখে, তাহারা খুব উৎসাহের সঙ্গেই কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। গ্রামের কিছু বয়স্কা মেয়ে এবং মহিলাও যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের এই উৎসাহকে ধরিয়া রাখিবার জন্য চরকারই জন্য কোন কর্মী আমাদের ছিল না—তদুপরি সম্পাদিকার গুরুতর অসুস্থতাতেও ইহার কাজকর্ম ব্যাহত হয়। ফলে আশ্রমের কয়েকজন ছাড়া বাহিরের কাটুনীদের চরকাকাটা প্রায় বন্ধই হইয়া গিয়াছিল। আবার এ বছরের মে মাসে গ্রামের ঘরে ঘরে চরকা দিবার চেষ্টা আরম্ভ করেন শ্রীযুক্তা প্রতিভা রায়। তাহার পর মাস হইতে একজন মেয়ে কর্মী ঐ কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় গ্রামের ঘরে ঘরে কিছু চরকা (এ পর্যন্ত ১৫টী) দেওয়া হইয়াছে মোট কাটুনী এখন ৪০ জন হইয়াছে।...এ পর্যন্ত ৫৪ সের সুতা হইয়াছে। তাহা হইতে এ পর্যন্ত ২১ খান কাপড় চাদর বুনিয়া বা সুতা বদলাইয়া কিনিয়া আনা হইয়াছে। আমরা গান্ধী স্মারক নিধি হইতে ২৬ খানা চরকা কিছু তুলা টেকো সাহায্য পাইয়াছি। এ ছাড়া এ পর্যন্ত আর কোন সাহায্য পাওয়া যায় নাই। আমরা কাজ চালাইয়া লইয়া যাইতে প্রাণপণ করিব। আমরা ১০০টী চরকা নিয়মিত চালাইব এই সংকল্প লইয়াছি। এই সঙ্গে এক খানি তাঁতও খুব শীঘ্র আরম্ভ করিতেছি। চরকা-কর্মীকে এখনও আমরা উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে পারিতেছি

না। আশা করিতেছি চরকার সংখ্যা বাড়িলে এ বিষয়ের সমাধান করা যাইবে। আমরা আশ্রম সঙ্ঘে সকল কাজে আপনাদের সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি।

(৩) নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজকর্মও মোটামুটি ভালই চলিতেছে। ১৯৬৩ পর্যন্ত ১৪২ জন ভর্তি হইয়াছিল; ৬৪তে ৫৩ জন এবং ৬৫তে ৪৮ জন ভর্তি হইয়াছে। বর্তমান ১৯৬৫-র জুলাই মাসে ছাত্রছাত্রীর মোট সংখ্যা ১৪৯। প্রতি শ্রেণীতে ৩৫ জন ছাত্রের বেশী ছাত্র নেওয়ার নিয়ম নাই। পঞ্চম শ্রেণী বাদে অপর সকল শ্রেণীতেই পুরা ছাত্র ছাত্রী রহিয়াছে।

(৪) প্রাক-বুনিয়াদী বিদ্যালয় গত বৎসর ঠিক এই ১৫ই আগষ্টে আরম্ভ করা হইয়াছিল। গত বৎসর ২৪ জন ভর্তি হইয়াছিল, এ বৎসর এ পর্যন্ত ২০ জন ভর্তি হইয়াছে। বর্তমানে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২৯। ৩ হইতে ৫ বৎসর বয়সের শিশুদের ৩০ জন পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে নিবার নিয়ম। এই শিশুদের বিদ্যালয়টীর জন্য জমি কেনা হইয়াছে শ্রীযুক্তা আভা শেঠের ৪৫০০০০ টাকায়। ঐ টাকার মধ্যে আড়াই হাজার তিনি দান করিয়াছেন, বাকি অর্থ তাঁহার নিকট হইতে হাওলাত হিসাবে নেওয়া আছে। ইহার বিদ্যালয় গৃহের জন্য এখনও কোন অর্থ পাওয়া যায় নাই।

অন্যান্য বৎসরের মত ১৯৬৪-তেও সরস্বতী পূজার দিন বার্ষিক অনুষ্ঠানে দুই বুনিয়াদী স্কুলের ছেলেমেয়েরা ও সেলাই স্কুলের মেয়েরা অঞ্জলি প্রদান অন্তে প্রসাদ পাইয়াছিল। শিশুরা নাচগান আবৃত্তি করিয়াছিল, সেলাই গুলির প্রদর্শনী হইয়াছিল। সেলাইর তিন বিভাগের প্রথমকে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। সরস্বতী পূজার দিন অনুষ্ঠান করিলে অনেকেই উপস্থিত থাকিতে পারেন না জন্য আমাদের নিয়মটী বদলাইয়া গত আর্থিক বৎসরে উহা ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫তে করা হইয়াছিল। সেদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডেপুটী চীফ ইন্‌স্পেক্টার শ্রীকিতীশ-রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকিয়া দুই বুনিয়াদী স্কুল দেখিয়াছেন এবং সেলাইর পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন। মোটামুটি ইহাই নরনারায়ণ আশ্রম সঙ্ঘের সামান্য সেবামূলক কাজগুলির সম্বন্ধে সংবাদ। এখন এই হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে অনেক কিছুই হয় নাই। গ্রন্থাগারে যে সত্তা সংখ্যা আছে তাহার তিনগুণ হইলে ভাল হইত, ক্রাফট সেন্টারের দুই ক্ষেত্রেই—সেলাই ও চরকা—আরও তিনগুণ ছাত্রী ও কাটুনী থাকা উচিত ছিল ইত্যাদি। সংখ্যার দিক দিয়া বাড়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি গুণগত উৎকর্ষও আরও বাড়ান উচিত ছিল। আপনাদের এইসব কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক, আমাদেরও মনে হয়। সব দিক দিয়া উৎকর্ষ লাভের চেষ্টা আমরা অবশ্যই করিব—তবু ঐ আশানুরূপ যে কেন হয় না তাহারও কারণ আছে। প্রথমত কর্মকে যতখানি বাড়াইব তাহার হিসাব সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকিতে হইবে—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমা-নন্দ বার বার কর্মকে বাড়ানর ছন্দ রক্ষা করিয়া চলিতে বলিয়া গিয়াছেন। কর্ম ততখানিই বাড়িবে যতখানি সেই সঙ্গে আমাদের জ্ঞান-ভক্তি-প্রেমের সামঞ্জস্য থাকে। এত বড় একটা বিবেচনার অবকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আসে আমাদের কর্মীর অকাল অভাবের প্রশ্নটী। তাই অনেক কিছু না হওয়ার সঙ্গে আপনাদের এইসব কথা গুলিও স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিব।

যাহা হউক, গত এক বৎসরাধিক কাল আমাদিগকে নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে এবং হইতেছে। মানুষ লইয়া আত্মসাক্ষাৎকারের এই যে সাধনা ইহাতে বাহিরের বিপর্যয় হাঙ্গামা তো থাকিবেই। বনে বসিয়া বা নিজের মনে একলা থাকিলে বাঘ সাপের হাত হইতে যেমন আত্মরক্ষার কথা ভাবিতে হইত, তেমনি নিজের ভিতরের সমস্যাগুলিও উৎকট আকারে যে আত্মপ্রকাশ করিত—তাহা হইতেও আত্মরক্ষা করিতে হইত। আর মানুষের সঙ্গে পথ চলায় এই সমস্ত সমস্যা তো থাকিবেই। ইহা লইয়া ভাবনা নাই, তবে বিবেচনার সঙ্গে পথ চলিবার অবকাশ আছে বই কি। যাহা হউক শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ও শ্রীনিত্যগোপালের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিদ্বারা কাজ চলিতেছে, ইহাই গোড়াকার সত্য কথা—আর রহিয়াছেন আপনারা সকলে—এইভাবে যুক্ত পূর্ণ হইয়া নরনারায়ণ আশ্রম, ও আশ্রম-সঙ্ঘ তাহাদের পথে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে। আবারও আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়া আপনাদের আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

UNIVERSITY

উজ্জ্বলভারত

আশ্বিন, ১৮৮৭ শকাব্দ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ ১৮শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

প্রার্থনা

॥ শ্রীনিত্যগোপাল ॥

সদানন্দময়ী শিবে শঙ্কটবারিণী,
স্নেহময়ী আদ্যাশক্তি তুমি যে জননী,
বিশ্বময়ী বিশ্বেশ্বরী তুমি যে পরমেশ্বরী—
তুমি অপরূপা অনুপমা আহ্লাদিনী।
কলুষনাশিনী কালী ত্রিকালব্যাপিনী।

তুমি বিশ্বমাতা তারা, তুমি ভব মনোহরা
ত্রিতাপহারিণী, বিপদনাশিনী…,
অজ্ঞানবারিণী কালী ভবদারা
নীরদবরণী, নলিননয়নী
শিবসীমন্তিনী সত্যা-সাকারা।
পরম শিবানী, যোগেশী যোগিনী
ভূতি বিভূষিণী ভীমা ভয়হরা।
শুধাংশুভালিনী, গিরীশমোহিনী—
সুচারুহাসিনী চারু চন্দ্রচূড়া
পরমা প্রকৃতি, বিভাবতী সতী,
জটাবিমণ্ডিত ব্যাঘ্রচর্মাম্বরা
সুখস্বরূপিণী দুঃখসরোজিনী,
এ হৃদয়ে হও তুমি শান্তিধারা।

নিস্তার, মা নিস্তারিণী সংসার সাগরে—
বিপদ ব্যাপিত ঐ যে অজ্ঞান আঁধারে।
কৃপাময়ি, কৃপা কর, ডুবে মরি! ধর ধর,
তুমি বিনা কেবা আর উদ্ধারে আমারে?
বারে বারে ডাকি তাই, শঙ্করি, তোমারে!

ভারতের মা

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

(১৩৩২ বঙ্গাব্দের পূর্ণপর্যায় উদ্বোধন হইতে পুনর্মুদ্রিত)

বহু শতাব্দীর পরাধীনতা ভারতের সকল চেতনা, সকল আনন্দকে এমন ক'রে হিম ক'রে দিয়েছে যে, মায়ের চিদানন্দময় মহাপ্রকাশ আজও সেই জমাট-বাঁধা হিমকে গলিয়ে গলিয়ে মুক্ত গঙ্গাধারার সৃষ্টি কর্ত্তে সক্ষম হল না! মা তো এসেছিলেন, আজও আসছেন; আমাদের দুয়ারে গান গেয়ে গেয়ে কতবারই না মুক্তিমন্ত্র প্রাণের মাঝে শুনিয়ে গেলেন! কৈ, ভারত তো গায়ত্রী দেবীর সেই বেদ-মন্ত্রের মাঝে মুক্তির ধারা আবিষ্কার কর্‌লে না! মুক্ত-কেশীর দর্শনিক আলোকেরা মুক্তরূপ কোলে পেয়েও ভারতবর্ষ যুগের পর যুগ কেবল অনাদরই ক'রে আস্‌ছে। তাই না, মা আমাদের সকল শুটিয়ে নিয়ে, চোখের জলে 'প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ঃ বিত্তাৎ প্রেয়ঃ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরাৎ'—আদরের বস্তুকে আদর না করার অপরাধ থেকে মুক্ত করবার জন্য আজ যোগনিদ্রায় নিদ্রিত। মা ঘুমিয়েছেন। ভারত আর মুক্তি চাইতে সাহস পাচ্ছে না; নিদ্রিত মায়ের ধর্ম্মরূপ, অর্থরূপ ও কামরূপ তার চোখ ঝলসাচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছে; বন্ধনের তীব্র জ্বালা জীবনে সহজ হ'য়ে গিয়েছে। আজ মুক্তি বল্‌তে তার কাছে কেবল 'পালিয়ে যাওয়া'; কাম আর সত্য কামরূপে খেলে না, সে নারী-শক্তির অবমাননায় নিরত; অর্থ বস্তুর ভিতর দিয়ে শোষণ-মূর্ত্তিতে সার্থক হ'য়ে না উঠে' রাবণের ব্রহ্মচারীবেশ ধারণ করার মত সমাজ-শরীরকে সর্ব্বতোভাবে শোষণই করছে; ধর্ম্ম আর সত্য ধর্ম্ম নয়, প্রাণহীন শুষ্ক অহমিকাময় কতগুলি নিয়ম-নিষেধের প্রতিপালনেই আজ ধর্ম্ম-সাধনা বিভোর! বাস্তব মুক্তি যতদিন ছিল, ঐই ততদিন ছিল।

ধর্ম্ম—অস্তিত্বপ্রধ, অর্থ—সমাজরক্ষাকল্পে অমোঘ শক্তি, আর কাম ছিল সমাজ-শরীরে অদ্বৈতভাবের স্পন্দন এনে দিয়ে, যা কিছু ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের মলিনতা সব ভেঙ্গে চুরে প্রণতি-বন্দনায় ও গলাগলির মধুর-রস-কীর্ত্তনে ব্যগ্র। যেদিন কামশক্তির ঘনীভূত বিগ্রহ ক্ষত্রিয় সুরথ ও অর্থশক্তির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বৈশ্য সমাধি রাজ্যচ্যুত হ'য়ে, বনে বনে ঘুরে ঘুরে আশ্রম সাধনায় নিরত মেধস মুনির শরণাপন্ন হ'য়েছিলেন, সেইদিন ভারতের মহামুক্তির সাধনা-রহস্য জগতের জন্য উন্মুক্ত হ'য়ে গেল। সুরথ ও সমাধি মুনির শরণ নিলেন; মুনিবর তাদের কাছে মায়াতত্ত্ব, মহামায়াতত্ত্ব ও যোগমায়াতত্ত্বাখ্যানের দ্বার উদ্‌ঘাটন করলেন; তারা মুক্তির আনন্দে মাতাল হ'য়ে জীবের জন্য সেই উন্মত্ততার এক কণা শ্রীশ্রীচণ্ডী মহাগ্রন্থে পুঁরে রেখেছেন। এমন মহামুক্তি-গ্রন্থ থাকতেও, সমাতীতে যে'কে তৃষিত হ'য়ে থাকার মত আমরা পরাধীনতার আবরণ গায়ে জড়িয়ে সেই মুক্তকেশীকেই বছরের পর বছর অপমানের আরতি করছি। যাঁর কৃপাকটাক্ষ একবার লাভ করলে, মানুষের সকল গ্রন্থি ছিঁড়ে যায়, যাঁর স্পর্শে সকল সংশয় সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারনাশের মত ল'লে যায়, যাঁকে ধারণা কর্ত্তে গিয়ে কর্ম্মের সকল খণ্ডভাব ক্ষীণ হ'য়ে যায়, আজ কি-না, সেই একাধারে পর (শ্রেষ্ঠ) ও অবর (নিকৃষ্ট) দেবতার পূজা ক'রে ভারতবর্ষ মুক্তির লালসা-বঞ্চিত, ধর্ম্মহীন, অর্থহীন ও কামহীন। এ শোচনীয় পরিণাম থেকে কে আমাদের মুক্ত করবে?

জীবের তিনটি গ্রন্থি বা গাঁট। প্রথমটি ব্রহ্ম-গ্রন্থি, যেটিকে ভেদ করবার জন্য মা মহাকালী মূর্ত্তিতে পূজিতা আর যাঁর ঋষি হচ্ছেন ব্রহ্মা; তিনিই চণ্ডীর প্রথম চরিত্র। দ্বিতীয় গ্রন্থি বিষ্ণু-গ্রন্থি, দেবী মহালক্ষ্মী, ঋষি বিষ্ণু, ইনিই চণ্ডীর মধ্যম চরিত্র। রুদ্র গ্রন্থিই তৃতীয় গ্রন্থি; এখানে

ইই মহাসমন্বয়ী, ঋষি কবি; উভয় চরিত্রে মায়ের এই মূর্ত্তিই ভুবনমনমোহিনী, অদ্বৈত-গৃহিণী শিবানী গৌরী।

সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা কে যেন প্রাণের মাঝে জাগিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবতা প্রদান কর্ত্তে গতানুগতিকতার জড়তায় মুগ্ধ প্রাণ সাহস পায় না; কিম্বা পেলেও চতুর্দ্দিকের সব আবেষ্টন এসে তাকে পিষে মেরে ফেল্‌তে চায়। সৃষ্টির পথে জীবের এই যে দু'টী বাধা, একেই শাস্ত্রকারগণ মধু ও কৈটভ বলেছেন। মধুকৈটভ অন্তরেও আছে, বাহিরেও আছে। মধুকৈটভ ধ্বংস ক'রে যদিও বা সৃষ্টি সম্ভব হয়, মহিষাসুরের তাড়নায় সেই বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি তত্ত্বগুলি কিছুতেই একত্র হ'তে পারবে না, সঙ্ঘও গ'ড়ে উঠ্‌বে না। সঙ্ঘ সৃষ্টি করতে হ'লে চাই মহিষাসুর বধ। এই ভাবে সকল ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান (organisation) গ'ড়ে উঠলে, তত্ত্বনিষ্ঠতন্ত্রের মত জীব সেই প্রতিষ্ঠানের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে, তার ভিতর দিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠাকে আস্বাদন করতে, কামলালসার কি বীভৎস পরিচয়ই না প্রদান করে। এ তত্ত্বনিষ্ঠতন্ত্রময় 'আমি'র মরণ না এলে জগৎ-জয়ী organisation গড়ে মুক্তির আশা দুরাশা। প্রতিষ্ঠানকে অটুট রাখতে হ'লে, চাই সৃষ্টি করবার ক্ষমতা, চাই তাকে বাঁচিয়ে রাখবার শক্তি, প্রয়োজন হ'লে চাই তাকে ধ্বংস করবার সাহস। প্রথম বাধা সৃষ্টির পথে, দ্বিতীয় বাধা স্থিতির পথে, তৃতীয় বাধা ধ্বংসের পথে। অতীতকে যথাযথভাবে বজায় রেখে নূতন সৃষ্টি হয় না, ইহাই প্রথম চরিত্রের শিক্ষা। বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলিকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করতে না পারলে কোন সঙ্ঘই দাঁড়াতে পারে না, বুদ্ধি ত ঘুরেই। ইহাই দ্বিতীয় চরিত্রের উপদেশ। সঙ্ঘ মলিন জড়-ভাবাপন্ন (rigid) হ'য়ে গেলে তখন চাই তাকে ভাঙবার মত দুর্জ্জয় সাহস; এই হ'তেছে তৃতীয় চরিত্রের মহান্ দান। এই তিন সাধনায় সিদ্ধ যিনি, তিনকে ভেঙ্গে এক করতে পারেন যিনি, তিনিই যোগমায়া-সমাবৃত ত্রিনয়ন 'অদ্বৈতং শিবং সুন্দরং'। ব্রহ্মা নূতন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে ভগবানের নাভি-কমলে ফুটে উঠেছেন। নূতন কিছু না ক'রে আরামে থাকবার মধু আকাঙ্ক্ষা (inertia) ব্রহ্মাকে গ্রাস করতে সমুদ্যত, নূতন সৃষ্টির কোন উজ্জ্বল চিত্র বা উজ্জ্বল কর্ম্মধারা (programme) না থাকায় পুরাতন কৈটভ তাকে সর্ব্বতোভাবে পেয়ে বসেছে। প্রাণের সামনে নূতন জগৎ সৃষ্টির লালসা, অথচ বাইরে জড়তা ও বিশেষ যুগোপযোগী কোন সাধন ধারা নেই, এই দোটানায় প'ড়ে ব্রহ্মা চীৎকার ক'রে উঠলেন। প্রত্যেক দিন যেমন একটা বিচিত্র দিন, তা তার পূর্ব্ব দিনের সঙ্গে যতই সামঞ্জস্য থাক্ না, তেমনি প্রত্যেক যুগও একটি স্বতন্ত্র যুগ। প্রত্যেকের একটি আদর্শও থাকবে এবং আদর্শানুযায়ী কর্ম্মধারাও থাকবে। একটির মাপে অপরটিকে গড়তে গেলে যে বিপদ, ব্রহ্মা একদিন সেই বিপদেই পড়েছিলেন। বেহাল হয়ে ব্রহ্মা মায়ের শরণ নিলেন। যোগনিদ্রা বিষ্ণুর নেত্রকে আলস্য ক'রে তার নেতৃত্ব পর্য্যন্ত হরণ ক'রে নিয়েছে। সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা বুকে করে জাগ্রত ব্রহ্মার 'জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী, ভারতের বেদমাতা গায়ত্রী'—এই আকুল আহ্বানে মা নিদ্রিত আদর্শবাদ ও কর্ম্মধারাকে জাগিয়ে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রেরণ করলেন। ইহাই বিষ্ণুর জাগ্রত হয়ে মধুকৈটভ দৈত্য-নাশ ও সেই অসুরদ্বয়ের মেদের উপকরণ দিয়ে নূতন জগৎ সৃষ্টির যথাযথ তাৎপর্য্য।

মধু ও কৈটভ চূর্ণীকৃত, তখন সব তত্ত্বগুলি ব্রহ্মার অঙ্গ থেকে একে একে বেরিয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ঘুরে বিচরণ কর্ত্তে লাগল। গণশক্তির আবির্ভাব হয় নি ব'লে কেউ কারও সঙ্গে মিলতে পারছে না; সকলেই আত্ম স্বার্থ। কেউ কারও আনুগত্য চায় না। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে স্বতন্ত্র হবার ধারণাই দেবশক্তির কল্পনাতীত। প্রত্যেকে চায় স্বতন্ত্র থাকতে, কিন্তু পরতন্ত্র না হলে স্বাতন্ত্র্য যে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় যে কোন মুক্তি আসে না এ সত্যের সাধনা তার কোথায়? জীবের কেবল স্বতন্ত্র হয়ে থাকবার যে দুর্জ্জয় অহঙ্কার, ইহাই মহিষাসুর মহিষাসুর জাতিতন্ত্রের বিরোধী। দেবশক্তি মহাকালীর রুদ্র তাড়নায় যখন সকল কূল হারিয়ে অকূলে ভাসছিল তখন তাদের হাল ছেড়ে দেওয়ার ভিতর দিয়ে দপ্ করে জ্বলে উঠল এমন একটি ক্রীড়াময়ী অথচ ক্রীড়াময়

সর্ব্বদেবতাময়ী অথচ বিশেষ মহিমান্বিতা, মহিষাসুরমর্দ্দিনী অথচ সিংহবাহিনী, গণদেব-জননী মাতৃ-মূর্ত্তি, যাঁর কোলে বিশ্বের কৌমার ও ক্ষাত্রতেজ কার্ত্তিকের মূর্ত্তিতে ধৃত, বাণী কমলাশক্তি—চৈতন্য জগৎ ও জড় জগৎ—যাঁকে দক্ষিণে ও বামে জড়িয়ে আছে; কেনোপনিষদের ঋষিকুল-বন্দিতা, সেই সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা হৈমবতী উমা মা-ই, সকল সৃষ্টির প্রাণদায়িনী মূর্ত্তিতে হিমালয়ের কোল জুড়ে প্রকট হ'তে যাচ্ছেন। ধন্য মা! ধন্য তোমার সর্ব্বাত্মিকা মূর্ত্তি, যে ভাবের মধুর প্রেরণায় আমার অন্তর বাইরের সব তন্ত্র তোমাময় হ'য়ে যন্ত্র হবে। তুমিই আজ হিমালয়ের লজ্জা, আবার লজ্জা দূর করবার আবরণ বসন; তুমিই সুধা-তৃষ্ণা, আবার তুমিই সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা অন্নপূর্ণা; তুমিই তুষ্টি-পুষ্টি, তুমিই মেধা-স্মৃতি, তুমিই মাতা ও জাতি; তোমাকে বারবার নমস্কার করি। তোমার মহামায়া মূর্ত্তির মহাস্নান সার্থক করতে হ'লে চাই যে ভারত-মন্থন। কিন্তু বার দিলেও তো তোমার স্নান পূর্ণ হয় না, মা! সকল তীর্থের জল, সকল নদ-নদীর জল, প্রকৃতির যা কিছু মধুর ও ভীষণ, সবই যে ভারতবর্ষময় ঘুরে ঘুরে, তোমার স্নানের জন্য সংগ্রহ করতে হবে, নইলে যে তোমার পূর্ণাভিষেক সম্ভব হবে না! তুমি মহা সতী, তুমি মহা অসতী, তুমি মহা সুরী, তুমি মহা অসুরী, তোমার পূর্ণ মাতৃমূর্ত্তির মাঝে সকলেই আপন আপন অধিকার লাভ ক'রে ধন্য হচ্ছে! তোমার মাঝে কেউ ত হারিয়ে যায় নি, হারিয়ে যাবেও না, তা সে সমাজের যতই নিন্দিত হউক না কেন। তুমি বারাঙ্গনার ঘরজার মৃত্তিকাকে অঙ্গভূষণ ক'রে যে কারুণ্যধারার প্রচার করছ, তার এক কণা যদি বিশ্বের কৌলীন্যাভিমানী ও সাধুত্বাভিমানীর দল লাভ করতো, তবে বিশ্ব এতদিন মধুময় হ'ত।

মহিষাসুর বধের পর যখন সঙ্ঘ সুপ্রতিষ্ঠিত হল, সাধকের বুকের ভিতর শুম্ভনিশুম্ভ মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াল। যখন অচলপ্রতিষ্ঠ সঙ্ঘশক্তির সুষমা ও সৌরভে দশ দিক আলোকিত, তখন শুম্ভনিশুম্ভ-সৃত সেই শক্তিকে জাতির নেতৃত্বের ভোগ্যা ক'রে পাওয়ার জন্য চঞ্চল হ'য়ে উঠল। এই যে জাতি-স্বাতন্ত্র্যের মাঝে ব্যক্তির বিরাট কামনালসা, ইহাই হচ্ছে শুম্ভনিশুম্ভের নিকট দেবগণের লাঞ্ছনার গূঢ় রহস্য। অসুর যখন সঙ্ঘকে নিজের প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্র ব'লে ভোগ করতে চায়, তখন তা সংসারের উপর এক বীভৎস লীলার অভিনয় করে। অসুর তখন মা সঙ্ঘ-শক্তিকে নিজ পরিণীতা ব'লে দেখতে চায়। মা সেই আহ্বানের প্রত্যুত্তরে বলে পাঠান :—

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥

শিব এই অসুর ও মহাশক্তির মাঝে বারবার দৌত্য করেও যখন ব্যর্থ হন, তখন মহাসরস্বতীর প্রকাশ এই ঘোর অন্ধকারের মাঝে আলোরূপে প্রকট হয়। শিবই অদ্বৈত, শিবই ভূতনাথ, শিবই গৌরীপতি। শিব ব্যতীত কার কাছে প্রকৃতি আত্মসমর্পণ করেন না। অসুরের কাছে প্রকৃতি কুহকী, ভক্তের কাছে তিনি সর্ব্ব সুষমাময়ী। মহাবিদ্যার অবতরণ যখন জীবের ব্যক্তিস্বাতিমান ও জাতিস্বাতিমান মুছে একাকার ক'রে দেয়, তখনই জীবের মহামুক্তি, আত্মার বিজয়া। এই মহামুক্তির আনন্দে জীব তখন প্রণতি বন্দনায় রত। বিশ্বের প্রত্যেক অণুপরমাণুটী তাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা মধুধারা সিঞ্চন করছে। কৃষি, শিল্প—সব তখন মায়ের বিগ্রহ। ধানদূর্ব্বা, ঘৃতদুগ্ধ, শিশিরের জল, এমন কি ভীষণ বরাহদন্ত পর্য্যন্ত নিজের জীবনে বরণ ক'রে নিয়ে মুক্তির আস্বাদন করে, তখন সে আত্মানন্দ, আত্মরতি, আত্মক্রীড়, স্বরাট। বিশ্বকে কোলে তুলে নেবার জন্য সে তখন ছুটাছুটি করে। আবার বিশ্বের কোলে লাফিয়ে উঠবার জন্য বালকের মত পাগল চাঞ্চল্য প্রকাশ করে।

মা! এমন তুমি আমাদের ঘরতে, কেন আজ আমরা নিজের ঘরে পরের মত আছি? কেন সকল কলঙ্ককালিমা মুখে মেখে বিশ্বের সম্মুখে তোমার সন্তান বলে পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ করছি? কেন অন্ন, স্বাস্থ্য, প্রাণ, মান হারিয়ে বালকের মত পথে পথে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছি? মা যশোদা! আমাদের বলবতী কর। আমরা জগতে তোমার আলোয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করব।

মা, মানদা! এমন মান আমাদের দাও যে জগতের সব জাতি যেন আমাদের মানে মানী হ'য়ে ভারতের সেবা-গৌরব লাভে লালায়িত হয়। ওগো জ্ঞান-বিজ্ঞান দায়িনি! জগতে বিজ্ঞানের নামে যে অজ্ঞানের অত্যাচার চলছে, সেই মহা অজ্ঞান যন্ত্রগুলি শোধন ক'রে, তার হৃদয়ে বাস্তব জ্ঞানের সঞ্চার কর। আহরা আর ভয় করব না। তোমার আগমনে আমাদের সকল ভয় দূর হয়ে গেছে। অভয়ার আগমনে আমরা অভয়; বিজয়ার আগমনে আমাদের শিরে বিজয়-মুকুট শোভা পাবে, সে দিন অতি অদূরে।

"ঘরে আমার মা আছে রে।
ওরে শমন! আমায় নিতে
পারবি নে রে॥
এ যে তারিণীর তনয়, এসেছি খেলায়
ঘরে যাই, মা ডাকছেন মোরে॥
রামপ্রসাদ বলে, ওরে শমন!
নিতে চাও কি বলে জোরে,
আজি বাজারে দামামা, বলিবে তায় মা
চলে যাব ব্রহ্ম-কৈলাসপুরে।"

বন্দেমাতরম্।

উজ্জ্বল ভারত

॥ শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ॥

যেন উজ্জ্বল-ভারত মোদের চির উজ্জ্বল থাকে।
কালিমা তাহাকে না করে পরশ, আঁধারে তাহে না ঢাকে।
হোম কুণ্ডের বহ্নি তাহার,
যেন না নিভায়, জ্বলে অনিবার,
ভগবান যেন চক্র হন তার শঙ্খের তাকে।

তার যুগাবতি চিরদিন যেন ভগবানে করে প্রীত,
বিশুদ্ধতায় ভরে যেন দেশ তব মন্ত্রের মত।
তাহার সাধির কমলেরা হায়,
যেন রাঙাপদ নিত্য সাজায়,
তাঁহার শ্রবণে জাগে যেন পদে তার ভজনের গীতও।

গঙ্গার মত নেমে যেন আসে তাঁহার আশীর্বাদ
উর্ব্বরা করে তারে আর মিটায় সকল সাধ।
জীবন তাহার যেন ধর্ম্মময়,
অখণ্ড এত তপস্যা হয়,
কোনো দিন যেন ঘটে নাক তার তব সেবা অপরাধ।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৫০)

২৪, ১০, ৪৬।... । একটা বিরাট স্বপ্ন শ্রীনিত্য-গোপাল নিয়ে এসেছেন—সেই স্বপ্নের ছবি তিনি আমার চোখের সামনে উদ্ঘাটিত করেছেন—সেই ছবি আমার চোখে লগ্ন হয়ে আছে...সেখানে মুক্ত মানুষের সমাজ চিত্র.. । মানুষকে আহ্বান করছি—সে নূতন সমাজে আসছে, যেমন করে বন্যা নূতন প্রাণ আনে পলির মধ্য দিয়ে···। অজ্ঞানী দেখছে না যে অতীত বিশ্ব নেই—প্রলয় পয়োধিতে বিশ্ব নিমগ্ন...নূতন বেদ নিয়ে নিত্য-গোপাল এসেছেন—সেই বেদ তিনি আমায় দিয়ে গেছেন —সকলকে তাই নিতে আহ্বান করি...নূতন জীবন যাপন করবার জন্য উদ্বুদ্ধ হবার প্রয়োজন ছিল। নূতন যুগের দোরে এসে দাঁড়িয়েছে—নন কোঅপারেশন অভিমান ইত্যাদি অতীত দিনের ঘটনা হওয়া উচিত ছিল। ...ভাগবতের অম্বরীষের কাহিনী জান? কী উদার প্রাণ, কী অভিযোগহীনতা...রাজা অম্বরীষের নিকট দুর্বাসা···। দুর্বাসা অতিথি স্নানে গেছেন, এদিকে একাদশীর পারণের সময় বয়ে যায়। অম্বরীষ পণ্ডিতদের বিধানে শিশিরবিন্দু পান করে পারণ রক্ষা করলে...দুর্বাসা এসে রেগে খুন ...বিষ্ণুচক্র অম্বরীষকে রক্ষা করেছিল—কালানলকে পুড়িয়ে চক্র দুর্বাসার পিছু নিল। দুর্বাসা ত্রিভুবন ঘুরে নারায়ণের কাছে উপস্থিত। নারায়ণ বললেন, ক্ষমা করবার একমাত্র পাত্র অম্বরীষ। সাধুরা আমার হৃদয়, তাদের ছাড়া আমি জানি না, তারাও আমি ছাড়া জানে না।···—অম্বরীষ এ পর্য্যন্ত উপবাসীই আছেন —অম্বরীষের কাছে দুর্বাসা ফিরে এলেন। অম্বরীষ ক্ষমা করলেন দুর্বাসাকে। এই-ই বর্ত্তমান যুগের নীতি। কেউ আক্রমণ করলেই প্রতি আক্রমণ করতে হবে না, কেউ নিন্দা করলেই প্রতি নিন্দা চলবে না, কেউ অভিযোগ করলেই তোমার পাল্টা অভিযোগ চালিয়ে সেব রক্ষা করা যাবে না···এ্যাটমবোমা দিয়েও সেব নেই...পাল্টা এ্যাটমবোমা আছে...। একত্র থাকা, মিলেমিশে থাকতে হবে এ চিন্তা আনতে হবে...বরিশাল পত্রিকা আমার মাসের পর মাস এক তরফা গালাগালি দিয়েছে (নো চেঞ্জার গ্রো চেঞ্জারের বিবাদে), আমি এক তরফা সয়ে গেছি। গুরু শাসন করেছেন? মেনে নাও। গুরু অবিচার করেছেন মনে করছ? মেনে নাও।... আমার স্ত্রী কত অভিযোগই করতে পারতেন অথচ জীবনে একটা অভিযোগ না করে একদিক দিয়ে তিনি আমায় কিনে রেখেছেন...। মেনে নাও, সেবা করে যাও তুমি মনে করছ আমি তোমার প্রতি অন্যায় করেই শাসন করলাম? তবু মেনে নেও।···যতই গুরুর তাড়না, ততই কৃষ্ণের করুণা।...মেনে নেও। মেনে নিলেই অত্যাচারের শাসন হও শিথিল হয়ে যাবে। ...গান্ধীজী শিখিয়েছেন ...ইংরেজ, তুমি অত্যাচার করবে? আমি হাসি মুখে সে অত্যাচার মেনে নেব...। এ্যাটমবোমা আমাদের শান্তির পথ দেখিয়েছে।...সমানে সমানে করতে যেয়ো না, সর্বনাশ হয়ে যাবে, পুড়ে মরবে...। গান্ধীজী ইংরেজের অস্ত্রকে ভস্ম করে দিলেন...শ্রদ্ধানন্দ বুক পেতে দাঁড়িয়ে রইলেন, গুলিটা তাঁর বুক বিদ্ধ করে চলে গেল।... নিত্যগোপালকে ধারণ করবার যৌথ তোমাদের দায় হোক।···বাইবেলে একটি গল্প আছে...বর আসবে— বর হচ্ছেন ভগবান—আগে থেকেই প্রস্তুত হও। কোন্ মুহূর্ত্তে বর এসে চলে যাবে সেদিন আর প্রদীপ জ্বালান হবে না—জীবনে পরম লগন করো না হেলা···। আমি

উন্মাদ নই—সত্যি বলছি, প্রাবন আসছে প্রস্তুত হয়ে থাক—যেদিন বর আসবে, সেদিন যেন বরণ করে নিতে পার।...প্রতিবাদ করো না, অভিযোগ করো না,...মেনে নিয়েই আমার শাসনকে স্তব্ধ করা যায় (যদি আমি শাসনই করে থাকি)...আমাকে বেঁধে ফেলা যায় ...। অভিযোগ না করা অর্থ আমায় বেঁধে রাখা—অভিযোগ করা অর্থ আমায় হাতছাড়া করে দেওয়া...। রসগোল্লার কালে এগিয়ে আসবে—আর দুঃখের দিনে তোমার পচ্ছন্দমত ...এ হয় না। বঞ্চিত আমি কাউকে করিনি—নিজে নিজের মধ্যে আগে বঞ্চিত হয়েছ...যদি না আসে প্রদীপ আলানর কাছে লাগলে না...সেই প্রাবনের মধ্যে নিত্য-গোপাল উদ্ধত নৃত্য করছেন। ..নরনারায়ণ আশ্রম প্রদীপ জালিয়ে বসে থাকবে—কেউ তোমরা না আস একলা আমিই জালিয়ে রাখব—সেই ১৯১৯-এর ৯ই ফেব্রুয়ারী প্রদীপ জালিয়েছি—সে সলতে আমি নিজতে দেব না বিশ্বাস কর।

২৬, ১০, ৪৬।...বর্তমান সমাজ বা শাস্ত্র-ব্যবস্থা বর্ণাশ্রমের উপর স্থাপিত—সে বর্ণাশ্রম ব্যর্থ হয়ে গেছে। ভাগবত একটী বলয়ের সঙ্গে তুলনা করে বলছেন তার তিন ঠ্যাং ভেঙে গেছে, এক ঠ্যাং-এ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে—কলি তাড়না করেছে...। বর্ণাশ্রমেরও তাই... একটা প্রলয় এসে গেছে ...। নিত্যগোপাল...কৃষ্ণ গৌর প্রবর্তিত ভাগবত-ধর্ম প্রবর্তন করে গেছেন...। বর্ণাশ্রম ও ভাগবত ধর্মের তফাৎ আকাশ পাতাল...। যে প্রয়োজনে বর্ণাশ্রম সাধনা নির্দেশ করেছেন, ভাগবতে সেই সাধনা আছে, কিন্তু প্রয়োজন বদলে গেছে। ...সংযম বর্ণাশ্রমে আছে, কিন্তু আমিকে লয় করে পাওয়া নয়, এখানে সংযম অর্থ সঙ্কোচ—কমাতে কমাতে যেতে হবে...সংসারকে—যেন কালপাত্রকে সঙ্কুচিত করে আনা...আমার স্ত্রী পুত্র ইত্যাদিতে আমি শক্ত হয় বলে এই সব শিক্ষাগুলি অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রাদি কেটে আমিকে একলা করা...। এখানে পাই নাই...অন্যখানে পাব...। ভাগবতে এর উলটো—সেখানে আগে পাওয়া—তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন। বর্ণাশ্রমে তিনি এসে দাঁড়ান না—তিনি থাকেন গোলোকবৈকুণ্ঠে—সেই খানে গিয়ে—কৃষ্ণবর্ণকনকঘনতপসত্য পাড়ি দিয়ে লক্ষ যোজন ডিঙিয়ে সেইখানে গিয়ে তাঁকে পেতে হবে।... শংকর ব্রহ্মসূত্রের প্রথম শ্লোকে আলোচনা করেছেন তোমার কি কি গুণ থাকলে তোমার বেদান্তপাঠে অধিকার হতে পারে.. মুমুক্ষু কিনা, শমদম তিতিক্ষা আছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি...। কিন্তু ভাগবত ধর্মে তিনি এসে দিয়ে দিয়েছেন—অফুরন্তভাবে দিয়ে দিয়েছেন...যতখানি পাওয়ার যোগ্য তার থেকে অনেক বেশী দিয়ে দিয়েছেন ...। বর্ণাশ্রমে পরীক্ষা করে করে তিনি দেন, পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে সাধকের পাওনা হয়...। ভাগবতে যিনি সর্বজ্ঞ তাঁর কাছে পরীক্ষা? একবার কলেরার পায়খানা হলে যাদের চোখ বসে যায়, তাদের আবার পরীক্ষা? এই বিরাট বিশ্বে যেখানে সহস্র সহস্র চন্দ্রসূর্য দীপ্তি পাচ্ছে... সেখানে আমার আবার একটা পরীক্ষা? ...মা কী পরীক্ষা করবেন সন্তানকে? ...বর্ণাশ্রমে সংযত হয়ে পেতে হয়...ভাগবতে পেয়ে সংযত হতে হয়...। এইখানে সাধনার কথা আছে—ভাগবত ধর্মের সাধনা হচ্ছে এই যে পেলাম—এতবড় অধিকার যে পেলাম, যা আমার যোগ্যতানুযায়ী পাওয়ার কথা নয় তাও যে পেলাম, এইবার আমাকে তার যোগ্য হতে হবে—যোগ্য হয়ে এই অধিকারের সম্মান রক্ষা করতে হবে, যিনি দিলেন তাঁরও সম্মান রক্ষা করতে হবে, আমি যে পেয়ে অধিকারী হয়েছি—আমারও সম্মান রক্ষা করতে হবে।...কিন্তু এই খানে জীবস্বধর্মী মানুষ ব্যর্থ হয়ে যায় তার সাধনায়—সে অধিকারের অপব্যবহার করে বসে...কি রকম করে? ...ইঁদুর বেড়াল হল, বাঘ হল, একটি সুন্দর মেয়ে হল... শেষ পর্যন্ত তার স্বভাব ও ব্যবহারের দোষে তার সৃষ্টি-কর্তাকে বলতে হল 'পুনর্মূষিকঃ ভব'...। এই শিক্ষা নিয়ো...অধিকারের অপব্যবহার করো না, যা পেয়েছ তার যোগ্য হয়ে ওঠ সাধনা করে করে...। পেলেই নিয়োনা অর্থাৎ তাতে অহংকারী হয়ো না। যারা মাথায় নিতে পারেন তোমাকে—কিন্তু তুমি তাঁর পায়েই থেকো, তোমার যেন এ কথা মনে না হয় যে আমার অত্যন্ত যোগ্যতা তাই তিনি আমার মাথায় রেখেছেন ইত্যাদি।

...তুমি তো পাচ্ছ কিন্তু তুমি কী দিয়েছ? তুমি কী বিনয়ী হয়েছ? তোমার কি দীনতা বেড়েছে? পাওয়ার বেলায় তুমি কি অহংকৃত হয়েছ, না তোমার দীনতা বৃদ্ধি পেয়ে তোমার জীবনের মাধুর্য আরও বেড়েছে!.. অধিকার পেয়েছ...অধিকারের সেবা কর.. পেয়ে এখন যোগ্য হও। যোগ্য হতেই হবে...যোগ্য না হলে রাখতে পারবে না—সব পাওয়া না পাওয়ার পরিণত হয়ে যাবে...। পোষ্যপুত্র নাও সব.. দশ হাজার টাকা দিয়ে যারা ব্যবস্থা করে দিলেন—ছেলে রাখতে পারল না।...যোগ্য না হয়ে পেয়েছ, কিন্তু যোগ্য না হলে রক্ষা করতে পারবে না···। নিত্যগোপালের অযাচিত স্নেহ পেয়ে আসছ, এখন যোগ্য হও...নিত্যগোপালের চরণপ্রান্তে আশ্রয় পেয়েছ···যোগ্য হও, যোগ্য হয়ে এ আশ্রয় রক্ষা করতে পার কিনা —নিত্যগোপালের উপযুক্ত না হলে কি তাঁর কাছে চিরদিন থাকতে পারবে? ·· গোবিন্দানন্দের কাহিনী জান তো? মদ গাঁজা ইত্যাদিতে যার দিন যেত, শ্রীনিত্যগোপালের স্পর্শে আজ সে সাধু-জীবন যাপন করছে, তবু বলে কিছুই হল না আমার। শুনে নিত্য-গোপাল বললেন, ঘুরে এস সমস্ত ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ সাধুর খনি। তারপরেও যদি ইচ্ছা হয় এসো; আমার দুয়ার খোলা রইল...। তিনি দিচ্ছেন বলেই অভিমানী হয়ো না...সন্ন্যাস পেলে, পৈতে পেলেই মনে করো না তুমি তার যোগ্য হয়েছ। তুমি বলো, পিতা, আমায় তুমি কোলে নিয়েছ, কিন্তু আমার জ্ঞান নাই, আমি দাসী, সেবিকা—কিছু চাইতে যেয়ো না— ...পেয়েছ বলে মাথা নত করো না—দিয়েছিলাম বলে আমি হাত ঠেকেছি? তিনি এমন মাথা বিক্রী করে আসেন নি যে কোন অজ্ঞাত আবারও তিনি মেনে নেবেন···।··· নিত্যগোপালকে বলতে শেখো, অহংকারী যেন না হই, আমি যেন তোমার দানকে সম্মান করি। নিজের কথা বলি, আমি কি বক্তা হওয়ার যোগ্য, আমি কি লোক শিখবার যোগ্য? নিত্যগোপাল, তুমি অযাচিত কৃপায় দিয়েছ...আমি দীনহীন, আমায় তোমার চরণধূলি করে রাখ। ···নূতন যুগ আসছে..আমার কত কথা তুমি দিচ্ছ...আমি কাউকে কৃপণের মত কিছু দেই নি—সকলকে আমি সম্পূর্ণভাবে দিয়ে রেখেছি। তিনি বলেছিলেন, পার না পার আমার উপর ভার রইল।··· তিনি এমন করে ভার নিলেন, তার উপর কি ভার চাপান যায়?.. আমাকে দীন করে রাখ ।···অহংকার থাকা সহজ দীন হওয়া যায় না...। অযাচিত শুদ্ধ কৃপায় সেবা কর। আরও যাও, আরও যাও এ ঘরটা ত্যাগ কর, পুনর্মূষিক হওয়ার দুর্ভাগ্য যেন তোমাদের না হয়।··· সংযত হও, ভাগবত ধর্মের সংযম অভ্যাস কর···। নিত্যগোপাল, তোমার এত কৃপা, আমি কত ছোট। সেই ব্রজমোহন স্কুলের ৮০৲ টাকা মাহিনার মাষ্টার ছিলাম আমি, সেই আমি নিত্যগোপালের প্রসাদে বেদান্তের ক্লাস নিচ্ছি। বলেছ, যখন যা দরকার ভগবান অন্তর্যামীরূপে বুঝিয়ে দিচ্ছেন: নিত্যগোপাল, মাথা নত করে যাও তোমার চরণ ধূলার পরে।...তোমাদের বলি, কাঁদতে শেখো, কাঁদতো শেখো; চোখ দিয়ে আগুন না বেরিয়ে চোখ দিয়ে যেন জল বেরোয়...। অনন্ত স্নেহের ভিতরে আছ, মাথা নত কর, সংযত হও, অনন্ত স্নেহ তিনি করছেন, উপলব্ধি করতে পারলে ধন্য হবে।

২৭, ১০, ৫৩। হিন্দুদের ছটা দর্শন— ১) পূর্ব মীমাংসা, ২) উত্তর মীমাংসা ৩) সাংখ্য, ৪) যোগ— পাতঞ্জল, ৫) বৈশেষিক, ৬) ন্যায়। এদের কারো সঙ্গে কারো মিল নেই। পুরুষোত্তম জীবনে এরা মিলেছে। মিল ছিল বলেই অমিল হতে পেরেছিল।···নিত্যগোপাল-প্রসাদে ব্রহ্মসূত্রের অবধূত ভাষ্য লিখতে আমি এদের ভিতরকার মিল তুলে ধরেছি।...বৈশেষিক বলছে প্রত্যেক মানুষ এক একটি বিশেষ—তেমনি প্রত্যেক ধর্ম, প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব একটি সত্তা আছে। এখানে ৭টী পদার্থ আছে তাদের সমবায়...(cooperative)·· এগুলি বেদান্তের আমলের নয়...সমবায়ের জ্ঞান হলে তত্ত্বজ্ঞান হয়, তত্ত্বজ্ঞান হলে মুক্তি...নিত্যসম্বন্ধঃ সমবায়ঃ। নরনারায়ণ আশ্রমে একটা সমবায় করতে হবে—নিত্যসম্বন্ধ আমার সঙ্গে তোমাদের, তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের।

সাতশো বছর আগের কবি

॥ শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় ॥

"পরকে চিনতে বাকী কর,
আত্মতত্ত্ব সেরে ধর,
বাহিরকে ভিতরে পুর,
তবে চিনবি সহজ অ-ধর জনে ?"

রাঢ় বাংলার রাঙা মাটির পথে, অশথ-বট-বেণু ফুলের ছায়ায় একতারা বাজিয়ে বাউল এই পারমার্থিক গান গেয়ে যায়। এ ভাব, এ সুর পল্লী বাংলার মানুষের কাছে কোন অংশে অপরিচিত বস্তু নয়। জীবমাত্রেই ব্রহ্মের প্রকাশ। জীবাত্মাই পরমাত্মার আধার এই নিগূঢ় তত্ত্বই বাংলার বাউল তার সহজিয়া ভাষায় মানুষের কানের ভিতর দিয়ে মরমের দুয়ারে পৌঁছিয়ে দেয়। 'আত্মানং বিদ্ধি' এই চিরন্তন বাণীই উৎসারিত হয় মরমী বাউলের কণ্ঠে। এ বাণীর আবেদন কোন সম্প্রদায় বিশেষ বা দেশ-কালের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না। এ বাণীর আবেদন মানবীয়। এ বাণীর আকুতি বিশ্বজনীন। নানা কবি নানা সুরে, নানা ছন্দে এই শাশ্বত বাণীকে প্রকাশ করেছেন যুগে যুগে। উপনিষদ-মন্ত্রে অনুপ্রাণিত ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন :

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখতে আমি পাই নি।
বাহির পানে চোখ মেলেছি
হৃদয় পানেই চাই নি।

অথবা,

চোখে দেখিস, প্রাণে কানা।
হিয়ার মাঝে দেখ্‌না ঘরে
ভুবনখানা।

প্রাচ্য দেশের কোন কবি-কণ্ঠে এ সুরের, এ ভাবের গান শুনতে আমরা অভ্যস্ত, তার কারণ অন্তর্মুখীনতা প্রাচ্য দর্শনের বৈশিষ্ট্য। বিষয়-বিলাসীর মন বহির্মুখী। পাশ্চাত্যের জীবন সম্ভোগবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই পাশ্চাত্যের কবির গানে, কাব্যে আমরা এ সুর, এ ভাব সাধারণতঃ আশা করি না। যখন পাই তখন সহজেই মুগ্ধ হই, অভিভূত হই, কারণ এ সুরের, এ ভাবের ব্যঞ্জনা মানবীয় এবং মর্মস্পর্শী। তাই যখন সাতশো বছর পূর্বেকার, পাশ্চাত্য জগতের সেই অন্ধকার যুগের এক কবি-কণ্ঠে শুনি এই আত্মোপলব্ধির উদ্গীতি তখন সেই কবিকে জগতের মহাকবি বলে জানাই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন। La Divina Commedia-র কবি দান্তে আলিঘিয়ারির বাণী বিশ্বমানবতার প্রাচ্য বাণীর প্রতিধ্বনি। অন্তরের অন্তর্লোকে যাত্রাই "ডিভাইন কমেডির" উপজীব্য। হৃদয়ের গহনে ডুব দাও। পাপ ও প্রলোভন পরিত্যাগ কর। হৃদয় শুদ্ধ কর, নির্মল কর, পবিত্র কর। মানুষে মানুষে প্রভেদ নেই : জগৎ জুড়ে এক জাতির বাস : প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সারা দুনিয়ার মানুষ এক হউক। প্রেম সর্বজয়ী। প্রেমাশ্রয়ী মানুষই পরমা গতির যোগ্য। 'ডিভাইন কমেডির' ছত্রে ছত্রে মধ্য দিয়া এই চির সত্যের জয়গান উদ্গীত হয়েছে। জাতি-দেশ-কালের গণ্ডী অতিক্রম করে কবির এই উদার বাণী মানুষকে আজও মহৎ অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করছে। দান্তে পৃথিবীর অন্যতম মৃত্যুহীন মহাকবি।

বিশ্বমানবতার সঙ্গে শুভ সংযোগ ঘটেছে বিশ্ব-প্রিয়তায়। যে সব ক্ষণজন্মা কবি অনুবাদের মাধ্যমে জগৎময় প্রচার লাভ করেছেন, যেমন কালিদাস, সেক্সপীয়র, গ্যেটে, টলস্টয়,—দান্তে তাঁদের অন্যতম। রচনাকালের অব্যবহিত পরেই "ডিভাইনা কমেডিয়ার" হস্তলিখিত পাঁচশত প্রতিলিপি বিক্রীত হয়েছিল। গ্রন্থখানির বিপুল জনপ্রিয়তায় এ হচ্ছে এক অকাট্য প্রমাণ। ইতালীর লক্ষ লক্ষ নরনারী দান্তে-কাব্য শ্রদ্ধার সঙ্গে, অনুরাগের

সঙ্গে আজও কণ্ঠস্থ করে। কবির জন্ম-নগরী ফ্লোরেন্সের গৃহ-দ্বারে, প্রাচীর গাত্রে উৎকীর্ণ আছে দান্তে কাব্যের উদ্ধৃতি। যে পথে কবি চলাফেরা করতেন তারই পাশে পাশে স্থাপিত মর্মর ফলকে উৎকীর্ণ লিপিগুলি যেন বলছে—দাঁড়াও পথিকবর, ভিষ্ঠ ক্ষণকাল, স্মরণ কর সেই বিশ্রুত-কীর্তি মহান কবিকে। ইতালীর জনগণের চিত্তে কবি আজও এক অনির্বাণ মহিমায় বিরাজ করছেন। প্রায় কুড়িটি বিভিন্ন সংস্করণে কবির শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'ডিভাইন কমেডি' প্রকাশিত, এবং গড়ে আশিহাজার খণ্ড প্রতি বৎসর নিয়মিত বিক্রয় হয়। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে দান্তের জনপ্রিয়তা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি। যে অতীত যুগে কবির আবির্ভাব, সে যুগটাকে ইতিহাসের ভাষায় বলা হয় 'অন্ধকার যুগ'। সে যুগের ভাষা ছিল ল্যাটিন। বাংলা মহাভারতের কবি কাশীরাম দাসের প্রশস্তিতে কবি মধুসূদনের উক্তি :

"—ভাষাপথ খননি যে বলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি—
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে!
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।"

সংস্কৃত ভাষার দুরূহ-শিলড় প্রাচীরের বন্ধন থেকে কাব্য-বন্দাকিনী ধারা লোক-ভাষার সহজ সরল খাতে প্রবাহিত করেছিলেন বাংলার চির আদৃত কবি কাশীরাম দাস। মহাকবি দান্তেও পণ্ডিতী ল্যাটিন ভাষার অবরোধ হতে মুক্ত করে লোকপ্রিয় ইতালীয় ভাষায় নবসজ্জায় সাজিয়ে-ছিলেন কাব্য-লক্ষ্মীকে। দান্তে ইটালীয় ভাষার স্রষ্টা। একটা অজ্ঞাত, অনাদৃত পল্লীভাষাকে বিশ্ব-ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি। এ অসাধারণ কৃতিত্ব খুব কম কবি ও সাহিত্যিকই দাবী করতে পারেন। যে সহজ ও সুললিত ভাষা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন সাতশো বছর আগে, সজীবতা, সরসতা ও জনপ্রিয়তায় তা' আজও অতুলনীয়।

১২৬৫ খৃষ্টাব্দে ইতালীর অন্তর্গত ফ্লোরেন্স নগরে দান্তে আলিঘীয়ারির জন্ম হয়। তাঁর জন্ম হয়েছিল এক অভিজাত পরিবারে। অপেক্ষাকৃত কম বয়সেই খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিলেন তিনি। আর্নো নদীর তীরবর্তী ফ্লোরেন্স শহরটি ছিল এক কঙ্ক-চকল স্বায়ত্ত-শাসিত সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্র। এ সময়ে ফ্লোরেন্সের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ঘটছিল কতকগুলি বৈপ্লবিক পরিবর্তন। পুরাতন সামন্ত-তান্ত্রিক গোষ্ঠি ক্রমশঃই দুর্বল ও ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ছিল। তার স্থান অধিকার করছিল এক বণিক-সমাজ। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রভাব দান্তের জীবনের গতিকেও পরিবর্তিত করেছিল। সমকালীন প্রথানুযায়ী সম্ভ্রান্তবংশীয় দান্তে ল্যাটিন, দর্শন এবং কাব্য-কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে যাজক-সম্প্রদায় পরিচালিত বিদ্যালয়ে যথারীতি শিক্ষা-লাভ করেছিলেন। পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও নবোত্থিত মধ্যবিত্ত বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ক্রমশঃই তীব্র রূপ ধারণ করছিল।

এই গৃহযুদ্ধে বিবদমান দুই দল অর্থাৎ সামন্তগণ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী যথাক্রমে 'ব্ল্যাকস্' এবং 'হোয়াইটস্' নামে পরিচিত ছিল। দান্তে সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছিলেন বটে, কিন্তু যোগ দিলেন 'হোয়াইটস্'দের দলে। তাঁর যোগ্যতায় সর্বোচ্চ ক্ষমতাশীল নগর-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। কবি বায়রণের ন্যায় দান্তেও সক্রিয় যুদ্ধ-বিগ্রহে অশ্বারোহী সৈন্যরূপে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ছত্রিশ বৎসর বয়সে পোপ অষ্টম বনিফেসের দরবারে কূটনৈতিক দৌত্য কার্যের ভার নিয়ে ভ্যাটিকেনে গমন করেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে দান্তে শুনতে পেলেন যে, প্রতিপক্ষীয় 'ব্ল্যাকস্'দল ফ্লোরেন্সের শাসন-কর্তৃত্ব পুনরায় হস্তগত করেছে, তাঁর বাড়িঘর লুণ্ঠিত হয়েছে, এবং তাঁর অনুপস্থিতিতেই তাঁকে চির নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। ফ্লোরেন্সে আর তাঁর ফেরা হ'ল না। নির্বাসন দণ্ডের গ্লানি মাথায় নিয়ে আশ্রয়ের জন্য বিদেশ শহরে চলে গেলেন। মিলানের ভিটর দিলেন তাঁকে প্রথম আশ্রয়। তারপর থেকেই শুরু হল দান্তের কঠোর, দুঃখময় নির্বাসিত জীবন। এ-দিকে ফ্লোরেন্সের 'ব্ল্যাকস'-দল চরম প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে এই আদেশ জারি করল যে, দেশে প্রত্যাবর্তন করলেই দান্তেকে জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ করা হবে। নির্বাসিত জীবনে দান্তের অন্তর তাঁর

প্রিয় জন্মভূমির জন্য হাহাকারে ভরে উঠত। ভুলতে পারতেন না স্বদেশের সুখ-স্মৃতি। পরে অবশ্য ফ্লোরেন্সের কর্তৃপক্ষ প্রচুর অর্থদণ্ডের বিনিময়ে নির্বাসিত নাগরিকদিগকে স্বদেশে ফিরে আসবার অনুমতি ঘোষণা করেছিল। কিন্তু ফ্লোরেন্সের শ্রেষ্ঠ সন্তান আত্মমর্যাদা-বোধসম্পন্ন দান্তে অর্থদণ্ড দিয়ে স্বদেশে ফিরে আসতে অস্বীকৃত হন।

কবির নির্বাসিত জীবন শেষ হয় র‍্যাভেনা শহরে। সেখানেই তাঁর নশ্বর দেহ সমাহিত করা হয়। কয়েক শতাব্দী পর ফ্লোরেন্সবাসিগণ তাঁদের লাঞ্ছিত ও অনাদৃত কবিকে সসম্মানে তাঁর প্রিয় জন্ম-ভূমিতে ফিরিয়ে আনতে চাইলে র‍্যাভেনার অধিবাসিগণ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কবির কথায় তাদের অভাব হল :

"জীবনে যাঁরে তুমি দাও নি মান,
মরণে তাঁরে কেন দিতে এলে তুল ?"

ফ্লোরেন্সবাসী "চার্চ অব দি হোলি ক্রস"-এর প্রাঙ্গনে কবির মরদেহের জন্য যে সমাধি-সৌধ রচনা করেছিল, তা' আজও অবধি শূন্য অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে। পাশেই অনন্ত শয়নে শায়িত আছেন অমর শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলো। মাইকেল এঞ্জেলো এবং বতিচেল্লি উভয়েই রেণেসাঁ যুগের উজ্জ্বল রত্ন, এবং উভয়েরই স্মরণী প্রতিভার উৎস হচ্ছে দান্তের মহাকাব্য।

নির্বাসিত জীবনেই কবির অক্ষয় কীর্তি "ডিভাইনা কমেডিয়া" রচিত হয়। রচনার স্থান র‍্যাভেনা শহর। কবি তাঁর আত্মীয় স্বজনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েই সে-সময় র‍্যাভেনায় অবস্থান করছিলেন। এ মহাকাব্য রচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল প্রায় কুড়ি বৎসরে। কবি নাম দিয়েছিলেন শুধু 'কমেডিয়া', কারণ এর শেষ হচ্ছে সুখকর মিলনে। পরবর্তী কালে প্রকাশক 'ডিভাইনা' কথাটি যুক্ত দিয়েছিল। মাত্র ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সে কবির মৃত্যু। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ইতালীর যাবতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "ডিভাইনা কমেডিয়া" সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ও নীতি গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হয়।

"ডিভাইন কমেডি" জগতের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের অন্যতম। তিন খণ্ডে এবং একশত সর্গে বিভক্ত এই সুমহান ও সুবৃহৎ কাব্য-গ্রন্থ। জীবনের পরপারে অদৃশ্য, রহস্যময় লোকে কবির কল্পনা-পরিক্রমণ—মহাকাব্যের এই হচ্ছে উপজীব্য। এক সপ্তাহ কালব্যাপী এই মহা-যাত্রার ঘটনাবলী যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি জীবন্ত ও বাস্তবধর্মী। অমর মহাকাব্য মহাভারতের মতই "ডিভাইন কমেডি" বৈচিত্র্য, বিশালতা ও গাম্ভীর্যে সুমহান। ধর্ম-নন্দন যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শন উপাখ্যানের সঙ্গে এ আখ্যানের কোন কোন ক্ষেত্রে সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এ আখ্যান শুধু নরক-দর্শনের কাহিনীই নয়। এ হচ্ছে এক সুন্দর ও সত্যাশ্রয়ী জীবন-দর্শন। সত্যতার সেই অন্ধকার যুগের যাবতীয় নিষ্ঠুরতা অন্যায় অবিচার ও ব্যভিচারের বিরুদ্ধে এত বলিষ্ঠ প্রতিবাদ হচ্ছে এই মহাকাব্য। পাপাচার থেকে নিবৃত্ত থেকে শান্তি ও সহ-যোগিতার সূত্রে সমগ্র মানব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হবার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন মহাকবি। এক অখণ্ড ও দ্বেষহিংসাবিহীন শান্তিময় জগৎ-সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন দান্তে। কবির সে স্বপ্ন রূপায়িত করার প্রচেষ্টা এখনও অব্যাহত চলেছে। ল্যাটিন কবি ভার্জিল ছিলেন দান্তের সকল প্রেরণার উৎস, তাঁর আদর্শ পুরুষ। ভার্জিলের প্রেতাত্মাই দান্তের নরক-যাত্রার পথ-প্রদর্শক। লেলিহান জলন্ত অগ্নিকুণ্ড, আর নিষ্পীড়িত জীবাত্মার দীর্ঘশ্বাস ও মর্মন্তুদ বিলাপ-ধ্বনিপূর্ণ সেই ভয়ঙ্কর নরকভূমি সজীব হয়ে উঠেছে কবির বর্ণনার চাতুর্যে। খরস্রোতা রক্তনদী ভয়াল দুস্তর মরুভূমি, উত্তপ্ত বর্ষণ-বন্ধুর শৈলচূড়া আর দাহমান জনপদ—এই নিয়েই রচিত হয়েছে 'ডিভাইন কমেডি'র বাহ্য বৃত্তাবলী। সে বিভীষিকাময় রাজ্যের নানা স্তর ডিঙিয়ে ক্রমে ক্রমে অতল গভীরে প্রবেশ করতে লাগলেন পর্যটক। কিন্তু তিনি নীরব, নিস্পৃহ পর্যটক নহেন। পর্যটকের মুখে নানা প্রশ্ন; পথ চলতে চলতে দাঁড়াচ্ছেন পথিক, পরিপার্শ্বের বন্দী অশরীরী আত্মাকে জিজ্ঞাসা করছেন নানা প্রশ্ন, আর লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছেন তাদের উত্তর। বস্তুত পাপের স্বীকৃতিই হচ্ছে তাদের উত্তর। দান্তের সমকালীন খ্যাতিমান ব্যক্তিরাই হচ্ছেন নরকে

অধিবাসী—এদের মধ্যে আছেন রাজা রাজড়া, পোপ, পুরোহিত, রাজনীতিক, সমাজনেতা প্রমুখ অনেকেই। এদের মুখ দিয়েই কবি সে যুগীয় নিষ্ঠুরতা, অন্যায়, অধর্ম ও পাপাচারের এক নিখুঁত বিবরণী দিয়েছেন। পাপী তাপীর যন্ত্রণা ভোগের কী ভয়ঙ্কর চিত্রই না ফুটিয়ে তুলেছেন। কেউ ডুবে আছে দুষ্টত পঙ্ক-কুণ্ডে, কারুর দেহ লম্বিত রয়েছে অর্ধ-ভিন্ন গাছের মাঝখানে। সেই গাছের একটি পল্লব ছিন্ন করলেন কবি,—দরদর ধারে রক্তস্রাব হতে লাগল,— আর্তনাদ করে উঠল সেই সজীব বৃক্ষটা। এরিয়ো হৃদয়-বিদারক দৃশ্য পর পর ভেসে উঠে পাঠকের মানসপটে। এই ভয়াবহ পর্যটনের মধ্যপথ শেষ হয়েছে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে যেখানে চিরতুষার বেষ্টনীর মাঝখানে সুসিফার বা শয়তানের সুবিশাল প্রেতমূর্তি নিশ্চল অবস্থায় উপবিষ্ট। এই ছায়াচ্ছন্ন প্রেতমূর্তির অপর পার্শ্বে এক বদ্ধ কপাট। সেই কপাট অর্গলমুক্ত করে বহির্গত হলেই নরকরাজ্যের সীমানা পার হয়ে স্বর্গলোকের প্রবেশ-পথে উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু কি ভাবে এ সম্ভব হতে পারে? অসীম দুঃসাহসে পর্যটকদ্বয় শয়তানের দেহারোহন করে অপর পার্শ্বে অবতরণ করলেন। তারপর সুদীর্ঘ অন্ধকারময় সুড়ং-পথ অতিক্রম করে এক উত্তাল সমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়ালেন। এই সমুদ্রের গর্ভ থেকেই উত্থিত হয়েছে 'পারগেটরি' নামে পাহাড়ের চূড়া।

গ্রন্থখানির সূচনাও বিচিত্র। ১৩০০ খৃষ্টাব্দের ইষ্টার পর্বের প্রাতঃকালে দান্তের সহিত তাঁর কবি-গুরু ভার্জিলের সাক্ষাৎকালে ভার্জিল বলেন যে, ব্রেসেক্ত ভার্জিল, দেন্ট লুসি এবং দান্তে-প্রিয়া বিয়াত্রিচের অনুরোধে তিনি দান্তেকে পরলোক পরিক্রমার পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। পর পর নরক (Inferno), যমলোক (Purgatory) এবং স্বর্গলোকের (Paradiso) মধ্য দিয়ে চলেছে এ মহাযাত্রার পথ! যমলোকের প্রান্তে এসেই যদি কবি তাঁর লেখনী বন্ধ করতেন তা হলেও তাঁর কীর্তি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকত কারণ তাঁর নরক বর্ণনার তুলা অবদান জগতের সাহিত্যে আর নাই। দ্বিতীয় খণ্ডে অর্থাৎ যমলোক অতিক্রমণের শেষে কবি পারগেটরি পর্বতের চূড়ায় অবস্থিত ইডেন উদ্যানে এসে পৌঁছুলেন। হঠাৎ পিছন থেকে রমণী কণ্ঠে উচ্চারিত নিজের নাম শুনতে পেলেন দান্তে। এ-ই কবির বাল্য-প্রিয়া বিয়াত্রিচে। মাত্র নয় বৎসর বয়সে বালক দান্তে এক সামাজিক অনুষ্ঠানে সমবয়সীদের যে বালিকা বিয়াত্রিচেকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এ-সেই মনোরমা রমণী। "নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী, হে নন্দনবাসিনী উর্বশী—বিয়াত্রিচের প্রতি দান্তের প্রেম ও অনুরাগের বোধ হয় এই হচ্ছে সঠিক অভিব্যক্তি। দান্তের নিজের উক্তি: 'বিয়াত্রিচ দেব-কন্যা, সাধারণ মানবী নয়'। শুচিতা, সম্ভ্রম, ও সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি বিয়াত্রিচের প্রতি দান্তের অনুরাগ নিষ্কাম প্রেমের এক বিরল দৃষ্টান্ত। "বাসনা-কলুষ প্রেম বিকম্পিত হেন, কামগন্ধ নাহি তায়"। দুজনার দেখা হত অতি কদাচিৎ, দান্তে দূর হতে যেন তাঁর ঈপ্সিতা দেবীকে জানাতেন হৃদয়ের প্রেমার্ঘ্য কতকগুলি অনবদ্য প্রণয়-মধুর কবিতার মাধ্যমে।

কিন্তু বিয়াত্রিচ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধা হয়েছিলেন জনৈক ব্যাঙ্কার বা লক্ষ্মী কারবারীর সহিত, আর মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিলেন মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে। দান্তে পাণিগ্রহণ করেছিলেন গেম্মা দোনাতি নাম্নী জনৈকা অভিজাতিকার। দান্তে-বিয়াত্রিচের সম্বন্ধ ছিল সম্পূর্ণ আত্মিক। দৈহিক মিলনের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু এই অধ্যাত্ম প্রেমই ছিল দান্তের আত্মার আশ্রয় ও অবলম্বন। জীবনের যাবতীয় মহতী প্রেরণা এসেছে ঐ প্রেমের উৎস থেকে।

"আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে,
মৃত্ত ললিত অশ্রুগলিত গীতে॥
পরশনের বেদনা মাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে—
ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয় তুমি আছ আমি আছি।"

দান্তে-বিয়াত্রিচের প্রেমের আদর্শ আত্মিক ও ত্যাগরত আদর্শ। প্রেম বিশ্বময়ী। মানুষের সুমহতী বৃত্তিগুলির ধাত্রী

অনন্তিত্রী প্রেম। জগজ মোহ আর দৈহিক আকর্ষণের ঊর্ধ্বে আত্মিক প্রেমের সঞ্চরণ। প্রেম মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে মহৎ কর্মে, শুভ প্রচেষ্টায়, সৃষ্টি-সাধনায়। প্রেমই সত্য-শিব-সুন্দরের আরাধনার কল্প মন্ত্র। প্রেমের প্রেরণায় কবি-কণ্ঠ হতে উৎসারিত হয় মধুনিস্যন্দী বাণী, বীর যাত্রা করেন দুর্গম সঙ্কট-যাত্রায়, শিল্পী প্রেমের রূপায়িত করেন হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে, যোগী ধ্যান করেন পরমার্থের। সে বিশ্বজয়ী প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী কবি-মনোরমা বিয়াত্রিচে দশম স্বর্গে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন দান্তেকে। উজ্জ্বল মহান্ত পুরুষ প্রতিভাত হলেন কবির দিব্য দৃষ্টিতে। ব্রতচারিণী বিয়াত্রিচে ব্রত সমাপ্তিতে অন্তর্হিতা হলেন। কবির লেখনীও হল নিরস্ত। শেষ কথার সবটে ঘোষণা করলেন: "প্রেম সর্বময়। সূর্য-গ্রহ-তারার নিয়ামক প্রেম"।

শতাব্দীর সমুদ্র পার হয়ে মহাকবির বাণী ভেসে আসে এক চিরন্তনী আশা ও উদ্দীপনার বার্তা নিয়ে। যাদের এক অজ্ঞতা ও অন্ধকারময় যুগে জন্ম গ্রহণ করেও সৃষ্টি করে গেছেন এমন এক কালজয়ী মহাকাব্য যার মানবিকতা এ মর্মবাণী সম্ভব করে তুলল আধুনিক যুগের আবির্ভাবকে। দান্তের প্রেতলোক-পরিক্রমা প্রকৃতপক্ষে মানুষেরই জীবন পরিক্রমার প্রতীক—বিবেকের অন্ধকার অন্তঃস্থল হতে জ্ঞানালোক ও মুক্তির মার্গে উত্তরণ। মৃত্যুঞ্জয়ী কবিকে আজ বিশ্বজন সাতশো বছর পরেও জানাই প্রণাম।

যোগ সমন্বয়

॥ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ॥

সুকৌশলে কর্মযোগ যোগ্যতার সুষ্ঠু পরিচয়
নীরবে নিঃস্বার্থ সেবা তাও যোগ ভিন্ন কভু নয়।
অনাসক্ত কর্মযোগ, যোগ চিত্তবৃত্তির সমতা
সম্পূর্ণ সংযম যোগ রাজযোগ সর্বাত্মময়তা।
ধ্যানযোগে দেখে সেই তমসার পারে যে আলোক
ওতপ্রোত এ নিখিলে আত্মায় বিধৃত সর্বলোক।
পূর্ণতার অংশ জীব, উপলব্ধি হয় তার সদা,
জীবে শিবে স্পর্শযোগ সেই মুক্তি শুভদা শর্মদা।
তপস্বী হইতে যোগী,—কর্মী হইতেও যোগী বড়,—
জ্ঞানী হতে রাজযোগী, সেই যোগে চিত্ত যোগ কর।
যোগীদের মধ্যে জানি সেই যোগী হয় শ্রেষ্ঠতম
তদগত নিষ্ঠায় ভজে তাঁহারেই মানে প্রিয়তম।
গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে
ভগবদ্ বাক্যানুসরণে।

লোক-সঙ্গীত ও বাঙ্গালীর সঙ্গীত-সাধনা

।। ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য ।।

লোক-সঙ্গীতের জন্য সাধনার প্রয়োজন না হইলেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জন্য সাধনার আবশ্যক হয়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা আমাদের দেশে কবে হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং তাহা বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়া আজ পর্যন্ত কি ভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিলে একটি বিষয় অতি সহজেই অনুভব করা যায় যে, যদিও প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন রাজসভায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা স্বাভাবিক নিয়মেই হইয়া থাকিবে তথাপি একথা সত্য তাহা কদাচ লোক-সঙ্গীতের প্রবাহকে স্তিমিত করিয়া দিতে পারে নাই। প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই দেখা যায়, লোক-সঙ্গীতই অনুশীলন করিবার ফলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে, আবার তাহা অনুশীলনের অভাবে লোক-সঙ্গীতের পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে।

খৃষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে রচিত বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন রূপে যে বৌদ্ধগান ও দোহার অন্তর্গত চর্যাপদগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কতকগুলি উচ্চাঙ্গ রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। ইহা হইতেই কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে খৃষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীতেই বাংলা দেশের সঙ্গীতে উচ্চাঙ্গ রাগরাগিণীর প্রবর্তন হইয়াছিল। কিন্তু এ' কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'বৌদ্ধগান ও দোহা' দশম একাদশ শতাব্দীর রচনা হইতে পারে, কিন্তু ইহার যে পুঁথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে এবং যাহাতে রাগ-রাগিণীগুলির উল্লেখ দেখা যায়, তাহা দশম একাদশ শতাব্দীর নহে, তাহা আরও অনেক পরবর্তী কালের। সুতরাং আরও পরবর্তী কালে গিয়া এই সকল রাগরাগিণীর নাম ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করা কিছুই আশ্চর্য নহে। সাম্প্রতিক কালে বাউল গানের যেমন একটী নিজস্ব লৌকিক সুর আছে, চর্যাপদগুলি তেমনই ইহাদের নিজস্ব লৌকিক সুরেই গীত হইত, তারপর যখন এ'দেশে নানা উচ্চাঙ্গ রাগরাগিণীর প্রচলন হইয়াছে, তখনই ইহাদের মধ্যে নানা রাগরাগিণীর নাম গিয়া যুক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ চর্যাপদগুলির মধ্যে যে সকল রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে দেশীয় রাগরাগিণীর সংখ্যাই অধিক। মনে হয়, এই বিষয়ে ইহা নিজস্ব ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করিয়াছে। যেমন, চর্যাপদের রাগরাগিণীর মধ্যে বহু সংখ্যক পদেই 'গৌড় রাগে' গেয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই 'গৌড় রাগ' তৎকালে প্রচলিত বাংলা-দেশের লোক-সঙ্গীত ভিত্তিক যে বিশিষ্ট কোন রাগ ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পাল রাজাদের সভায় সঙ্গীত এবং নৃত্যের চর্চা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তখন পর্যন্ত দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী রাজসভায় তাহা স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। সুতরাং রাজসভায় সঙ্গীত-সংস্কারের মধ্য দিয়াও লোকায়ত সংস্কারই মার্জিত-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকিবে। পালরাজত্বের পরবর্তী কালে সেন রাজত্বের আমলে বিশেষতঃ লক্ষ্মণসেনদেবের রাজসভায় যে অভিজাত প্রকৃতির নৃত্যগীত প্রচলিত ছিল, তাহার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় সত্য, তথাপি দেখা যায়, তাঁহার সভাকবি জয়দেব যে নৃত্যগীত সংবলিত গীতিকাব্য 'গীত গোবিন্দ' রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দেশীয় রাগরাগিণী এক অতি প্রধান অংশ অধিকার করিয়াছে। দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা চর্যাগানের রাগরাগিণীরই উত্তরাধিকারী হইয়াছে। চর্যাগানে যেমন দেশীয় রাগরাগিণী, যথা, রাগ গউড়, দেশাখ বা দেশীয়, শাবরী বা পার্বত্য, বরাড়ি ('গীতগোবিন্দে' ইহাকে দেশীয় বরাড়ি

বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, সুতরাং ইহা দেশীয় সুর), মালসী (আগমনী বিজয়া বা রামপ্রসাদী গানের সুর) বঙ্গালী বা পূর্ববঙ্গীয় সম্ভবতঃ ভাটিয়ালি ইত্যাদি সুরের উল্লেখ আছে, 'গীতগোবিন্দে'ও তেমনই গৌড়রাগ, দেশী-রাগ, দেশীবরাড়ী রাগ ইত্যাদি নাম উল্লেখিত হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'ও তাহারই ধারা অনুসরণ করিয়া নানা দেশীয় রাগরাগিণীর সর্ব্বত্রই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায়, লক্ষ্মণসেন দেবের রাজত্ব-কাল হইতে অন্ততঃপক্ষে বাঙ্গালীর সঙ্গীত-সাধনায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি বিশেষ স্থান স্বীকৃত হইলেও বাঙ্গালীর লোক-সঙ্গীতের যে ধারা ইতিমধ্যেই এক বলিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়াছিল, তাহাও ইহার নিজস্ব গতিপথে একটি সমান্তরাল ধারা সৃষ্টি করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। 'গীত-গোবিন্দে'র রচনাগত বৈশিষ্ট্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, রাজসভার মধ্যেও কেবল মাত্র উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতই নহে, লোক-সঙ্গীতেরও প্রভাব স্থাপিত হইয়াছিল।

মধ্যযুগের বাংলার সমাজে নাটগীত নামে যে এক শ্রেণীর গীত এবং নৃত্যযুক্ত লোক-নাট্যের প্রচলন ছিল, 'গীত-গোবিন্দ' এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' যে তাহারই পূর্ণরূপ, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেব মধ্যযুগে যে কীর্ত্তনগানের প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহা কিছুকাল পর্যন্ত ক্রমাগত অনুশীলনের ফলে রাগসঙ্গীতের পর্য্যায়ে উঠিয়া গেলেও তাহা মূলতঃ লোক-সঙ্গীত ভিত্তিকই ছিল। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালে কীর্ত্তন গান নিতান্ত সহজ ও বৈচিত্র্যহীন ছিল, সুতরাং ইহার উদ্ভবের মধ্যে লোক-সঙ্গীতের ধর্মই শক্তিয় ছিল। সে যুগের নাম-কীর্ত্তন 'গীত-গোবিন্দ' ও 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে'র গীত-রীতির সহজ সংস্করণ ছিল, অর্থাৎ চৈতন্যদেব পূর্ববর্তী গায়ন-শৈলীকে আরও সহজ এবং সরল করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। জনসাধারণের জন্য তিনি যে ধর্মের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা জনসাধারণের ব্যবহৃত সুরেই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, অনাবশ্যক কোন জটিলতা সৃষ্টি করিয়া ইহাকে জনসাধারণের অধিকার হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে যান নাই। কিন্তু কীর্ত্তন-গান ক্রমক্রমে জটিল হইতে জটিলতর হইয়া শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পর্য্যায়ভুক্ত হইল এবং চারিটি আঙ্গিক ধারায় বিভক্ত হইয়া গেল। নামকীর্ত্তন ক্রমে পদাবলী কীর্ত্তন হইল, ক্রমে তাহা মহাজন পদাবলীর সীমায় আবদ্ধ হইয়া ইহার স্বতঃস্ফূর্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিয়া দিল, এই ভাবেই ইহার ধারা লুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যে প্রেরণাটুকু এই পদ্ধতির সঙ্গীতের মধ্য দিয়া সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহাকে অবলম্বন করিয়া কীর্ত্তন গান একটি লৌকিক ধারাও সৃষ্টি করিল এবং তাহা আর বিনাশপ্রাপ্ত হইল না, বাংলার লোক-সঙ্গীতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ইহার প্রাণ-প্রবাহ রক্ষা পাইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় সঙ্গীত কোন বৈঠকী রূপ (Classical Bengali) লাভ করিবার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত কয়েকজন বৈষ্ণব নাগর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আদর্শ স্বরূপ সর্বপ্রথম বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে রসকীর্ত্তন বা লীলাকীর্ত্তনের প্রবর্তন করেন। তখন হইতে কীর্ত্তন গানের একটি ধারা সঙ্গীত সাধকের উচ্চাঙ্গ সাধনার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। বাংলাদেশে সঙ্গীত-শাস্ত্রের যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকটিই এই সময়ের পরবর্তী। সপ্তদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া কীর্ত্তন গানের ব্যাপক অনুশীলন হইয়াছিল সত্য কিন্তু এই শতাব্দীর সীমা অতিক্রম করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই ইহার প্রাণধারা শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদাবলীর এক নূতন রূপ আত্মপ্রকাশ করিল, তাহা শাক্ত পদাবলী নামে পরিচয় লাভ করিল। লোক-সঙ্গীতের যে ধারাটির মধ্যে আগমনী-বিজয়া গান রচিত হইয়াছিল, রামপ্রসাদ সেন সেই ধারাটিকে অনুশীলন করিয়া একটি উচ্চতর রস মর্যাদায় তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার লোক-সঙ্গীতগুলিরও নানাভাবে অনুশীলন হইয়াছিল; কিন্তু কীর্ত্তনের মত তাহাদের কোনটিই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে নাই; লোক-সঙ্গীতের স্তরে থাকিয়া জনসাধারণে

ক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বাংলা দেশে যে শ্রেণীর সঙ্গীত জনপ্রিয় ছিল, সে সম্পর্কে সমসাময়িক কবি জয়নারায়ণ ঘোষাল তাঁহার এক গ্রন্থে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধারযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,

সঙ্কীর্তন নানা ভাঁতি অপূর্ব সুন্দর।
গড়াহাটি রানীহাটি বিরহ মাথুর।
অভিসার মিলনাদি গোষ্ঠের বিহার।
কবি পদ্‌তো তালকেয়া শুনিতে মধুর॥
পাঁচালী অনেক ভাঁতি রামায়ণ সুর।
কথকতা তরজাতে সাধিতে প্রচুর॥
ভবানী জরের গান মালসী মাথুর।
গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী বিজয়াতে ভোর।
বাইশ আখড়া ছাপ প্রেমে চুরচুর।
গোবিন্দ মঙ্গল আরি গাইছে সুধীর।
চৈতন্যচরিতামৃত প্রেমের অঙ্কুর।
শ্রবণে যাহার গান ভকত আতুর।
কালীয় দমন রাস চণ্ডীযাত্রা ধীর।
রচিল চৈতন্যযাত্রা রসে পরিপূর॥
সাপড়িয়া বাদিয়ার ছাপের সহর।
বাঙ্গালার নবগান নূতন সুমুর॥

এই বর্ণনার মধ্যে কোন উচ্চাঙ্গ রাগসঙ্গীতের উল্লেখ নাই; অবশ্য গরাণহাটি ও রেনেটির কীর্তনের উল্লেখ আছে, তাহাও বাংলারই পদাবলী কীর্তন—উচ্চ অনুশীলনের ফলে ঐ পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে মাত্র। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কীর্তনেরই বিভিন্ন লৌকিক রূপের যেমন জনসাধারণের মধ্যে একদিকে ব্যাপক প্রচলন ছিল, তেমনই অন্য দিকে বাংলার পল্লী-সঙ্গীতেরও বিভিন্ন খুব নূতন প্রতিষ্ঠিত নাগরিকদের জীবনের প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে নানাভাবে মার্জিত করিয়া ব্যবহৃত হইতেছিল। কলিকাতা মহানগরী প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে কলিকাতার যোগাযোগের ফলে ইহার সঙ্গীত-সাধনায় এক নূতন পর্বের সূচনা দেখা দিল। তখন হইতেই হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের নানা ঢঙ্, বাংলাদেশে প্রবর্তিত হইবার ফলে বাংলা গানেও তাহার প্রভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।

সে যুগে বাংলা গানে হিন্দুস্থানী ঢঙের প্রথম প্রবর্তক রামনিধি গুপ্ত। তিনিই নিধুবাবু নামে পরিচিত। হিন্দুস্থানী টপ্পার তিনি এক বাংলা রূপাদর্শ সাধিত করিয়া বাংলার সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিলেন। হিন্দুস্থানী ঢং ইহাতে পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা করিয়াও বাংলার লৌকিক সুরের ধর্ম ও মেজাজ ইহাতে তিনি আরোপ করিলেন, তাহাতে ইহা অনুশীলন-সাপেক্ষ এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রূপ গ্রহণ করিলেও সে যুগের বাঙ্গালী শ্রোতার চিত্ত অতি সহজেই অধিকার করিয়া লইল। তারপর হইতেই ক্রমাগত হিন্দুস্থানী বিভিন্ন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বাংলাদেশে নানাভাবে প্রচার লাভ করিতে লাগিল। নিধুবাবুর টপ্পার মধ্যে বাংলা গানের যে রেশটুকু ছিল, হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মধ্য হইতে তাহা লুপ্ত হইয়া গেল। তাহার ফলে বাঙ্গালীর সঙ্গীত-সাধনা একটি নির্দিষ্ট অভিজাত শিল্পী সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল। ইহার সুনির্দিষ্ট পথেই ইহার ধারা অগ্রসর হইয়া চলিয়া জন-সাধারণের উপভোগের ক্ষেত্র হইতে দূরবর্তী হইয়া পড়িল। ইহার মধ্য দিয়াও বাংলার লোক-সঙ্গীত নানা লৌকিক ধারার ভিতর দিয়া নিজের পথ খুঁজিয়া লইল।

আধুনিক কবি মেস্‌ফিল্ড

॥ জনাব রেজাউল করীম ॥

আধুনিক ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জন্ মেস্‌ফিল্ড প্রথম জীবনে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে কোনও রূপে নিজের পথ রচনা করলেন। ভিক্টোরিয়ার যুগে ১৮৭৪ সালে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতামাতা ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। বাল্যকালে উচ্চ শিক্ষালাভের কোন সুযোগ-সুবিধা তিনি পান নি। প্রথম জীবনে গৃহত্যাগ করে জীবিকার্জনের জন্য নাবিকের বৃত্তি অবলম্বন করলেন। এই নাবিক বৃত্তি তাঁর ভবিষ্যতের পথ উন্মুক্ত করেছিল। সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করতে করতে সমুদ্র সম্বন্ধে নানা অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করলেন। কিন্তু এই নাবিক-জীবন তাঁর ভাল লাগল না। সে যুগে ইংলণ্ডের তরুণদের জন্য আমেরিকার প্রতি আকর্ষণ ছিল অত্যন্ত প্রবল। কোন উপায়ে সেখানে পদার্পণ করতে পারলেই একটা না একটা কাজ জুটে যেত। সেই আশায় মেস্‌ফিল্ড জাহাজের কাজ পরিত্যাগ করে আমেরিকা চলে গেলেন। সেখানে কিছুদিন স্বাধীনভাবে ভবঘুরের মত উদ্দেশ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়ালেন। তাঁর কোন নিরাপদ আশ্রয় ছিল না। কখনও কোন লোকের গোলাঘরে আশ্রয় গ্রহণ করে রাত্রি কাটাতেন। কখনও কারুর অধীনে দীন-মজুরের মত শস্যক্ষেত্রে কাজ করতেন। এই ভাবে কিছুদিন কাটলো। অবশেষে একটা হোটেলে মাসিক দশ ডলার বেতনে একটি সামান্য কাজে নিযুক্ত হলেন। হোটেলে তাঁকে ষোল ঘণ্টা কাজ করতে হ'ত। রাত্রি দুটো অবধি কাজ করে তবেই তিনি বিশ্রামের অবসর পেতেন। তারপর হোটেলের একটা চিলেঘরে কোন রকমে রাতটা কাটিয়ে দিতেন। সেই সময় তাঁর হাতে ছিল মাত্র একটি পুস্তক—তার নাম Morte Darthur। তিনি কাজের ফাঁকে একটু অবসর পেলেই ঐ পুস্তকটি যত্ন-সহকারে পাঠ করতেন। কিছুদিন পরে তিনি হোটেলের কাজ ছেড়ে দিলেন। তারপর কিছুদিন বাগানের মালির কাজ করেছিলেন; এমন কি কিছুদিন মদের দোকানে পান-পাত্র বাহকের কাজও করেছেন। আমেরিকায় তাঁর কোন সুবিধা হ'ল না। অবশেষে তিনি মনোরথে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু আমেরিকায় তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করলেন তা ব্যর্থ হ'ল না। লণ্ডনে এসে সাংবাদিকের কাজ করতে লাগলেন। কোথায় হোটেলের 'বয়', আর কোথায় সাংবাদিক। এই দুটি কাজই মেস্‌ফিল্ড নিপুণভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছেন। তিনি "ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান" এবং "ডেলি-মিরর"তে রীতিমত প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। এইভাবে একটু একটু করে তিনি স্বদেশেই আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করতে লাগলেন। এই সময় কয়েকজন বিখ্যাত লেখকের সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। তাঁদের মধ্যে জে, এম, মিঞ্চ অন্যতম। মিঞ্চ একজন বিখ্যাত নাট্যকার। আয়ারল্যাণ্ডের জাগরণের অন্যতম নেতা। এই দুজন সাহিত্যিক বহুদিন লণ্ডনে একত্রে ভ্রমণ করতেন ও সাহিত্য বিষয়ে বহু আলোচনা করতেন।

ধীরে ধীরে মেস্‌ফিল্ডের কবি-প্রতিভা বিকশিত হতে লাগল। ১৯০১ সাল থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে তিনি নানা বিষয়ে অজস্র কবিতা রচনা করলেন। শুধু কবিতাই নয়—সেই সঙ্গে নাটক উপন্যাস ছোট গল্প প্রবন্ধ ও সমালোচনা বিষয়ক বহু রচনা প্রকাশ হ'তে লাগল। এই সব রচনা তাঁর যশঃ সৌরভ চারদিকে ছড়িয়ে দিল। তিনি এখন থেকে সাহিত্যিক সমাজে লেখক বলে গণ্য হলেন। এরপর তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ "দি এভারলাষ্টিং মারসি The Everlasting Mercy" প্রকাশিত হল ১৯১১ সালে। ইহা একটি আখ্যানমূলক কাব্য গ্রন্থ। একজন দুষ্ট ব্যক্তির ও উড়ন-চণ্ডী ব্যক্তির কেমন করে

আধ্যাত্মিক পরিবর্তন হয়েছে সেই বিষয় নিয়ে এই গ্রন্থ রচিত। কাব্যের প্রধান নায়কের নাম "সলবেন"। এই কাব্য গ্রন্থটিতে নাটকীয় ভঙ্গীতে একজন ব্যক্তির স্বগত উক্তির মাধ্যমে কাহিনী বলা হয়েছে। মেস্‌ফিল্ডের এই উড়ন-চণ্ডী নায়ক তার জীবনের কোন কথাই গোপন করে নি। সে অকপটে তার জীবনের সমস্ত কথা বলে যাচ্ছে। তার মিথ্যুতা, তার কুৎসিত কাম, তার উন্মত্ত প্রলাপ সব কিছুই নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে। পরে একজন ধার্মিক মহিলার সংস্পর্শে এসে সলবেনের ভাবান্তর উপস্থিত হল এবং যথাসময়ে সে উদ্ধার লাভ করলো।

বস্তুতঃ এই কাব্য গ্রন্থটি মেস্‌ফিল্ডকে সাহিত্য-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। ১৯১২ সালে The Widow iu the Bye street প্রকাশিত হ'ল। এর পর বৎসর The Daffodil field এবং Danber প্রকাশিত হ'ল। এ সব কবিতা একেবারে ত্রুটিহীন নয়। কিন্তু এ সব গ্রন্থে স্থানে স্থানে এমন বহু পংক্তি আছে যা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে, বিশেষ করে সমুদ্রের বর্ণনা-প্রসঙ্গে যে সব উক্তি তিনি করেছেন সেগুলি যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমনি কাব্যধর্মী। মেস্‌ফিল্ডের আর একটি কাব্যগ্রন্থের নাম Salt Water Ballad—এতে এমন কতকগুলি কবিতা আছে যা ইংরাজি সাহিত্যে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। Reynard the fox গ্রন্থটিতে সামান্য একটি কাহিনীর মাধ্যমে কবি মানব চরিত্রের নানাদিক বিশ্লেষণ করেছেন। এই কাব্যটি কবি চসারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইহা তাঁর গল্পমূলক শ্রেষ্ঠ কবিতা।

মেস্‌ফিল্ড কয়েকটি নাটকও রচনা করেছেন। প্রথম মহা-সমরের পর ব্যবসায়ের দিক থেকে নাটকের স্থান অনেক নীচে নেমে গেছে। তবুও শিল্পের দিক দিয়ে কতকগুলি উৎকৃষ্ট নাটক রচিত হয়েছে। মেস্‌ফিল্ড যে-সব নাটক রচনা করেন সেগুলি প্রথম শ্রেণীর না হ'লেও নাট্য-জগতে বেশ সমাদর লাভ করেছে। The Tragedy of Hun তাঁর একটি নাটক। সমালোচক-গণ একে কোন উচ্চ স্থান দেন নি। কিন্তু তবুও স্বীকার করেছেন যে সার্থক নাটক রচনার যোগ্যতা তাঁর আছে। এছাড়াও তাঁর আরও দু-একটি নাটক মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। তাতে তিনি কিঞ্চিৎ সফলতাও লাভ করেছেন।

কবি ও শিল্পী মেস্‌ফিল্ড তাঁর স্বদেশবাসীর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন। চসার থেকে কিপলিঙ পর্য্যন্ত ইংরাজি সাহিত্যে যে ট্রাডিশন অক্ষুণ্ন আছে, মেস্‌ফিল্ড সে ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা করেন নি। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত আধুনিক। তিনি গণতন্ত্রের কবি। যুগের স্পিরিট ও স্বীয় অভিজ্ঞতা সম্ভ জ্ঞান—এই দুয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করেই তাঁর কবিতা রচিত। তিনি যেমন গণতন্ত্রের কবি, সেইরূপ সমুদ্রের কবি। সমুদ্র-প্রীতি ইংরাজ জাতির মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য। সমুদ্র সম্বন্ধে তিনি যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তার পরিচয় তাঁর বিভিন্ন কবিতায় পরিস্ফুট। তাঁর Salt Water Ballad সমুদ্রের ডাকে পরিপূর্ণ। মেস্‌ফিল্ড গণতন্ত্রের কবি—দরিদ্র, নিপীড়িত, পদাহত, ভদ্রসুরে ও অবহেলিত মানুষের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি। এর সহিত যুক্ত হয়েছে একটি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য-বোধ এবং জিজ্ঞাসার দৃষ্টিভঙ্গী। তাই দেখি মেস্‌ফিল্ডের কবিতার মধ্যে রহ ভাবের সমাবেশ ও ভাবের সুসঙ্গত প্রকাশ। সৌন্দর্য্যের প্রতি একটা গভীর অনুভূতি, ছন্দের উপর অদ্ভুত কর্তৃত্ব, গল্প বলবার শক্তি, প্রকৃতির নিখুঁত বর্ণনা—আর প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে যুক্তির প্রবলতা এই সব একত্রে মিলে তাঁর রচনাকে দিয়েছে একটা শ্রেষ্ঠত্ব যা খুব কম লেখকের মধ্যে পাই। তাঁর মধ্যে আছে যেমন উৎপীড়িতের প্রতি সহানুভূতি, সেইরূপ আছে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী। এ যুগের বহু কবির কাব্যে আছে একটা সন্দেহের ভাব, একটা দ্বিধা-নিমুকের মনোভাব কিন্তু মেস্‌ফিল্ডের কবিতা এ সব দোষ থেকে মুক্ত। তিনি মানব-জাতির প্রতি বিশ্বাস হারান নি। যদিও তিনি মানুষের নিকৃষ্ট দিকটাও দেখাতে দ্বিধা বোধ করেন নি।

মেস্‌ফিল্ড কবিতার মধ্যে বহু গল্প ও কাহিনী বলেছেন। কিন্তু তাঁর এ সব গল্প ও কাহিনী যথা-যুগের

রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে রচিত নয়। তাঁর কাহিনীর বিষয় হচ্ছে একজন চোর কেমন করে সংশোধিত হল, একজন শিল্পী কেমন করে নাবিকের বৃত্তি গ্রহণ করল, একটি ভাগ্যহীনা নারী কিরূপ দুঃখ কষ্টের মধ্যে পতিত হল এই সব কাহিনী তাঁর কবিতার উপজীব্য। তাঁর গল্প বাস্তবধর্মী। তবুও তাঁর বর্ণনার মধ্যে রোমান্টিক ভাব প্রবেশ করিয়ে তিনি গল্পকে আরও মধুর ও সরস করে তুলেছেন। মেসফিল্ড শুধু কবি নন—তিনি শক্তির উৎস। উচ্চ স্তরের কবিতা রচনার যথেষ্ট যোগ্যতা তাঁর আছে। কিন্তু তিনি এত বিভিন্ন বিষয়ের উপর কবিতা লিখেছেন যে বিশেষ কোন একটা দিকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারেন নি। তিনি এই আধুনিক যুগে বাস্তব ও রোমান্টিক আদর্শের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর যুগ এখনও শেষ হয় নি।

কতটুকু

॥ শ্রীভারতী ॥

কতটুকু ?
কতটুকু জীবনের সীমা ?
সৃষ্টির পরিধি কত ?
কাছে, দূরে, খণ্ড, ক্ষুদ্র, তুমি, আমি, সে,
চলি, ফিরি, উঠি, নামি, আসি আর যাই,
আজ আছি, কাল নাই ; নিমেষে ফুরাই।

নিমেষে ফুরাই ; তবুও আমরা
সেখানেতে মৃত্যু রাখি সেখানে বিশ্বাস।
সে বিশ্বাসে মৃত্তিকার সিক্ত মোরা গর্ব ভরে নাচি,
কলস্বরে বলে উঠি আছি, আছি, আছি।
অতর্কিতে তীক্ষ্ণ শব্দে কাঁপে স্নায়ু শিরা
প্রবলের কষাঘাতে ফুটে ওঠে রক্তের ফোয়ারা। কারা যেন
বিশ্বাসের টুঁটি টিপে সব কিছু কেড়ে নিতে চায়
সুরু হয় প্রাণান্তিক যন্ত্রণার দুঃসহ লড়াই।
তবুও হারাল প্রাণ সর্বশক্তি দিয়ে
মুহূর্তেই কেড়ে আনে নিজস্ব সম্পদ।
আবার, আবার হাটে দুরন্ত চড়াই।

দুদিনে ফুরাই ; তবুও আমরা
গোণা গাঁথা ছোট ছোট খণ্ড খণ্ড কালে
রহস্যের মজা লুটি প্রহরে প্রহরে।
অথৈ জীবন লীলা, পর্বে পর্বে কত রূপরেখা ;
প্রাণরসে ভরা মর্ত্য, অফুরন্ত বৈভবের চলন্ত সরাই ;
প্রহরী কোথাও নাই। তুমি, আমি, সে
খুশিমত সে ঐশ্বর্য দু হাতে কুড়াই।
আমরা ফুরাই ; তবুও আমরা
ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের গিরি চূড়া ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাই।
বেদনার বিপুল বিস্তারে পাই,
অন্তহীন সমুদ্রের লবণাক্ত স্বাদ। আমাদেরই
বিস্ময়ের কলস্বরাসে ঢেউয়ে ঢেউয়ে জলে চকমকি ; আমরাই
কৌতুকের কেনিল উল্লাসে
চূর্ণ চূর্ণ যন্ত্রণারে আকাশে উড়াই।

কে বলে ফুরাই ?
খণ্ডরে অখণ্ডে রাখি, সীমারে অসীমে—
স্থির চোখে চেয়ে দেখি
আদিন্ত মিছিলেতে সারি সারি মুখ। ক্ষয় নাই,
শেষ নাই ; কালের প্রকাণ্ড পটে অফুরান মেলা।
অতএব, তুমি, আমি, সে আছি, থাকি চিরকাল ;
কিছুতে না আমরা ফুরাই।
কালের মুক্তির কোলে মাথা রেখে বিয়োগের বেদনা ভুলাই।

মানবিক অধিকার-বোধ ও বিদ্যাসাগর

॥ শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ॥

মানুষের স্বাভাবিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নটি আজ সারা পৃথিবীর মানব-সমাজকে আলোড়িত করে তুলেছে। কিন্তু কিছুকাল আগে এ নিয়ে কেউ বড় একটা মাথা ঘামাতো না। মানুষের প্রতি মানবিক দৃষ্টি-ভঙ্গির এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে কয়েকজন অসামান্য ব্যক্তির প্রচেষ্টা, সহজাত মানব প্রেম যাদের হৃদয়ে শক্তি জুগিয়েছে। আজ এই ভারতবর্ষের মানুষের পক্ষে কল্পনা করা শক্ত যে, একশ বছর আগে এ দেশের হিন্দুসমাজে মানুষের অধিকার কত সীমিত ছিল। ধর্মবৈষম্য জাতিভেদ, শুচিবায়ুগ্রস্ততা ও কুসংস্কারের ধোঁয়া সেদিন সমগ্র জাতির চিত্তকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কোন মহৎচিত্তে সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গুমরিত হলেও সেই প্রতিবাদ প্রকাশ্যে জানানো বা সেই অবিচার দূর করার চেষ্টায় অগ্রসর হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

হিন্দুসমাজে প্রথম মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—যিনি হিন্দুসমাজের মধ্যভাগে থেকেই সেই অমানবিক অবিচারগুলিকে দূর করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই নিবন্ধে বিদ্যাসাগরের জীবনী থেকে দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করবো। একশ' বছর আগে সেই দুর্দমনীয় চরিত্রের মানুষটি নির্দ্বিধায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং মানব-কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই যা করণীয় তাকে সম্পাদন করেছেন। এর জন্য বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটেছে, আত্মীয়-স্বজন তাঁকে ত্যাগ করেছে। সমাজ তাঁকে অপবাদ দিয়েছে, এমন কি তাঁর জীবনীকারও তাঁকে রেহাই দেন নি। আজ একশ' বছর পরে সমাজের দ্রুত পরিবর্তনের গতি লক্ষ্য করে বলতে পারা যায় যে সেদিন বিদ্যাসাগর যে প্রেরণায় এই সর্বাঙ্গীণ বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হ'তে পেরেছিলেন, সে প্রেরণা এসেছিল মানবিক অধিকার বোধের চিন্তা থেকে, যার উৎস ছিল মানবপ্রেম।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে বিদ্যাসাগর কতক-গুলি যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেন। আগে সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈদ্য ছাড়া অন্য জাতের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কায়স্থদেরও কলেজে প্রবেশের অধিকার ছিল না। বিদ্যাসাগরের কাছে এই বৈষম্য অবিচার বলে বোধ হ'য়েছিল। তাঁর চেষ্টাতেই সংস্কৃত কলেজে সর্বশ্রেণীর ছাত্ররা অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করে। এ'র জন্য বিদ্যাসাগরকে তখনকার সমাজশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হ'তে হ'য়েছিল। বিদ্যাসাগর কখনও সত্যের অনুসরণ থেকে বিরত হ'তেন না। সেদিন তিনি তাঁর সমাজ-সংস্কারের কাজে বন্ধুদের সহায়তা পান নি। কিন্তু তাঁর সেই অবিচল সত্যানুধ্যানইযে সমাজে বিপ্লবের সূচনা করেছিল তা আমরা অন্ততঃ এখন অনুভব করতে পারছি।

শুধু সকলের জন্য সর্বমানবের জন্য যে সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল তাই নয়। তার চেয়েও বড় উদার-চিত্ততার এবং অতি নির্ভীক হৃদয়ের পরিচয় দিলেন বিদ্যাসাগর যখন কলকাতার নামকরা বাইজী হীরার পুত্রকেও কলেজে অধ্যয়নের অনুমতি দিলেন তিনি।

দ্বিতীয় ঘটনাটি তাঁর শেষ জীবনে ঘটেছিল। এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য করেই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রর সঙ্গে তাঁর মতভেদ ও মনান্তর ঘটে। দ্বারকানাথ বিদ্যাসাগরের গুণমুগ্ধ সুহৃদ্ ছিলেন। কিন্তু তবুও সমাজের তৎকালীন মনোভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবার মত দৃঢ়তা তাঁর

ছিল না। বিদ্যাসাগরের "বিধবা বিবাহ" প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেও দ্বারকানাথ এই ঘটনায় বিদ্যাসাগরকে ভ্রান্ত বলে মনে করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের গুণগ্রাহী ব্যক্তিরাও অনেকেই ভেবেছিল, বার্ণবোধ দক্ষ তাঁর বুদ্ধি ও বিচার শক্তিতে শিথিলতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু সত্যকার বিপ্লবী যাঁরা, সত্যবোধ ও মানবতা যাঁদের সকল কর্মের প্রেরণা, তাঁরা যুগচিন্তার অগ্রগামী হ'য়ে জন্মগ্রহণ করেন। যুগ তাঁদের চিন্তার প্রগামিতাকে হয়ত তখনই স্বীকার করে নিতে পারে না। বিদ্যাসাগরকেও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পার হ'য়ে এসে আজ আমরা কিছুটা অনুভব করতে পারি যে কী দৃঢ় ও সত্যদৃষ্ট হৃদয় ছিল সেই মানুষটির। বিদ্যাসাগরের আগে মানুষকে তার স্বাভাবিক মানবিকতার অধিকারে কেউ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে বলে আমার জানা নেই।

কলকাতার হাইকোর্টে দ্বারকানাথ মিত্রর হাতে সেই সময় একটি মামলা নিষ্পত্তির জন্যে আসে। মামলার প্রধান আসামী এক বিধবা নারী। বিষয় বস্তু, হিন্দু বিধবা যদি পতিতা হয় তবে সম্পত্তির ওপর তার উত্তরাধিকারের দাবি থাকবে কিনা। দ্বারকানাথের মতে পতিতা নারী কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেতে পারে না। যে মুহূর্তে সেই নারী অসামাজিক পথে পা দিল সেই মুহূর্তে সে উত্তরাধিকারের সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'লো। হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি মিঃ কীয়ারও দ্বারকানাথের সঙ্গে একমত হ'য়েছিলেন। এই ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট বিদ্যাসাগরের মতামত জানতে চান্। বিদ্যাসাগর বলেন: কোন নারী যদি একবার কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন, তবে পরবর্তী যুগে তিনি অসতী হ'য়েছিলেন, এই অজুহাতে তাঁকে সম্পত্তির দাবি থেকে বঞ্চিত করা অযৌক্তিক। বিধবা নারী যদি স্বামীর সম্পত্তি লাভ করে থাকেন, তবে সে সম্পত্তি থেকে তাঁকে কোন ভাবেই প্রবঞ্চিত করা যায় না। বলা বাহুল্য বিদ্যাসাগরের এই মতই সেদিন বিধিবদ্ধ হ'য়ে আইনে রূপান্তরিত হ'য়েছিল।

দুটি ছোট্ট ঘটনা। কিন্তু এই দুটি ঘটনাই যথেষ্ট। সেদিনকার রক্ষণশীল সমাজ-ব্যবস্থায় বিদ্যাসাগর বজ্রের মত আঘাত হেনেছিলেন। অথচ বিদ্যাসাগর বহির্গত ছিলেন না। রামমোহনের মত হিন্দুসমাজকে পরিত্যাগ করে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলবার বাসনাও তাঁর ছিল না। বিদ্যাসাগর সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে ছিল অতি আধুনিক চিন্তাধারার স্ফুরণ। মানুষকে তার স্বাভাবিক অধিকারে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এই সমাজের ভেতরে থেকেই সমাজকে তিনি এই আধুনিক চিন্তার স্পর্শে নতুন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেদিনের দেশবাসী তাঁকে বিদ্রূপ করেছিল, প্রচণ্ড বিরোধিতা দিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিল। তবু একশ বছরের পরেও তাঁর চিন্তার প্রতিফলনকেই নতুন ভাবে জেগে উঠ্‌তে দেখতে পাচ্ছি।

ভারতবর্ষে বিদ্যাসাগরের প্রয়োজন আজ ফুরোয় নি।

বিচিন্তা

॥ শ্রীসন্তোষকুমার দে ॥

আমাদের জীবন যখন 'শুধু দিন যাপনের প্লাগ-ধারণের গ্লানি'-তে এসে ঠেকেছে, দৈনন্দিন তৈল-তণ্ডুল-ইন্ধন সন্ধানে মন যখন হাঁপিয়ে উঠছে, তার মধ্যে 'শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস'। অভাবের নাগিনী, ত্রাসের নাগিনী, লোভের নাগিনী, ক্ষোভের নাগিনী দিকে দিকে বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলে চলেছে। এর মধ্যে আমরা বাঁচব কি করে সেই সমস্যাই যখন বলবৎ তখন দু দণ্ড স্থির হয়ে বসে শান্ত চিত্তে মহৎ জীবনের কথা বলবার বা শুনবার প্রবৃত্তি ও সংযম আমরা হারিয়ে ফেলছি।

আজ আমরা যারা হিন্দুত্বের জন্য দেশ ছেড়েছি, শত পুরুষের বাস্তুভিটা ত্যাগ করেছি, সম্পূর্ণ নিরবলম্ব অবস্থায় শুধু ধর্ম রক্ষার জন্যই অকূলের উদ্দেশে পাড়ি দিয়ে চলে এসেছি তারাও ভাবছি বসে, আমরা কি সত্যই কোনও প্রকার ধর্মাচরণ করি? শৈশবে দেখেছি, আমাদের বাড়িতে শীতকালে ঘরামিরা কাজ করতে আসত। তাদের বেশির ভাগই মুসলমান ছিল। খড়ের ঘর ছন দিয়ে ছেয়ে দিতে কয়েক দিন সময় লাগত। সে কদিন তারা আমাদের বাড়িতে অস্থায়ী আস্তানা গেড়ে বাস করত, রান্নাবান্না করে খাওয়াদাওয়াও করত। রাতে কাজের শেষে কত রকমের গল্প শোনাত। যা বলতে যাচ্ছিলাম, ছোট-বড় সব ঘরামিই সন্ধ্যার প্রাক্কালে চাল থেকে নেমে কাজ থামিয়ে পুকুরের ঘাটে গিয়ে হাত পা ধুয়ে পুকুরের ঘাসে ঢাকা পারে গামছা বিছিয়ে পশ্চিম-মুখো হয়ে সারি বেঁধে নমাজ করত। আমরা শিক্ষিত হিন্দুরা আনুষ্ঠানিক ভাবে ধর্মাচরণ করতে উৎসাহ হারাচ্ছি, এমন কি কেউ করলে তাকে উৎসাহিত করা দূরে থাক, তাকে উপহাস করতে পিছ-পা হই না। আমাদের এই মনোভাবের মধ্যেই আমাদের চারিত্রিক শৈথিল্য, দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার অভাব এবং চঞ্চলমতিত্বের বিষয় সূচিত হয়েছে।

নিয়ম শৃঙ্খলা অনুষ্ঠান প্রভৃতির নিজস্ব মূল্য কিছুই নেই—এ কথা তারা অস্বীকার। নিয়ম-শৃঙ্খলা না মেনেও গাড়ি চালানো যায়, তাতে এঞ্জিন বিগড়ায় না, বিগড়ায় চালকের মগজ; অল্প কণেই সে দশ-বিশজনকে হতাহত করে নিজেও হাসপাতালে যায়। শৃঙ্খলা মানবার বিধি-নিষেধ থাকলে সহজে মানুষ যা-তা করতে পারে না। মানুষের মনের অন্তরালে যে পশু বাস করে সে নিয়ম-শৃঙ্খলার গণ্ডি ভেঙে বেরুলেই একটা ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে যায়।

যা আমাদের ধরে রাখে তাকে যদি ধর্ম বলে তবে হিন্দু ধর্ম যে আমাদের ধরে রেখেছে তাতে আর সন্দেহ নেই। বিকৃতির চরম বিকাশে যখন তা কেবল অনুষ্ঠান-সর্বস্ব হয়ে পড়েছিল, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় আমরা সেই বীভৎস অবস্থার দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছি। কিন্তু সবখানি গৌরব পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রাপ্য নয়। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা পান নি। এমন কি যে সময়ে মহাপ্রভুর জন্ম হয়েছিল তখন পাশ্চাত্ত্য-জগৎ নিজেই গভীর কুসংস্কারের দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধা ছিল। অথচ মহাপ্রভুর প্রেমধর্মে আপামর জনসাধারণ সকলেরই সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। এমন কি মুসলমান বলেও কাউকে বিধর্মী বলা হয় নি। মহাপ্রভু সকলকেই কোল দিয়েছিলেন। মহাপ্রভু হিন্দু ধর্মেরই এক বিপ্লবাত্মক দিক্‌ দর্শক। তার পূর্বে, সভ্যতার আদিমতম যুগের দিকে তাকালেও আমরা একই দৃশ্য দেখতে পাই। সকল কালেই মানুষের উপরেই মহত্ত্বের রাজমুকুট অর্পিত হয়েছে এ রকম একটা ধারা সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—এ কথা

সর্বকালে সর্বদেশে মহামানবদেরই মুখের বাণী। এই বাণী যিশুর মুখে, বুদ্ধদেবের মুখে, রামকৃষ্ণের মুখে,—কেবল দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ভাষা ভিন্ন।

আমরা যখন নিয়মশৃঙ্খলা মানি না, ধর্ম মানি না, দেবতা মানি না, কোন বিশেষ দেব-বিগ্রহ দেখলেও মাথা নত করা লজ্জাকর মনে করি তখন আমরা জানি না আমরা কি মানি। যে মুহূর্তে পূর্বাস্ত হয়ে প্রভাত সূর্যকে প্রণাম না করে আমরা পশ্চিমাস্ত হয়ে যাই, তাকিয়ে দেখলে দেখতে পাই, আমারই ছায়া আমার পিছনে লম্বিত হয়ে পড়ে আছে। উজ্জ্বল সূর্যের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালে, তখন আমরা সেই কালো ছায়াটার দিকেই তাকিয়ে দেখতে পাই, আমার মনের কালোই যেন ছায়ামূর্তি ধরে দেখা দিয়েছে। যখন আমরা নিয়ম মানি না, তখন অনিয়মকে আমন্ত্রণ করে আনি, যখন আমরা সংযমকে উপহাস করি, তখন অসংযমকে বরমাল্য দেই, যখন আমরা দেবতাকে অগ্রাহ্য করি, তখন নিজের অজ্ঞাতে উপদেবতা-অপদেবতার উপাসনা করি। সেখানেই আমাদের অধঃপতন সুরু হয়, আমাদের নৈতিক চরিত্র হীনবল হয়ে পড়ে।

গায়ের জোরে, গলার জোরে, অর্থের জোরে অস্বীকার করলেই সব সত্য মুছে যায় না। ন্যায়পথ ও কল্যাণের পথ অবলম্বন করতে হবে—তবেই আমাদের দুঃখের সাহারার মধ্যেও শান্তির করুণাধারা দেখা দেবে। মানুষ আত্মস্থ হবে।

"...শুধুই বলিতে ইচ্ছা হয় 'চরৈবেতি'। দিন যায়, এগিয়ে যাও। অবশ্য শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখিও। 'সঙ্কল্পময়ঃ পুরুষঃ'—পুরুষ সঙ্কল্পময়। সঙ্কল্প যদি পুরুষোত্তম-শ্রীচরণার্পিত হয় এবং পুরুষ যদি তাহা নিয়া আবেষ্টনের উপর ব্যর্থ চাপ না দিয়া নিজের চলার পথে অব্যাহত থাকে, তবে সঙ্কল্প দুই দিন আগে আর পিছে সিদ্ধ হয়ই। তুমিও ইহা মনে রাখিও। টিকিয়া থাকাই সবচেয়ে বড় কথা এবং এই টিকিয়া থাকার জন্য প্রয়োজন line of least resistance। বাধা তো প্রকৃতির মধ্যে স্বভাবতঃই আছে; তাহার উপর যদি মানুষ আবার বাধাকে জমাইয়া তোলে, তবে কি আর অগ্রসর হইবার যো আছে? অবশ্য গা ছাড়িয়া দিয়া চলিলেও চলিবে না।...

...কাজ ঠাকুরের, বিশ্বের। তাহার সেবার কথার মধ্যে তো আর জড়াইয়া বলিবার কিছু নাই।...২৬ বৎসর আগের লেখা আমার বেদান্ত-ভাষ্য আলোচনা করিয়া দেখিতেছি যে, সে সময়ে ভাবনা যাহা শুধু নিজের ভিতরেই পাইয়াছিলাম, আজকালকার পাশ্চাত্ত্য চিন্তা-প্রণালীর সঙ্গে তাহার কত মিল। সে সময় তো প্ল্যাঙ্ক (Planck) বা আইনষ্টিন (Einstein) এর নাম জানিতাম না। ঠাকুরের আশীর্বাদে যাহা পাইয়াছিলাম, যাহা ছাড়া ভবিষ্যৎ যুগ চলিতে পারিবে না, তেমনি মতবাদ ও তাহার বিগ্রহ নিত্যগোপালকে পাইয়া এমনভাবে অপদার্থের মত চলিয়া যাইব, ইহা ভাবিতেও বেদনায় বুক ভরিয়া উঠে।...

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র (১৯৪৪)

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় জন্যই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে, দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেইজন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়-নির্দ্দেশিত "সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

আর অহঙ্কারকে তুমি বেদান্তানুসারে মায়ারই এক বিকাশ ত বলিয়াই রাখিয়াছ; সুতরাং সত্য আত্মার পক্ষে আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞাননিত আনন্দ এবং অহঙ্কারও অসত্য। সুতরাং ঐ তিনে আত্মার আছা থাকাও অনুচিত।

অষ্টম সিদ্ধান্ত

আত্মজ্ঞানের সহিত, আত্মজ্ঞান-জনিত আনন্দের সহিত, যে অহঙ্কার প্রভাবে আত্মা নিজে আছেন বোধ করেন, যে অহঙ্কার প্রভাবে আত্মা নিজের আত্মজ্ঞান আছে বোধ করেন, যে অহঙ্কার-প্রভাবে আত্মা আত্মজ্ঞানজনিত আনন্দও আছে বোধ করেন, যে অহঙ্কার-প্রভাবে আত্মা সেই আনন্দ সম্ভোগও করেন, সেই অহঙ্কারের সহিতও আত্মার অভেদত্ব নাই। ঐ সকল আত্মার সহিত সম্পূর্ণ অসত্য। সুতরাং ঐ সকলের কোনটিই আত্মা কিম্বা আত্মার কোন ধর্ম-বিশিষ্ট নহে। সুতরাং ঐ সকলকে মায়িক ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? সুতরাং ঐ সকলকে মায়ারই বিবিধ বিকাশ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? অদ্বৈতমতে মায়া অসত্য। সুতরাং ঐ সকলও মায়ার বিবিধ বিকাশ বলিয়াই ঐ সকলও অসত্য। বেদান্ত প্রভৃতি নানা অদ্বৈতমত-প্রতিপাদক গ্রন্থে অহঙ্কারকে স্পষ্টই মায়ার এক প্রকার বিকাশ বলা হইয়াছে। সুতরাং সে কারণেও ঐ সকলকে মায়িক বলা যাইতে পারে। কারণ ঐ মায়িক অহঙ্কারের সাহায্য ব্যতীত ঐ সকলের অস্তিত্ব-বোধও হইতে পারে না। মায়া বা-মায়ার কোন বিকাশদ্বারা যে সকলের অস্তিত্ব বোধ হয়, সে সকলকে কখনই, অমায়িক বলা যাইতে পারে না। সে সকলকে সত্যও বলা যাইতে পারে না, কারণ অসত্য দ্বারা সত্য নিশ্চয় করা অতি অসম্ভব।

নবম সিদ্ধান্ত

আত্মা শব্দও মায়িক ও সান্ত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সংস্কৃত ভাষাটিও অমায়িক নহে। আত্মা শব্দটিও সংস্কৃত ভাষার বহু শব্দের মধ্যে একটি শব্দ মাত্র। আত্মা শব্দকেও তুমি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বলিতে পার না। কারণ আত্মা শব্দে আ, ত, ম, ও আকার আছে। সুতরাং সেই আত্মা শব্দও বহুর সমষ্টি বলিয়া সেই আত্মা শব্দও এক অদ্বিতীয় আত্মা নহে। আত্মা শব্দ যে অনন্ত নহে তাহা উচ্চারণেও জানা যায়, এবং তাহা লিখিলেও দেখিতে পাওয়া যায়। ১

আত্মা শব্দ মায়িক বলিয়া তুমি যাঁহাকে আত্মা বল, তাঁহাকেও তোমার আত্মা বলা উচিত নহে। তুমি তাহার অন্য কোন নামও দিতে পার না। কারণ সকল নামই ভাষার অন্তর্গত ও পরিমিত, সকল নামেই বহুতা আছে। সুতরাং তুমি যাঁহাকে অমায়াত্মা বল, তাঁহার কোন নামই হইতে পারে না।

আত্মজ্ঞান শব্দও ত মায়ার অন্তর্গত। কারণ তাহাও মায়িক ভাষার অন্তর্গত। কারণ তাহাতেও বহুতা আছে। সুতরাং তুমি যাঁহাকে অমায়াত্মা বল, তাঁহাকে তোমার আত্মজ্ঞানও বলা উচিত নহে। তোমার তাহাকে অন্য কিছুও বলা উচিত নহে। কারণ তুমি তাহাকে অন্য যাহা কিছু বলিবে, তাহাই ত ভাষার অন্তর্গত হইবে। ভাষার অন্তর্গত যাহা হইতে পারে, তাহা অমায়িক নহে; কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ভাষাও মায়িক। ৩

দশম সিদ্ধান্ত

বেদান্ত ত আত্মা নহে। সুতরাং তাহাতে আত্মজ্ঞানও নাই। বেদান্ত জড় এবং মায়িক। বেদান্ত যাহা আশ্রয় করিয়া আছে, তাহা কাগজ। কাগজ প্রাকৃত এবং অতি সামান্য। বেদান্ত সংস্কৃত ভাষা এবং বাক্‌শক্তিকে আশ্রয় করিয়া আছে। সংস্কৃত ভাষাও বহুর সমষ্টি, সুতরাং তাহা অদ্বিতীয় আত্মা নহে। সেই সংস্কৃত ভাষার মধ্যে আত্মা বুঝাইবার জন্য যে নানাপ্রকার উপমা ও উদাহরণ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেগুলিও লৌকিক। সুতরাং সেগুলিও প্রাকৃত ও মায়িক। সুতরাং সেগুলিও বেদান্তানুসারেই অসত্য। কারণ বেদান্তেই বলা হইয়াছে যে আত্মা ব্যতীত অন্যান্য সকলই অসত্য। বৈদান্তিক ভাষার মধ্যে যে বাক্‌শক্তি আছে, তাহারও বহু স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাহাও এক অদ্বিতীয় আত্মা নহে। সুতরাং তাহা ব্রহ্ম নহে। বেদান্তানুসারেই নিত্য সত্য আত্মাতেই নিত্য সত্য আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হইয়া থাকে। বেদান্ত গ্রন্থ যে জড় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে এবং তাহা যে জড় তাহা প্রত্যক্ষও করা হইয়া থাকে। সুতরাং তাহা যে আত্মা নহে, ইহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। সুতরাং ঐ অসত্য বেদান্ত গ্রন্থে সত্য আত্মজ্ঞান কখনই নাই। বেদান্ত গ্রন্থ অসত্য বলিয়া তাহা আত্মার আত্মজ্ঞানেরও কারণ হইতে পারে না।

একাদশ সিদ্ধান্ত

বেদান্ত গ্রন্থ পরিমিত। তাহা অনন্ত নহে। বেদান্ত গ্রন্থে যে ভাষা আছে, তাহাও অনন্ত নহে। বেদান্ত গ্রন্থে যে সকল বর্ণ আছে, সে সকলের কোনটীই অনন্ত নহে। বেদান্ত গ্রন্থে যে সকল বাক্য আছে সে সকলের কোনটীও অনন্ত নহে। বেদান্ত গ্রন্থে যে সকল উপমা আছে সে সকলের কোনটীও অনন্ত নহে। বেদান্ত গ্রন্থে যে 'আত্মা' শব্দ আছে, তাহাও অনন্ত নহে। বেদান্ত গ্রন্থে যে 'ব্রহ্ম' শব্দ আছে, তাহাও অনন্ত নহে। বেদান্ত যে ব্রহ্মাত্মার বিষয় বলিতেছেন, সেই ব্রহ্মাত্মা যে অনন্ত, তাহাই বা তিনি কি প্রকারে জানিলেন? তিনি ত নিজে অনন্ত নহেন। তবে অনন্ত যে কি প্রকার, তাহাই বা তিনি বুঝেন কি প্রকারে? বেদান্ত ত নিত্য সত্য নহেন, তবে তিনি নিজে অনিত্য অসত্য হইয়া সেই নিত্য সত্য ব্রহ্মাত্মাকে কি প্রকারে বোঝেন? এবং সেই ব্রহ্মাত্মা যে নিত্য সত্য তাহাই বা তিনি কি প্রকারে অবধারণ করেন?

জাতীয়তা-বোধের প্রেরণা

॥ শ্রীনলিনীকিশোর গুহ ॥

বাংলার দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবোধের পরিচয় লইলে দেখা যায় উহার প্রেরণা আত্মিক। মূলে একটি আস্তিক্য-বুদ্ধিও প্রভাবিত করিয়াছে। বিলাতী Patriotism বা Nationalism এ নয়। তাই সুমহান উচ্চ স্তরের একটি অনুভূতি—যাহা নিম্ন স্তরের নয়, যাহা নিঃসংশয়ে উর্ধ্বলোকের, তাহাই যেন উনবিংশ শতকের এবং বাংলা স্বদেশী যুগের বা বঙ্গ-বিপ্লব যুগের মনীষী নায়কদের বাক্যে ও আচরণে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছি। সত্য প্রকাশের বীর্যবত্তায় তাঁহাদের অভী মন্ত্রে সহজেই দীক্ষিত করিয়াছে। ক্ষুদ্র সংকীর্ণ কিছু নয়, ভূমার জন্যই তাঁহাদের সাধনা। তাঁহাদের রাজনীতি তাই প্রচলিত রাজনীতি নয়, উহা যেন 'ধর্ম' হইয়া উঠিয়াছে।

দোটাকের দৃষ্টান্ত মাত্র উল্লেখ করিব। শ্রীঅরবিন্দ (১৯০৮ সাল হইতেই অরবিন্দ পূর্ণ সত্যের সন্ধানী, ভগবদ্বিশ্বাসী হইয়া ভয় দূর করিতে হইবে—অন্তর ও বাহিরের ভয়, তিনি এই মন্ত্রেরই সাধক) আমাদের জাতীয়তা আসলে কি বস্তু তাহাই দেশবাসীকে শুনাইতেছেন: "Our Nationalism is a religion that has come from God"। বাংলার স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার আত্মিক ভিত্তি এইখানে। উহার বাণী লৌকিক নয়—ঐহিক নয়, আত্মিক বা পারমার্থিক তথা ঐশিক। শ্রীঅরবিন্দ বলেন: "যখন সত্যই বাণী (ভগবৎ বাণী) নামিয়া আসিল—বাঙ্গালী তখন বাণী গ্রহণের জন্য প্রস্তুতই ছিল। মুহূর্তে বাঙ্গালী সেই বাণী গ্রহণ করিল।"... ভারতকে ডাকিয়া শুনাইল—"জাতির আছে দিব্য জীবন। জাতির দৈন্য ও দুর্গতি সত্য নয়, জাতির আছে মৃত্যুহীন জীবন, এই জীবন লাভই উহার নিষ্কৃতি, আজ বাংলা এই সত্য এবং বিশ্বাসের মধ্যে জীবন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে"।

১৯০৬ সালের ১৬ই অক্টোবর (রাখিবন্ধন দিনে) শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল বলেন: "প্রতি মানুষটির জীবন মহিমময়। বৃহত্তর ও মহত্তর ডিভাইন তথা দিব্য জাতীয় জীবন অধিকতর ধন্য, কারণ, ব্যক্তি এই সমষ্টির মধ্যে চরম সার্থকতা লাভ করে। কিন্তু ধন্য, ধন্য, সেই বিশ্বমানবতার মহা জীবনই ধন্য—যাহার মধ্যে জাতীয় জীবনের সমগ্রতার পরিপূর্তি ও পরিণতি।" ব্যক্তি ও জাতীয় জীবন সম্বন্ধে এই সত্যানুভূতি এবং মর্যাদাবোধে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের মনীষী নেতাদের আচরণ সে দিনে অপূর্ব মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

বিপিনচন্দ্রের একটি আচরণ এখানে উল্লেখ করিব।

বন্দেমাতরম্ (ইংরেজী) সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা। ১৯০৭, ২৩শে আগষ্ট মামলা দায়ের করা হয়। 'বন্দেমাতরমে' শ্রীঅরবিন্দের লেখা প্রমাণের জন্যই বিপিনচন্দ্রকে সরকার সাক্ষী মানেন। ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের এজলাসে বিপিনচন্দ্র বলেন: "I have conscientious objection to be sworn in or take part in the proceedings" অর্থ, এই মোকদ্দমায় শপথ লইতে এবং অংশ গ্রহণ করিতে আমার বিবেক-গত আপত্তি আছে। ম্যাজিস্ট্রেট ইহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া প্রশ্ন করেন, সত্য সাক্ষ্য দিবার শপথ গ্রহণেই আপনার আপত্তি?

উত্তরে বিপিনচন্দ্র বলেন—"আমি এই মামলায় অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না, কারণ আমি মনে করি.....।

হাকিম: আমি তা শুনতে চাই না। আপনার যে কোন মামলায় শপথ লইতেই কি বিবেকে বাধে?

বিপিনচন্দ্র: না, তাহা নয়। কিন্তু এই মামলায় অংশ গ্রহণ করিতে আমার বিবেকে বাধে!

হাকিম: তাহা হইলে এই মামলায়ও আপনাকে অবশ্যই শপথ গ্রহণ করিতে হইবে।

বিপিনচন্দ্র : আমি তাহা করিতে অসম্মত।

হাকিম : আপনাকে প্রশ্ন করা হইবে। যদি উহার উত্তর দিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে উহার জন্য আপনাকে ফল ভোগ করিতে হইবে।

বিপিনচন্দ্র : বিবেকগত কারণে আমি নিশ্চয় উত্তর দিতে অস্বীকার করিব।

ইহার পর আদালত অবমাননার জন্য বিপিনচন্দ্রের বিরুদ্ধে একটি স্বতন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। সেই মামলায় (১৯০৭, ১৯শে সেপ্টেম্বর) বিপিনচন্দ্র আদালতে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেন।

"ইহাতে সন্দেহ নাই যে, সমাজের প্রত্যেকেরই কর্তব্য সমাজের কল্যাণের জন্য বিচার আদালতের সাহায্যার্থে সাক্ষ্য দান করা। কিন্তু যখন শাসন-নীতির দ্বারাই অভিযোগ প্রভাবিত হয়—পরিচালিত হয়, যাহার উপর ধর্মাধিকরণের কোন একক্তিয়ারই নাই, তখন সমাজের একজন ব্যক্তিরও কর্তব্য ভিন্ন হইয়া উঠে। আমি যথার্থই বিশ্বাস করি যে, 'বন্দেমাতরম্' পত্রের বিরুদ্ধে যে মামলা আনা হইয়াছে তাহা অন্যায় এবং ক্ষতিকর ; ইহা অন্যায় এই কারণে যে, ইহা জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকেই ধ্বংস করিতেছে এবং অত্যন্ত ক্ষতিকর এই জন্য যে, চিন্তার স্বাধীনতা ও বাক্যের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার মনোবৃত্তি হইতেই এই মামলা আনা হইয়াছে, আর ইহা সমাজের শান্তি রক্ষার প্রয়োজনেও নহে। আমি উপরোক্ত কারণেই উক্ত মামলায় শপথ গ্রহণ করিতে ও সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিয়াছি। উক্ত মামলা (বন্দেমাতরমের মামলা) যে আদালতে চলিতেছে সেই আদালতের প্রতি কোন অসম্মান আমি দেখাইতে চাই নাই। সেই আদালতে আমাকে আমার বক্তব্য বলিতে দেওয়া হয় নাই বলিয়া এই (আদালত অবমাননার) মামলায় আমার বক্তব্য বলিলাম।"

এই মামলায় বিপিনচন্দ্রের ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়।

বন্দেমাতরম্ মামলা উপলক্ষে বিপিনচন্দ্রের আচরণ ও উক্তি লক্ষ্য করিবার। ইংরেজ শাসন নীতির মূলে যে গলদ ও অসত্য রহিয়াছে, বিদেশী শাসন-দণ্ড যে ন্যায়-বিচারের তুলাদণ্ডকে নিত্য বিকৃত ও আহত করে, বিপিন-চন্দ্র তাহাই কেমন সত্য সুন্দর এবং সংযত অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করিতেছেন। কোনও উগ্রতা নাই, আইন-অমান্যের আওয়াজ নাই, দম্ভ নাই,—কিন্তু সংযত মহিমার মর্যাদায় বিচার আদালতের মামলাকেও অবশ্য আলোড়ন তুলিয়াছে,—সেই সত্য বিচারকের অহং বা দম্ভ প্রকাশে স্বীকার করুক বা নাই করুক।

স্বদেশী যুগে—বাংলার জাতীয়তাবাদী বা তখনকার গরম দলের সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ করিবার তাগিদে ১৯০৮ সালের জুন মাসে ভারতের তদানীন্তন আইন সচিব (Law member Sir Harvey Adamson) এক নূতন প্রেস বিল ইম্পিরিয়াল লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিলে উপস্থিত করেন। এবং উক্ত প্রেস আইনের একান্ত অপরিহার্যতা প্রমাণের জন্য নিম্নোক্ত মর্মের যুক্তি প্রদর্শন করেন : "যুগান্তর পত্রের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে (১৯০৭ সালে জুলাই মাসে যুগান্তর সম্পাদক ভূপেন্দ্র নাথ দত্তকে প্রথম রাজদ্রোহের অভিযোগে সাজা দেওয়া হয়। ভূপেন্দ্রনাথ আদালতে বলেন—"আমি সম্পাদক ; যুগান্তরের সব লেখার জন্য আমিই দায়ী। আমি আমার দেশের প্রতি কর্তব্য বলিয়া যাহা বিশ্বাস করি তাহাই করিয়াছি। এর অতিরিক্ত আর কিছু বলিতে চাই না, এবং এই মামলায় আর কোন অংশ গ্রহণ করিব না।") পাঁচ হাজার পর পর দণ্ড প্রদান করা হইলেও কোন ফল হয় নাই। কারণ এই কাগজের পরিচালকগণ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক ও হিংসাত্মক কার্যে উৎসাহদান বন্ধ করে নাই এই জন্য যে, ইহারা সাজা লাভ করিয়া মেকী শহীদ্ (Pseudo-Martyrs) হইয়া উঠে। যুগান্তর কাগজ যথেষ্ট কুখ্যাত, উহার নাম উল্লেখ করিলে আর কি বেশী কুখ্যাত হইবে? কিন্তু কলিকাতার ...আরও কয়টি সংবাদপত্র (বন্দেমাতরম্, নিউ ইণ্ডিয়া সন্ধ্যা প্রভৃতি লক্ষ্য) এই রকমই বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে বিষের প্রচার করিতেছে। উহাদের নাম উল্লেখ করিয়া ঐ সকল নগণ্য (disreputable papers) কাগজের

নাম প্রচার করিতে চাহি না"। এই আইনের বলে কাগজের প্রচারই বন্ধ করা যায়। এই ধরণের সংবাদপত্র বন্ধ করার এই সরকারী ব্যবস্থার পক্ষে ওকালতী করিতে গিয়াই অতঃপর স্যার হারকোর্ট এডামসন বলেন: "আসলে এই সকল সংবাদপত্র (Bandemataram, New India, সন্ধ্যা প্রভৃতি নাম) অত্যন্ত নীচু স্তরের। উহাদের সম্পাদকগণ মনে করেন রাজদ্রোহ প্রচার ব্যবসায় হিসাবে লাভজনক। এই কারণেই উহারা যাহা লেখে উহারাই তাহা বিশ্বাস করে না। ইহারা দায়িত্বহীন অপরিণত বুদ্ধির লোক"। (without sense of responsibility and mature understandings.)

সন্দেহ নাই, আইন সচিব স্যার হারকোর্ট লেখের বিরুদ্ধের উক্তিগুলির উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। বন্দেমাতরম্-এ শ্রীঅরবিন্দ এই সকল সংবাদপত্র ও উহার সম্পাদকগণের প্রসঙ্গে লিখিতেছেন: "এই সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে রহিয়াছেন—শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—ইহারাই হইলেন এই সকল নীচু স্তরের কাগজের সম্পাদক! সিডিশন লেখার নায়ক, স্বার্থপরায়ণ আন্দোলনকারী, ইহারা দায়িত্বহীন ও অপরিণত বুদ্ধির লোক! স্যার হারকোর্ট যাহা বলিতেছেন, তাহা আদৌ সত্য নহে। এবং এডামসন সাহেব ইহা জানিয়া রাখিতে পারেন যে, যাহাদের বিরুদ্ধে তিনি কুৎসা প্রচার করিতেছেন, তাহাদের মস্তিষ্কের এক কোণে যাহা আছে, এডামসনের গোটা কঠিন মাথায় খুলিতে যাহা আছে তাহা হইতে অধিকতর গুণসম্পন্ন, আর এই সম্পাদকদের পদধূলি স্পর্শের যোগ্যতাও তাঁহার নাই।" (You say the thing which is not and know it, a licensed slander of men a corner of whose brains has a richer content than your whole Scotch skull and whose shoes you are unworthy to touch.") বস্তুতঃ সত্য ও ত্যাগ-নিষ্ঠা, এবং বিদ্যাবত্তা ও মনস্বিতার বিচারে স্যার হারকোর্ট বা তাঁহার সমগোত্রীয় শাসক-গোষ্ঠী অপেক্ষা বিপিনচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিগণ যে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ কি? মনীষী শ্রীঅরবিন্দ বাংলার 'স্বদেশী' ও বিপ্লব-যুগের এই সকল সহকর্মীদের আদর্শনিষ্ঠ চরিত্র ও জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পর্কে অশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। তাঁহাদের সম্পর্কে স্যার হারকোর্টের মর্যাদা হানিকর এইরূপ অশিষ্ট উক্তি তাই উপেক্ষা করেন নাই। সঙ্গে সঙ্গেই সমুচিত উত্তর দিয়াছেন!

সে দিনের এই সকল মহানায়কদের প্রতিভা চরিত্র ও জীবনের সম্যক আলোচনার চেষ্টা এখানে করিতেছি না। তাঁহাদের স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে মাত্র গোটা কয় দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলাম।

তাঁহারা যে নব ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন সেই সম্বন্ধে নিউ ইণ্ডিয়া পত্রে প্রকাশিত বিপিনচন্দ্রের উক্তিটি উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। তিনি লিখিতেছেন—"আমাদের আদর্শের নব-ভারত হিন্দু নয়, মুসলিম নয়, খৃষ্টিয়ও নয়"। এক মহান সমন্বয়ী ভারত। কিন্তু সেই স্বপ্নের নব ভারত কবে বাস্তব উজ্জ্বল ভারত রূপে দেখা দিবে? কবে সেই ভারতকে দেখিব? ভারত আত্মার বাণী-মূর্তি শ্রীঅরবিন্দের সত্য প্রত্যয়: "ভারতের আছে একটি আত্মা (soul)। ভারত এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য (India is one, indissoluble, indivisible)" ভারতকে রাজনীতিক প্রয়োজনে আমরা খণ্ডিত হইতেও দেখিলাম। সত্যকে খণ্ডিত করিয়া (করা কি যায়?) নব ভারত গঠনের অসাধ্য সাধন যদি সম্ভব ভারতের ভাগ্যবিধাতাই উহার বিধান দিবেন—আমরা সেই অবিচ্ছেদ্য কল্পনা করিতে অক্ষম। শুধু কামনা করিতে পারি, গড়িয়া উঠুক সেই স্বপ্নের ধ্যানের নব-ভারত।

সত্য বড় ভয়ঙ্কর

[একাঙ্কিকা]

॥ নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় ॥

[সুবিখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিদ্ ডক্টর মানস চৌধুরীর মনোবিজ্ঞান মন্দির। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত প্রদর্শনী কক্ষ। ডক্টর চৌধুরী এবং তাঁহার বন্ধু তাপস রায়ের মধ্যে ডক্টর চৌধুরী কর্তৃক সদ্য আবিষ্কৃত 'বীক্ষণ' নামক যন্ত্র সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হইতেছে। সন্ধ্যা রাত্রি।]

মানস ॥ তারপর ?

তাপস ॥ 'নিউ ইয়র্ক হেরল্ড' এর খবরটি দেখেই আনন্দে আমি লাফিয়ে উঠলাম মানস। "বিখ্যাত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এম, চৌধুরীর চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার। মনোরাজ্যের গুপ্ত রহস্য প্রকাশক বিস্ময়কর যন্ত্র 'বীক্ষণ'। মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম রহস্য উদ্ঘাটন। বিংশ শতাব্দীর নবতম বিস্ময়।" দেখে দিয়েই তাই কাগজগুলো নিয়ে ছুটে এলাম তোর কাছে। দেখ্—তোর আবিষ্কারে ও দেশেও কেমন সাড়া পড়েছে।

মানস ॥ দেখেছি। দেশ বিদেশের সব পত্রিকায় ঐ সবই লিখছে। জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদেরও অনেকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন। নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস, মস্কো—এমনকি টোকিও থেকেও এসেছে বহু নিমন্ত্রণ। শুধু তেমন সাড়া পাচ্ছি না নয়াদিল্লীর।

তাপস ॥ এতে কিন্তু আমি এতটুকুও বিস্মিত হচ্ছি না মানস। 'সেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না' যে দেশে, সেটা আমাদের দেশ। রবীন্দ্রনাথের কথা জানিস তো ? নোবেল প্রাইজ পেলেন, তখন এদেশে সুরু হলো তাঁকে নিয়ে কাড়াকাড়ি। ঘাবড়িয়ো না বন্ধু, তোমার ক্ষেত্রেও তাই হবে। তোর এই আবিষ্কারের পেটেন্ট নিয়েছিস তো ?

মানস ॥ হ্যাঁ, তা নিয়েছি।

তাপস ॥ যন্ত্রটির নামটি কিন্তু ভারি সুন্দর দিয়েছিস—'বীক্ষণ'। ইংরেজি নাম দিলে এত খুশি হতাম না মানস। 'বীক্ষণ' নামটি খুব এ্যাপ্রোপ্রিয়েট্ হয়েছে। বীক্ষণ, মি না, বিশেষ ভাবে দর্শন।

মানস ॥ 'অণুবীক্ষণ' কথাটি আমাদের দেশে চালু আছে। তাই ভাবলাম 'বীক্ষণ' নামটা চলবে। আয় তাপস, তোকে একবার বীক্ষণ করি। আয়, বীক্ষ্যমানের এই চেয়ারটায় এসে বোস। এই 'হস্ত' অঙ্কিত চক্রে হাতটা রাখ। হাত রাখলেই যন্ত্রটা চালিয়ে দেব আমি। সঙ্গে সঙ্গে তোর মনের গুপ্ততম কথাও প্রকাশ করতে বাধ্য হবি। সাধ্য হবে না তোর তা গোপন রাখতে।

তাপস ॥ ওরে বাবা, বলিস কি ?

মানস ॥ হ্যাঁ। এক মাস আগে তুই কি চিন্তা করেছিস তা তোর মন থেকে টেনে বের করে তোর নিজের মুখে বলিয়ে নিতে পারবো আমি, শুধু এই বৃত্তটাকে ঘুরিয়ে এক মাসের অনুপাতে পিছিয়ে দিয়ে। এমনি করে এক বছর আগেকার মনের চিন্তাধারাও টেনে বের করা যায় তোরই মুখ থেকে। পরিত্রাণ নেই বন্ধু, আজ আমার হাতে তোমার···। ডুবে ডুবে জল খাওয়া আর এখন চলবে না বন্ধু কারো।

তাপস ॥ কী সর্বনেশে লোক তুই! মানুষ খুন করতে পারিস দেখছি তুই। কাকে নিয়ে এ সব পরীক্ষা তুই করেছিস এতদিন ?

মানস ॥ নিজেকে দিয়েই সুরু করেছিলাম।···বহুকাল থেকে ডায়েরি লিখি আমি। প্রতিজ্ঞা করে বসতাম নিজের গোপন কথা মুখে আমি বলবো না, কাউকে

আমি লিখবো না। ডায়েরীর পাতাতেই তা থাক্ গুপ্ত। 'হস্ত অধিষ্ঠান চক্রে' বাঁ হাত রেখে ডান হাতে কলম নিয়ে এই চেয়ারে বসতাম। সহকারী ছেলেটি নির্দেশ অনুযায়ী চালিয়ে দিত এই 'বীক্ষণ'। কিছুতেই কিন্তু রোধ করতে পারিনি এই সত্যকে। শুধু মুখেই বলিনি, যন্ত্রটির চাপে আমাকে কাগজেও লিখে দিতে হয়েছে মনের গুপ্ততম প্রতিটি চিন্তা। পরে দেখা গেছে ডায়েরীর সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে তা।

তাপস ॥ আমি তাই পালাচ্ছি।

মানস ॥ না না, তুই পালাবি কেন তাপস? পালিয়েছে আমার সহকারীরা। ছ্যাঁ এক এক করে সবাই পালিয়েছে। কেউ ভয়ে, কেউ লজ্জায়। বিপদ হয়েছে এই, আজ আমার কোনও সহকারী নেই। নতুন বিজ্ঞাপন দিয়ে যাদের পাচ্ছি তাদের প্রথম শর্তই এই যে, তাদের এই যন্ত্রে পরীক্ষা করা চলবে না। তোর কথা স্বতন্ত্র। বাল্যকাল থেকে তুই আর আমি হরিহর আত্মা, অভিন্নহৃদয় বন্ধু। কে না জানে?

তাপস ॥ না না ভাই, সেদিন আর নেই। সে ছিলো বটে বাল্যকালে। ছিলো বটে প্রথম যৌবনে। কিন্তু তোর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে রয়েছিও তো অনেক-দিন। না জানি কত গোপন পাপ জমা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে এই বুকে। রক্ষে কর ভাই। সারা বিশ্বে তোমার অযশস্কর হোক, আমাকে তুমি তোমার গর্বে গর্বী করেই সুখী রাখো, যন্ত্রটি দিয়ে পরীক্ষা করে বিব্রত করো না বন্ধু।

মানস ॥ তুই কি ভাবছিস তাপস, তোর গুপ্ত কথা আমি কারো কাছে ব্যক্ত করবো? আমাকে তোর এত অবিশ্বাস?

তাপস ॥ না না, তোমাকে অবিশ্বাস করছি না আমি, তোমাকে বলতে লজ্জা পাচ্ছি তাই।

মানস ॥ আমার কাছেও তোর লজ্জা। প্রথম যৌবনে দুই বন্ধুতে যে সব কাণ্ড আমরা করেছি, তা যদি পরস্পরের কাছে লজ্জায় না হয়ে থাকে, আজ লজ্জা কেন বন্ধু। না না, আমি তোর কোনো কথা শুনবো না। এই মুহূর্তে তোর মনের কথা কি, আর, সেটা জানা যাক। নিশ্চয়ই আমার সামনে বসে থেকে এমন কোনো পাপ কথা ভাবছিস্ নে, যেটা তোর লজ্জার কারণ হতে পারে। আমি তোকে কথা দিচ্ছি, বর্তমান এই মুহূর্তগুলির পেছনে তোকে আমি টেনে নিয়ে যাব না—যাব না। এখন এখানে বসে যা ভাবছিস ঠিক তাই বের করে নেব।

তাপস ॥ সত্যি! সত্যি তো?

মানস ॥ আমি তোকে কথা দিচ্ছি তাপস, কথা দিচ্ছি।

তাপস ॥ বেশ। তবে দেখ। আমার কৌতূহলও মিটুক। কিন্তু জেনে রাখো, আমি যাই ভাবি না কেন এখন, গুপ্ত রাখতেই চেষ্টা করবো সেটা প্রাণপণে। কোথায় কি করতে হবে বলো।

মানস ॥ সাধু! সাধু! আয়।

[মানসের নির্দেশমত তাপস যথাস্থানে তাঁহার বাম হস্ত রক্ষা করিলেন। তাহার দক্ষিণ হস্তে একটি ফাউন্টেন পেন দেওয়া হইল এবং সম্মুখে রাখা হইল একটি লিখিবার প্যাড। মানস যন্ত্রাদি যথা নিয়মে চালাইয়া দিলেন। যন্ত্রের নানান জায়গায় লাল নীল বাতি জ্বলিয়া উঠিল। তাপস ধীর, স্থির গম্ভীর হইয়া গেলেন। মুহূর্তকাল পরেই দেখা গেল যন্ত্রের শঙ্কুকে ডুবাইয়া দিয়া তিনি উচ্চ কণ্ঠে মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন এবং কলম দিয়া তাহা প্যাডে যন্ত্রতে লিপিবদ্ধ করিতেছেন।]

তাপস ॥ উঃ, শেষকালে তুই এত বড় একটা আবিষ্কার করে ফেললি মানস? তোর এই জয়, তোর এই যশ, এ যে আমি কিছুতেই সইতে পারছি না। তুই এত বড় হলি। আর আমি! কে আমাকে চিনছে? যা দেখছি, তুই কোটিপতি হবি। আর আমি। তোকে খুন করতে ইচ্ছা হচ্ছে আমার।

[মানসের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। বেদনাহত হইলেন তিনি। তাপসের লিখিত কাগজখানি টানিয়া লইয়া তিনি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং মেদিনটি বন্ধ করিয়া দিলেন। গভীর নিস্তব্ধতা। তাপস

ক্রমশঃ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন।]

তাপস ॥ কি বলছিলাম আমি ?

মানস ॥ (হাসিয়া) ঐ এক কথা। আমার গর্বে তুই কত গর্বিত ভাই। সত্যি এত ভালবাসিস তুই আমাকে !

তাপস ॥ দেখি, কি লিখেছি দেখি !

মানস ॥ সেটা আমি ছিঁড়ে ফেলেছি ভাই।

তাপস ॥ ছিঁড়ে ফেলেছিস ? কেন ?

মানস ॥ আমার সম্বন্ধে তোর অতটা উচ্ছ্বাস—শুনেও যেমন লজ্জা হলো, পড়তেও তেমনি লজ্জা পেলাম। ছিঁড়ে ফেললাম তাই।

তাপস ॥ সত্যি বলছিস ?

মানস ॥ নয় তো কী ?

তাপস ॥ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে আমার। কেমন যেন একটা অবলায় বোধ করছি। আমি ভাই উঠি।

মানস ॥ বোস্ বোস্। নতুন একটা অভিজ্ঞতা কিনা, ভাই। এক পেয়ালা কফি খেলেই চাঙ্গা হয়ে যাবি। (ইলেকট্রিক বেল টিপিলেন। ভৃত্য দশরথ ভাকের চিঠিপত্র সহ প্রবেশ করিয়া চিঠিপত্র মানসের সামনে রাখিল। মানস সেগুলি দেখিতে দেখিতে) দু পেয়ালা কফি। (দশরথ অন্তরে চলিয়া গেল।)

তাপস ॥ প্রত্যেক ডাকে তোর এত চিঠিপত্র আসে কেন ?

মানস ॥ হ্যাঁ। এইটেই এখন সব চেয়ে বড় অত্যাচার হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বেতকীর চিঠি আজ এসেছে দেখছি।

তাপস ॥ কি ? খবর পেয়ে বুঝি লণ্ডনের পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে অর্ধাঙ্গিনী উড়ে আসছেন স্বামীর কাছে, অন্নের ভার নিতে ? এখনও এসে পৌঁছাননি দেখেই বরং আমি অবাক হচ্ছিলাম। তা' স্বামী-পরিত্যক্তা আসছেন কবে ? কোন্দিন আসবে।

মানস ॥ (চিঠি পড়িতে পড়িতে) আসছেন না।

তাপস ॥ সে কি ? ভয় পাচ্ছেন নাকি ?

মানস ॥ কি জানি, জানি না।

তাপস ॥ ও বাবা, ওটা তো দেখছি নয়া দিল্লীর চিঠি। কি ? স্বয়ং কর্তা আসছেন নাকি ?

মানস ॥ (চিঠি পড়িতে পড়িতে) না, তিনিও আসছেন না। তবে খুব অভিনন্দন জানিয়েছেন।

তাপস ॥ ওরে, শেষে কি তুই একঘরে হবি মানস ?

মানস ॥ হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। একে একে সবাই আমাকে বয়কট করছে। আমার বীক্ষণ যেন একটি অ্যাটম বোম্ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাপস ॥ ওরে মানস, আমিও আজ একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার করে ফেললাম।

মানস ॥ কি ?

তাপস ॥ মুখে আমরা বলি বটে 'সত্যমেব জয়তে', কিন্তু সত্য থেকে দূরে থাকতেই চাই আমরা। ঘৃণা করি সবচেয়ে বেশি ঐ সত্যকে। আর শোন মানস, একটা ভবিষ্যদ্বাণীও আজ আমি করছি।

মানস ॥ কি ?

তাপস ॥ তোমার এই যন্ত্র তুমি রক্ষা করতে পারবে না। চুরমার করে ফেলা হবে একে।

মানস ॥ চুরমার করবে কে ?

তাপস ॥ ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ—এই তিন শক্তি এক যোগে ছলে হোক, বলে হোক, কৌশলে হোক তোমার বীক্ষণকে ভক্ষণ করবে। তার চেয়েও বড় ভয় কি জানো ?

মানস ॥ কি ?

তাপস। এখন তুমি প্রাণে বাঁচলে হয়।...যাক। কফি এসে গেছে।

[দশরথ কফি আনিয়া উভয়ের সামনে রাখিল। উভয়ে নীরবে কফি পান করিতে লাগিলেন। যবনিকা নামিল।

মায়ের পূজা

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

মায়ের পূজার পেছনে আছে একটা জিজ্ঞাসা—আকর্ষণ করে কেন? কেন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আকর্ষণ করে, কেন সোনা হাতীটা পর্যন্ত আকর্ষণ করে, কেন বিশ্বে একে অপরকে আকর্ষণ করে, কেন ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডটিও আকর্ষণ করে? সৃষ্টির এই রহস্যের কাছে শুদ্ধ মানুষের বুদ্ধির প্রার্থনা। উচ্চতম বিচারাধিপতি—বুদ্ধি যার তীক্ষ্ণতম, দেশের হর্তা-কর্তা-বিধাতা বা ত্রিভুবনত্রাস রাষ্ট্রপ্রধান—শক্তি যার সীমাহীন কিংবা আজন্ম সংবেদেন্দ্রিয়—সমস্ত বৃত্তিকে জয় করে যে উর্ধ্বশীর্ষ—এমন ব্যক্তিবিশেষকেও নত হয়ে পড়তে হয় এই আকর্ষণ করার ক্ষুদ্র শক্তির কাছে দিনান্তে কর্মান্তে বা ঘটনাচক্রে—সাধারণ মানুষের পক্ষে তো কথাই নেই।

কিন্তু কেন? কী এই রহস্য?

এই জিজ্ঞাসা নিয়েই আরম্ভ—এই জিজ্ঞাসারই উত্তর দিতে ঋষি আনলেন মায়ের কথা।

এই আকর্ষণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে ভারতীয় পুরাণ-শাস্ত্রের পাতায় পাতায় লেখা আছে সাধারণ বুদ্ধি-অগম্য কত না কাহিনী—অবিশ্বাসের কাছে যা হাস্যকর, নীতি-বাগীশের কাছে যা নোংরামী। বর্তমান বিজ্ঞানের মনঃসমীক্ষণের পাতায় পাতায় আঁকা আছে এই আকর্ষণেরই অবিশ্বাস্য রূপ—যা আজকের সভ্যতায় বিকৃত রূপ খানিকটা আর খানিকটা যা বিশ্বের গোড়াকার সত্য। সব মিলিয়ে এই সত্যটাই স্পষ্টতর হয়ে উঠবে—বিশ্বের একে অপরকে আকর্ষণ করে।

কিন্তু কেন? কী এর রহস্য?

আকর্ষণ করে এ তো আছেই—একটা স্বভাব, কিন্তু তারপরে আরও কিছু আছে—সেটা বিকৃত ভাব। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কিংবা যে আকর্ষণ করে সে আমাকে তাড়িয়ে দিলেও আমি সে আকর্ষণ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারি না কিংবা এমনও হয় অন্য কোন কারণেও নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারি না। তবু মনে পড়ে, দেখলি মনে পড়ে, ঘুরে ঘুরেই মনে পড়ে।

অর্থাৎ এই আকর্ষণী শক্তি মানুষের বন্ধন—এই-ই মানুষের সব বিপদের মূল, সব বিপর্যয়ের গোড়ায়।

কিন্তু তা-ই কি? কী এর রহস্য?

এই আকর্ষণ-তত্ত্ব বুঝতেই মায়ের পূজার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

এই আকর্ষণ করা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "প্রকৃতি তাহার রূপরস বর্ণগন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধি মন, তাহার স্নেহ প্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে, তাহা আমাকে বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণ-পাশ আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে। জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন, আর কাহারও টানিবার ক্ষমতা নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই প্রাকৃতিক রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা—ইহাকেই তো আমরা মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন"—"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত নানা বর্ণগন্ধময়।"

বিশ্বের অন্তঃস্থিত এই আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টিতে বন্ধনের রূপে আসে নি, তার কল্যাণী মূর্তিরই সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছিলেন, সেই তাঁর কাছে মুক্তিরূপেই ফুটে উঠেছিল। আর তাই যে হয় সেই কথা জানাতেই মায়ের কথা, মায়ের পূজা ঋষি রেখে গিয়েছিলেন ভারত-বর্ষের বুকে কত কত বৎসর আগে।

কি করে হল?

বিশ্বের বস্তুপুঞ্জের শুধু আকর্ষণ করাটাই ধর্ম নয়, প্রতিহত করাও তার স্বভাব। সে যেমন কাছে টানে তেমনি দূরে ঠেলে দেয়—এই দুটো মিলিয়ে তার সত্যের সমগ্রতা। এই কথাটি যখন ভুলি তখনই আকর্ষণ করা আমাকে মোহিত, বিমুগ্ধ করে, শক্তিহীন করে। তখন আকর্ষণ করাটাকেই মানি, দূরে ঠেলে দেওয়াটাকে মেনে নিতে পারি না—সত্যকে সমগ্র রূপে না নিয়ে তাই দুঃখই শুধু পাই। এই কথাটাও ভুললে চলবে না যে একান্তভাবে জড়ধর্মী কোন বস্তু নেই। একই বস্তু ব্যবহারের ভেদের ঘোরে গুণে জড়ধর্মী বা চৈতন্যধর্মী হয়ে ওঠে। বস্তুর স্বরূপ গোড়াতে মনে না রাখলে তার আকর্ষণ বিকর্ষণের তত্ত্বেরও কূলকিনারা পাওয়া যাবে না। মেধসমুনির কাছে সুরথ-সমাধি এই জন্যই বলেছিলেন যে কেন তাড়িত হয়েও মনের আসক্তি দূর করা যায় না বা সে সব বস্তু থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনা যায় না—যেহেতু তাঁরা বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। বস্তু যেমন আকর্ষণ করবে, তেমনি ঠেলেও দেবে—সেটা মেনে নিতে না পারলে চলবে কেন? বস্তুর তত্ত্ব সম্বন্ধে এবং বস্তুর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সম্বন্ধে মিথ্যাজ্ঞান থাকায় জন্যই বিশ্বের মূলীভূত এই আকর্ষণ আমাদেরকে আনন্দিত না করে বিমোহিত করে—আমরা ভেবেই পাই না কেন এমন হয়? রবীন্দ্রনাথ সেটা জানতেন, তাই তিনি বলতে পারেন জগতের আকর্ষণ-পাশ আমাদিগকে অগ্রসরই করে দিচ্ছে—তাই আকর্ষণ করাটা তাঁর কাছে আকর্ষণ না করার সঙ্গে সঙ্গে সত্য।

মায়ের কথা মুনিবর কি বললেন?

মা যে?

বিশাল বিশ্ব, চারদিকে শক্তির কি সুবিপুল আলোড়ন—সূর্য ওঠা থেকে মাটি থেকে যে তৃণখণ্ডটি উদ্ভিন্ন হয়ে উঠল এ সবের কোনখানেই আমি নেই, কোটি কোটি মানুষের জীবন-ধারা চলছে কত জানা না-জানার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে, আমি সেখানে কোথাও নেই। এত ক্ষুদ্র আমি, এত স্বল্প আমি, এত শক্তিহীন আমি? এই বিরাট বিশ্বে কি নিঃসহায় আমি! এই যা কিছু সবই আমার বাইরের, সবই আমার অনাত্মীয়, সবই আমাকে প্রতিহত করবার জন্যই? তাহলে নিজেকে আমি কোথায় রাখি?—এ উপলব্ধি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সত্য বটে। কিন্তু এ উপলব্ধিও সঙ্গে সঙ্গে সত্য যে—

বিশাল বিশ্বে চারিদিক হতে প্রতি কণা মোরে টানিছে
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ শতকোটি কর হানিছে।

*　　*　　*　　*

আছে আছে প্রেম ধূলায় ধূলায়, আনন্দ আছে নিখিলে
মিথ্যায় ঘেরে ছোট কথাটিরে তুচ্ছ করিয়া দেখিলে।
জগতের যত অণু রেণু সব
আপনার মাঝে অচল নীরব
বহিছে একটি চির-গৌরব—এ কথা না যদি শিখিলে
জীবনে মরণে ভবে ভবে তবে প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে।
ধূলা সাথে আমি ধূলা হয়ে রব সে গৌরবের চরণে।
ফুলমাঝে আমি হব ফুলদল তাঁর পূজারতি চরণে।
যেথা যাই আর যেথায় চাহিয়ে
তিল ঠাঁই নাই তাঁহার বাহিরে
প্রবাস কোথাও নাহিরে নাহিরে জনমে জনমে মরণে
যাহা হই আমি তাই হয়ে রব সে গৌরবের চরণে।

তাহলে এ বিশাল বিশ্বে ক্ষুদ্র আমি একদিকে যেম অসহায় শক্তিহীন, আবার সেই ক্ষুদ্র আমিই বিশ্বের অ রেণুর সঙ্গে প্রেমে বিধৃত। বিশ্বের সঙ্গে এইটেই আমা সম্পর্ক—যদিও একদিক থেকে এ ভীষণ হতেও ভীষণত কঠিন হতেও কঠিনতর—আবার তারই অণু রেণুর সা আমার গলায় গলায় প্রেম। বিশ্বই আমার রক্ষা করা আবার তার ভীষণতাই আমার ভয় ঘুচিয়ে যে এই-ই মাতৃমূর্তি। মায়ের কাছেও তাই দেখি—মা আম

জনম দিলেন, তাঁর রক্ত দিয়ে, প্রতি মুহূর্তের ধ্যান দিয়ে আমায় লালন-পালন করে আমায় বড় করে তুললেন, অথচ শিশুকালে কিংবা আমার জ্ঞান-বুদ্ধি যেদিন হয় নি সেদিন তাঁর কথা বুঝতে না পেরে যখন তাঁর কল্যাণ-ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছি, তখন সেই আমিহীন মাতৃমূর্তিই কি আমার কাছে ভীষণ বলে প্রতিভাত হন নি? নিশ্চয়ই সেদিনের মাকে দেখে আমি ভীত হয়েছিলাম। কিন্তু মায়ের সেই ভীষণ মূর্তির পিছনে কি আমার কল্যাণ কামনাই ছিল না? আমি বুঝতে না পেরেই ভয় পেয়েছিলাম! বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কেও তাই দেখি—ঝড়ের তাণ্ডব বেগ যখন আমার জীবনের আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে দিচ্ছে, তখনও যদি এ বিশ্বাস, এ অপেক্ষা নিয়ে ধীর শান্ত মনে বসে থাকতে পারি যে এই ঝড়ের মধ্য দিয়েই মাটি উর্বর হয়ে উঠছে, আকাশ-বাতাসের ময়লা কেটে যাচ্ছে—এই ঝড়ের পিছনেই আছে কল্যাণী শস্য শ্যামলা ধরণী—তাহলে ঝড় আমার কি করবে? শক্তিকে, বিশ্বের এই গতি-শীলা জীবনধারাকে ঋষি তাই মাতৃরূপে দেখেছেন। এই বিশ্বই মা—তিনি আমায় সৃষ্টি করে তুলছেন, পালন করে তুলছেন—আবার আমার বিবৃদ্ধির জন্যই তাঁর ভীষণরূপের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর কল্যাণীমূর্তি আর তাঁর ভীষণাৎ ভীষণা মূর্তি দুইয়ে মিলিয়েই মা, দুইয়ে মিলিয়েই বিশ্ব, দুইয়ে মিলিয়েই সত্যের সামগ্রিকতা। তিনি তাই কালী করালবদনা, আবার তিনিই কমলা বরাভয়দায়িনী—। তিনিই আকর্ষণ করেন, তিনিই ঠেলে দেন—দুইকেই সমান আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হবে।

এটা না করতে পেরেই জিজ্ঞাসুরা আকর্ষণ-অভিভূত হয়ে বলেছিল কেন এমন হয়?

ঋষি জানলেন ঐ মায়ের কথা।

কেন?

যতক্ষণ শুধু আমিকে দিয়ে আবৃত হয়ে থাকি, ততক্ষণ শুধু আকর্ষণটাই বুঝি, তাকেই চিনি—এবং ততক্ষণ সে ক্ষেত্রটা অতিরিক্ত সীমিত। কিন্তু বস্তুর সঙ্গে—আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-হাতীটারও সঙ্গে—যে বিকর্ষণের সম্বন্ধও আছে সে-ও তো আমার জীবন দিয়েই উপলব্ধি করতে হবে—নইলে বস্তু-তত্ত্বের এই সমগ্রটুকুর সঙ্গে পরিচিত না হলে জীবনে আর যাই হোক আনন্দ তো পেতে পারব না—অথচ আনন্দ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রতিটি মানুষের মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ, সহজ, স্বাভাবিক বলেই জিজ্ঞাসুদের মনে জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয়েছিল। নিজের আমি দিয়ে ঘেরা অবস্থাটা কাটাবার আহ্বানে সাড়া দিতে অর্থাৎ বস্তুপুঞ্জকে trauscend করে যেতেই মাকে আনতে হল —কেননা আমার থেকে অনেকখানি ব্যাপকতর গভীরতর জীবন-চেতনার সঙ্গে যুক্ত না হলে, যার সাথে আমার রয়েছে সহজের হৃদয়-সংবেদন, আমি কিছুতেই আমার আমিকে ডিঙিয়ে যেতে পারব না। ভারতীয় অধ্যাত্ম-শাস্ত্র এ কথা স্পষ্টভাবেই বলে গেছেন, আজকের মনঃ-সমীক্ষণও যে কথা তত্ত্বগতভাবে স্বীকার করতে পেরেছেন এই বলে যে, intuition intelligence-এর কাছে হার মানবে। নিজেকে ডিঙিয়ে যাবার বুদ্ধি দিয়েই নিজেকে ডিঙান যায় না—আর একটা ব্যাপকতর গভীরতর জীবন-সত্তার সঙ্গে জীবনগত যোগেই তা সহজ স্বাভাবিক সম্ভব। তাই মা এলেন—তিনি বড় অথচ তিনি আপন, তিনি শ্রেয় অথচ তিনি প্রেয়—তাই আমাকে তিনি উত্তরণ করিয়ে নেবেন দুস্তর বিচ্ছিন্ন আমিত্ব থেকে —সেই বিচ্ছিন্নতাই জীবন্ত।

আকর্ষণ করাটাই দোষেরও নয় বন্ধনেরও নয়, যদি তার বাইরে গিয়েও একবার দাঁড়াতে পারি, যদি দুইয়ে মিলে এক এই তত্ত্ব বুঝতে পারি। আকর্ষণ-তত্ত্ব জানি না বলে আমরা বদ্ধ হই, মূঢ় হই। মাতৃ-তত্ত্ব সৃষ্টি-তত্ত্ব, বস্তু-তত্ত্ব তথা আকর্ষণ-তত্ত্ব জানলে, আর তা যদি জানতে পারি হৃদয় সংবেদনার ভিতর দিয়ে, তাহলে ঐ আকর্ষণ আমাকে বিচ্ছিন্ন ও অনবদ্য উপলব্ধির সম্পদ দান করে আমাকে উন্নততর সমৃদ্ধতর জীবন-চেতনার অধিকারী করবে। এই মাকে নমস্কার, আমার সকল সত্তা দিয়ে নমস্কার—বার বার নমস্কার—সহস্রবার নমস্কার।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৩—

(৫০)

'তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে'। রেণু চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যায়। ...মানুষ যে কেমন করিয়া ভাবে আমি তো অবাক। সে বলিয়াছে, 'মানুষ যেখানে বাধা প্রকাশ করিবার সুযোগ পায়, সেখানেই তাহা প্রকাশ করে। কিন্তু যেখানে সুযোগ পায় না, সেখানে তিতিক্ষা শিখিতে বাধ্য হয়। তিতিক্ষা অভ্যাস করিলে রোগের অনেকখানি উপশম হয়'।...এই তো ইহাদের বুদ্ধি। এমনি করিয়াই মানুষ নিজের দুঃখ নিজে সৃষ্টি করে ও ঘুরে সরিয়া যায়। কাহারও তো আমার উপর নির্ভর বিশ্বাস বা ভক্তি নাই। যে যাহার সেখানে বিভোর। বুদ্ধি বদলাইবার প্রয়োজন কাহারও নাই। যাক, আর দুঃখ করিব না। সবই আমার হইয়াছে। আমি তো প্রত্যেককে প্রথমেই 'একাত্ম' বলিয়া ধরিয়া লই। মানুষ আমা হইতে পৃথক হইয়া দাঁড়ায়। ইহাই আমার ভাগ্য বিধান। আজ আর পাঠ হয় না। 'প্রাণের ভাষা' লিখিতে আরম্ভ করি।...

১৬ই মে

রাধারাণী আমার, তোমার যোগীবেশ আমার বড় ভাল লাগে, যে বেশে তুমি সকল জটিলতা-কুটিলতাকে পুরুষোত্তম-জীবনের মধ্যে পাক করিয়া চলিয়াছ। ইহাই তো তোমার যুগোপযোগী রূপ। ওগো বিজ্ঞানময়ী, বর্তমান বিজ্ঞান তোমার ঐ রূপের আবিষ্কার করিয়াছে। তুমি যেমন mysticদের, তেমনি আজ বৈজ্ঞানিকদের। তোমার শ্রীচরণ-তলে Mystic ও Scientist গলাগলি করিয়া একাত্ম হইয়াছে। তুমি নৈর্ব্যক্তী হইয়াই চির উজ্জ্বলা, তুমি নৈর্গুণী হইয়াই সর্বগুণান্বিতা। তোমার অতুলনীয় রূপ, অতুলনীয় মহিমা। তুমি আমার জীবনে ধরা দিয়াছ, তাবিয়া আমার সকল দেহ প্রাণ মন আনন্দে পুলকিত হয়। তুমি আমার—ইহাই আমার গর্ব। তোমার এই রূপের খোঁজ পাইয়া আমি ধন্য।...'নি আয়তে' শ্লোকের আলোচনা হয়—ছয় রসমের বিকার পরিপাক করিয়াই যে তিনি নির্বিকার, তাহাই আলোচনা হয়। পাঠের মধ্যে দেবকীকুমার বসু আসেন তাঁহার মোটরে। পাঠ শোনেন। পাঠের পরও এক ঘণ্টা আলোচনা হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে পুরুষ-প্রকৃতির পারস্পরিক মর্যাদা, পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া একাত্মা, রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত, ইহাই আলোচিত হয়। শ্রীনিতাগোপাল যে গৌরসুন্দরেরই দ্বিতীয় কলেবর, তাহাও বলি। পক খাসনার কাছে গুরুগোবিন্দের দীক্ষাগ্রহণের কথা, Whitehead-এর It is as true to say ইত্যাদি লেখা, গোলোক-বৈকুণ্ঠেরই অমাট বাঁধা রূপ যে ধরা, ইহা আলোচিত হয়।...

১৭ই মে

ঠাকুর, 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'—সমস্যা-সঙ্কুল তরঙ্গায়িত এই বিশ্বের মধ্যে তুমিই আমার মূর্তিমান সমাধান, সকল পরিণাম পরিপাক করিয়া তুমি অপরিণামী নিত্য নির্বিকার; বেথা আমি যাই নাকো, তুমি সমাধান মূর্তিতে সর্বত্র প্রকাশিত থাক, তিলের অন্তর হলে আমি জীবনের খেই হারাইয়া ফেলি, না হেরি কূল-কিনারা। তোমার মুখ আমার জীবনের সঙ্গোপন প্রদেশে সদা জাগিতেছে, কখনো প্রাণপথ ছাড়িয়া যদি প্রজ্ঞার পথে চলিতে চাই, তোমার সদা প্রকাশিত মুখ দেখিয়া সরমে যে হই সারা। প্রাণের মধ্যে প্রজ্ঞা থাকিতে বাধ্য, কিন্তু প্রজ্ঞা প্রাণহীন হয়। তুমি আমার জীবনের সকল বৃত্তির মূর্তিমান 'অর্থ', তোমাকে বুঝে করিয়াই চলিয়াছি। আমার জীবনে তোমার অযাচিত

আসা সার্থক হউক।...৮-এ-তে যাওয়া একরূপ স্থির হয়। ...নীচের ছুটি হয়ই নিব।...

১৮ই মে

ঠাকুর, তুমি আমার বড় লক্ষ্মী ঠাকুর, তোমাকে নিয়া আমার বিব্রত হইবার কিছু নাই। আমি যদি সত্যিই তোমায় ভালবাসি, যেখানেই রাখি না কেন, যাহাই খাইতে দেই না কেন, আরতি করি বা না করি, তোমার কিছু আসে যায় না। তুমি নিয়তলা শ্মশানে পড়িয়া রহিয়াছ ঝঞ্ঝরদের মধ্যে, কাদা খাইয়া রহিয়াছ, আহরীটোলায় (শ্রীনিত্যগোপালের শ্বশুর বাড়ীর পাড়া) ভিক্ষা করিয়া খাইয়াছ। প্রকৃতির কোন-কিছুতে তুমি বদ্ধ ছিলে না। তাই তো তোমাকে এত ভাল লাগে। আমার সোনার মানুষ তুমি। যাহা পারিয়াছি করিয়াছি, যাহা পারি নাই করি নাই। তবুও তো তুমি ভালবাসিয়াছ। মনে পড়িতেছে একদিনের কথা—হুগলী মঠে একদিন বলিয়াছিলাম, 'ঠাকুর, আমি আপনাকে যোল যখনই দেখা হইবে, তখনই প্রণাম করিতে পারিব না। আসিবার পর একবার প্রণাম করিব, আবার যাইবার সময় একবার করিব। তুমি বলিয়াছিলে, তোমার যাহা ভাল লাগে, তাহাই করিবে'। ঠাকুর, তোমার মত আর কে আছে বল? দেখিয়াছি ভক্তরা দিনে দুইবার দেখা হইলেও দুইবারই প্রণাম করিত।...রেণু ৮-এ-তে গিয়া চুপকার করার কথা বলিয়া আসে।

১৯শে মে

ঠাকুর, যেদিন তোমাকে বুকে লইয়া বাহির হইয়াছি, সেদিন হইতেই কি পৃথিবীর সকল দুয়ার আমার জন্য রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে? আমি আজ কোনও গৃহের নই, কোনও সম্প্রদায়ের নই। তুমিই আমার পথে বুকাইয়া পাওয়া ধন। 'তোমারেই প্রাণের আশা কহিব'। সুখ-দুঃখ, আঁধার আলোকের মধ্য স্থানে স্থির তোমার চরণে মাথা রাখিব। আমার জীবনে তোমার যে প্রয়োজন নিত্য হইতে চাহিতেছে বলিয়া বুঝিতেছি, তাহা কি আমার মনঃকল্পিত? ৮-এ-তে যাইতে চাই, তাহারা কি প্রাণ খুলিয়া চায়? আমার স্থান বোধহয় বিশ্বে নাই। পথই আমার স্থান। ৮।। মাস ছিলাম এখানে, আবার স্থান তুলিতে হইল। খুব ভোরে আমি ও রেণু বেহালা যাই।...৪টায় ৮-এ-তে যাই।...

২০শে মে

ঠাকুর, তুমি আমার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ ঘটনা-সমূহের সমাধান-মূর্তি। আমি যখনই আমার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ ঘটনাসমূহের উদ্বেলিত তরঙ্গের ভিতর পতিত হই, তখনই একান্তে তোমার রাতুল চরণ আমাকে সমাধানের পথ প্রদর্শন করে। তোমার চরণে শরণ নিলাম, তোমার চরণ অবলম্বন করিয়া আমি এই উদ্বেলিত তরঙ্গের বুক চিরিয়া আগাইয়া যাইব। ঘটনাসমূহ এত স্বজাতীয়, বিজাতীয়, পরস্পরদ্বন্দ্বী যে ইহাদের মধ্যে প্রাণ-পথ খুঁজিয়া বাহির করা একরূপ অসম্ভব। তোমার চরণে শরণ নিবার মত বুদ্ধি যখন আগ্রত হয়, তখন সেই বুদ্ধি পথের খোঁজ দেয়।...ভবিষ্যতে দিনের পথ খুলিয়া রাখিয়া প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে কখনও বা আগাইয়া কখনও বা পিছাইয়া চলাই আমার নীতি। আশুবাবুকে কমল মনোরমা সম্বন্ধে যাহা বলিয়া ছিল, তাহা খুবই সঙ্গত কথা।...এখানে আর এক দিনও থাকিতে ইচ্ছা হয় না। উপবাস-ভঙ্গের সময় ঠিক করার পর যেমন আর এক মুহূর্তও খাওয়ার দেরী সয় না, তদ্রূপ।...আমি যতদূর পারিয়াছি, এই অপরা প্রকৃতির ক্ষেত্রেই মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনের সঙ্গে অদ্বৈত হইতে চাহিয়াছি। যাহারই সঙ্গে মিশিয়াছি, তাহার ষোল আনা দায়িত্ব নিজ মাথায় বহিতে চাহিয়াছি। অথচ দায়িত্ব বহন করিবার মত অধিক সুবিধা আমার নাই। তাই আমার উপর চাপ পড়ে প্রচুর। কংগ্রেসের কাজ করিয়াছি, divided responsibility আমি জানিতাম না। আমি ভাবিতাম, আমিই ষোল আনা দায়ী, অপরে করুক বা না করুক। আমার মায়ের সেবা আমি করিব, তাই করিল কি না দেখিবার প্রয়োজন নাই।...

২১শে মে

ঠাকুর, তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। তুমি সংসার-সমুদ্রের চকল তরঙ্গের উপর দিয়া নাচিয়া

চলিয়াছ, যেখানে তোমার পা পড়িতেছে সেখানেই পদ্ম ফুটিয়া উঠিতেছে। আমি তোমার সেই চরণ অনুসরণ করিয়া চলিব। আমি চঞ্চল তরঙ্গের তালে তালে নাচিয়া চলিব সমুদ্রের গর্জনে গর্জন মিলাইয়া...আমি তোমার সেই movement এ পা চালিয়া চলিব। তোমার হাসি-ভরা মুখখানি, তোমার সোহাগ মাখা আহ্বান আমার মনে সংগোপনে জাগিতেছে। তুমি দেহ লইয়া লোক-চক্ষুর আড়ালে গিয়াছ। আমি পড়িয়া আছি। তোমার আসিবার প্রয়োজনকে আমার প্রয়োজন মনে করিয়া চলিবার সুযোগ কি তুমি দিবে না?... পারমার্থিক রূপে আমি যখন—কে চাই, তখন আমার তো সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেই হইবে, যদি কখনও ফিরিবার বুদ্ধি আসে তখন যাহাতে হাত বাড়াইয়া আমাকে পাইতে পারে তাহারই সুবিধা দিবার জন্য। আমি যদি তাহাকে তাহার সকল বিপদের মধ্যে ধরিয়া না রাখি, মানুষের মধ্যে কে আছে তাহার যে তাহাকে সকল বিপদের মধ্যে ধরিয়া রাখিবে? আমি তো তাহার পিতা, তাহার গুরু। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে আছি, থাকিব, যেমন prodigal son-এর সঙ্গে সঙ্গে ভগবান ছিলেন।...

২২শে মে

রাধারাণী আমার, তুমি আসিয়াছিলে আমার জীবনে কোন্ প্রয়োজনে? তোমাকে শুধু চিরন্তনরূপে তো চাই নাই; চাহিয়াছিলাম ধরার ধূলিতে মূর্তরূপে। সে রূপে আজিও তো দেখা দিলে না? 'রাধা রাধা' বলিয়া কত কাঁদিলাম, তবে আসিলে না তো? মাটির মানুষের জীবনে তোমাকে মূর্ত করিয়া পাইতে চাহিয়াছিলাম, পদ্ম প্রকৃতির সঙ্গ গড়িতে চাহিয়াছিলাম। নারী প্রকৃতির পরম সার্থক রূপ গড়িয়া তুলিয়া নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিব—ইহাই ছিল তোমার চরণ স্পর্শের পর হইতে আমার ধ্যান। কই মেয়েরা তো আসিল না। যাহাদের 'রাই রাজা' রূপ প্রতিষ্ঠার জন্য পথে পথে কাঁদিলাম, যাহা কলসে ধরিয়া রাখিলে অনেক কলস চোখের জল হইত, তাহারা কই? এস এস রাধারাণী আমার!...তাহাদিগকে আমাদের এখান হইতে ৮-এ রাসবিহারী এভিনুর বাড়ীর একতলাতে যাওয়ার কথা বলা হয়।...বেণু প্রেসে যায়...৮-এ-তে ঘুরিয়া আসে।... নজরানার X-Ray Plate পাওয়া গিয়াছে।...এত বাহিরের কাজ আসিয়া পড়িয়াছে, যাহাতে উজ্জন-তারতের প্রত্যক্ষ কর্মের হানি হইতেছে। সেই দিকে কর্ম গুটাইয়া আনা উচিত। যতটা মনোযোগ উজ্জন-তারতের দিকে দেওয়া উচিত, তাহা দেওয়া হইতেছে না। এত বড় space লইয়া এত অল্প লোকের পক্ষে কাজ চালাইয়া যাওয়া কঠিন। সকলেই যে অসুস্থ। নানাদিক হইতে খরচ তো বাড়িয়াই চলিয়াছে। খরচ কমানো দরকার...হাত পা গুটানো দরকার। ৮-এ-তে গেলে অনেক দিক হইতে সুবিধা হইবে।

২৩শে মে

ঠাকুর, জীবের প্রতি অঙ্গের কান্নার গূঢ় তাৎপর্য হইতেছে অপরা প্রকৃতিকে পরা প্রকৃতিতে গড়িয়া তোলা, একাত্ম হওয়া। তাহারই মূর্তি হইতেছেন শ্রীরাধা। জীব তাই কাঁদে, অনন্ত কাল ধরিয়াই কাঁদিয়া চলিয়াছে বিশ্বকে ব্রহ্মের ছাঁচে গড়িবার জন্য। তুমিই আমার শ্রীরাধা। ভগবানকে পাওয়ার অর্থ যে ভগবানকে গড়িয়া তোলা, তাঁহার বিশ্বকে গড়িয়া তোলা, অপরাকে পরায় গড়িয়া তোলা—তুমি তাহা প্রকাশ করিয়া অদ্বিতীয়। তোমাকে জীবনে আমি চাই। তোমাকে আমি ঘিরিয়া বেড়াইব, আমাকে দেখিয়া তোমাকে দেখিবে, আমাকে ছুঁইয়া তোমাকে ছুঁইবে এমন করিয়া আমি দিব্য প্রেমযোগে তোমার সঙ্গে এক হইব। তুমি আমি, আমি তুমি, ওগো আমার আমি, আমার স্বামী।.. বেণু ৮-তে যায় ...। আবার সাড়ে ৯টার পর বেণু মধুর ওখানে গিয়া...। ধরার ভার হরণ করিতে ভগবান আসেন। ধরা বিকারের কেন্দ্র, তাই হইয়াছিল সাধুদের কাছে আসা। ইহাই ধরার ভার। ভগবান 'জায়তে অস্তি বর্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে ম্রিয়তে' এই ষড় বিকার নিজ অঙ্গে মাখিয়া ইহাকে নির্বিকারেরই আস্বাদনরূপে গড়িয়া তুলিলেন। গ্লানি কাটিয়া গেল। বিশ্ব তাঁহার জীবনে এই technique শিখিবার সুযোগ পাইল। 'তত্তে তাত্ত্বীঃ জীড়া

যা : শ্রদ্ধা উৎপন্নো ভবেৎ'...। সন্ধ্যার পর আভা ফুটু, অতি আসে।...প্রতিজ্ঞায় আজ সপ্তম ইনজেকশান।

২৪শে মে

ঠাকুর, আমি তোমার মনোবৃত্তি-অনুসারিণী মনোরমা ভার্যা হইব, তোমার পরাশক্তি হইব। তোমার মনের আরাম আমি দিব, তোমার মনোবৃত্তি অনুসরণ করিয়া চলিব, আমার জীবনে তোমার যে প্রয়োজন তুমি সাধিতে চাহিয়াছ, আমি তাহারই অনুসরণ করিয়া আমার দেহ প্রাণ মনকে চালাইব। তোমাকে সকল দেহ মন প্রাণ দিয়া ধারণ করা ছাড়া আর কি সার্থকতা আমার থাকিতে পারে? তোমার ছায়া আমি। তোমার সেবার পথে সুখ দুঃখ, আদর-অনাদর, অপেক্ষা উপেক্ষা যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহার অনাদর না করিয়া, তাহার মর্যাদা দিয়া তোমার সেবার পুরস্কার রূপে যেন মাথায় তুলিয়া লইতে পারি। আমি তোমার সেবক—ইহাই আমার সর্বোৎকৃষ্ট পরিচয় হউক। আমি তোমার 'নিত্য সাথী'। ঘিনিঘি-পত্র ছড়ানো হয়। রেণু সকালে বীরেনের ওখানে যায়... প্রতিজ্ঞাকে ধারাপি করিতে হইবে, তখন যমুনা কাছে থাকে ইহা প্রতিজ্ঞার ইচ্ছা।...রেণু ৮-এতে গিয়া ঘর ঝোঁ, পায়খানার চুণকাম করে, পাকের ঘর ঠিক করে। আবার নূতন করিয়া সব করিতে হইতেছে। ঐ বাড়ীতে ছাদের উপর পাঠের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বাহিরের লোকের আসার পথ প্রশস্ত থাকিলে তাহার কিন্তর দিয়া আপন লোক পাওয়া যাইতে পারে। আবার উৎসবাদির বন্দোবস্তও করিতে হইবে—জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, ঝুলন-পূর্ণিমা ইত্যাদি। একটি চাদোয়ার বন্দোবস্ত করা দরকার।...

২৫শে মে

ঠাকুর, সান্ত অনন্তের, পরিচ্ছিন্ন অপরিচ্ছিন্নের স্বপ্ন গলাইয়া একাত্ম হইবার জন্য, পরস্পরকে সৃষ্টি করিবার জন্য সান্ত-অনন্তের, পরিচ্ছিন্ন-অপরিচ্ছিন্নের কি বেদনা! সান্ত তাই অনন্তের জন্য, অনন্তও সান্তের জন্য কাঁদিয়া চলিয়াছে! এই কান্নারই ঘন বিগ্রহ শ্রীরাধা, পরাশক্তি। দুইয়ের কান্না যেখানে সমান মূল্যে গৌরবান্বিত, দুইয়ের কান্না যখন দুইকেই অন্যোন্যমৈথুনে গড়িয়া তোলে, তখনই প্রকাশিত হয় ব্রজধাম। ব্রজধাম, ব্রজধাম, কেন আমার জীবনে তুমি প্রকাশিত হইলে যদি না তোমাকে বিশ্বের প্রতি দেশে, প্রতি জনপদে, প্রতি ঘরে আস্বাদন করিতে না পারিলাম। আমাকে সুযোগ করিয়া দাও এই বিশ্বকে ব্রজধামরূপে গড়িয়া তুলিবার মত শক্তি দিয়া। ঠাকুর, ঠাকুর, দয়া কর। পোটলাপুঁটলী বাঁধা হইয়েছে, যাত্রা সুরু। রেণু পোষ্টাফিসে ডিরেক্ট করায় ও ইলেকট্রিক সাপ্লাইতে disconnect করার ও টাকা ফেরত দিবার দরখাস্ত দিয়া আসে।...পুলিনকে ১০টাকা দেই। আমরা কাল যাইব—কাল তাহার যাইবার কোন সংস্থান নাই। এতদিন ছিল—দুঃখ হয়। শরীর ভাল হইয়াছে, যাহা হয় করিয়া যাইবে। একটা ঠেলায় কিছু মাল লইয়া রেণু ও জয়া ৮-এতে একটায় যায়। নিতাব্রত ফিস খুলিয়া দেয়। ইন্দুলেখা ঠাকুরাণী ঠাকুরের জন্য অনেক ভোগ আনিয়াছে।...বলরামবাবু নন্দুলের নিকট (যোগেশ্বরীর বাড়ী) এক পোষ্টকার্ড দেই। কাহারও যাইবার সম্ভাবনা নাই। ঠাকুর ভাল করুন।... ইন্দুলেখা আসেন, দুঃখ করেন। এখানে সত্যিই তো আমাদের বান্ধব ছিলেন উনি। ঠাকুর তাঁহার সেবা গ্রহণ করিবেন। আমারই তো সেবা করিয়াছেন, অনেক কিছু খাওয়াইয়াছেন। প্রায় ৯ মাসের এখানের অবস্থান শেষ হইল। প্রতিজ্ঞার বেদনা আবার বৃদ্ধি হওয়ায় স্পেসিফিক ১নং ৪বার করিয়া দেওয়া হয়। ম্যালিগনেন্ট টিউমারে ৯মাস কেবল স্পেসিফিক ১নং ৪বার করিয়া যাইবার ব্যবস্থা।

২৬শে মে

টালিগঞ্জ ৮৯ নং রোড সাউথের আশ্রম ত্যাগ।

ঠাকুর, তোমাকে বুকে লইয়া, পরাণপুতলী রাধারাণী আমার, তোমাকে হৃদয়ে লইয়া সেই যে কবে পথে বাহির হইয়াছিলাম, আজিও তো তাহার বিরাম হইল না। তোমার প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছিলাম ধরার বুকে, প্রতিষ্ঠানি তো গড়িয়া তুলিতে পারিলাম না। আজ এখানে কাল ওখানে। ইহার কি বিরাম নাই? বক্তমাংসের মানুষের মধ্যে রাধারাণী আমার, তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে

চাহিয়াছিলাম। আজও তো তেমন করিয়া ধরা দিলে না? কেন তবে অযাচিত করুণায় আসিয়াছিলে? তোমার আসা কি আমার জীবনে সার্থক হইবে না? দিন তো বেশী আর নাই। সকালেই তিনটী ঠেলা আনা হয়। তাহাতে মাল বোঝাই করিয়া আনা হয়। প্রতিভা-মিনু রিক্সায় সঙ্গে সঙ্গে আসে। খুব সকালে হরিগোপালবাবুর বাসায় গিয়া দেখা করিয়া আসি। বেবুদের বাসাতেও যাই। বেবু, ইন্দুলেখা প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করিয়া আসি। কে আমার কাছে আসিবে, কেন আসিবে? আমিই যাইব। প্রতিভা ঠাকুর নিয়া আসে। আমি বেবু গোপা বাসে আসি। তখনই তিন ঠেলা এখানে পৌঁছিয়াছে। ঠাকুরের ঘটো উপরেই আনা হয়। ৪টার পূর্বে বেবু আসার ঠেলা করিয়া বাকী সব মাল নিয়া আসে।...ঠাকুর ঘুরিয়া আবার এই বাড়ীতেই আসিলেন। ২৭শে মে

৮-এতে আজ অনেক দিন পর আমার তেতলায় প্রার্থনা হয়। প্রতিভা, বেবু, মিনু, গোপা উপস্থিত থাকে। উপরেই হরিতকী বাটা মিনু আনিয়া দেয়। ঠাকুর, তুমি আমার জীবনের ধ্রুবতারা। যে কোন ঘটনার মধ্যে আমি পড়ি, ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে যেখানেই রহিয়া যাই, তুমি ঘটনার মোড় ফিরাইয়া তোমার মুখো করিয়া দেও। তোমার সেই স্নেহভরা আহ্বান, ঢলঢল নয়ন আমার হৃদয়ে জাগিতেছে। তোমার চরণ অনুসরণ করিয়াই আমি চলিয়াছি।...বৃদ্ধ মন্দিরে যাই বেবু সহ। সভাপতি হন ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, প্রধান অতিথি রাধাগোবিন্দ বসাক। একজন জাপানী ভিক্ষু প্রথম জাপানী ভাষায় বলেন, দোভাষী ইংরাজী করিয়া দেন। রাধাগোবিন্দ নাথ প্রবন্ধ পড়েন। রেভারেণ্ড জে, কে, বিশ্বাস বলেন। যাদবপুরের দীনেশ সেনের পুত্র শৈলেশ সেন বলে। তাহার কথায় নূতনত্ব আছে, রসও আছে। শেষটা বাড়িয়া যাওয়ায় আমি আর বলি না। অনিল ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে সেখানে বেবুর দেখা। কাল আসিতে বলা হইয়াছে। এবারেই তাঁহার প্রেসে উদ্বোধনের কাজ দেওয়া হইবে। ঘোষণাপত্র আনিতে হইবে। ২৮শে মে

রাধারাণী আমার, তুমি পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্মের ঘন-বিগ্রহ। তুমি কুরূপী, তুমি বৈষ্ণবী, কালী কাত্যায়নী। শ্রীরাধারূপে বৃষভানুপুরে দীপ্তিয়া মাতার কোল আলো করিয়া উদিত হইয়া ছিলে। জীবনে তুমি এলে সত্য, কিন্তু সার্থক করিতে পারিলাম কই তোমায় এই আসা? মাটির বেদে মাটির মেয়েতে তোমার ছবি দেখিবার জন্য পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। ওগো মৃণ্ময়ী আমার। মৃণ্ময়ীতেই চিন্ময়ী তোমার পরিপূর্ণ প্রকাশ। দেখা দেও, দেখা দেও। তোমাকে বুকে লইয়া এই অপরা প্রকৃতিকে পরা-প্রকৃতিতে গড়িয়া তুলিব। প্রবৃত্তি নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব চিরতরে মিটিয়া যাইবে। আজ হইতে টালিগঞ্জের চিঠি redirected হইয়া আসিতেছে।... লোকসেবকের সঙ্গে কাজ করা (উদ্বোধনের ছাপান) আর সম্ভব হইবে না। ...কাগজ কেরত দিয়াছে।...সন্ধ্যার সময় ধীরেন ও সুবোধ আসে, A P করে। তাহাদিগকে জোর করিয়া ৪৲ টাকা করিয়া দিয়া দেই। ইহারা যে সেবা আমার করিল, ঠাকুর তাহা গ্রহণ করুন, সেবার পুরস্কার দিন। সূর্য্য সেন, রমেন্দ্র ঘোষ, আর এক ভদ্রলোক আসেন।...

২৯শে মে

অনন্ত রূপ রসের অনন্ত ক্ষুধা জীবের। তাই জীব সর্বদেশে সর্বকালে জনম জনম ধরিয়া অবিরাম ছুটিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। শ্রীরাধা এই অনন্ত পথিকের অগ্রগামিনী, অভিসারিণী। বিশ্বের বুকভরা বেদনার মূর্ত বিগ্রহ শ্রীরাধা। তুমি আসিয়াছ। কেন আসিয়াছ, জানি না। আমার জীবনে তোমার আসা কি আমার কল্পনা মাত্র? ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনও অভিসন্ধি লইয়া তো তোমাকে ভালবাসি নাই। তোমার জন্য আমার প্রাণটা স্বতঃই নাচিয়া উঠে। তোমার কথা ভাল লাগে, তোমার নাম ভাল লাগে, তোমার বৃন্দাবন ভাল লাগে। এই ভাল লাগা কি আমার সাময়িক দুর্বলতা? আমি খুঁজিয়া দেখিয়াছি, আমার এ ভাল লাগা তো আমার জীবনের গভীরে নিহিত। তুমি সত্যরূপে এস।.. 'প্রাণের ভাষা' কিছুটা লিখি।...

৩০শে মে

ঠাকুর, যে সংসারের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া উঠিতে পারিলাম না, যেখানে মানুষ বুদ্ধির পথ ধরিয়া চলিয়াছে, অভিসন্ধি ছাড়া যেখানে মানুষ চলে না, তথা কথা কয় না, সেখানে আমি প্রাণপথের পথিক কেমন করিয়া চলিব? জলের মাছ ডাঙ্গায় তুলিলে মাছের অবস্থার মত আমি ছটফট করি। কাহারও সঙ্গে কি তেমন করিয়া মিলিতে পারি, না ব্যবহার করিতে পারি? সব যেন আমার কাছে foreign। তোমার চরণস্পর্শে সকল মানুষ ব্রহ্ম মানুষ হইবে, প্রতি পরিবার হইবে ব্রহ্ম-পরিবার, প্রতি সমাজ হইবে ব্রহ্ম-সমাজ, প্রতি রাষ্ট্র হইবে ব্রহ্ম-রাষ্ট্র—ইহাই তো ছিল আমার সারা জীবনের কল্পনা। আমার কল্পনা কল্পনাই রহিবে? বাস্তবরূপিনী হইবে না?... ৪টার পর উপরে আমার ঘরে পাঠ হয়।...

৩১শে মে

রাধারাণী আমার, বৃষভানুপুরে জনম নিয়াছ—আবির্ভূতা কালী কাত্যায়নী আমার, তুমি জীবনের সব বন্ধন—জাতি কুল শীলের বন্ধন ছিঁড়িয়া, পরিপাক করিয়া, পথের সব বাধা পদদলিত করিয়া আগাইয়া চলিয়াছ শিব-সুন্দরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য। তুমি কালী, তুমি ঊর্ধ্বাসিনী, সকল রক্ত পান করিয়া, পরিপাক করিয়াই তুমি করালবদনী, চিন্ময়ী। তোমার এলোকেশে দিগন্ত আচ্ছাদিত, কবে গোবিন্দ তোমার এই এলোমেলো কেশকে শুছাইয়া দিবেন, বেণী বাঁধিয়া দিবেন, স্নান-বসন-আভরণের উপযোগী বেশ পরাইয়া দিবেন? দিগম্বরী তুমি সেদিন হইতে নাম্বরা, সালঙ্কারভূষিতা মদনমোহিনী, রসবিলাসিনী। তখন শ্মশান পড়িয়া উঠিবে নিকুঞ্জ কাননে। শ্মশান ও নিকুঞ্জ কানন একাত্মা।...যে নিজের দেহ সম্বন্ধে উদাসীন, তাহার কাছ হইতে আমার সেবা নেওয়া বেদনাদায়ক। 'দেহ' একটা তত্ত্ব—তা নিজের দেহই হউক, আর পরের দেহই হউক। নিজের দেহ সম্বন্ধে এত উদাসীন যে তাহার কাছ হইতে আমার দেহের সেবা নেওয়া কি যায়? আমি পারি না, যে পারে পারুক।...

১লা জুন

রাধারাণী, তোমার সঙ্গে জীবনের কোন্ নিগূঢ় প্রদেশে যে একটা যোগ হইয়া পড়িয়াছে, যাহার জন্য মনে হয় সারাদিনই বুঝি আমি তোমার ধ্যান করি, তোমার পথে চলি। যেখানটায় তুমি আমার আমি তোমার, সেইখানটা লইয়াই আমি মানুষের সঙ্গে মিশিয়াছিলাম, মানুষকে ভাল বাসিয়াছিলাম, আজও ভালবাসিতে চাই। কত বড় নির্মমভাবে পরিচয় আমি দিয়াছি এদের মধ্যে থাকিয়া এদের সঙ্গে পৃথগ্‌ভূত হইয়া। উদাসিনী কাছে না থাকিলে থাকা হইত না। তাহাও তো আমি সহ্য করিতেছি। আমার থাকার কাছে সে বসে না। মানুষ অনাসক্তির কথা বলে, কিন্তু আসক্তির মধ্যে যে অনাসক্তি আমি আস্বাদন করিতেছি, তাহা ঠাকুর বুঝিতেছেন।...

২রা জুন

রাধারাণী আমার, বৃন্দাবনে যে বেদনা লইয়া জীবজগৎ অনন্তকাল ধরিয়া সর্ব রূপ সর্ব রস, সর্ব গন্ধ শব্দের মাধুর্য আস্বাদন করিবার জন্য কত না জন্ম—পশু পাখী কীট পতঙ্গ দেব অসুর মানব স্থাবর জঙ্গম—গ্রহণ করিল, সেই বেদনার মূর্ত বিগ্রহই না তুমি? তুমি সর্ব বেদনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তোমার কায়ায় বিশ্ব গড়া। কায়ার মূল তুমি, বেদ তুমি। তুমিই বেদমাতা গায়ত্রী, আমার জীবনের সব। আমার জীবনে তোমার সকল সত্তা নিয়া সদা প্রকাশিত থাকিও। আসিয়াছ যদি সার্থক কর।...অনিল ঘোষের খ্যানেজার গাড়ী নিয়া আসে ২টার পূর্বে। আমি চলিয়া যাই আলীপুর। সেখানে কাজ হইল না, লাইব্রেরীয়ান আসে নাই, রেকর্ড করিবার লোক নাই। কি অদ্ভুত অবস্থা। রেণু বেদনকার্ডগুলি করিয়া আনে।

৩রা জুন

ঠাকুর, জড়-অজড়ের মাঝে, নিত্য-অনিত্যের মাঝে, চৈতন্য-অচৈতন্যের মাঝে তুমিই সেতু, তুমিই বিধৃত। এ-দেশ হইতে ও-দেশে, ও-দেশ হইতে এ-দেশে জীব যাতায়াত করিবে, এ দেশের দ্রব্য ও দেশের বাজারে বিকাইবে, ও-দেশের পণ্য দ্রব্য এ-দেশের বাজারে মিলিবে, এ-দেশের

তাহা ও-দেশের লোকেরা বুঝিবে, ও-দেশের ভাষা এ-দেশে চলিবে। এমন করিয়া এ-দেশ ও-দেশ সর্বতোভাবে একাত্ম হইবে। এই একাত্ম হওয়ার মাঝ দিয়া 'ভবসমুদ্র' হইবে লীলারস-আস্বাদন করিবার স্থান। ওগো, তুমি আমায় জড় অজড়ের ঝগড়ায় জড়াইয়া পড়িতে দেও নাই। আমি বাঁচিয়াছি।···রেণু বাহির হইয়া হরিদাস ভট্টাচার্য মহাশয়ের ওখানে···অর্থ আনিবার জন্য যায়।··· ল্যাটিন গ্রামার-এর কথা বলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া ল্যাটিন গ্রামার আনে।···

৫ই জুন

ঠাকুর, 'নি' কি চুপ করিয়াই থাকিবেন···? 'নি'-র যে নিজস্ব দর্শন ছিল···সেই দর্শন কি আড়ালেই থাকিবে, চুপ করিয়া থাকিবে? বিশ্বের ভাব হরণ কি করিয়া হইবে? অবশ্য 'নি'-ই তাহা ভাল বোঝেন। আমি সেজন্য ভাবি কেন? মানুষ যে কোন কূল খুঁজিতে না পারিয়া—জড়ের কূল বা অজড়ের কূল খুঁজিতে না পারিয়া ঘো-টানায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। 'নি' ছাড়া কে আছেন এই মহা সঙ্কট হইতে জীবকে উদ্ধার করিতে? আমার যে কি ভাবে দিন যায়, তুমি জান। কিছুই তো তোমার সেবা আমি করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, অথচ দিন চলিয়া যাইতেছে। কোথায় তুমি? আমার পথ সাফ করিয়া দেও, আবেষ্টন অনুকূল করিয়া দেও, মন দেও, ধন দেও, বুদ্ধি দেও। সকালে অতীন চক্রবর্তী আসেন, তাঁহার সঙ্গে মাটির দেশে মুক্তির অবতরণের দর্শন আলোচিত হয়। মাটিকে কেহ চায় না। এলবার্ট হলের এক জন প্রুফ রীডার আসিয়া বলিয়া যান যে যদি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আসিবেন বলিয়া উকিল খবর দেয়, তবে গাড়ী করিয়া আমাকে নিয়া যাইবে। রেণু টেলিফোন আফিসে গিয়া যথেষ্টীয় বিষয় জানিয়া আসে। ...বীরেন ডাক্তার আসে। 'Man is essentially good' ইহার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করে। অনেক আলোচনা হয়। জড় ও অজড়ের সাযুজ্য মানিয়া না চলিলে একান্ত অজড়বাদীকে জড়বাদের খপ্পরে পড়িতেই হইবে। পেটের দায়ে নিতান্ত বিগর্হিত কার্যও করিতে হইবে। সাবধান হওয়া চাই আদর্শবাদীদের।...সব নারীচরিত্রের পর চরিত্র ছাপিবার।...রাধা তাই পরা সতী। 'শত শত সতী চিতায় পুড়িয়া ছাই হইয়াছে—সেই চিতার পূত বিভূতি হইতে রাধিকার উদ্ভব'—শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—পৃ ৩০১।

৬ই জুন

···ঠাকুর আমার, কথা কও আমার মুখ দিয়া। আমার কথা একদিন শুনিত। কিন্তু তেমন করিয়া বলিতে তো পারি নাই, যাহাতে তাহারা আজিও আমার কথা শুনিতে আসিবে। আমাকে তেমন করিয়া বলিতে দেও। আমার জিহ্বায় তোমার অধিষ্ঠান হউক। তোমার জীবন চিরিয়াই তো 'রাধা' আসিয়াছেন। তিনি আসিয়াছেন, এ কথা তো অস্বীকার করিতে পারিব না। তাঁহার আসা তো আমার কল্পনার আসা নয়। এ যে অস্বীকার করিবার যো নাই। সকল নারী চরিত্রের পর চরিত্র রাধা চরিত্র। সেই রাধারাণীকে চাহিয়াছিলাম মাটির মানুষের মধ্যে। আমি ঐ রাধা স্বরূপকে, রাধা-রূপকে মাটির দেশে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিয়াছিলাম। তাই শত আঘাতেও আমি কাহাকেও ছাড়ি নাই। আমার যে যোগ তাহাদের সঙ্গে তাহা যে রাধারাণীর জীবনের ধারা ছিল। ইহাদের চরিত্রে রাধা চরিত্রই তো চাহিয়াছিলাম। তিনি সতীরও পরা, অসতীরও পরা।... ছাদের উপর পাঠের বন্দোবস্ত করার কথা আলোচনা হয়। আমায় তোড়জোড় করিয়া আরম্ভ না করিলে এগোনো যাইবে না। রীতিমত নিমন্ত্রণ চিঠি দিয়া বিজ্ঞপ্তি পত্র বিলাইয়া আরম্ভ করিতে হইবে। ঠাকুরের দর্শন যখন অভিনব, তখন উহা চলিতে বাধ্য। আজও যে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পাঁচ বৎসর উজ্জলভাবেও চালাইয়া যাইতে পারিতেছি, ইহাই কি কম আশীর্বাদ। এমন একটা দার্শনিক বিপ্লব একজন 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' বলা যাইতে পারে। ইহার জন্য সময়ের অপেক্ষা করিতেই হইবে। দায়িত্বের একটা বিপ্লব আনা কি সহজ-সাধ্য?

৭ই জু

গোরা আপনার আপনি নাই, সে যে আপন-হারা ঝড়ের মাঝে তাহার সকল উড়িয়া গিয়াছে, দুনিয়া হইতে

বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণই তাঁহার আজ একমাত্র আপন, নিজেও নিজের কাছে পর। পাগলিনী রাধা আমার, কেন এলি? তোকে যে আমি ধরার ধূলিতে রক্ত মাংসের মানুষের মধ্যে চাই। আমার পরাণ পুতলী যে, আয়, দেখা দে, দেখা দে। যাহারা আমার বুকের মধ্য হইতে, আমার কোল হইতে সরিয়া গিয়াছে, আমি আজিও তাহাদের অপেক্ষায় আছি, চিরদিন থাকিব। একদিন চক্ষু মুদিব। কে আর অপেক্ষা করিবে তাহাদের জন্য। সংসারে কি কেহ কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতে পারে? আমার সঙ্গে সম্পর্ক যে কালাতীতের; কালাধীন হইলে কালেই তাহা মুছিয়া যাইবে। আমি যে সব কিছু জাগাইয়া রাখিতে পারি। আমি যে নিত্যের উপাসক। যাহাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হইয়াছিল, তাহাদের ছবি আমার মনের সামনে দিয়া সিনেমার ছবির মত চলিয়া যায়। সে স্মৃতি অম্লান। সুধার স্মৃতি আমার কাছে অম্লান। তাহা বুকে করিয়া চলিয়াছি। ৯টার পর জগদীশ প্রেসের অর্দ্ধেন্দুবাবু আসিয়া কাগজ লইয়া আসিপুর যান, বলিয়া যান সব ঠিক করিয়া গাড়ী পাঠাইব। ১২।টার পর গাড়ী আসে। আমি চলিয়া যাই। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে উপস্থিত হই। বেলু ১০টায় বাহির হইয়া...ফেরে ৩টার পর।...

৮ই জুন

রাধারাণী, জীবনের ধ্রুবতারা আমার, আমার জীবনের মণিকোঠায় হিয়ার পরে কোণে 'তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে।' কেহ তো তাহার খবর রাখিল না। চন্দ্রকলঙ্কিনী রাধা নিত্যগোপাল সেজেছে।... তোমার আমির তাহার কথা বলিব, চলিব। কবে দিবা মৈথুনযোগে তোমার আমার identification, unification হইবে? ওগো আমার আমি! তোমার আমার অদ্বৈত মিলনের মাঝে বিশ্ব গড়িয়া উঠুক, ধরার ধূলি হউক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম-মানুষ।...আমি বেলু ও গোপা তাহাদের বাসায় যাই।...। -র জন্য উদ্বেগ যথেষ্ট। কিন্তু উপায় কি? আমি কি প্রাণ খুলিয়া তাহাদের ঐ রূপ থাকা সমর্থন করিতে পারি? ঘাতাঘাতে আমার সঙ্কোচ আছে। ঠাকুর বুদ্ধি শুদ্ধ করুন, তাহার পথ খুলিয়া দিন...। নিজের ব্যবহারের দ্বারা সকলকে সরাইয়া দিয়া থাকা কি নিরাপদ? ঠাকুর রক্ষা করুন, কল্যাণ করুন।

৯ই জুন

ঠাকুর, তোমার শ্রীপাদপদ্মই আমার জীবনের ভিত্তি ভূমি; আমার জীবনের সকল সমস্যা সকল ঘটনা তোমার পাদস্পর্শে সমাধান লাভ করুক, পরিপাক প্রাপ্ত হউক। ওগো সর্ব সমাধান মূর্তি ঠাকুর আমার, আমার প্রতিকূল আবেষ্টন তোমার যাত্রাপথে অনুকূল হউক। তুমি এলে, চলিয়া গেলে। কেউ তোমাকে চিনিল না? বিশ্বের সকল সমস্যার সমাধানে সক্ষম এমন জীবন তো আর দেখি না, তোমার জীবন ছাড়া? তবুও তুমি অপরিচিত থাকিবে, অগোচরে থাকিবে? কেহ তোমাকে খোঁজে না? ঠাকুর, তুমি তোমার স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হও।... আমার প্রস্রাবের অবস্থাটায় একটু গোলমাল হইয়াছে।... শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ রোজ কিছু কিছু প্রতিভা পড়িয়া শুনায়। যেখানে 'শক্তি শক্তিমান এক' হইতে 'বহু'র সৃষ্টির প্রসঙ্গ উঠিয়াছে, সেখানেই একটী 'উৎপ্রেক্ষা', 'জান', 'যেন'র উল্লেখ আছে। 'মায়াবাদ' ভারতীয় দর্শনে অস্থিমজ্জাগত। জগদীশ প্রেসে আজ সর্বপ্রথম উদ্বোধন ছাপাইতে দেওয়া হয়।

১০ই জুন

ডক্টর আলবার্ট সোয়াইৎসার

॥ শ্রীনারায়ণ চৌধুরী ॥

পাক-ভারত সংঘর্ষের ডামাডোলের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ চাপা পড়ে গিয়েছে : বিগত ৪ই সেপ্টেম্বর জগদ্বিখ্যাত মানবতাবাদী মনীষী ডাক্তার আলবার্ট সোয়াইৎসার পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বৎসর, সেই দিক দিয়ে তাঁর মৃত্যুতে বিলাপ করবার কিছু নেই ; জীবনের আরব্ধ কার্য সমাধা করে পূর্ণ গৌরব ও পূর্ণ আয়ুষ্কালের মহিমায় ভূষিত হয়ে নিতান্ত পরিণত বয়সে তিনি সংসার থেকে বিদায় নিয়েছেন। মহৎ জীবনের এক উপযুক্ত মহৎ পরিসমাপ্তিই ঘটেছে। কিন্তু বিষয়টিকে যদি অন্য আর একদিক থেকে চিন্তা করা যায় তাহলে অন্তর খুবই বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।

ডঃ সোয়াইৎসারের মত মানুষ কোনো দেশে কোনো কালেই খুব বেশী জন্মান নি। এ যুগের মানুষের পক্ষে তাঁর জীবন ছিল এক পরম বিস্ময়। যে যুগে মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা আর কূটনীতির খেলা রাষ্ট্র-প্রধানদের একমাত্র চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাঁদের সেই কূটক্রিয়ার তালে তাল মিলিয়ে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ পশুশক্তি আর চাতুর্যকেই শক্তির প্রমাণ বলে জেনেছে, সেই যুগের কলুষিত আবহাওয়ার মধ্যে বাস করে ডঃ আলবার্ট সোয়াইৎসারের মত একজন প্রথম শ্রেণীর মনীষী প্রভূত মেধা মনস্বিতা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েও রাজনীতির ছায়া মাড়ান নি, শাসক-বণিক-ধনিক প্রমুখ বিভিন্ন বর্গের ক্ষমতাবানদের সংস্পর্শ এড়িয়ে নিরবচ্ছিন্ন মানবসেবাতেই তাঁর জীবন একান্ত ভাবে উৎসর্গীকৃত করেছিলেন—এ এমন একটি সংঘটন যার দোসর এ কালের সংস্কৃতি ও বুদ্ধি-জীবিতার জগতে আর একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।

ডঃ সোয়াইৎসার নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান বিশেষ ছিলেন। তাঁর তুলনায় তাঁকে ব্যতীত আর কাউকেই বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না এ কালের পরিধির ভিতর। তবু পুরাতন বা যে যুগ সদ্য বিগত হয়েছে সেই কালে তাঁর ধারার মানুষ কিছু কিছু ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর মৃত্তিকাকে ধন্য করেছিলেন, কিন্তু ইদানিন্তন কালে তাঁর ব্যক্তিত্বের অনুরূপ ব্যক্তিত্বের সন্ধান করতে গেলে সে সন্ধান ব্যর্থ হওয়ারই বেশী সম্ভাবনা। নিছক মানবসেবাকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে তাতেই নির্বিচিত্ত হয়ে জীবন-যাপন ও সমাপন করার আদর্শ আজ আর তেমন করে মানুষের মনোহরণ করে না এখন লোকে রাজনীতি-চর্চায় দল-চর্চায় সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি-চর্চায় বেশী আনন্দ পায়। ব্যক্তিগত জীবনের তন্ময়তার আদর্শ, ঈশ্বর প্রীতির আদর্শ, নীরব মানব-সেবার আদর্শ—এ সব কথার কথা হয়েই রইল। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনার প্রতিযোগিতা যত বাড়ছে, হিংসার হানাহানি যত প্রবল হয়ে উঠছে, তত ব্যক্তিজীবনের মূল্য কমে আসছে। ব্যক্তির একক ভূমিকার মহিমায় লোকের বিশ্বাস শিথিল হতে বসেছে। আণবিক মস্তত্তার ঘরফাটাই যে যুগের প্রধান কথা, সে যুগে কে আর individual man-কে সম্মান দেয়? সর্বদেশে সঙ্ঘবদ্ধ, সামূহিক, যৌথ জীবনের অত্যাচারে ব্যক্তি-জীবন গুঁড়িয়ে যাবার উপক্রম।

এই individual man বা ব্যক্তি মানুষেরই প্রতীক ছিলেন ডক্টর আলবার্ট সোয়াইৎসার। মহাত্মা গান্ধীর পরে তিনি বোধ হয় একালে ব্যক্তি মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রতীক ছিলেন। তাঁর জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ওই প্রতীকের বিলয় না হলেও স্পষ্টতঃই ঘটেছে শক্তিক্ষীণতা ঘটল তিনি ছিলেন ব্যক্তিগত মানবসেবীদের ধারার শেষ শ্রেষ্ঠ বীর নায়ক—the last of the Mohicans। তাঁর

বিয়োগে শোক আমাদের সেজন্য, নয় তো পূর্ণ আয়ুষ্কালের অন্তিমে তাঁর জীবন ঝরে যাওয়া একান্ত প্রত্যাশিত ছিল এবং সেটি কিছু শোকাবহ ঘটনাও নয়।

আশ্চর্য, অদ্ভুত মানুষ এই ডক্টর আলবার্ট সোয়াইৎসার। যত আমি তাঁর জীবনের ঘটনাবলীর কথা চিন্তা করি তত আমার মন বিস্ময়রসে পরিপ্লুতিত হয়ে যায়, আমি তাঁর জীবন-রহস্যের তল খুঁজে পাই না। এমন মানুষও এই কালে সম্ভব হয়! গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন—পৃথিবীতে যে এমন একজন মানুষ সত্যি-সত্যি রক্তমাংসের দেহধারী হয়ে বিচরণ করত ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা হয়ত সে কথা বিশ্বাস করতে চাইবে না। ডক্টর সোয়াইৎসার সম্পর্কেও অনুরূপ ভাবের প্রতিধ্বনি করা যায়। ভবিষ্যৎ যুগের মানুষ হয়তো তাঁর সম্বন্ধেও বিস্ময়াপন্ন হবে এই ভেবে যে, যে শতাব্দীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ আর মারামারি কাটাকাটিটাই ছিল সর্বত্র সভ্য রাষ্ট্রের সভ্যতার পরাকাষ্ঠা, সেই কালে এমন মানুষেরও দেহ-ধারণ করা সম্ভব। ডক্টর সোয়াইৎসারের জীবনের দিকে এক নজর চোখ বুলালেই এই বিস্ময়ের হেতু বোঝা যাবে।

ডক্টর আলবার্ট সোয়াইৎসার ১৮৭৫ সালের ১৪ই জানুয়ারি জার্মানীর আপার আলসাস অঞ্চলের কাইজার-বার্গ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক মোটামুটি বিত্তবান পরিবারের সন্তান। ধর্মচর্চার ঐতিহ্য এই পরিবারের কৌলিক লক্ষণ ছিল, সোয়াইৎসার পিতার কাছ থেকে ধর্মীয় প্রবণতা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন। তিনি ছিলেন এক গভীর ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ। খৃষ্টধর্মের সার তত্ত্বে তিনি শুধু তাঁর বিশ্বাস স্থাপন করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, নিজ জীবনেও সেই আদর্শ বর্ণে বর্ণে রূপায়িত করবার চেষ্টা করে গেছেন। যীশুর প্রতিকৃতি অনুযায়ী তিনি স্বীয় চরিত্র ও জীবনধারা গঠনে সচেষ্ট ছিলেন বরাবর। পরবর্তী জীবনে তিনি যে সেবার আদর্শ জীবনের একমাত্র কৃত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন, বিশেষ করে কুষ্ঠ রোগীদের সেবায় জীবনপণ করেছিলেন, তার মূলে আছে খৃষ্টধর্মের মানব-সেবার আদর্শের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক অনুরাগ। তিনি যীশুর প্রকৃত ভক্ত ছিলেন—মুখের কথায় নয়, কাজের ভিতর দিয়েই তার প্রমাণ রেখে গেছেন। একটানা পঁচাশি বৎসর আফ্রিকায় পাশ্চাত্যের সভ্যসমাজের বৈভব ঐশ্বর্য আর প্রচার-নিনাদ থেকে বহু দূরে লোক-লোচনের অন্তরালবর্তী লোয়েরনের হাসপাতালে দুর্গত নিপীড়িত আর্ত আফ্রিকা-বাসীদের সেবায় জীবন ক্ষয় করে তিনি গভীর ঈশ্বরবিশ্বাস আর খৃষ্টধর্মের সারাৎসারের প্রতি তাঁর নিবিড় অনুরক্তি ঘোষণা করেছেন। পাশ্চাত্যের দেশগুলি মুখে খৃষ্টধর্ম কবুল করে কিন্তু কার্যতঃ আপাদমস্তক অনুরঞ্জিত হতে জানে না। খৃষ্টধর্মের মূল কথা হল অহিংসা ও জীবে প্রেম। এই সুস্থ নীতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গিয়ে পশ্চিমের তথাকথিত খ্রীষ্টিয়ান রাষ্ট্রগুলি আজ পারস্পরিক বিদ্বেষের চর্চায় ও হিংসাচারে মত্ত। তাদের কথার সঙ্গে তাদের আচরণের মিল নেই। তাদের ধর্মবিশ্বাস অধুনা কালে কেবলমাত্র রবিবার গির্জায় যাওয়াতেই পর্যবসিত—এই প্রথাও ক্রমক্ষীয়মাণ। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের এই সর্বব্যাপী আদর্শহীনতার মধ্যে বসে ডক্টর আলবার্ট সোয়াইৎসার একটি মহৎ আদর্শকে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন তাঁর জীবনে—নিবিড় ঈশ্বরভক্তি ও জীবে প্রেমের আদর্শ। খৃষ্টের জীবন থেকেই তিনি এই আদর্শের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।

সোয়াইৎসার ছিলেন এক অত্যাশ্চর্য মেধাবী পুরুষ। অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তা তাঁর। তিন-তিনটে বিষয়ের তিনি ডক্টরেট—দর্শন, সঙ্গীত ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তিনি কাণ্টের দর্শনের উপর গবেষণা করে দর্শনে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে ছিল তাঁর অগাধ অধিকার। যৌবনকালেই তিনি খৃষ্টতত্ত্বের উপর একাধিক মৌলিক পুস্তক রচনা করে পাশ্চাত্যের সুধী মহলে আলোড়নের সৃষ্টি করেন। এই গ্রন্থগুলিতে সংবদ্ধ তাঁর চিন্তার মধ্যে মৌলিকতা যেমন আছে তেমনি বলিষ্ঠতাও যথেষ্ট আছে। তাঁর এই সব বলিষ্ঠ মতামতের জন্য তিনি একদা পশ্চিম ইউরোপের যাজক সম্প্রদায়ের সবিশেষ বিরাগ ভাজন

হন। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে তাঁর আগ্রহের কথা পূর্বেই বলেছি। ভারতীয় দর্শন তথা ধর্মশাস্ত্রেও তাঁর প্রভূত অধিকার ছিল। তিনি যে কত অভিনিবেশের সঙ্গে ভারতীয় চিন্তাধারার চর্চা করেছিলেন, উপনিষদের উপরে লিখিত তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানিতে তার প্রমাণ মিলবে।

সোয়াইৎসার একজন বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। সঙ্গীত তাঁর অবসর বিনোদনের ক্ষেত্র মাত্র ছিল না, এটি তাঁর নিরলস চর্চারও বিষয় ছিল। অর্গান যন্ত্রের তিনি একজন সুনিপুণ বাদক ছিলেন। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে অর্গান বাদ্যের পরিবেশনার দ্বারা একদা তিনি তাঁর জীবিকার সংস্থান করতেন। সঙ্গীতের ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক দুই দিকেই তাঁর সমান জ্ঞান ছিল। তিনি সঙ্গীত বিদ্যার ডক্টরেট ছিলেন সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। মনীষীর পক্ষে বা জীবনের অন্যতর ক্ষেত্রে নিযুক্ত কৃতী ব্যক্তির পক্ষে সঙ্গীতবিদ্যার ডক্টর ইউরোপখণ্ডে বিরল না হলেও ঠিক সোয়াইৎসারের পর্যায়ের সাঙ্গীতিক কৃতিত্বের উদাহরণ খুব বেশী মিলবে না। এ বিষয়ে একমাত্র সার্থক প্রতিতুলনার দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে: প্রখ্যাত সাহিত্যিক রোমাঁ রোলাঁ ও রাজনীতিজ্ঞ প্যাডেরুস্কি (পোল রাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট)। শেষোক্ত জন পিয়ানোর শিল্পকৃত ছিলেন। তবে মনে হয় সোয়াইৎসারের মৌলিকতা এ ক্ষেত্রে আরও উচ্চ স্তরের। তিনি একজন সুদক্ষ অর্গানবাদকও বটেন আবার একজন উচ্চ স্তরের সঙ্গীততাত্ত্বিকও বটেন।

এই পর্যন্ত সোয়াইৎসারের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা থেকে দেখা যায় তাঁর জীবন মূলতঃ বুদ্ধিজীবীর জীবন, শিল্পীর জীবন, গভীর প্রজ্ঞাযুক্ত মনীষীর জীবন। তিনি যদি এই কটি ভূমিকা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন ও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেগুলিতেই নিবদ্ধমনোযোগ হতেন, তা হলেও তাঁর জীবন উজ্জ্বল-গৌরবের প্রভায় দ্যুতিময় হয়েও থাকত। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে আরও উজ্জ্বলতর আরও মহত্তর ভূমিকার জন্য নির্দিষ্ট করে সংসারে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং পূর্ববর্তী সংকীর্ণ ভূমিকার গণ্ডী তাঁকে শীঘ্রই অতিক্রম করে যেতে হল। ছিলেন একজন উচ্চ পর্যায়ের মনীষী ও শিল্পী, হয়ে উঠলেন একজন শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী। মানুষের সেবায় তাঁর দীক্ষা হল। সোয়াইৎসারের নাম আর্তের বন্ধু নিপীড়িতের সেবক রূপে আধুনিক কালের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হল। তার মানে অবশ্য এ নয় যে তাঁর জীবনে পূর্ব ভূমিকার বিল্প বাত্যায় হয়েছিল,—তিনি তাঁর সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক তৎপরতা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন—; তবে তফাৎ দাঁড়ালো এই যে, গুরুত্বপূর্ণ ও মানবজাতির পক্ষে অশেষ মূল্যবান নূতন ভূমিকার যোগে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভূত সম্প্রসারণ ঘটল: তাঁর ব্যক্তিত্বের রূপান্তর ঘটল বলা চলে। তিনি একজন বিদগ্ধ সঙ্গীতশিল্পী ও মনস্বী ঠিকই রইলেন, কিন্তু নিবিড় ধর্মানুমোদিত জীব-প্রেম তাঁর চরিত্রের গোত্র বদল করে দিয়ে গেল। এই গোত্রবদল বা metamorphosis ই সোয়াইৎসারের জীবনে সব চেয়ে বড়ো সংঘটন আর তা দিয়েই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

যৌবনের প্রান্ত সীমায় সোয়াইৎসার যখন একজন শিল্পী ও মনস্বী রূপে খ্যাতির সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত, তখন তিনি হঠাৎ একদিন উপলব্ধি করলেন প্রভূত খ্যাতি ও সাফল্য সত্ত্বেও তাঁর জীবনের শূন্যতা। তাঁর মনে হল এতাবৎ তিনি যে পথ অনুসরণ করেছেন সে পথে সিদ্ধি এলেও অস্তিত্বের সার্থকতা সে পথে নয়। জীবনকে পরম সার্থকতার চেতনার স্তরে তুলতে হলে তাঁকে মানবসেবার পথ গ্রহণ করতে হবে, সব ছাপিয়ে হয়ে উঠতে হবে একজন প্রেমিক। এই উপলব্ধি তাঁর অন্তরে সুদৃঢ় হতে যেমন ভাবা তেমনি কাজ। মানবসেবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার জন্যে আয়োজন শুরু হয়ে গেল। তিনি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষায় মন দিলেন। ভাবতে অবাক্ লাগে প্রায় প্রৌঢ়ত্বের সীমায় যখন পৌঁছে গেছেন তখন সোয়াইৎসার একজন নূতন ছাত্রের মত মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন এবং যথারীতি চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ নিতে লাগলেন। ৩৭ বৎসরের মাথায় তিনি মেডিসিনে সর্বোচ্চ উপাধি (এম. ডি.) লাভ করে মেডিকেল কলেজ থেকে বেরিয়ে এলেন। শুরু হল তাঁর জীবনের নূতন অধ্যায়।

তিনি শুনেছিলেন আফ্রিকা মহাদেশের সুদূর অভ্যন্তর ভাগে ল্যাম্বেরন অঞ্চলের কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের মধ্যে কুষ্ঠ রোগের অতিশয় প্রকোপ। খৃষ্টভাবে ভাবিত ভাষার দানিয়েলের মত একজন মিশনারী ডাক্তার রূপে তিনি ছুটলেন আফ্রিকার তাদের সেবার ব্রত নিয়ে। সঙ্গে গেলেন তাঁর বিদুষী স্ত্রী ও কন্যা। তাঁরাও তাঁরই আদর্শে দীক্ষিত ছিলেন। সোয়াইৎসার ল্যাম্বেরনে আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত এক বৃহৎ হাসপাতাল গড়ে তুললেন তত্রস্থ দুর্গত অধিবাসীদের সেবার মানসে। তিনি নিলেন ডাক্তারের ভূমিকা, তাঁর স্ত্রী হলেন তাঁর সহকারিণী নার্স। যে সময়ের কথা বলছি সেটা ১৯১৩ সাল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালীন মুহূর্ত।

সোয়াইৎসার একজন দক্ষ চিকিৎসক ও দরদী মানব-সেবক হিসাবে অত্যল্প কালের মধ্যে ল্যাম্বেরন ও তার চতুষ্পার্শ্বস্থিত অঞ্চলের অধিবাসীদের চিত্ত জয় করে নিলেন। দূর দূর এলাকা থেকে পর্যন্ত তাঁর হাসপাতালে চিকিৎসার্থ রুগী আসত: তিনি সকল শ্রেষ্ঠীর আর্তের সেবায় কায়মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। কিন্তু ইউরোপের চিরাভ্যস্ত সমাজ স্বজন বন্ধু-বান্ধব বিস্মৃত-জগৎ পড়ে রইল দূরে, খ্যাতি প্রশংসা ও প্রচারমহিমার ছোঁয়া দূর মরীচিকার মত মিলিয়ে গেল দিগন্ত বিস্তারী অস্পষ্টতার মধ্যে: নিভৃতচারী নীরব সেবার দৌলতে দেখতে না দেখতে তিনি ল্যাম্বেরনের কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠলেন।

কিন্তু এ রকম অবস্থা বেশীদিন রইল না। ইতোমধ্যে বেঁধে গেল যুদ্ধ: এক পক্ষে ইংরেজ, ফরাসী ও অন্যান্য মিত্র শক্তি, অন্য পক্ষে জার্মানী ও তুরস্ক। ফরাসী বিমান-বাহিনীর বিমান আক্রমণে ল্যাম্বেরনের হাসপাতাল বিধ্বস্ত হল: জার্মান নাগরিক বিধায় সোয়াইৎসার মিত্র-শক্তির বন্দী হলেন। তাঁকে ইউরোপে অন্তরীণ করা হল।

যুদ্ধ চলাকালীন সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর চলল এই অবস্থা। যুদ্ধ সমাপ্তিতে সোয়াইৎসারের অন্তরীণ দশার অবসান ঘটল। এই পাঁচ বৎসরে বহুতর পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। তাঁর সাধের হাসপাতালটি বোমার আঘাতে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, হাসপাতালের তাবৎ সরঞ্জামাদি লণ্ড-বিলণ্ড; দীর্ঘকালীন বন্দিদশার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য বিনষ্ট ও তাঁর সহযোগীদের মনোবল ভগ্ন। কিন্তু এতেও সোয়াইৎসার দমলেন না। তিনি নতুন করে আবার ল্যাম্বেরনে হাসপাতাল গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। হাসপাতাল গড়তে প্রচুর টাকা চাই, নতুন করে এত টাকা তিনি কোথায় পান? যুদ্ধে তাঁর সমস্ত সম্বলই যে নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সাধু যাঁর অভিপ্রায় ঈশ্বর তাঁর সহায়। সোয়াইৎসার সঙ্গীত শিল্পী রূপে পুনরায় সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করলেন: দীর্ঘ পাঁচ বছরের ধূলিমলিন অর্গানের তালা খুলে তার চাবিতে হাত রাখলেন। ইউরোপের বড়ো বড়ো শহরগুলিতে অর্গানের পরিবেশনার দ্বারা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতে লাগলেন তিনি। সেই টাকার জোরে উঠল ল্যাম্বেরনের নতুন হাসপাতাল, সোয়াইৎসার স্ত্রী-কন্যা সমভিব্যাহারে পুনরায় সেখানে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তার পর থেকে একটানা ল্যাম্বেরনেই ছিলেন —কোনো প্রলোভনেই এই মহাপ্রাণ শ্বেতাঙ্গ তাঁর কৃষ্ণাঙ্গ সুহৃদ্‌দের ত্যাগ করেন নি। আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের প্রতি ইউরোপ আমেরিকার খ্রীস্টীয়ান শ্বেতাঙ্গ সমাজের কৃত নানাবিধ অত্যাচার ও অবিচারের এই ভাবে জীবন-ভোর প্রায়শ্চিত্ত করেছেন এই খৃষ্টভক্ত শ্বেতাঙ্গ মনীষী। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর তাঁর ল্যাম্বেরনে কেটেছে আর এখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ইতোমধ্যে ডক্টর সোয়াইৎসারের জীবনে বহুতর সম্মান-সংবর্ধনা এসেছে ও গেছে। সম্মান তিনি নিজে থেকে যাচ্ঞা করেন নি, সম্মানই তাঁকে খুঁজে নিয়েছে। ১৯৩৪ সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯৫০ সালে শান্তির জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এই সময় থেকে আরও একাধিক আন্তর্জাতিক পুরস্কার এই প্রতিভাবান পুরুষটির উপর বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু সম্মান-সংবর্ধনার ছদ্মবেশে ইউরোপ-আমেরিকা যতই কেন-না তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকুক, তিনি তাঁর আফ্রিকাস্থিত লোক-লোচনের অন্তরালবর্তী কর্মস্থল ত্যাগ করেন নি বা স্বীয় বুদ্ধিজাত

হন নি। দীর্ঘকালীন সেবা ও প্রেমের প্রসাদে তিনি মধ্য আফ্রিকার একটি বৃহৎ অঞ্চলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। কালক্রমে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন।

সেই মহৎ প্রতিষ্ঠানটিরই সম্প্রতি তিরোধান ঘটল। পৃথিবীর দৃশ্যপট থেকে একটি অত্যুজ্জ্বল আলো বিলীন হয়ে গেল। এমনতরো আর একটি আলোর দেখা দীর্ঘ-কালের মধ্যেও মিলবে কি না বলা দুষ্কর।

অমৃতের আশ্বাসে

॥ অধ্যাপক শ্রীগোপেশ চন্দ্র দত্ত ॥

'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলে' ডাক দিল ঋষি একজন,
অতীতের কোন্ লগ্নে, সে যে চির আতিথ্যময় বাণী ;
সেই ডাক যুগে যুগে ক'রে তোলে হৃদয় সন্ধানী,
ধরণীর মানবেরে ; তিমির-কারার উচ্চারণ

সেদিন সমাপ্ত হ'লো, নতুন আলোর বিচ্ছুরণ
ছড়ালো দিগন্ত দেশে, মানুষ শান্তির হ'লো ধ্যানী !
আত্মার গহনে দিল দৃষ্টি তার, জীবনের গ্লানি
চলে' গেল বহু দূরে, অস্তিত্বের আনন্দ-চয়ন

প্রতিটি দিনেরে তার ক'রে দিল অপূর্ব উজ্জ্বল ;
অনেক ক্লান্তিতে দিল প্রেরণার সূর্য্যমুখী মন।
সেই দিনটির কথা মনে ক'রে যন্ত্রণা-বিহ্বল
এ প্রাণ আমারও জাগে, ঘুম ভাঙা পুষ্পের মতন

আলোক-প্রত্যাশী হয়ে। রাত্রির সমুদ্র থেকে তার
প্রভাতের ব্যঞ্জনাকে টেনে এনে বলে বার বার,
'হে ধাত্রারি, বন্ধু, প্রিয়, আমি আজ পেলাম আশ্বাস ;
মুছে যাক বুক থেকে জীবনের ক্লান্ত ইতিহাস।'

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

॥ শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

মহাসংহিতার অন্তর্নিহিত উপনিষদ্ ব্যাখ্যায় ফলে বিরাটের দিকেই উপাসকের ঝোঁক পড়ে, ব্যক্তিগত জীবনের অংশ কর্তব্যগুলি বাদ পড়িয়া যায়। তাই এই 'Error of omission'-এর বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই কল্পনাময়ী শ্রুতি এই অনুবাকে তাহার উপরই জোর দিতেছেন—Spiritual life is at the same time a self life and a cosmic life। আধ্যাত্ম জীবন—যুগপৎ ব্যষ্টিজীবন ও বিশ্ব-জীবনের সমন্বয়] অতঃ চ [সাধু শাস্ত্র গুরুসম্মত কর্মবিধির জ্ঞান] স্বাধ্যায়প্রবচনে চ [এবং স্বাধ্যায়—বেদাধ্যয়ন, প্রবচন—অধ্যাপনা]। সত্যং চ [কায়মনোবাক্যের যথার্থ আচরণ] স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। তপঃ চ [কৃচ্ছ্রাদি] স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমঃ [বাহ্য ইন্দ্রিয়ের উপশম] স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। শমঃ [অন্তঃকরণের উপশম] স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। অগ্নয়ঃ চ [গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি নাম অগ্নিসমূহ আধান করিবে] স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রং চ [অগ্নিহোত্র হবণ করিবে] স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। অতিথয়ঃ চ [অতিথি সৎকার করিবে] স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। মানুষং চ [মানুষের সেবা করিবে] স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ [সন্তানোৎপাদন করিবে] স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজনঃ চ [ধর্মবিরুদ্ধ কামসেবা করিবে] স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাতিঃ চ [উৎকৃষ্ট বংশ রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিবে অর্থাৎ পুত্রকে নিবেদিত করিবে] স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। সত্যম্ ইতি [সত্যই অনুষ্ঠেয়] রথীতরঃ [রথীতর-গোত্রীয়] সত্যবচাঃ [সত্যবচানামক ঋষির মতে] তপঃ ইতি [তপস্যাই অনুষ্ঠেয়] পৌরুশিষ্টিঃ [পুরুশিষ্টি তনয়] তপোনিত্যঃ [তপোনিত্য নামক ঋষি মনে করেন]। স্বাধ্যায় প্রবচনে চ এব ইতি [স্বাধ্যায় প্রবচনই কেবল অনুষ্ঠেয়] মৌদ্গল্যঃ [মুদ্গল পুত্র] নাকঃ [নাক নামক ঋষি মনে করেন] (কেননা) তৎ হি [উহাই] তপঃ [মুখ্য তপস্যা]। তৎ হি তপঃ [উহাই তপস্যা]

সাধুশাস্ত্রগুরুপ্রদর্শিত কর্মবিধি জানিবে এবং বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। সত্য বলিবে এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিবে। বাহেন্দ্রিয় সংযত রাখিবে এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিবে। অন্তরেন্দ্রিয় সংযত রাখিবে এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিবে। অগ্নিসমূহ আধান করিবে এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিবে। অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিবে এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিবে। অতিথিসৎকার করিবে এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিবে। মানুষের সেবা করিবে এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিবে। সন্তানোৎপাদন করিবে এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিবে। ধর্মবিরুদ্ধ কামসেবা করিবে এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিবে। প্রজাতি রক্ষা যাহাতে হয় তাহা করিবে এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিবে। রথীতরগোত্রীয় সত্যবচার মতে সত্যই অনুষ্ঠেয়, পুরুশিষ্টি পুত্র তপোনিত্য বলেন তপস্যাই কর্তব্য। মুদ্গলতনয় নাকের মতে, কেবল স্বাধ্যায় প্রবচনই কর্তব্য। কেন না তাহাই মুখ্য তপস্যা, উহাই তপস্যা। ১।৯

দশম অনুবাক

অহং বৃক্ষস্য রেরিবা। কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। ঊর্ধ্ব পবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি। দ্রবিণং সবর্চসম্। সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ। ইতি ত্রিশঙোর্বেদানুবচনম্। ১।১০

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমোঽনুবাকঃ।

উপাসনায় নিরত উপাস্ত উপাসক একীভূত হন্; তখন স্বারাজ্যপ্রাপ্ত উপাসক উপাস্ত পরমপুরুষের সুরে 'সমপ্রাণঃ সখা' হইয়া তাঁহারই সুরে বলিতে থাকেন] অহম্ [আমি] বৃক্ষস্য [এই সংসার বৃক্ষের] রেরিবা [অন্তর্যামীরূপে প্রেরয়িতা] কীর্তিঃ [আমার কীর্তি] পৃষ্ঠং ইব [পৃষ্ঠের ন্যায় সমুন্নত ও শক্ত] গিরেঃ [পর্ব্বতের] (আমি) ঊর্দ্ধ-পবিত্রঃ [ঊর্দ্ধ অর্থাৎ মূল যাহার পবিত্র ঐ পুরুষোত্তম ব্রহ্মবস্তু] বাজিনি [অন্নাধার সূর্য্যে] সু-অমৃতম্ ইব [যেমন উত্তম রসামৃত রহিয়াছে] অস্মি [আমিও সেইরূপ পূর্ণ রসামৃত তত্ত্ব] (আমি) দ্রবিণং [ধন] সবর্চসম্ [দীপ্তিমৎ, অর্থাৎ ব্রহ্মধন প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই বলিয়া দিয়াছি] সুমেধা [আমি উত্তম মেধাসম্পন্ন] অমৃতোক্ষিতঃ [অমৃত আনন্দ রসদ্বারা উক্ষিত সিক্ত] ইতি [এই প্রকার] ত্রিশঙোঃ [ত্রিশঙ্কুর] বেদানুবচনম্ [বেদ অর্থাৎ পরমপুরুষতত্ত্ব জানিবার অনুকূলে, বচনম্ উক্তি]

আমি সংসার-বৃক্ষের প্রেরয়িতা। আমার খ্যাতি গিরির পৃষ্ঠের মত। আমি ঊর্দ্ধপবিত্র। সূর্য্যে যেরূপ উত্তম অমৃত, আমিও তদ্রূপ। আমি দীপ্তিমৎ ধন। আমি সুমেধা। আমি অমৃতধারা সিক্ত। ত্রিশঙ্কুঋষির ইহাই বেদানুবচন।

একাদশ অনুবাক

বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি—সত্যং বদ। ধর্ম্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ ॥ ১।১১।১

বেদম্ [বেদ] অনূচ্য [অধ্যাপনা করাইয়া] আচার্য্যঃ [আচার্য্য] অন্তেবাসিনম্ [শিষ্যকে] অনুশাস্তি [অনুশাসন দিতেছেন, যে গুলি অবশ্যকরণীয় থাকিলে ব্রহ্মবিদ্যা দাঁড়াইতে পারিবেনা, যে গুলি ব্রহ্মবিদ্যার ভিত্তিস্বরূপ] সত্যং [কল্যাণকর যথাবগত বিষয়] বদ [বলিও] ধর্ম্মং [যাহার দায়িত্ব তোমার উপর রহিয়াছে তেমন কর্ত্তব্য কর্ম্ম] চর [আচরণ করিও] স্বাধ্যায়াৎ [বেদাধ্যয়ন বিষয়ে] মা প্রমদঃ [প্রমাদ করিও না] আচার্য্যায় [আচার্য্যসেবার জন্য] প্রিয়ং [অভীষ্টং] ধনম্ [ধন] আহৃত্য [দক্ষিণাস্বরূপ আহরণ করিয়া] প্রজাতন্তুং [সন্তানদ্বারা] মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ [ব্যবচ্ছেদ করিও না, অব্যাহত রাখিও] সত্যাৎ [সত্যনিষ্ঠা হইতে] ন প্রমদিতব্যম্ [প্রমত্ততার বসে ভ্রষ্ট হইও না] ধর্ম্মাৎ [ধর্ম্ম হইতে] ন প্রমদিতব্যম্। কুশলাৎ [কুশল কর্ম্ম, কুশল চিন্তা প্রভৃতি যাহা বিশ্বের সমস্ত বস্তুর সহিত ব্যবহারের কৌশল শিক্ষা দিতে পারে] ন প্রমদিতব্যম্ [প্রমাদী হইও না] ভূত্যৈ [বিভূতি বিস্তারক কল্যাণকর কর্ম্ম হইতে] ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাম্ [স্বাধ্যায় অধ্যাপনা বিষয়ে] ন প্রমদিতব্যম্।

বেদ অধ্যাপনান্তে আচার্য্য শিষ্যকে অনুশাসন দিতেছেন —সত্য বলিবে, ধর্ম্ম আচরণ করিবে, অধ্যয়নে প্রমাদ করিবেনা। আচার্য্যের জন্য অভীষ্ট ধন আহরণ করিয়া সন্তান দ্বারা অব্যাহত রাখিবে। সত্যভ্রষ্ট হইও না। ধর্ম্মচ্যুত হইও না। কুশল হইতে প্রমত্ততা বশত দূরে সরিয়া যাইও না। বৈভব লাভার্থ কল্যাণ-কর্ম্মে প্রমাদী হইও না। স্বাধ্যায়-প্রবচন বিষয়ে শ্রান্ত হইও না। ১।১১।১

দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি ॥ ১।১১।২

দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং [দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য হইতে] ন প্রমদিতব্যম্ [শ্রান্ত হইও না] মাতৃদেবঃ [মাতা যাহার দেবতা সেইরূপ] ভব [হও] পিতৃদেবঃ [পিতা যাহার দেবতা সেইরূপ] ভব [হও] আচার্য্যদেবঃ [আচার্য্য যাহার দেবতা সেইরূপ] ভব [হও] অতিথিদেবঃ ভব [অতিথি যাহার দেবতা সেইরূপ হও] যানি [যে সব] অনবদ্যানি [অনিন্দিত] কর্ম্মাণি [কর্ম্মসমূহ] তানি [সেই সকল] সেবিতব্যানি [করিবে] নো ইতরাণি [অন্য কর্ম্মগুলি নহে] যানি [যেগুলি] অস্মাকম্ [আমাদের] সুচরিতানি [শাস্ত্রসম্মত আচরণ] তানি [সেইসব] ত্বয়া [তোমাদ্বারা] উপাস্যানি [গৌরব দান করিয়া তাহার

অনুষ্ঠান করিবে; মহাপুরুষগণ লোকহিতার্থে এমন অনেক 'সাহস'-পূর্ণ কর্ম করেন, যাহা লৌকিক দৃষ্টিতে শোভন নহে, যেমন নীলকণ্ঠ বিষপান করিয়া ছিলেন; সেগুলি আচরণ করিবে না। যে সব আচরণ লোক-সমাজ-শাস্ত্রসম্মত, তাহাই শুধু আচরণ করিবে। ব্রহ্মের সমগ্রতাকে জীবনে উপলব্ধি করিতে হইলে সাধকের জীবনকে সমগ্র ভাবেই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। তাহার জীবনের উপর বিশ্বের যাহার যাহা দাবী সকল দাবী পূর্ণ করিয়া তবে সমগ্রের উপাসনায় যোগ দিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে এই সমগ্র জীবনের একটী অপূর্ব্ব চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—যে আমার কাছে যে ভাবে প্রপন্ন হয় আমিও সেইভাবে তাহার কাছে প্রপন্ন হই। আমার উপর যে যে দাবী যাহাদের রহিয়াছে, সব দাবিই আমি পূর্ণ করিয়াই চলিয়াছি।

দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে প্রমাদ হইও না। মাতৃদেব হও। পিতৃদেব হও। আচার্য্যদেব হও। অতিথিদেব হও। অনবদ্য যে সব কর্ম, তাহা সেবা কর। অন্য সকল নহে। আমাদের যে সব সুচরিত, তোমরা তাহার উপাসনা কর। ১।১১।২

নো ইতরাণি। যে কে চাস্মাচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ তেষাং ত্বাসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্ ভিয়া দেয়ম্ সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ। ১১।৩

নো ইতরাণি [অপর আচরণ সকল অনুষ্ঠেয় নহে] যে কে চ ব্রাহ্মণাঃ [যে সকল ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ] অস্মৎ-শ্রেয়াংসঃ [আমাদিগের চেয়ে শ্রেষ্ঠ] তেষাম্ [তাহাদের] আসনেন [আসন প্রদান পূর্ব্বক] প্রশ্বসিতব্যম [শ্রম অপনোদন করিবে] শ্রদ্ধয়া [শ্রদ্ধা সহকারে] দেয়ম্ [দান করিবে] অশ্রদ্ধয়া [অশ্রদ্ধায়] অদেয়ম্ [দেওয়া উচিত নয়] শ্রিয়া দেয়ম্ [ঐশ্বর্য্যোচিত দিবে] হ্রিয়া [সলজ্জ ভাবে, বিনয় পূর্ব্বক] দেয়ম্ [দেওয়া উচিত] ভিয়া দেয়ম্ [ভয়ে ভয়ে দিতে হইবে, যেন দেওয়ায় কিছুর দিয়া গর্ব্ব ফুটিয়া না উঠে এবং যাহাকে দেওয়া হইতেছে তাহার আত্মসম্মানে কোনও আঘাত না পৌঁছে] সংবিদা [তাদাত্ম্যভাবে] দেয়ম্। (মহাপুরুষের সেবা ব্যতীত পরম পুরুষের উপাসনা অসম্ভব: তাঁহাদের জীবনেই পুরুষোত্তমের সর্ব্বপ্রধান বিকাশ। মহৎ কৃপায় শ্রীভগবৎ কৃপা মিলে।) অথ [আর] যদি [যদি] তে [তোমার] কর্মবিচিকিৎসা বা [কর্ম সম্বন্ধে সংশয়] বৃত্তবিচিকিৎসা বা [আচরণ সম্বন্ধে সংশয়] স্যাৎ [উপস্থিত হয়]।

অপরগুলি অনুষ্ঠানযোগ্য নহে, যে সকল ব্রহ্মবিৎ আমাদিগ হইতে শ্রেষ্ঠতর, তাঁহাদিগকে আসন দ্বারা শ্রম অপনোদন কর। শ্রদ্ধা সহকারে দিবে, অশ্রদ্ধায় দিবে না, সামর্থ্যানুসারে দিবে, সলজ্জ ভাবে দিবে। ভয়ে ভয়ে দিবে। তাদাত্ম্যভাবে দিবে। আর যদি কর্ম সম্বন্ধে সংশয় অথবা বৃত্তসম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয় তবে—

যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আয়ুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্। তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেষু যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আয়ুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু বর্ত্তেরন্। তথা তেষু বর্ত্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্ এবমু চৈতদুপাস্যম্ ॥ ১।১১।৪

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে একাদশোঽনুবাকঃ।

যে [যাহারা] তত্র [সেই দেশে বা কালে] ব্রাহ্মণাঃ [ব্রহ্মবিৎ পুরুষ] সম্মর্শিনঃ [সম্যক্ বিচার পটু] যুক্তাঃ [নিত্য নৈমিত্তিক কর্মপরায়ণ] আয়ুক্তাঃ [ধর্ম্মে ও আচরণে স্বতঃ প্রবৃত্ত] অলূক্ষাঃ [অরুক্ষ, স্নিগ্ধ মধুর] ধর্মকামাঃ [ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাম যাহাদের] স্যুঃ [থাকেন] যথা [যে কৌশলে] তে [তাহারা] তত্র [সেই সব কর্ম বা আচরণে] বর্ত্তেরন্ [নিরত থাকেন] তথা [সেই কৌশলে] তত্র [উক্ত কর্ম এবং আচরণে] বর্ত্তেথাঃ [রত থাকিবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও ইহাই বলিতেছেন—"মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশ] অথ [আর] অভ্যাখ্যাতেষু [কাহারও আচরণ সম্বন্ধে কেহ অভিযোগ বা সংশয় উপস্থিত করিলে] যে [যাহারা] তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ

মুক্তা আমুক্তাঃ অমুক্তাঃ সর্বকামাঃ স্যুঃ যথা [যেমন] তে [তাহারা] তেষু [উক্ত কর্ম বা আচরণ সম্বন্ধে] বর্তেরন্ [আচরণ করিবেন] তথা তেষু বর্তেথাঃ। এষঃ [ইহাই] আদেশঃ [বিধি] এষঃ [ইহাই] উপদেশঃ [উপদেশ] এতৎ [ইহাই] অনুশাসনম্ [বেদের অনুশাসন, ঈশ্বরের অনুশাসন] এবম্ [এই প্রকারে] উপাসিতব্যম্ [উপাসনা বুদ্ধিতে সব করিবে] এতৎ উ ৬ [এই প্রকারেই] উপাস্যম্ [উপাসনা বুদ্ধিতে করণীয়]

দ্বাদশ অনুবাক

শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শন্নো ভবত্বর্যমা। শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বাদিষ্যামি। ঋতং বাদিষ্যামি। সত্যং বাদিষ্যামি। তন্মামবীৎ তদবক্তারমবীৎ। অবীন্মাম্। অবীদ্বক্তারম্ ॥১।১২

ওঁম শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বাদশোঽনুবাকঃ।

ভাষ্য ও অনুবাদের জন্য প্রথম অনুবাক দ্রষ্টব্য। তফাৎ শুধু এই যে, এই স্থানে ক্রিয়াগুলিকে অতীত কালে প্রযুক্ত হইয়াছে। বাদিষম্ [বলিয়াছি], অবীৎ [রক্ষা করিয়াছেন]।

দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দ বল্ল্যধ্যায়

প্রথম অনুবাক।

ওঁ শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শন্নোভবত্বর্যমা শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবীৎ তদবক্তারমবীৎ। অবীন্মাম্। অবীদ্বক্তারম্ ॥১

ভাষ্য ও অনুবাদ শীক্ষাবল্লীর প্রথম অনুবাদে দ্রষ্টব্য। অতীত বিদ্যার আদান-প্রদানে কোনও ত্রুটী বিচ্যুতি হইলে তাহার উপশমার্থে অধ্যায়ের শেষে এই শান্তি পঠিত হইয়াছে এবং আগামী বিদ্যার বিঘ্ন উপশমের জন্য পুনরায় পঠিত হইল। আশীর্বাদ কামনাই এই 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া' ব্রহ্ম বিদ্যার পথে একমাত্র সম্বল।

সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ॥২

ভাষ্য—অনুবাদ কঠোপনিষদের শান্তি পাঠে দ্রষ্টব্য।

ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাঽভ্যুক্তা—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্।
সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ। তস্যেদমেব শিরঃ। অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ। অয়মাত্মা। ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥২।১।৩

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে প্রথমোঽনুবাকঃ

ব্রহ্মবিৎ [ব্রহ্মকে, সর্ব্ব বৃহত্তমকে যিনি জানেন] আপ্নোতি [প্রাপ্ত হন] পরম্ [পর পুরুষকে, সব কিছুকে পূর্ণ করিয়া, সব কিছুকে স্বয়ং মর্য্যাদা দিয়া, নিজ স্বাধর্ম্যে গৌরব দান করিয়া, সব কিছুকে ছিনাইয়া যিনি আছেন, তিনি পরকীয়, পর] তৎ [সেই সম্বন্ধে এষা [এই ঋক মন্ত্র] অভ্যুক্তা [কথিত হইয়াছে] সত্যা [ব্যবহারিক সত্য (dynamic truth) ও পারমার্থিক সত্যের (static truth) সমন্বয় রূপ পর সত্য ; জগতের তথাকথিত মিথ্যাত্বকে সত্যত্বে গড়িয়া তুলিয়া নিজ নিজ ক্রমশ

সাময়িকী

ভারত-পাকিস্তান ঃ ভারত-পাকিস্তান-এর সম্পর্ক কোনদিনই মধুর ছিল না—শেষ পর্যন্ত তাহা অস্ত্র সংঘাতের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গত ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে ভারতবর্ষ 'আর নয়' বলিয়া নূতন পথে পা বাড়াইয়াছে।

ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব লইয়া আলোচনা করিতে পাকিস্তান জন্ম বৃত্তান্ত মনে রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। বেদ উপনিষদের দিন হইতে ভারতবর্ষ বিশ্ব মানবকে আপন বলিয়া মনে করিতে পারে বটে কিন্তু সৌরাণিক যুগ হইতেই বলা হইত অধিকতর সঠিক হইবে যে, ভারতবর্ষের এই মানবিকতা-বোধের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমাজ-জীবনে ছিল ভেদ ও অসাম্যের লজ্জাকর শক্ত প্রাচীর যাহা সমাজ-জীবনকে সুস্থ রাখিতে পারে নাই। এই ভেদ ও অসাম্য সমাজে উঁচু-নীচু, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য, হিন্দু অহিন্দুর যে ফাটল সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল তাহাতে ভারতবর্ষের বহু বহু মহা-প্রতিভার সমস্ত অবদানকে দলিত মথিত করিয়া সামাজিক অসাম্যকে জিয়াইয়া রাখিয়া সমাজকে ক্রমে নীচ হইতে নীচে টানিয়াছে। মুসলমান যে শুধু রাষ্ট্র-শক্তিকেই থাকিতে পারিল না, সে যে তথাকথিত হিন্দু সমাজের ভাজন ধরাইয়া রাখের পাশে রহিবের স্থান বাড়াইয়া লইল, ইহা সম্ভব হইয়াছিল শুধু সেই ভেদের ফাটল ছিল বলিয়া। বুদ্ধদেব নানক কবীর মহাপ্রভু চৈতন্যদেব অসাধারণ জীবনের অসাধারণ প্রেমস্পর্শও সে ফাটলকে ঢেকাইতে পারে নাই। নিম্ন শ্রেণীর অস্পৃশ্য অন্ত্যজ বলিয়া কথিত অথচ সমাজের ভিত্তি স্বরূপ এই বিশাল দলটিই যে মুসলমান সমাজে পরিণত হইয়া পড়িল সেই পর যুগে—এবং তাহাই যে 'যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে'-র অকাট্য নীতিতে আমাদের অজ্ঞানেই একদিন পাকিস্তানের জন্ম দিবে সে কথা বুদ্ধি-প্রদীপ্ত সেদিনের বর্ণাশ্রমীয় হিন্দু সমাজপতিগণ ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

তাহার পর এমনই করিয়া ঘরের ছেলে যখন পর হইল স্বভাবতঃই সে অধিকতর বিদ্বেষকে অন্তরে পুষিয়া রাখিল, আরও বিশেষতঃ যখন সে দেখিয়াছে তথাকথিত হিন্দুরা তাহাকে কতখানি অবজ্ঞার চোখে দেখিয়াছে, কতখানি দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে যদিও ইহারই সাথে সাথে ছিল এই বিরুদ্ধতাকে পরিশাক করিবার জন্য অবতীর্ণ মহাপুরুষদের একটা প্রাণ-পূর্ণ প্রচেষ্টা।

কিন্তু সমাজ-কাঠামোর অন্তরালের দার্শনিক চিন্তা-ধারার পরিবর্তন না করিয়া কেবল মিলিবার কথায় মিলন সম্ভব হয় নাই কেননা এই ভেদের একটা শক্ত যুক্তিগত সমর্থন ছিল। যখন ধরা হইল সাত্ত্বিকতাই শ্রেষ্ঠ গুণ এবং উহাই কুলীন, রজোগুণ তাহা অপেক্ষা কম কুলীন, এবং তমোগুণের তদপেক্ষা নীচে স্থান এবং যখন সাত্ত্বিক রাজস তামস কর্মের একটা শক্ত তালিকা প্রস্তুত হইয়া গেল, তখন ঐ ঐ কর্মকারী মানুষের স্থান ও মর্যাদাও চিরদিনের জন্য সেই অনুযায়ী স্থিরীকৃত হইয়া গেল—যেন কাল শাস্ত্রের কোন অপেক্ষা এ সত্য রাখিল না। সত্যের এই অনমনীয়তার কাছে নূতন চিন্তা, নূতন জীবন-চেতনা কোনটাই স্থান পাইল না।

তাই হিন্দু হিন্দু হইয়া গর্বিত হইয়া রহিল, বিতাড়িত হিন্দু, নিপীড়িত হিন্দু ইসলামের তথাকথিত গণতন্ত্রের মধ্যে নিজ মর্যাদা খুঁজিয়া লইল।

এ যেন পটভূমিকায় প্রবেশ করিল কূটনৈতিক প্রবর ইংরেজ। সে তাহার divide and rule-এর অমোঘ অস্ত্র আমাদেরই উপর শান দিয়া লইতে পারিল কেন? আমরা তাহার ভেদ নীতির ক্রীড়নক হইতে পরিলাম কেন? কেননা আমাদের মধ্যে ভেদের ফাটল ছিলই

আর সেই ফাটলেই ইংরেজ তাহার divide and rule-এর জেদ নীতি শাস দিয়া পাকিস্তান তৈরী করিয়া দিয়া গেল। পাকিস্তান না হওয়া সব দিক দিয়া ভাল ছিল, কিন্তু ঠেকান গেল না—মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্বও ব্যর্থ হইল।

পাকিস্তান হইল—বিদ্বেষই পাকিস্তানের ভিত্তি। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ বলিতেন, বিদ্বেষ পুঁজি করিয়া একটা দল বা সম্প্রদায় টিঁকিতে পারে, কিন্তু কোন রাষ্ট্র টিঁকিতে পারে না। একটি রাষ্ট্র তাহার সকল নাগরিককে সমান দৃষ্টিতে দেখিবে না ইহা হইতে পারে না—বিদ্বেষ বুকে টিঁকিয়া থাকিতে হইলে এ বিদ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়া রাষ্ট্রের সকলকে সম দৃষ্টিতে বিচার করিতে হইবে। কিন্তু পাকিস্তান তো নিজের শক্তিতে টিঁকিয়া নাই—বিশ্বের বড় বড় রাষ্ট্রগুলির সাহায্য সমর্থন ও সহানুভূতিতে পাকিস্তান টিঁকিয়া আছে। পাকিস্তানকে যতটুকু বাঁচাইয়া রাখিলে যাহার যতটুকু সুবিধা হয়, সে ততটুকু পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সমাগ্র হইয়া আছে। এ বিষয়ে নিজের বা নিজের দলের স্বার্থ ছাড়া আর কোন ন্যায় নীতি বা কিছুই কাহারো নাই। এই যেখানে অবস্থা সেখানে ভারতবর্ষ কি করিবে? বিশ্বের যাহার অশ্বের ঘোড়ায় এবং যাহাকে জিয়াইয়া রাখা বিশ্বের ছোট বড় প্রতিটি রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপুষ্টি—যেখানে কোন ন্যায় নীতি নাই—সেই আবেষ্টনে দাঁড়াইয়া ভারতবর্ষ কি করিবে তাহা নির্দ্ধারণ করা একেবারে সহজ ব্যাপার নয়, তাহারও পরে বিশেষতঃ যখন ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে লোভ, স্বার্থ, দুর্নীতির প্রাধান্য এত বেশী।

যুদ্ধ—সশস্ত্রই হউক আর কালি কলমের আঁচড়েই হউক—কাহারো কোন দিক দিয়াই কল্যাণকর নয়—একথা ভারতবর্ষ আপাতঃ কোন অবস্থাতেই ভুলিয়া যাইবে না। আমাদের দুর্বলতার ছিদ্র দিয়া যাহার জন্ম সেই পাকিস্তানকে বিশ্বের দুরভিসন্ধি যখন বাঁচাইয়া রাখিবেই তখনও অর্থাৎ এই এত বড় বাস্তবকে স্বীকার করিয়া লইয়াও যুদ্ধ এড়ান যায় কি প্রকারে তাহাও বাহির করিতে হইবে। ভারতবর্ষ দীর্ঘ ১৮ বৎসর যে পথে চলিয়াছে, সে পথ সুফলপ্রসূ হয় নাই—পাকিস্তানের বিদ্বেষকে প্রেমে পরিণত করিতে পারা দূরস্থান, তাহার সঙ্গে মিতালী পাতাইয়া বিশ্বের দুরভিসন্ধি ভারতের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ভারত তাহার সকলীল ও সহাবস্থান নীতির প্রতি দীর্ঘ আঠার বৎসরের অবিচল আস্থাদ্বারা যেটুকু অর্জন করিয়াছে তাহা হইল এই যে, বাহিরে স্বীকার করুক বা না করুক বিশ্বের প্রতিটি জাতি অন্তরের অন্তরে জানে যে, ভারতবর্ষ কাহারও ন্যায়সঙ্গত অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না, কাহারও স্বাধীনতা হরণ করিয়া লয় না—ইহা তাহার স্বভাবে নাই। কিন্তু এই স্বভাব যদি দুর্বলতা বা ক্লীবত্বের নামান্তর হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহাও সমান অপরাধেই বিধাতার নিকট ভারতকে অপরাধী করিবে, ইহাও যেন ভারতবর্ষ ভুলিয়া না যায়।

আজ যে পথ লইতে ভারতবর্ষ বাধ্য হইয়াছে, তাহা দ্বারা সে এইটুকুই প্রমাণ করুক যে সে ক্লীব নয়, পরের হাতে মার খাইয়া তাহার আদর্শ হইতে সে চ্যুত হইবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে কি করিয়া যুদ্ধ বন্ধ হয় অথচ পাকিস্তান ও স্বার্থান্বেষী রাষ্ট্রগুলি তাহাদের দুরভিসন্ধি কি করিয়া চালাইতে না পারে। কোথায় দুই রাষ্ট্রের মিল হইতে পারে এমন কতকগুলি সাধারণ ক্ষেত্র আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। পাকিস্তান মনে করিয়া থাকিতে পারে এ পর্যন্ত যে পথে সে এতদূর আসিয়াছে, সেই পথেই হয়তো সে শেষ পর্যন্ত লাভবান হইবে—কিন্তু তাহা হইবে না হয়তো আজ ক্রমে সে তাহা বুঝিবে—তখনই মিলনের সাধারণ সূত্রও আবিষ্কৃত হইতে পারে। ভারতবর্ষ যেন সে যে ভীরু নয়, কাপুরুষ নয়, দুর্বলের অহিংসা তাহার নয় এ কথা বুঝাইবার ক্ষমতা রাখার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করিবার ও মিলনের সূত্র আবিষ্কার করিবার জন্য উৎসুক থাকে।

কিন্তু ইহা তো হইল সাময়িক যাহা করিতে হইবে তাহা—কিন্তু সুদূরবর্তী কালের জন্য যে আর একটি কাজ এখনই আরম্ভ করিতে হইবে তাহা হইল এই যে, যে দার্শনিক চিন্তাধারাদ্বারা হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে এই জেনবাদের চিন্তাধারা ঢুকিয়া সমাজ-শরীর হইতে অগণিত মানুষকে বিদায় করিয়া দিয়াছে, সেই চিন্তাধারা দার্শনিক

জানে বদ্ধপরিকর হইয়া যজ্ঞের ক্ষেত্রেই, সমাজের ক্ষেত্রের গোড়া পত্তন করিতে হইবে—অন্যথা বিগত পাপের প্রায়শ্চিত্তও হইবে না, নূতনতর সমস্যাকে, নূতনতর আবেষ্টনকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিশ্বের বুকে নূতন সমাধানও আনা যাইবে না। যাহারা অস্ত্রবলে বলী তাহারা সেটা ব্যক্তিগত, দলীয় বা নিজ জাতীয় স্বার্থে ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু যেহেতু স্বার্থান্ধতা বা শক্তিমত্ত পৃথিবী হইতে কোন দিনই লোপ পাইবে না সেইজন্য ঐ স্বার্থ বা শক্তির হাতে যাহাতে আমাকে বিড়ম্বিত হইতে না হয়, যাহাতে তাহার পশুশক্তির কাছে আমার সমস্ত বিশ্বহিতৈষণা পরাজিত না হয় তাহার ব্যবস্থা রাখিয়া সেই অস্ত্রবলকে কেবল সেই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করিতে হইবে। বিশ্বের সমস্যা এই যে, অস্ত্রবল কি উদ্দেশ্যে কতখানি ব্যবহৃত হইবে তাহাই সে জানে নাই। সেই উদ্দেশ্য ও মাত্রা ঠিক রাখার দৃষ্টান্ত স্থাপন করাই ভারতের কাজ। পশুশক্তিকে অস্ত্রাঘাত করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে—কিন্তু কি মনোবৃত্তি লইয়া কতখানি অস্ত্র ব্যবহার করা হইবে? পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অস্ত্রাঘাত করিবার আগে এই মনোবৃত্তি প্রদান করিবার জন্যই গীতা কহিয়াছিলেন—ব্যক্তিগত দলীয় বা জাতীয় স্বার্থ অপরকে অস্ত্রাঘাত করিবার মত বড় কারণ হইতে পারে না—লোভ স্বার্থ বা শক্তির দম্ভকে পরাভূত করিতেই মাত্র অস্ত্রধারণ বা অস্ত্রাঘাত সম্ভব। অথচ তাহার পশ্চাতে থাকিবে মিলনের উদ্দেশ্য—বিশ্বসঙ্ঘ স্থাপনা দ্বারা দেশ-নিরপেক্ষ প্রতি মানুষের জন্য বিশ্বনাগরিক হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি করিয়া তোলা। এ উদ্দেশ্য ভুলিয়া গেলে, মিলনের উদ্দেশ্যে আত্মরক্ষার জন্য পশুশক্তির দম্ভকে শুধু প্রতিহত করিবার জন্য অস্ত্রধারণ না করিলে সে অস্ত্রধারণ ব্যর্থ হইবে—তাহাতে বিশ্ব-শান্তি আসিবে না। অস্ত্রের শক্তিদম্ভদ্বারা যেমন বিশ্ব-শান্তি আসিবে না তেমনি ক্লীবত্বের কীরুতাদ্বারাও নয় এ কথা মনে রাখিয়া মিলনের উদ্দেশ্য না ভুলিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইয়া যাইতে হইবে। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান এইখানে—পশুশক্তির দম্ভকে প্রতিহত কর—সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিশ্বশান্তি রচনা করিবার শুভ উদ্দেশ্যে। পুরুষোত্তমের দেশ ভারতবর্ষ তাহার আদর্শ হইতে চ্যুত না হয়, পুরুষোত্তমের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

পাকিস্তান ভারতের আত্মসাক্ষাৎকার লাভের সহায়কই হইবে—ইহাই ভারত-ভাগ্য-বিধাতার বিধান। আমাদের যেন তাহা বুঝিবার শক্তি হয়। ভারতের লাঞ্ছনা কেন হইতেছে, কোথায় তাহার ত্রুটি এ সকলের মূল ধরিতে না পারিলে সমস্যার সমাধান নাই। পাকিস্তান যে তাহার চিন্তাধারার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা হইতে সৃষ্টি এবং সেই দুর্বলতা ছিল বলিয়াই যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ সে রন্ধ্রপথে ঢুকিয়া ভেদবাদের কুফলকে মহীরুহে পরিণত করিতে পারিল ইহা বুঝিতে হইবে—সেই ভেদবাদকে একদিকে গোড়ায় দার্শনিকভাবে উৎখাত করিতে হইবে আর একদিকে বিশ্বসঙ্ঘ রচনাদ্বারা দেশ-নিরপেক্ষ প্রতি মানুষের বিশ্বনাগরিকতা বোধের আত্মসাক্ষাৎকার লাভের উদ্দেশ্য লইয়া মিলনের জন্য পশুশক্তির দম্ভকে প্রতিহত করিবার ব্রতে অগ্রসর হইতে হইবে। পুরুষোত্তম আমাদের সহায়। বন্দেমাতরম্।

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

উদ্বোধন

কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৮৮৭ শকাব্দ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ ১৮শ বর্ষ, ১০ম-১১শ সংখ্যা

"ভারতীয় দর্শন-প্রস্থান বনাম পুরুষোত্তম-জীবনবেদ"

॥ সাহিত্যবিনোদ শ্রীচুনীলাল মিত্র এম-এ, ॥

(৮ই-তম জন্মতিথিতে পঠিত)

সমবেত সুধি! আজ আমরা এখানে যে মহাপুরুষের জন্মমহালগ্নে মিলিত তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা জানাই। আমরা যেন অন্তরে তাঁহার বাস্তব-সাক্ষাৎ উপস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। আমাদের সকলের উপর তাঁর করুণা ও আশীর্বাদ বর্ষিত হউক। যারা এখানে আজ এই শুভক্ষণে মিলিত হয়েছেন, তাঁদের স্বাগত জানাই।

সমস্যা-জর্জরিত বাংলা তথা ভারত তথা বিশ্বের প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া, বাস্তা-বিক্ষুব্ধ জন সমাজে, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পৃথিবীর পটভূমিকায় শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন বিভ্রান্ত ও বিপথগামী মনুষ্য-সমাজের সম্মুখে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের জীবন-দর্শন ও আদর্শের স্থান ও মূল্য কোথায় ও কতটুকু আসুন আমরা সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তাঁর জন্মমহোৎসব সার্থক করে তুলি।

পূর্ব্বাহ্নে এবং প্রারম্ভেই বলিয়া রাখি যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দর্শন প্রস্থানের যে পার্থক্য, স্বামীজির চিন্তাধারা এ দুইয়েরও ভিন্ন। ও দেশে দর্শন অর্থ জ্ঞানের বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ। যেমন Kant-এর মতে "Philosophy is the criticism of cognition", কিন্তু ভারতীয় দর্শনে চর্চা চর্য্যা এক। তত্ত্ব ও জীবন ভিন্ন নয়। স্বামীজীও তত্ত্ব ও জীবনকে এক করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁর কাছে জীবন ও দর্শন অভিন্ন। তবে ভারতীয় দর্শনে যেমন পূর্ব্বপক্ষ, খণ্ডন ও সিদ্ধান্ত—বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা—প্রতিপক্ষের মতবাদ প্রকাশ, বিরুদ্ধ বক্তব্য খণ্ডন ও নিজমত প্রকাশ ও প্রচার—স্বামীজী এই বিধিই যথাযথাভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি অযথা বাহ্যিকতা ও গড্ডালিকা প্রবাহ স্বীকার করেন নাই। পক্ষান্তরে, দর্শনকে তিনি ব্যাপক ও সর্ব্বতোমুখী বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন তাঁর দৃষ্টিতে—"Philosophy is to feel at home everywhere in nature". অধ্যাত্ম জীবনকে তিনি যুগপৎ একত্ব ব্যক্তিগত ও বিশ্বজনীন বলে স্বীকার করেন। "Spiritual life is at the same time a self life and a cosmic life".

ভারতীয় দার্শনিকদের কয়েকটি বিষয়ে মূলগত ঐক্য আছে। তাঁরা জগৎকে নাটমঞ্চ মনে করেন। তাঁদের সর্ব্বজন স্বীকৃত বক্তব্য এই যে, জগৎ জীবন ও জীব সম্বন্ধে অজ্ঞানতাই বন্ধনের কারণ এবং সত্যজ্ঞান লাভ বন্ধনমুক্তির কারণ। এই মুক্তিকেই তাঁরা পুরুষার্থ ও পরমার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মনে করেন মানুষই নাটমঞ্চ রচয়িতা। মানুষ ভগবানের হস্তপুত্তলি নয়। ব্যক্তি পরিবার ও রাষ্ট্রের নির্মাতা ও রচয়িতা এই মানুষ। সমাজ পুনর্গঠনের ভার মানুষেরই। তাঁর জীবনে বন্ধনমুক্তি সত্যজ্ঞানলাভের ফল বটে, কিন্তু বন্ধনকে স্বীকার করিয়াই তিনি বন্ধনের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। জরা ব্যাধি মৃত্যু দুঃখ যন্ত্রণা ও মৃত্যুকে তিনি আমাদের অঙ্গীভূত বলিয়াছেন। ঋষি শ্রীঅরবিন্দের বাণীকে তিনি আরও খানিকটা আগাইয়া দিয়াছেন। তাঁরও একান্ত বিশ্বাস ছিল: Suffering is not the only fact of life, nor is death the last word of existence. Suffering is a

temporary privation, death a temporary inertia. They arise out of our wrongly identifying life with the phases of life. The cure lies not in forsaking them, but getting ourselves more and more identified with them"। একই কারণে স্বামীজি দুঃখ প্রসারী দৃষ্টিতে জীবন-মরণ, যৌবন বার্ধক্য, ইহকাল পরকাল সমান অর্থেই দেখিয়াছেন। উহারা তুলা সত্য। নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই। একান্ত শান্তি অবাস্তব, অবোধ্য; রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :—

এই যে একান্ত করে চাওয়া এও সত্য যত,
এই একান্ত ছেড়ে যাওয়া সেও সেই মত।
এ দু'য়ের মাঝে তবু কোনখানে আছে কোন মিল,
নহিলে নিখিল,
এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা,
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।
সব তার আলো,
কাঁটে-কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো।

ভারতীয় বিভিন্ন দর্শনপ্রস্থানের মধ্যে চার্বাকদর্শন নিতান্ত আংশিক, একদেশদর্শী ও পক্ষপাতদুষ্ট। ইহার মতে জড়জগৎই সত্য। চতুর্ভূতই সত্য। আত্মা নশ্বর। ঈশ্বরের অস্তিত্ব অযৌক্তিক। পরকাল নাই। অতীত বিগত, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, এমতাবস্থায় বর্তমান জীবনেই যত সম্ভব অকুণ্ঠ চিত্তে ভোগ করাই কর্তব্য। ইহা পাশ্চাত্ত্যের Hedonism-এর সঙ্গে অভিন্ন। 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' চার্বাক জীবনাদর্শ।

চব্বিশ তীর্থঙ্কর প্রবর্তিত জৈন দর্শন অপেক্ষাকৃত উচ্চতর। প্রাণী, উদ্ভিদ, এমন কি ধূলিকণারও যে আত্মা আছে ইহা জৈন মত ও বিশ্বাস। ইহা যুগান্তকারী নিঃসন্দেহ। মুক্তি অর্থ সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক চরিত্র। তবে ইহাদের সমগ্র চিন্তাধারা তীর্থঙ্করদের শিক্ষা ও উপদেশের উপর ভিত্তিস্থাপিত। আর যে দিক দিয়া ইহা বাস্তবাবাদী (Realistic), বহু তত্ত্ববাদী (Pluralistic) ও নিরীশ্বরবাদী (atheistic), সেই অংশে ইহা সঙ্কীর্ণ।

পুরুষোত্তম জীবন দর্শন একাধারে বাস্তবাবাদী ও আদর্শবাদী—at once realistic and idealistic। সেই দিক দিয়া একাধিক ভাবে ইহার বৌদ্ধদর্শনের সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া মাধ্যমিক (শূন্যবাদী) ও বৈভাষিক (বাহ্য প্রত্যক্ষবাদী) দর্শন ছাড়া বৌদ্ধদর্শনের যোগাচার ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের সহিত পুরুষোত্তম-দর্শনের মিল রহিয়াছে। কারণ প্রথমটী বিজ্ঞানবাদী ও শেষোক্তটি সর্বাস্তিবাদী। তিনি চেতনা ও বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার না করিয়া বস্তু মাত্রেই চৈতন্যময় বলিতেন। আত্মমুক্তিকে যেমন মহাজ্ঞানী বৌদ্ধগণ স্বার্থদুষ্ট মনে করেন, স্বামীজিরও মত উহাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে
সে কখনো পেয়েনি বাঁচিতে।"

বস্তু মাত্রেই সত্তাধীন ও পরিবর্তনশীল। বৌদ্ধদর্শন যেমন জীবনের ধারাবাহিকতা স্বীকার করেন কিন্তু নিত্যতা স্বীকার করেন না, স্বামীজির মতে জীবন নিত্য, ক্ষণ নিত্য, মুহূর্ত অনন্ত। ব্যক্তির জীবনকে তাই তিনি বার বার বিশ্বের জীবনের মধ্যে পাবার, অনন্তেতে বিলীন করে আস্বাদন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে অংশকে পূর্ণ বলিয়া ঘোষণা করেছেন। তাঁর অনুকরণীয় ভাষায় আমাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব জীবনের হর-কে লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতকে উন্নীত ও পরিণত হতে বলেছেন। তবেই অংশ এক হইবে, অণু অনন্ত হইবে, ব্যক্তি পূর্ণ হইবে, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র বিশ্বজনীন হইবে। দ্বেষ হলাহল, হিংসা এমন কি আন্তর্জাতিক সংঘর্ষও বহুলাংশে কমে যাবে।

প্রচলিত ও চিরাচরিত চিন্তাধারায় আমরা বার্ধক্যকে স্বীকার করেছি, যৌবন ও কৈশোরকে অস্বীকার করেছি, পরকালই যথাসর্বস্ব বলে মেনেছি, ইহকালকে তুচ্ছ ভেবেছি, সন্ন্যাসই মুখ্য, সংসার গৌণ ও হেয় ভেবেছি। ফলে জীবনে আমাদের ব্যর্থতা এসেছে, সমাজ পঙ্গু হয়েছে, রাষ্ট্রদেহে ক্ষত দেখা দিয়েছে। স্বামীজির দৃষ্টিতে সংসার ও

সন্ন্যাস তুলা সত্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য তুলা মূল্যবান, ইহকাল পরকালে কোনও বৈষম্য নেই, পথ ও গন্তব্যস্থল, যৌবন ও বার্দ্ধক্য উভয় গ্রাহ্য। তাঁকে বার বার উদ্ধৃত করতে শুনেছি—

"পথের বাঁশী পাথে পাথে তারে যে আজ করেছে চঞ্চল।
আনন্দে তাই এক হলো তার পৌঁছানো আর চলা।"

মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় তিনি সিদ্ধি ও সাধনা, End ও Means-কে সমার্থক ভেবেছেন। "They say means are afterall means. I would say means are afterall everything. As the means so the end. Violent means will give us violent Swaraj." (Mahatmajee)

ন্যায়-বৈশেষিকের ঋষিদ্বয় (গৌতম ও কণাদ) আত্মা শরীর, প্রবৃত্তি, পুনর্জন্ম ও অপবর্গ প্রভৃতি দ্বাদশটি বিষয়ের জ্ঞানকেই যথেষ্ট বলিয়াছেন। বাৎস্যায়ন বলেন— এই কয়টি বিষয়ের জ্ঞানই মুক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ। কিন্তু জ্ঞান অপার ও তাহার বিষয়ও অনন্ত। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে Heraclietus (502 B.c.) সত্যই বলেছেন "We cannot dip twice in the same river"। স্বামীজিও ফরাসী দার্শনিক বার্গসোঁ (Henri Louis Bergson 1859-1941) সঙ্গে একযোগে স্বীকার করেন যে সত্য গতিশীল। It is ever fleeting, ever transitory, eternaly moving. তাঁরা সত্য, জ্ঞান ও জীবনকে সমার্থকই বলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ন্যায়-বৈশেষিক দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই মোক্ষ বলিয়াছেন। তাঁরা দুঃখকেই প্রাধান্য দিয়াছেন পক্ষান্তরে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে তাঁদের চারিটি যুক্তির অন্যতম নৈতিক যুক্তি বলিয়াছেন। সেখানে অদৃষ্টের জন্যই জীবের দুঃখভোগ ও সুখভোগ বলিয়াছেন। স্বামীজির যুক্তিতে মানুষই আপন অদৃষ্টের স্রষ্টা। অদৃষ্ট অজ্ঞানতারই নামান্তর। তারই সঙ্গে তিনি ভগবৎ-করুণাকেও অস্বীকার করেন নাই। কর্ম্ম ও করুণা উভয়ই মানুষের অদৃষ্টের নিয়ামক। (মদীয় আচার্য্য) সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তাঁর গ্রন্থে বলিয়াছেন "Man is continuously shaping his own self"···"Pleasure and pain may govern the animal nature of man but not his humau"। সেই কারণেই স্বামীজি বৈশেষিকের চতুর্বিংশতি বস্তুকে একান্ত বলে মেনে নেননি।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সাংখ্যের পুরুষতত্ত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন। সাংখ্য দর্শনের পুরুষ স্থিত, নিত্য, কূটস্থ ও নির্বিকার। ইনি অসঙ্গ অপরিণামী। পুরুষ প্রাকৃতিক বিকারের অতীত ও উহার প্রতি উদাসীন। প্রকৃতি জড়, অথচ অব্যক্ত, নির্বিশেষ ও নিরবয়ব। উভয়ের সংযোগে জগতের অভিব্যক্তি। আর দুঃখের নিবৃত্তিতেই মোক্ষ। এই অসঙ্গত অসম্ভব বিচার ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্বামীজি আজীবন অভিযান করিয়াছেন।

সাংখ্যের ঋষি কপিল-মুনি উক্ত

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধি র্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যে যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥

শ্লোকের অপব্যবহারে আমরা জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে স্বীকার করিয়াছি, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য যশঃ ও শ্রীকে গ্রহণ করি নাই। ফলে প্রজ্ঞাবাদকে প্রশ্রয় দিয়াছি। এবম্বিধ জ্ঞান ও বৈরাগ্যে বিকার আসে, ক্লীবতা আসে। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সকল ক্ষেত্রে যোগ্য হওয়াকেই যোগ বলিয়াছেন। কর্মকুশলতাই যোগ। "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।" তিনি "বুদ্ধি র্যোগে ত্বিমাং শৃণু"তে অর্জুনকে বিতর্ক বিকল্প ও বিভিন্ন মতবাদগুলির সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যই ঘোষণা করিয়াছেন।

আবার "ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা" ছন্দে সাংখ্য ভাষ্যকারেরা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ ও ব্যবধানকেই স্বীকার করিয়াছেন। ইহাদের একাধিক অর্থকে অনুভব করেন নাই। ইহাদের মিলন ও ঐক্যকে কল্পনা করিতে পারেন নাই। কিন্তু বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের অধুনাতম সিদ্ধান্তে subject ও object (কর্ত্তা ও কর্ম্ম) মধ্যে একান্ত ব্যবধান স্বামীজি কদাপি কল্পনাও করেন নাই। কারণ objectও যে subject, passiveও যে আংশিক active, জড় চেতনের একান্ত বিভেদ কল্পনা

* An Idealist View of Life. S. Radhakrishnan. pb.275

একটা ব্যভিচার। স্বামীজি বার বার Einstein ও Whitehead প্রমুখ বিজ্ঞানীদের উদ্ধৃত করেছেন। "Matter is concentrated mind." Cunningham-এর ভাষায় "There is nothing as matter and mind, but matter-mind continuum"। কিন্তু সাংখ্যের ঋষি এ দু'য়ের অসঙ্গত অবাস্তব ও অস্বাভাবিক মিল করেছেন জড়শক্তিসম্পন্ন পঙ্গুর সহিত চলনশক্তি সম্পন্ন অন্ধের মিলনকে! নিষ্ক্রিয় চেতন ও সক্রিয় প্রকৃতির মিলনেই জগতের অভিব্যক্তি প্রকৃতির জন্য পুরুষের বন্ধন সাংখ্যের স্বীকার্য। ইহা এক প্রচণ্ড libel।

সাংখ্যের পরিণামবাদে প্রকৃতিকে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অন্যতম তত্ত্ব হিসাবেই মানিয়াছেন। আর পুরুষের মুক্তি এই তত্ত্ব জ্ঞান লাভেই। আর তত্ত্বজ্ঞান অর্থই—প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ জ্ঞান। কিন্তু স্বামীজি বলিলেন—Life is from within out. Spencer-এর ভাষায় "Life is a continual adjustment of inner to the outer"।

পতঞ্জলিও মানসিক চাঞ্চল্যের নিবৃত্তিই ও চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই যোগ বলিয়াছেন। এখানেও যোগ অর্থ বিয়োগই দাঁড়াইয়াছে। চিত্ত বিকার রুদ্ধ ও আত্মসমাহিত অবস্থাই তিনি যোগের লক্ষণ বলিয়াছেন। সেখানে প্রত্যাহার ও প্রতিনিবৃত্তি, ধ্যান ও সমাধি, আসন ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহই যোগের উপায়, জ্ঞানের পথ ও মুক্তির মার্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। চিত্ত চাঞ্চল্য নাকি বিকার, ব্যাধি। যোগেশ্বর কৃষ্ণ ইহাকে মনের ধর্ম বলিয়াছেন। আর পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ সমগ্র মানুষ একাধারে অন্নময়, প্রাণময়, জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় বলিয়া অভিহিত ও স্বীকার করিয়াছেন।

মীমাংসা দর্শন নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম ও কাম্যকর্ম সম্পাদনার উপরই জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে বলিয়াছেন। মোক্ষই পরম পুরুষার্থ। আর জগৎ যে দুঃখপূর্ণ এই বোধের মাধ্যমে জগতের প্রতি বিতৃষ্ণা হইতেই আত্মজ্ঞান সম্ভব ইহাই মীমাংসা দর্শনের সিদ্ধান্ত। বেদ-বিহিত নিষ্কাম কর্মই মোক্ষ লাভের উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা বৈদিক কর্মকাণ্ড ভিত্তিক এবং অত্যধিক বেদ-নির্ভর হেতু ঈশ্বরের স্বীকৃতি ও প্রচারের অবকাশ হয় নাই।

কিন্তু বিতৃষ্ণার দ্বারা দিয়া আত্মজ্ঞান সম্ভব নয়। বিতৃষ্ণার-ও বস্তুর প্রতি প্রচ্ছন্ন আসক্তি বর্তমান থাকে।

মূলতঃ বেদের জ্ঞানকাণ্ডই বেদান্ত। ইহার দিগ্বিজয়ী ভাষ্যকার শ্রীশঙ্কর। শ্রীরামানুজ, মধ্ব, বল্লভ ও নিম্বার্কও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়—ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ। মায়া অনির্বচনীয় শক্তি। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত. নিত্য অনিত্য বস্তুর বেদান্তের জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। ইন্দ্রিয় সংযম, বিরাগ ও অনাসক্তিই এখানে মুক্তি লাভের উপায় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। এখানেও নানা বা বহুকে স্বীকার করা হয় নাই। সর্বং খল্বু ইদং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। এখানেই অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের সৃষ্টি। ইহাই আমাদের সর্বস্তরে সকল জীবনে ব্যর্থতা আনিয়াছে।

স্বামীজির মত এক সত্য, বহুও সত্য, ব্রহ্ম ও জগৎ তুল্য সত্য। সত্য নিত্য ও অনিত্য, নিত্যানিত্যেরও ঊর্ধ্বে। সত্য স্বাস্থ, সত্য চঞ্চল। মানুষ প্রতিনিয়ত সত্যকে সৃষ্টি করিবে, জগৎকে পুনর্জন্ম দান করিবে। জগৎ একান্ত বস্তুতান্ত্রিক নয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়। স্থিতি সত্য, গতি মুক্তি ততোধিক সত্য। সংযম সত্য, চাঞ্চল্যও সত্য। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের নিকট মায়া অর্থ যোগমায়া। জগৎ ও ব্রহ্ম কোনটাই মিথ্যার নয়, একান্ত নয়। Bradelyর ভাষায় "Appearance is reality. So much appearing is so much being." স্বামীজির ভাষায় পূর্ণও পূর্ণ, অংশও পূর্ণ। ক্ষুদ্রকে বৃহতের আসন দেওয়া, ক্ষুদ্রকে মহতের মর্যাদা দেওয়া, নীচকে উচ্চে উন্নীত করা, খণ্ডকে অনন্তের পর্যায়ে মূল্যায়ন করা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে ও স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের জীবন-বেদেই সম্ভব। মহাত্মা গান্ধী-দর্শনের বলিষ্ঠ বাহক ও বাহক, একান্ত ভক্ত, সেবক ও অনুধ্যানী অবধূত মহারাজ প্রতি মানুষকে বিশ্বরূপ চেতনার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রতিটি পল্লীকে স্বয়ংপূর্ণ প্রজাতন্ত্রে গড়িবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমরা আজ তাঁর পুণ্য জন্ম-দিনে তাঁর কথন ও উপদেশ শিরোধার্য করি, তাঁর দর্শন ও জীবনকে রূপায়ন করবার সংকল্প বাক্য গ্রহণ করি।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

ওঁ নমো ব্রহ্মমূর্তয়ে ব্রহ্ম ভগবতে নিত্যগোপালায় জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয় তুরীয়াতীতায় ব্রহ্মপরমাত্মভগবৎ-পুরুষোত্তমায় নিত্যগোপালায়।

ওঁ আজানুলম্বিতভুজ কনকাবদাতম্ সঙ্কীর্তনৈক-পিতরৌ কমলায়তাক্ষম্। বিশ্বস্তপ্রেমঘন নরনারায়ণপ্রেসিং বন্দে সমন্বয়গুরুম্ পুরুষোত্তমানন্দম্।

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৬৩তম জন্মতিথি ক্ষণে আজ আমরা সমবেত হইয়াছি। তাঁহাকে আমাদের সম্মিলিত প্রণাম নিবেদন করি। আশ্রমের পক্ষ হইতে আপনাদের সকলকে আমার সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করি। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ ১৯৫৬ সনে এই গ্রামে আসিয়া আশ্রম করিয়াছিলেন, মাত্র দুই বৎসর এখানে থাকিয়া তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র দেহ ঐ মন্দিরের নীচে রক্ষিত আছে। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ব্যক্তি-মানুষ ছিলেন না—সমাজের কাছে, জগতের কাছে, বিশ্বের কাছে তাঁহার বলার কিছু আছে। সেই জন্যই তিনি এই আশ্রম করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কিছু অবদান আছে বলিয়াই তাঁহার জন্ম শতবর্ষে সে কথা আলোচনা করিবার অবকাশ হইয়াছে। শ্রীমৎ স্বামিজীর জীবন-দেবতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে চিন্তাধারা লাভ করিয়াছিলেন, সমস্যা-বিধ্বস্ত বিশ্বের সে চিন্তাধারাকে প্রয়োজন আছে। সেই চিন্তাধারাটি রক্ষা করিবার জন্য, উহাকে ঘন করিয়া বাস্তবে রূপ দান করিবার জন্য তিনি বেদান্ত, এগারখানা প্রধান উপনিষদ ও গীতার ভাষ্য রচনা করিয়া এইখানে আশ্রম করিয়া বিশ্বের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দকে বুঝিতে হইলে শ্রীনিত্যগোপালকে বুঝিতে হয়। শ্রীনিত্যগোপাল জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন একশত এগার বৎসর আগে। আড়াই বৎসর বয়সেই তাঁহার নির্বিকল্প সমাধি হইয়াছিল এবং তাঁহার প্রায় অর্ধ শতাব্দীর স্বল্প পরিসর জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই সমাধিতে কাটিত। তিনি খানিকটা আড়ালে থাকিয়াই একটা যুগ-চিন্তা তাঁহার কতকগুলি অনবদ্য পুস্তকে ধরিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। অবশ্য সে চিন্তাধারার দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনের মধ্যে বহু ঘটনায় ওতপ্রোত হইয়া ছিল। সেই চিন্তাধারাটিকে রূপ দিবার ও প্রচার করিবার ভার দিয়াছিলেন তিনি শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের উপর। এই চিন্তাধারা যেমন পুরুষোত্তমানন্দের জীবনের নিয়ামক ছিল—তেমনি বর্তমান যুগেরও পথের সন্ধান দিবে এই চিন্তাধারাই ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না যে ভারতবর্ষের প্রাচীন কালে বিধি ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া যাইয়া বর্তমানে একটা মহা অব্যবস্থা চলিতেছে। এই অব্যবস্থাটা কোন্ ছন্দে কোন্ পথে একটা অনেকটা শৃঙ্খলাপূর্ণ সামঞ্জস্যময় ব্যবস্থায় গড়িয়া উঠিবার পথ পায়, সেই পথের কথাই শ্রীনিত্যগোপালের জীবন রচনাধারা অনুসরণ করিয়া শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ রাখিয়া গিয়াছেন। দেহবান মানুষের প্রয়োজন দেহের ক্ষেত্রে সুস্থ ও আনন্দিত থাকা, দেহটাই সম্ভব হইয়া আরও যে একটা কিছু যারা যাহাকে এক কথায় দেহাতিরিক্ত আত্মা শব্দে অভিহিত করা হইয়া থাকে সেই আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা এবং ও দুইটির সম্পর্কটা নির্ণয় করা। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস অনুসরণ করিলে দেখা যায় ভারতবর্ষ এই আত্মাকে জানিবার বুঝিবার জন্য তাহার প্রচেষ্টাকে এমন ঐকান্তিক করিয়া তুলিয়াছিল যে সেটা জীবনের সৌন্দর্যকে আস্বাদনকে বাড়ান দূরস্থান, জীবনকে উহা পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছিল। অপর দিকে পরবর্তী কালে উদ্ভূত হইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা দেহটাকেই আবার ঐকান্তিক করি

তুলিয়া তাহাকেই নানারকম করিয়া সাজাইবার চেষ্টা করিতে গিয়াও সফলকাম হয় নাই বলা যায়। সে পথে সে মানুষকে শান্তি ও আনন্দ দিতে পারে নাই, সকলে মিলিয়া মিশিয়া বাস করিবার বুদ্ধিও দিতে পারে নাই। দেহ ও আত্মা মিলিয়া একটি সমগ্র বস্তু—সেই সমগ্রতা ভাঙিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিলে আর তাহাকে পাওয়া যায় না—কেননা সান্ত্বনা বা পুষ্পসাটি আসিতে পারে শুধু সমগ্রতার পথেই। শ্রীনিত্যগোপাল মুকুন্দোত্তমানন্দ এই সমগ্র জীবন-চেতনার কথা রাখিয়া গিয়াছেন দার্শনিক ভাবে এবং আচরণদ্বারা। এই দেহ-ধর্ম বা আত্মধর্ম সম্বন্ধে এই কথা তাঁহারা বলিলেন যে ইহারা কোন বিশেষ বস্তু বা স্থানে সীমাবদ্ধ নাই, ইহাদের কোন একটা দিয়াও কোন বস্তু সৃষ্ট হইয়া উঠে না এবং ইহারা কেবল বিরুদ্ধ বা বিপরীতও নয়। মানুষ যদি একলাও থাকে তথাপিও নানা বিরুদ্ধতার সঙ্গে তাহাকে সংগ্রাম করিতেই হইবে—সে বিরুদ্ধতা তাহার বাহিরেরও, ভিতরেরও। যদি বাহ্য-সাধনার উৎকর্ষদ্বারা নানা কৌশলে বাহিরের বিরুদ্ধতাকে কমাইয়া আনাও যায়, তাহা হইলেও তাহা নিঃশেষ হয় না, আর তাহা রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া মানুষের ভিতরে বাসাও বাঁধে—ভিতর হইতেই বিরুদ্ধতার নানা স্তর প্রকাশ পাইতে থাকে। অর্থাৎ বিরুদ্ধতাকে এড়াইবার জন্য জীবন-চলার পথকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর করা যাইতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ জীবন আছে, ততক্ষণ উহাও আছে। ব্যক্তি-জীবন-সাধনাই যদি একমাত্র লক্ষ্য হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের ঐ এতদিনকার সূক্ষ্মতর পথের কথা ভাবা যাইত—কিন্তু বিশ্বের রূপরসগন্ধস্পর্শের আঘ্রাত জীবন-চেতনার মধ্যে সমস্ত মূলসহ জীবন-বোধই আজিকার মনুষ্যত্ব বোধের পরিপন্থী—তাই নূতন করিয়া ভাবিবার প্রেরণা দিতেছে প্রতি দেশের চিন্তাশীলকে। তাই লেনিন মার্ক্স যেমন ভাবিতেছেন, বার্নার্ড শ রাসেল যেমন ভাবিতেছেন, হ্যাড্ ডোয়াইটহেড-আইনস্টাইন যেমন ভাবিতেছেন, এমনি ভাবিতেছেন অনেকে। শুকদোত্তমানন্দ শ্রীনিত্যগোপালের প্রেরণায় সেই ১৯১৯এ অর্থাৎ ৩০ বৎসর আগে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে একটি ভাবনাকে তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্যে রূপ দিয়াছেন। সেখানে তথাকথিত ভারতীয় প্রথায় ব্যক্তি-মুক্তির পথের কথা নাই। ব্যক্তি তাহার অপরিহার্য অঙ্গ দিয়া তাহার পরিবার সত্তা, সমাজ সত্তা, রাষ্ট্র সত্তা ও বিশ্ব সত্তাতেও কি ভাবে মুক্তির আস্বাদন করিতে পারে, সে কথা লেখা আছে। সেখানে আছে, এই যে একটা বিরুদ্ধতাকে আমার ভিতরে বাহিরে দেখিতেছি, সে শুধু আমার বিরুদ্ধই নয়, সে শুধু আমাকে পিছনেই টানে না, সে আমাকে জীবনের পথে আগাইয়াও নিয়া চলে। শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ায় যে আমি বলিতে কিংবা যে কোন বস্তু বা ঘটনা বলিতে কেবল আমাকেই বা সেই বিশেষ বস্তু বা ঘটনাকেই বুঝায় না—আমার বা সেই বস্তুর বাহিরে যাহা কিছু তাহা বিরুদ্ধ বিপরীতই হউক কিংবা স্বপক্ষ সগতই হউক, এই সবটুকু মিলাইয়াই আমি বা বস্তু বা ঘটনা। এই দৃষ্টিতে দেখিলে বিশ্বের কোন কিছুকেই আর হিংসা করিতে হয় না, কাহাকেও বিদ্বেষ করিতে হয় না, কেননা সে আর আমি মিলিয়াই তো আমার সত্তাকার আমি। তখন তাহাকে পাইতে না পারিলেই আমার সাধনা ব্যর্থ হয়, মুক্তি ফাঁকি হইয়া যায়। তখন ইহাতে বিশ্বের প্রতি বিদ্বেষের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। ইহার পর আরও একটা মুক্তির প্রয়োজন—সেটা আসক্তির হাত হইতে মুক্তি। মুক্তি বলি কাকে? ঘটনার অনুপস্থিতিতেই মুক্তি নয়—ঘটনার মধ্যেকার বিদ্বেষ ও আসক্তিতে আবদ্ধ হইয়া না পড়িয়া ঘটনাকে আস্বাদন করিয়াও তাহাকে পার হইয়া যাইতে পারার যে দেহমন-প্রাণের নমনধর্মী অবস্থা তাহাই মুক্তি। বিশ্বের সব কিছু আমারই অপরার্ধ—আমি উহার সহিত যুক্ত হইয়াই সত্যি-কারের আমি, এ কঠিন উপলব্ধিতে বিদ্বেষের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া গেল—আর আসক্তির বন্ধতা হইতে মুক্তি পাই কিসে? ঐ আগের তত্ত্বেরই রকমফের উপলব্ধি দ্বারা। বিশ্বের কিছুকে হিংসা বিদ্বেষ করা আমার নিজেকেই হিংসা করা—এ যেমন আমি-তত্ত্বের এক দিক, তেমনি বিশ্বের কোন 'একটি' বস্তু বা 'একটি' ঘটনাই যে আমি নই—'সর্ব' বস্তু বা 'সর্ব' ঘটনা মিলাইয়াই

যে আমি—আদি-তত্ত্বের ইহা অপর দিক। তখন কোন এক বস্তু বা এক ঘটনার আবদ্ধ তো আমি হইতে পারি না, উহা তো আমার স্বরূপ নয়—স্বরূপতঃ আমি তখনই আমি যখন আমি সর্বভূতময়, যখন আমিই বিশ্ব—কোন অংশেই তো আমার শেষ বা একমাত্র স্থিতি নাই—তাই কোথাও আবদ্ধ হওয়াও আমার চলে না। এই ভাবে দেখিয়া সংসার করাও হয়, প্রতি মুহূর্তে সংসার হইতে উপরে থাকাও হয়।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ এই ভাবেই জগৎ ও জীবনকে দেখিয়াছেন। নিজের জীবনখানাকেও এই ভাবেই তিনি চালাইয়াছেন। ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের বিভিন্ন স্তরে তিনি বিচরণ করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও নিজেকে আটকাইয়া রাখেন নাই। তিনি সংসার করিয়াছেন, আবার সেই একই সঙ্গে সংসার করেন নাই-ও। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভোগবুদ্ধির সংসার তিনি করেন নাই। তাই স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়াই তিনি সন্ন্যাসী। তাঁহার জীবনের প্রতিটি ঘটনা প্রণোদিত হইয়াছিল বিশ্বসেবা-বুদ্ধিদ্বারা। ভারতবর্ষের সমাজ জীবনের বিভিন্ন গ্লানিকে দূর করিবার জন্য তিনি নূতন চিন্তাধারা বাহিয়াছেন। মানুষে মানুষের সম্পর্ক তিনি যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, সেখানে উচ্চনীচের ভেদবোধ নাই, জন্মধারাও তাহার সিদ্ধান্ত হইয়া যায় নাই। সকল মানুষের প্রাথমিক পরিচয় মানুষ হিসাবে—সেখানে প্রত্যেকের নিরঙ্কুশ স্বীকৃতি—আর যোগ্যতা তাহার স্থান-নির্ণয় করিবে। সে যোগ্যতা বুদ্ধির প্রতিযোগিতাপূর্ণ ঘোড়দৌড় নয়—সে যোগ্যতা হৃদয়-ধর্মের, প্রাণ-ধর্মের স্ফুরণ—যাহা বুদ্ধিবিহীন নয়। সে যোগ্যতার স্ফুরণ অহংকারের জন্ম দিবে না, শরণাগতির সেবাবুদ্ধি জাগ্রত করিবে—জীবনে শিষ্টাচার, বিনয় ও অপরকে স্বীকার করিবার, প্রীতির মধ্যে গ্রহণ করিবার হৃদয় ও সজ্ঞ-চেতনা প্রদান করিবে। প্রতি খণ্ডেই অখণ্ড দর্শন, প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র মর্যাদা ও অস্তিত্বের স্বীকৃতি অথচ তাহাদের সমগ্রের মধ্যে বিধৃতি—এই দার্শনিক ভিত্তিতেই পুরুষোত্তমানন্দ ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়াছেন। এই চিন্তা মানুষের মধ্যে অনুপ্রবেশ করাইবার জন্য প্রবল আন্দোলন তিনি করিয়াছেন। হিন্দুকে তাহার ক্ষুদ্রত্ব পরিহার করিয়া বৃহৎ হিন্দু হইয়া সব কিছুকে হজম করিবার কথা, আত্মস্থ হইয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিবার কথা তিনি শুনাইয়াছেন। মানুষের সত্যতাকে এবং মানুষের মুক্তিকে এইভাবে দেখিয়া তিনি হাজার হাজার বক্তৃতা দিয়াছেন, গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে মানুষের ঘরে ঘরে যাইয়া এ বার্তা পৌঁছাইয়াছেন। এই ভাবে সর্বত্র তিনি বিচরণ করিয়াছেন—বহু রকম মানুষ আর বহু রকম ঘটনার মধ্যে। সর্বত্রই ছিল গভীর প্রীতি আর দেবাবুদ্ধি—তাই কোনখানে কোন কিছুতেই তিনি আটকাইয়া থাকেন নাই—কাহারও প্রতি কর্তব্যেরও ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার পঁচাত্তর বৎসরের বহু ঘটনাপূর্ণ জীবন সহস্র সহস্র মানুষের মধ্য দিয়াও যেমন আসিয়াছে, আবার একলা নীরব সাধনারও বহু দিন কাটিয়াছে। এই ভাবে দেখা গিয়াছে পুরুষোত্তমানন্দ কর্মী জ্ঞানী ভক্ত প্রেমিক একাধারে সবই।

যাহাহউক, তাঁহার এমনই একখানি অসাধারণ জীবন তিনি অত্যন্ত সাধারণভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে যাপন করিয়া গিয়াছেন। এইখানেও তাঁহার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। অত বড় একজন জ্ঞানবৃদ্ধ যেমন তিনি, আবার তিনি ভক্ত চূড়ামণি, আবার তিনি প্রেমিক, আবার তিনি অসাধারণ কর্মী—এমন একটি বৃহৎ ব্যক্তিত্বের মানুষ হইয়া তিনি এমন সাধারণভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে থাকিয়া গিয়াছেন যাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়। তাঁহার বেশভূষা আহার আচরণ যেমন ছিল খুব সহজ এবং অত্যন্ত সাধারণ, তেমনি অত্যন্ত সাধারণ মানুষের সঙ্গে অত্যন্ত সহজ ভাবে তিনি মিশিতে পারিতেন। প্রাণসর্বস্ব ছিলেন বলিয়াই তাঁহার এহেন জীবন এমন মধুময় ছিল—অসাধারণ পাণ্ডিত্য তাঁহার হৃদয়কে এতটুকু শুখাইয়া ফেলিতে পারে নাই।

তাঁহার সজ্ঞ-চেতনা অনেকগুলি প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে শেষ প্রকাশ নরনারায়ণ আশ্রমে স্থান পাইয়াছে। এইখানে তিনি তাঁহার চিন্তাধারার জ্ঞান ও প্রীতির আধার হৃদয়কে এবং তাঁহার পুণ্য পবিত্র স্বপ্ন

দেবতাকেও রাখিয়া গিয়াছেন—ভবিষ্যতের মানুষ এইখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইবে। একদিকে তিনি রাখিয়া গিয়াছেন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যুগের দর্শন, আর এক দিকে রাখিয়া গিয়াছেন একটি অত্যন্ত সহজ জীবন—যাহা অত সহজ বলিয়াই মানুষের নিকট অতি দুর্বোধ্য হইয়াছিল। যাহাহউক, আজ তাঁহার এই ৮৩তম জন্মতিথি ক্ষণে তাঁহার এই দর্শন ও জীবনকে ধ্যান করি—তাঁহার জীবন-দেবতা শ্রীনিতাগোপালকে মানুষ উপলব্ধি করিবে, তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে—করিয়া মানুষ সোয়াস্তি পাইবে—এই আকাঙ্ক্ষা লইয়া আপনাদের সকলকে পুনরায় তাঁহার সমাধি প্রাঙ্গনে আসিবার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীসুনীতি চক্রবর্তী ॥

ওঁ অজ্ঞানতমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ সংকীর্তনৈক-বিভবস্থিত বহ্নিমাক্ষম্। বিশ্বপ্রেমঘন নরনারায়ণসেহিম্ বন্দে সদ্গুরুং পুরুষোত্তমানন্দম্॥

আজকের এমনই এক তিথিতে আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ ধরার মাটিতে আসিয়াছিলেন। তাঁরই জীবন-দেবতা শ্রীনিতাগোপাল আলোকে আলোকিত ছিল তাঁর সারা জীবনের পথ-চলা। তাঁকে আমার অনন্ত জীবন ধারা দিয়া আমার সকল সত্তা দিয়া প্রণাম জানাইতেছি।

আমি যতদিন দেখিবার ও সঙ্গলাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছি, সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি, মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁর জীবনখানি আশ্চর্যতম শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা চলে। সর্ব সংসার মুক্ত অবধূত জীবন পুরুষোত্তমানন্দ ছিলেন জীবনের পূজারী। প্রত্যেক বস্তুকেই তিনি জীবন্ত রূপে দেখিতে পাইতেন। তাই তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়াছি—"ধরার ধূলি হোক ব্রহ্মধূলি—ধরার মানুষ হোক ব্রহ্মমানুষ"। প্রত্যেক মানুষের অন্তরের ব্রহ্মকে কোন্ কৌশলে, জীবন যন্ত্রের উপর চাপ না দিয়াও ফুটাইয়া তোলা যায়—জীবনে জাগরূক হওয়া যায়, সুন্দর হওয়া যায়, সেই কথা পুরুষোত্তমানন্দের প্রতি কথায় শুনিয়াছি—আর দেখিয়াছি তাঁহার সারা জীবনের আচরণে। তিনি ছিলেন ব্রহ্মনিষ্ঠ সংসারী, ব্রহ্মনিষ্ঠ বিশ্বপ্রেমিক, ব্রহ্মনিষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ, ব্রহ্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসী। জীবনের কোন উপাধিতেই তিনি আটকা পড়েন নাই। তাই সাধারণ চোখে তাঁহাকে দেখিয়া বোঝা খুব কঠিন। পরস্পর বিরোধী মতবাদকে পুরুষোত্তম-মতবাদে দর্শন করা, প্রচার করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। প্রচলিত শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় মায়ার সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক নাই, মায়াতীত হইয়া তবে ব্রহ্মের সাধনা করিতে হইবে—কিন্তু পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার জীবন-দেবতা শ্রীনিতাগোপাল-প্রদর্শিত পথে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন ব্রহ্ম-মায়া সমন্বিত পথ। তিনি মায়ারও আধ্যাত্মিক রূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন যোগমায়ারূপে, মহামায়ারূপে। তাই সংসার তাঁহাকে বাঁধিতে পারে নাই—সংসার তাঁহার কাছে ছিল বৃন্দাবন। তিনি বলিতেন, বিষয়কে সংসারকে ভোগের দৃষ্টিতে দেখিলে বিষয়, সংসার বিষের কাজ করে আর তাহাকেই পুরুষোত্তম প্রসাদে বলিয়া দেখিলে তাহাই হয় অমৃত। শুধু আস্বাদন করিবার কৌশল জানা চাই। কোন রকম কৌলীন্য বা কোঠাবিভাগ তাঁর জীবনাচরণে সমন্বিত ছিল না। প্রতিটী গুণ প্রতিটী কর্ম তাঁহার কাছে ছিল পুরুষোত্তম গুণ, পুরুষোত্তম কর্ম। তাই সাত্ত্বিক, রাজসিক তামসিক সকল বৃত্তিই তাঁহার কাছে পুরুষোত্তম অভিসারে সহায়ক। ব্রহ্ম এবং জগৎ তাঁহার কাছে সমান

পূজা। তাই তাঁহার মুখে কবে তুষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারই রসাল নন্দনের পরিবর্তে কবে তুষিত মরু গড়িব তুলিব তোমারই রসাল নন্দনের গান শুনিয়াছি, রসাল নন্দনে গড়িবার জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা দেখিয়াছি। সব কিছুকেই তিনি ব্রহ্ম আস্বাদনে আস্বাদন করিতেন, এবং প্রত্যেককে সেই মহামৃত আস্বাদন করাইবার জন্য দাঁড়া-জীবন সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথা বলিবার সামর্থ্য আমার নাই—শুধু বলিবার প্রয়াস মাত্র আছে আমার।

পুরুষোত্তমানন্দের গুরুভক্তির কথা যখন ভাবি তখন অবাক হইয়া যাই—কী অতুলনীয় গুরুভক্তি, একনিষ্ঠ ভালবাসা গুরুর প্রতি। তাঁহার জীবন-দেবতা শ্রীনিত্যগোপাল ছাড়া তাঁহার পৃথক সত্তা ছিল না। উপনিষদের মন্ত্র "যস্য দেবে পরা ভক্তি যথা দেবে তথা গুরৌ—তস্যৈতে কথিতা হি অর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ" মন্ত্রের প্রতিমূর্তি ছিলেন পুরুষোত্তমানন্দ। তাঁহার কেশাগ্র হইতে নখাগ্র পর্যন্ত শ্রীনিত্যগোপালে বিকানো। তাই সমগ্র পুরুষোত্তম-দর্শন তাঁহার জীবনে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল।

আজ ভারতবর্ষের কথা ভাবিতে গেলে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, ভারত পাকিস্থান সমস্যা যাহা ভেদনীতির দুর্বলতার সৃষ্টি হইতে পারিয়াছিল, তাহাই আজ মহীরুহে পরিণত হইয়া ভারত-শরীরে আঘাত করিতেছে—বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রের বন্ধুত্বের মুখোস খুলিয়া গিয়াছে। এখন ভারতবাসীর সর্বতোভাবে যোগ্য হইবার দিন—নতুবা ভারতের বাঁচিবার পথ নাই। তাই আজ বার বার পুরুষোত্তমানন্দের জীবনখানি মানব সমাজের কাছে তুলিয়া ধরা নিতান্ত প্রয়োজন। এমন একখানি জীবন ধারায় চলিতে পারিলেই সকল দুর্যোগ হইতে ভারতবাসী রক্ষা পাইতে পারিবে, তবেই সকল পশু শক্তির হস্ত প্রতিরোধ করা ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব হইবে।

আজ তাঁহারই জন্মবাসরে তাঁহার চরণে প্রার্থনা জানাইব, তোমারই জীবনে জীবন লভিবার শক্তি আমাদের দাও, তোমারই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলি "ধরার ধূলি হোক ব্রহ্মধূলি ধরার মানুষ হোক ব্রহ্ম মানুষ"। বন্দেমাতরম্।

স্মৃতি মন্থন

॥ শ্রীবিরূপাক্ষ রায় ॥

পৃথিবীতে কত মানুষ আসে,—আবার কত মানুষ কালের প্রবাহে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু তারা কি সকলেই নিঃশেষে মুছে যায়? যায় না। পৃথিবীর বুকে এমন দু'চার জন মানুষ থেকে যায় যাদের মানুষ কোনদিনই ভুলতে পারে না। এই কালজয়ী একটি মানুষের কথা এখানে আলোচনা করছি।

আজ থেকে প্রায় বছর এগার বার আগে ৮এ রাসবিহারী এভেনিউতে একদিন গীতাপাঠ শুনতে গিয়েছিলাম। গীতাপাঠ শোনা সেদিন যদিও আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না—উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি মানুষের সান্নিধ্য পাওয়া যার জীবন-দর্শন সীমাহীন আকাশের মত নির্মল ও উদার এবং গভীরও। আশা আমার ব্যর্থ হয়নি ৮এ-তেই বাঞ্ছিত দেবতার সান্নিধ্য মিলল। সেই দেবতাই আমার পরমারাধ্য গুরুদেব স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত।

স্বামীজির সান্নিধ্যলাভের পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমে চলে আসি এবং তাঁর জীবন-দর্শন-তত্ত্ব জীবনে আচরণ ও উপলব্ধি করবার জন্য দীক্ষা গ্রহণ করি। দীক্ষা-গ্রহণের পর আজ পর্যন্ত তাঁরই দেব চিন্তা প্রবাহে প্রবাহিত হয়ে যেন দেখতে পাচ্ছি: কবির ভাষায়:

"তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই
কোথাও মৃত্যু কোথাও দুঃখ বিচ্ছেদ কোথা নাই···।"

কূল আজ অকূলে সীমাহারা। সমস্ত চিন্তার পরিধি টুটে যাচ্ছে ক্রমে এবং অসীমের ওঙ্কারধ্বনি শুনতে পাচ্ছি কানে। শুনতে পাচ্ছি মহামানবের সুমধুর কণ্ঠস্বর। যেখানে কোন মানুষের পূর্ণ মর্যাদার হানি হবার সম্ভাবনা নেই, সেখানে মহামানবের চির উৎসব মুখরিত। স্বামীজি আজ দেহে নেই তবু তিনি আমার জীবনদেবতা, আমার অন্তরে বাস করছেন। তাঁর জীবন-বাঁশরীতে বাজতে শুনেছি অসীমের সুর, যে সুরের ছন্দ-মাধুরী কালজয়ী, যাহা সমস্ত দেশ কালের অন্তরে থেকেও অনেক উর্দ্ধে: তিনি ছিলেন সাধারণ হয়েও অসাধারণ। প্রতিটি মানুষের যথাযোগ্য মর্য্যাদা তিনি দিতেন। মানুষকে তিনি দেখেছেন নারায়ণের অংশ বা তাঁরই সন্তান বলে যেটা আমরা দেখতে পাই স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যেও বেদান্তের মন্তব্যে। কর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন,

"So work, says the Vedanta, putting God in everything, and knowing Him to be in everything. Work incessantly, holding life as God Himself, and knowing that this is all we have to do, this is all we should ask for. God is in everything, where else shall we go to find Him? He is already in every work, in every thought, in every feeling".

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ ব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে every-work-এর মধ্যে, every thought-এর মধ্যে, every feeling-এর মধ্যে দেখেও নর-নারীকে রাধাকৃষ্ণের প্রতি-মূর্তি করে দেখেছেন এবং সেই ভাবে নর-নারীর জীবন-গঠনে আপ্রাণ চেষ্টাও তিনি করে গেছেন। নর এবং নারায়ণ, এই দুইয়ের সম্মিলিত রূপই হচ্ছে পুরুষোত্তম রূপ। তিনি এইরূপ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র রচনার অভিলাষে প্রতিষ্ঠিত করেন নর-নারায়ণ আশ্রম। নর-নারায়ণ আশ্রমের মূল নীতি অতি ব্যাপক ও মহান। স্বামীজি চেয়েছিলেন এমন কিছু মানুষ, যারা চিন্তায়, আচার আচরণে হবে বিনয়ী ও সংগঠক এবং সু-উচ্চ আশাবাদী। জানিনা তাঁর সে অভিলাষ কবে পূর্ণ হবে। আজকের মানুষ যে সমস্যা নিয়ে পর্যুদস্ত, স্বামীজি সে সমস্যার সমাধান-বীজ রেখে গেছেন বহুদিন পূর্বেই। নর এবং নারীর এই দু'টি ভূমিকা তিনি শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতিচ্ছবির মতই দেখেছেন। নারীকে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন, স্নেহকে তিনি পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে দেখেছেন, এবং মানও দিয়েছেন। তাই বুঝি আমাদের মত সামান্য মানুষও তাঁর স্পর্শ পেয়ে আশাতীত গর্বানুভব করে।

স্বামীজি প্রতিটি মানুষের প্রতি এমন মধুর ব্যবহার করতেন যা মাধুর্য রসে রসান্বিত। তিনি আজ দেহে অনুপস্থিত, তবু যখনি একটু নির্জনতার অবকাশ পাই তখন তাঁর জীবন্ত বাণী যেন মূর্ত্ত হয়ে ভেসে ওঠে মনের দর্পণে। তাঁর আশ্রিত হয়ে কোন মানুষকে আজ আর ছোট বা বড়র মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না। প্রতিটি মানুষের যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে, প্রতিটি মানুষকে শ্রদ্ধা করে চলবার কি সুন্দর ও মনস্তত্ত্বসম্মত চিন্তা তিনি দিয়ে গিয়েছেন, যত ভাবি ততই যেন তাঁর কোন্ গহনারণ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলি!

স্বামীজি বলতেন আমি কেবল কতকগুলি সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী চাই না,—আমি চাই তোমরা শ্রীনিত্যগোপাল জীবন-দর্শন-তত্ত্ব বুঝে নিয়ে সংসারটাকে নূতন করে গড়ে তোল—যে সংসারের খাটুনী ভূতের বেগার খাটা হবে না,—গোলোক বৈকুণ্ঠ হবে। তবে কিছু সন্ন্যাসীর প্রয়োজন আছে যাঁরা বিশ্বের সমস্যার বিষয় নিয়ে থাকবে। তবে প্রত্যেকের একই চিন্তা থাকবে শ্রীনিত্যগোপালের সেবা করা। শ্রীনিত্যগোপালের সেবা অর্থ বহু বিচিত্রের মধ্যে শ্রীনিত্যগোপাল তত্ত্ব আস্বাদন করা।

স্বামীজি ছিলেন এমন একটি মানুষ, যিনি মানুষের হৃদয়ে এমন ভাবে আঘাত করতেন না যাতে কেউ ব্যথা পায়। হৃদয়ের মাপকাঠিতে তিনি করতেন মানুষের বিচার এবং হৃদয় দিয়ে করতেন মানুষকে গ্রহণ। বর্ত্তমান কালের মানুষ বুদ্ধি দিয়ে মানুষকে বিচার করে—আবার ত্যাগও করে সেই বুদ্ধির ভিতর দিয়ে, তাই

বুঝি সংসারটা ক্রমেই অসার হয়ে আসছে। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। ঐকদেশদর্শী বুদ্ধির প্রাধান্য ছড়িয়ে পড়ছে সংসারময়। হৃদয়ের সবর কে আজ রাখে? এক অহংকারী আপন মানদণ্ডে বিচার করছে অপরকে যেটা মোটেই বৈজ্ঞানিকভাবে যুক্তিযুক্ত নয়। অপর দিকে একজন করছে অপর জনের নিন্দা, এই তো সংসার! অন্তরের ঐক্যানুভূতি যেখানে বিরল হয়ে ওঠে সেখানেই প্রবেশ করে অশুচি আর অনাচার। সমস্ত মঠমন্দির আজ কলকারখানায় রূপান্তরিত। মেশিনের মত প্রার্থনা পূজা-অর্চনা সবই চলছে—কিন্তু প্রাণ যাচ্ছে ক্রমশঃ শুকিয়ে। সংঘ নেই, প্রীতি নেই, কোন মহৎ উদ্দেশ্যের প্রাণপূর্ণ আলোচনা নেই—আছে কেবল শুষ্কনো শাস্ত্রীয় চর্চার রেওয়াজ।

স্বামীজি বহুদিন হল মর্ত্যভূমির ধূলি ধূসরিত অঙ্গন থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর জীবন ধারা ও চিন্তা প্রবাহ এখনো জীবন্ত হয়ে রয়েছে মনে। গুরুগিরি তিনি কোনদিন করেন নি। গুরুগিরি তাঁর নেশাও ছিল না, পেশাও ছিল না। তিনি চেয়ে ছিলেন মানুষ তৈরী করতে। যাক্, স্বামীজি আর নেই, হাজার মাথা কুটে কাঁদলেও তাঁর সান্নিধ্য পাওয়া যাবে না। তবু তিনি আছেন। তাই আজ তাঁর শুভ জন্মদিনে তাঁর জীবন-বৈতরণীর তীরে দাঁড়িয়ে যেন কান পেতে শুনি:

Man may come and man may go but I go on for ever."

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রী রাধেশ্যাম মজুমদার ॥

আজ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৮৩তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে এই আনন্দধামে সবাই সমবেত হয়েছি। আজকের এই শুভ দিনে পবিত্র তীর্থভূমি নরনারায়ণ আশ্রমে যারা এসেছেন তাঁদের সবাইকে আমরা সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আশ্রমগুরু স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ আজ থেকে প্রায় আট বৎসর আগে অনন্ত লোকে চলে গেছেন। আজ তাঁর সমাধিস্থলকে কেন্দ্র করে দাঁড়িয়ে আছে নূতন যুগের নূতন চিন্তাধারা, সাথে সাথে একে কেন্দ্র করে একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। নূতন যুগের নূতন চিন্তাধারার ধারক ও বাহক স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মানুষকে এ যুগের মানুষের মত বেঁচে থাকার পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। আজ তিনি দেহে না থাকলেও তাঁর কথাগুলোর বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাঁর কথাগুলো আজ শুনবার ও পালন করবার দিন এসে যাচ্ছে। তাঁর কথাগুলো শুধু কান দিয়ে শুনলে চলবে না, প্রাণ দিয়ে শুনতে হবে। প্রাণের পূজারী পুরুষোত্তমানন্দ মানুষকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে প্রাণে জয়ী হবার ইঙ্গিত পরিবেশন করে গেছেন। এই পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া আর সকল প্রাণীই তাদের পুরাতন অভ্যাসকে যুগ যুগ ধরে আঁকড়ে থাকতে চায়, কিন্তু মানুষের চিত্ত এতে সোয়াস্তি পায় না, সে চায় অজানাকে জানতে, অচেনাকে চিনতে। মানুষ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে মন, বুদ্ধি ও আত্মার বিকাশ সাধন করে সুদূরের আহ্বানের দিকে এগিয়ে যেতে চায়। রবীন্দ্রনাথ তাই এক জায়গায় বলেছেন—"জীবজন্তু তাদের জীর্ণ অভ্যাসের বাসাকে আঁকড়ে ধরে থাকে, মানুষ যুগে যুগে নব নব সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করে, পুরাতন সংস্কার কোনদিন তাকে বেঁধে রাখতে পারে না"। ভারতবর্ষে অতীতে যে আদর্শকে ভিত্তি করে সামাজিক কাঠামো গঠিত হয়েছিল সেটা সেই যুগের জন্যেই প্রযোজ্য ছিল কিন্তু তাই বলে

আজকেও যদি আমরা সেই প্রাচীন মনু সংহিতার যুগেই থেকে যাই তবে কি সত্য জগতে মানুষ একটি উন্নত জীবন যাপন করতে পারতো? কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে সবই পালটায়। প্রাচীন কালে আচার্য শংকর প্রমুখ মহাপুরুষ পণ্ডিতগণ বলে গেছেন ব্রহ্মই সত্য, জগৎটা মিথ্যা মায়া; কিন্তু তার উত্তরে পুরুষোত্তমানন্দ বললেন, আজকের দিনে ব্রহ্মকে সত্য বলে জগৎকে মিথ্যা মায়া প্রমাণ করলে চলবে না। তিনি এই বিশ্বের বুকে দাঁড়িয়ে সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলতে চাইলেন যে, ব্রহ্মও সত্য জগৎও সত্য, সংসারকে আজ আর মায়া বলে বিকৃত করতে তিনি চান না। সংসারকেও অলকাপুরীর মত সুখের স্থান ভাবতে হবে এবং তাকে সেই রকম গড়তেও হবে। আজ মানুষের মাঝে মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে নিজের যোগ্যতা বাড়াতেই হবে, নিজেকে যোগ্য হতেই হবে। স্বামীজী এক স্থানে বলেছেন যে—"নিজ আত্মরের সঙ্গে একাত্ম হইতে হইতেই মানুষ যোগ্য হয়। পাইয়াই যোগ্য হয়। যুক্ত থাকিতে থাকিতে মানুষ যোগ্য হয়। যোগ্যতা আগে নয়, আগে যুক্ত হওয়া এবং তাহাকে জমাইয়া তোলা। আগে ভগবানে ভক্তি, পরে তাঁহার পূজায় অনুরাগ। পবিত্র হইয়া ঠাকুর ঘরে যাইতে হইবে, ইহাই ছিল সনাতনীদের কথা; ভাগবত ধর্মের কথা ঠাকুরকে জীবনে লইয়াই তবে পবিত্র হইতে হইবে। জলে নামিয়াই সাঁতার শিখিতে হয়। আগে স্বরাজ, পরে যোগ্য হওয়া, যোগ্য হইয়া স্বরাজ পাওয়ার কথা ইংরেজ শুনাইয়াছে। কিন্তু স্বরাজ না পাইলে কিসের যোগ্য হইবে? যোগ্যতা অর্থ কিরূপ বিচারে যোগ্য হওয়া"। সত্যের সন্ধানী এই মহাপুরুষ সমস্ত জীবন ধরে মানুষকে যোগ্য হবার ও ছন্দময় সুস্থ জীবন যাপন করার কথাই বলে গেছেন। কত বড় পণ্ডিত ছিলেন তিনি। নিত্যগোপালের সংস্পর্শে আসার আগে এই বিশাল প্রতিভা তাঁর হৃদয়ে আত্মগোপন করে ছিল। নিত্যগোপালকে পাবার পর থেকে তাঁর ভিতরের সেই প্রতিভার প্রকাশ হতে থাকে। পুরুষোত্তমানন্দ নিজ মুখে বলে গেছেন তিনি জন্মের ছয় বৎসর পর পর্যন্ত বোবা ছিলেন। তাঁর বাবা মা কখনও ভাবতে পারেন নি যে এ ছেলের মুখে আবার কখনও বাক শক্তি ফিরে আসতে পারে। নিত্যগোপাল তাঁর মধ্যে বাক শক্তি দিলেনই, আবার তাঁকে একজন বক্তাও তৈরী করলেন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত তাঁর বক্তৃতা শুনেও থাকবেন। কি প্রাঞ্জল তাঁর ভাষা, কি সুন্দর যুক্তিপূর্ণ তাঁর ব্যাখ্যা। সেই কথা ভাষায় ফুটিয়ে তোলার মত আমার কলমে জোর নেই। একটি কথা শুনে আপনারা হয়ত একটু আশ্চর্যান্বিত হবেন যে সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে অনেক পণ্ডিত ও জ্ঞানী মানুষেরা তাঁর ভাষণ শুনতেন কিন্তু খুব কম লোকেই তাঁর কথাকে বুঝতে পারতেন। সকলেই তাঁর বক্তৃতা মন্ত্র-মুগ্ধের মত শুনে যেতেন। অথচ কেউ তাঁকে ধরতে পারতেন না। আবার বক্তৃতা ছেড়ে যাওয়াও তাঁদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ত। ছোটবেলা থেকেই পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ মায়ের পূজায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি দুর্গাপূজা ইত্যাদি উৎসবে মায়ের কাছে খুব আকুল হয়ে কাঁদতেন। ধর্মের প্রতি তাঁর এরকম অনুরাগ ও গভীর বিশ্বাস দেখে ছাত্র জীবনে তাঁর এক ব্রাহ্ম বন্ধু তাঁর কাছে একদিন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের খুব নিন্দা করে বললেন। পুরুষোত্তমানন্দ সেই সময় কৃষ্ণ তত্ত্ব সম্বন্ধে তেমন ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তিনি তাঁর বন্ধুটিকে বলেন, ভাই, আমি তোমার সব কথাই শুনলাম কিন্তু আজ আমি তোমার সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো না কেননা তাঁর সম্বন্ধে আমার সব কথা জানা নেই। আমি আজ তাঁকে তাকে তুলে রেখে দিচ্ছি, যেদিন আমি কৃষ্ণতত্ত্বকে ভাল করে বুঝে উঠতে পারব সেইদিন যদি তোমায় দেখা পাই তবে আমি এই সম্বন্ধে তোমার সাথে আলোচনা করব। বরিশালে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে ২৫ বৎসর বয়সে তাঁর কর্ম-জীবন আরম্ভ হয়, কিন্তু বেশিদিন তাঁর ভাগ্যে এই শিক্ষকতার কাজ ছিল না। আট বৎসর কাটতে না কাটতেই বিপ্লবী শরৎ ঘোষের হৃদয়ে এসে পড়ল সুদূরের আহ্বান। শ্রীনিত্যগোপাল তাঁকে নিয়ে এলেন তাঁর দার্শনিক তত্ত্ব মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে। চাকরী ছেড়ে দিয়ে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ বেদান্ত লিখতে

আরম্ভ করলেন। তাঁর ভিতর থেকে যেন তত্ত্বদৃষ্টি হতে আরম্ভ করল। এক বৎসর কাল ধরে তিনি এই বেদান্ত লিখলেন। বেদান্ত শেষ করে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইংরেজের শোষণের বিরুদ্ধে রাজনীতিতে, গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করলেন। এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে তাঁকে কারাবরণও করতে হল। রাজনৈতিক জীবন যাপন করার সময় হঠাৎ তাঁর হৃদয়ের মধ্যে বৃন্দাবনের ডাক এলো। তিনি সব ছেড়ে দিয়ে বৃন্দাবনে চলে গেলেন। বৃন্দাবনে আড়াই বৎসর কাটালেন, কিন্তু ইংরেজের শোষণে তাঁর হৃদয়কে একেবারে বিদীর্ণ করে দিচ্ছিল। একটা গভীর বেদনা তাঁর মনকে পিষ্ট করছিল। তিনি দেশে ফিরে এলেন। স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলকে নিয়ে তিনি মেতে পড়লেন লবণ আইন আন্দোলনে। এবারও তিনি স্বেচ্ছায় কারাবরণ করলেন। এবার তাঁকে প্রায় ছয় মাস কারাগারে থাকতে হল। এই বিপ্লবীর দেহ কারাগারে বন্ধ থাকলেও মন কারাগারে বন্ধ থাকতো না। দেশের সেবার জন্য সব সময় প্রাণটা আকুল হয়ে উঠতো। তিনি ১৯৪২-এর আন্দোলনেও কারাবরণ করেছিলেন। এই সময় জেলে থেকেই তিনি গীতা ও ১১ খানা উপনিষদের ভাষ্য লিখেছেন। একজন বড় দার্শনিক বলেছেন জগতের সবচেয়ে বড় বীর হলেন তিনি, যিনি তাঁর শক্তিমত্ত সেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করেও হয়ত পরাজিত হন, কিন্তু সেই পরাজয়ের জন্য এক মুহূর্ত্তও জীবনকে তিক্ত মনে করেন না। পুরুষোত্তমানন্দ ছিলেন সেই রকম একজন বীর পুরুষ। পথ চলতে গিয়ে তাঁকে অনেক সময় অনেক লাঞ্ছনা অত্যাচারও সহ্য করতে হয়েছে, এমনকি অনেক সময় বহু কাজে খুব বেশী ব্যর্থও হয়েছেন কিন্তু তাঁর মনের বাঁধ কখনও ছিঁড়ে যায় নি।

তিনি বলতেন, যে মানুষ ভগবানকে ভালবাসে অথচ তাঁর জগৎকে ভালবাসে না, সে মানুষের সে ভালবাসা কামুকতা। ঐ দৃষ্টিতে আজও মানুষের কাছে জগৎটা মিথ্যা হয়েই আছে। আজ মানুষের মধ্যে এমন একটি শক্তি চাই যাতে সে আজ সত্যকে সত্য বলে চিনতে শেখে। ভারতবর্ষ চিরকাল আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিল, সে আজ পোষাক পরিচ্ছদে চালচলন ইত্যাদি সকল ব্যাপারে পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করলেও তার ধর্মকে একেবারে foreign করে ফেলেনি। ধর্মের কাছে সে পরের কাছে এখনও একেবারে বিকিয়ে দেয় নি। এখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষ তার ধর্ম ও আদর্শকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়, আদর্শে স্থির থাকতে চায়। বিশ্বের কাছে পাকিস্থানের নগ্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এনে সে স্পষ্টভাবে সেটা জানিয়ে দিয়েছে ভারতের গণতন্ত্রের আদর্শ এই ধর্ম সত্যকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তাই মনে হয় এই ভারতবর্ষ যতই পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে ঝুঁকে পড়ুক না কেন সে তার সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শকে একেবারে ভুলতে পারবে না। ধর্মের রূপ কি হবে? ইত্যাদি বর্ত্তমানের বিভিন্ন সমস্যার সামনে বিশ্ব স্তব্ধ হয়ে আছে। এর উত্তর কোথায়? এর উত্তর স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ রাখতে চেয়েছেন —তিনি বলেছেন "এই বিশ্ব Finished Product নয়, ইহার বুকে যে অনন্ত ভাগবত সম্ভাবনা ঘুমাইয়া রহিয়াছে, সেই অনন্ত সম্ভাবনার মাঝে বিশ্বকে আকর্ষণ করিয়া ব্রহ্মধামে গড়িবার পথই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন"। তাই আজ থেকে ৬০.৭০ বৎসর আগে নিত্যগোপাল one world one family -র কথা বলে গেছেন। তিনি তাঁর এই বিশ্বজনীন মনোভাবকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করার জন্যে তাঁর লেখা বিভিন্ন পুস্তকের সংলাপের মধ্যে বলে গেলেন I am a cosmopolitan, আমি বিশ্বনাগরিক, এই বিশ্বই আমার মহামঠ ইত্যাদি। আজ বিশ্বে সকল প্রকার বিপরীতের সমন্বয় করে বিশ্বের সাথে ও বিশ্বাতীতের সাথে একটা যোগসূত্র গড়ে তুলবার দিন এসেছে। জীবনটাকে পুরুষোত্তম নিত্যগোপালের মধ্য দিয়ে পুরুষোত্তম লীলাঘন করার সাধনা সমস্ত জীবন ধরে করে গেলেন পুরুষোত্তমানন্দ। মানুষের জন্য এই মানুষটির একটি সহজ প্রাণঢালা ভালবাসা ছিল। তাই তিনি প্রতিদিন প্রার্থনার সময় সকাল সন্ধ্যায় বলতেন ধরার ধূলি হোক ব্রহ্মধূলি ধরার মানুষ হোক ব্রহ্মমানুষ। সারা জীবন ধরে তিনি মানুষ মানুষ করেই কেঁদে গেলেন। মনের মধ্যে

তাঁর একটি বিরাট কর্মধারা ছিল যা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য মন প্রাণ সব সময় আকুপাকু করতো। কত শত শত মানুষ তাঁর কথা শুনল কিন্তু কেউ ধরে রাখতে পারলো না। তাঁর এই নূতন কথা শোনাতে না পারার বেদনা মনের ভিতরেই থেকে গেল। নিত্যগোপালের প্রতি তাঁর এক গভীর বিশ্বাস ও একাত্মতার সম্পর্ক ছিল। তিনি নিত্যগোপালকে নিজের প্রাণ বলেই জানতেন। নিত্যগোপালের প্রতি তাঁর ভালবাসা একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে বেশ সুন্দরভাবে বুঝা যায়। বরিশালে তিনি তাঁর স্ত্রীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—"কোন সময় একখানি জাহাজ সমুদ্রের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। তখন সাগরের মধ্যে ঝড় উঠিল। সমস্ত লোক ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ বা ভগবানের নাম করিতেছে। যখন এইভাবে সকলেই মৃত্যুভয়ে অস্থির তখন সেই জাহাজ চালক নির্ভীক হৃদয়ে জাহাজের এদিক ওদিক হাঁটিতেছে। তাহার কোন ভয়ের চিহ্ন না দেখিয়া তাহার পত্নী আসিয়া বলিল জাহাজ যায়, তুমি নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, সকল লোক যে মারা যাইতেছে! তখন সেই জাহাজ চালক তাহার হাতের তরবারি স্ত্রীর বুকের উপর ধরিয়া বলিল এই তরবারিতে তোমার ভয় কবে? এই তরবারি দেখিয়াও তোমার ভয় হইতেছে না। স্ত্রী বলিল ঐ তরবারি যে তোমার হাতে। তোমার হাতের তরবারিতে আমার কোনও ভয় নাই। তখন সেই জাহাজ চালক বলিল এই যে ঝড় প্রবাহিত হইতেছে যাহার মধ্যে পড়িয়া তোমরা ভয়ে অস্থির সেই ঝড় এমন একজনের হাতের ভিতরে রহিয়াছে যিনি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম। তোমার যদি এই তরবারিতে ভয় না হয় তবে আমার সেই প্রিয়তম শ্রীভগবানের হাতের ঝড়ে ভয় হইবে কেন?"। স্বামীজীর অবস্থাও নিত্যগোপালের জন্য এই রকম গভীর ও প্রেম-মধুর ছিল। স্বামীজীর কথা বলে বা লিখে শেষ করা যায় না। তিনি আজ নেই। আজও তাঁর কথা দেশ-বাসীর কাছে জনপ্রিয় হবার দিন আসেনি। স্বামীজী বলে গেছেন তাঁর অবর্তমানে এখানে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে, একদিন মানুষ এই আলোর সন্ধানে আসবেই। বুদ্ধের দেহ রক্ষার বহু বৎসর পর তাঁর ধর্ম ও আদর্শ প্রচারিত হয়েছিল। আমরা বিশ্বাস করি স্বামীজীর এই দর্শন বিশ্বের বুকে একদিন দানা বাঁধবেই। বিশ্ববাসী তাঁর এই অবদানে ধন্য হয়ে উঠবে।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৫১)

নিত্য সম্বন্ধ না বুঝলে সঙ্ঘ হয় না, অনিত্য সম্বন্ধ থাকা পর্যন্ত সঙ্ঘ হবে না। হোটেলের অনিত্য সম্বন্ধে সঙ্ঘ হয় না। নিত্যকাল যাদের সঙ্গে থাকব, তাদের সঙ্গে মারামারি করে তো থাকা যায় না—তাই এখানে মিলতে হবে। ...মানুষ জাতি—বাঙালী উড়িয়া মাদ্রাজী মানুষ, আবার প্রত্যেক ব্যক্তিও মানুষ। প্রত্যেক ব্যক্তিকে বুঝতে হবে আমি জাতি ...। দেহের অংশী ও অংশের বিভক্ত সমবায় রয়েছে..হাত চোখ অংশ হয়েও অংশী—প্রত্যেক অঙ্গকে বুঝতে হবে আমি সমগ্র মানুষ, অথচ আমিই একমাত্র বা একান্ত নই। প্রত্যেক মানুষকে বুঝতে হবে আমি জাতি—এমনি প্রত্যেকটী জাতি-মানুষ নিয়ে মানুষ জাতি। প্রত্যেক ব্যক্তি সমষ্টি, সমষ্টি ব্যক্তির যে সামঞ্জস্য তাই সমবায়। তাই নিত্যগোপাল বললেন, I am a cosmopolitan...। আমি প্রথমে সামান্য

মানুষ, পরে আমি বিশেষ মানুষ।···এ হলেই সমবায় সম্ভব। যদি বুঝতে পারতে আমি পুরুষোত্তমানন্দের অংশ পুরুষোত্তমানন্দ তাহলেই সব গোল চুকে যেত। প্রচার করেও সেবা, খাইয়েও সেবা, কৃষি করেও সেবা—দেখতে হবে সেবা হচ্ছে কি না, সেবার মনোবৃত্তি আছে কিনা। প্রচারের সঙ্গে খাওয়ার বা কৃষি করার সম্বন্ধ নিত্য—গাছের অংশ গাছ···। ভারতবর্ষকে ভালবাসতে হলে বিহার বা যশের প্রকাশকে ভালবাসতে হবে, তবেই হবে সঙ্ঘ।··· সমবায় করতে গেলেই একটা বিরাট জাতির অংশ আমরা—তার সব অংশ মিলিয়ে এক জাতি—ভারতবাসী··· তাহলেই সমবায়। কলকাতাকে জানতে হলে রাইটার্স বিল্ডিং, বেলেঘাটা, মনুমেন্ট—অর্থাৎ চৌরঙ্গীর ঐশ্বর্য আর বস্তীর বিভীষিকা সব মিলিয়েই জানতে হবে—তাহলেই সমবায় হয়। কালীঘাট ও খিদিরপুরকে কলকাতা হতে গেলে পরস্পরকে পেতে হবে। ব্রজগোপীদের রাসলীলার মধ্যেও এই সমবায়ের দৃষ্টান্ত—প্রত্যেক ব্রজগোপীর মাঝে একজন কৃষ্ণ···। সঙ্ঘে প্রত্যেকে স্বাধীন আবার প্রত্যেকে পরাধীন। —সবই কর্ম—কর্ম হিসেবে সব এক—প্রত্যেক কর্মী যদি না জানে যে আমি না করলে আমিই সার্থক হই না, আমি সমগ্রের অংশ সমগ্র—তাহলে কর্ম সার্থক হয় না। প্রত্যেক কর্মের সঙ্গে সমগ্রের ও অপর কর্মের নিত্য সম্বন্ধ···। মানুষ সর্বত্র আছে—সমগ্র মানুষ সত্তাকে আগে বুঝতে হবে—তারপর মানুষ যেখানে যেখানে আছে, সেই সব প্রকাশকে চিনতে হবে···। এই সঙ্ঘ করতে নিত্যগোপাল এসেছেন—কঠিন কাজ বলে এ কাজ করি নি—তবু তিনি এর মধ্যে আমাকে নিয়ে এলেন···। ব্রজগোপীর পাশে কৃষ্ণ, আবার মাঝেও কৃষ্ণ···। কোন মহিষী একা কৃষ্ণের সেবা করতে পারবে না—সবাই মিলে কৃষ্ণের সেবা করবে—সে বহুবল্লভ। আমি বহুবল্লভ—প্রত্যেক মানুষই তাই—আমার নাক বা চোখ বা কান যদি একলা আমি হতে চায়, তবে তা হবে না···। প্রেমে ঈর্ষা নেই, কামে ঈর্ষা। genus আমি মানুষ এটা বুঝে species-বোধ আনতে হবে, জানতে হবে···। দুজন নিয়েই সঙ্ঘ গড়—পাঁচ হাজার পাঁচ শ হবে না—প্রত্যেকে যদি মনে করি আমি এক দিক দিয়ে সেবা করছি—তাহলেই গোলমাল হয় না। কার একলা সব সেবা করবার এমন অহংকার আছে, এমন সামর্থ্য আছে?···সকলের কর্ম যোগ আনার অংশ এই বুঝে যখন প্রত্যেকে কাজ করবে, তখনই শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা ছাড়া পরিবার চলে না, সমাজ চলে না, রাষ্ট্র সম্ভব নয়—রাষ্ট্রে কী ভীষণ শৃঙ্খলা প্রয়োজন···এতগুলি বিশেষকে মিলতে হবে···এই মিল ভাঙলেই বেসুরো লাগবে। তানসেনের গুরু হরিদাসের ধ্যান ভেঙে গেছে বেসুরা বেতালের গান শুনে—বেসুর হলেই শৃঙ্খলা ভাঙে। কেউ তরলা হও, কেউ বেহালা হও, কিন্তু সকলের একতানতা থাকতে হবে—সুর তান সব মিলিয়ে সমগ্রতা বজায় রাখতে হবে। সমগ্র বিশ্বটা তালে বাঁধা—সকলে মিলে যদি ২৪ ঘণ্টা সুর মেলাতে চেষ্টা না কর তবে থেকো না এখানে।···সমবায় না হলে ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব নয়—সুর মেলাতেই হবে—ঈর্ষা থাকতে পারবে না, হিংসা থাকতে পারবে না, বিদ্বেষ থাকতে পারবে না, অভিযোগ থাকতে পারবে না।···আমি কি নিত্যগোপালের সবটুকু সেবা পাই?···সুর মেলাতে হলে আগে গুরুর সঙ্গে একসুর হতে হবে, তার সঙ্গে মিলে সকলের সঙ্গে মিলতে হবে। ঠাকুর, যেন সঙ্ঘের মত সঙ্ঘ হয়···যদি তুমি ডেকে এনেছ, সঙ্ঘ গঠনের মত প্রাণ এদের দাও—তোমার সঙ্গে এরা যুক্ত হউক—সেই যুক্ততার মধ্য দিয়া বিশ্বের সঙ্গে মিলতেই হবে···। অমুককে না হইলেও আমার চলে—এ হতেই পারবে না।···এই সমবায় দর্শন বৈশেষিকের···এই সমবায়ের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের খোঁজ নিত্যগোপাল দিয়ে গেছেন—তাই ভবিষ্যৎ যুগের তিনি স্রষ্টা···তিনি জগন্নাথ—তিনি বাঙ্গালীর, তিনি ইংরেজের, তিনি আমেরিকার।·· এইটাই নেহরুর principle of coexistence—মিশরের সঙ্গে আমেরিকার মিলন—কোথায় বুদ্ধাদুতী, কোথায় সৌর্ণমাসী?···একজন বেয়ারাপানা করলে সকলের বুক কেঁদে ওঠা উচিত · সুখ দুঃখ বণ্টন করে দেওয়া দরকার···ভগবান করুন, নিত্যগোপাল করুন—নিত্যগোপাল ছাড়া আমি ভগবান জানি না···। ঠাকুর, যারা মিলিত না হলেও খাওতে পারে, সঙ্ঘবদ্ধ না হলেও যাদের দিন চলে,

তাদের সঙ্গে থাকতে এনে আমাকে ক্লান্ত করে ফেলছ…।

২৯, ১০, ৫৩।…আমি থাকা পর্যন্ত ভক্তিও হয় না, জ্ঞানও না, বর্মও না। জ্ঞানের লক্ষণ—বস্তুতন্ত্রঃ ভবেৎ জ্ঞানম্—জ্ঞান অর্জন করতে যে বস্তুকে আমি জানতে চাই আমার জীবনে তাকে প্রধান করে তুলতে হবে… আমার মত করে বস্তুকে দেখব না—বস্তুর মত করে বস্তুকে দেখব—বস্তুর মধ্যে এমন ভাবে মিশে যাব যাতে আমি বড় হয়ে না উঠি, বস্তুত্বই বড় হয়ে ওঠে…। আমার মত করে দেখাকে কর্তৃতন্ত্র বলে।…কাল পাঠে বলেছি রাধার বংশী শিক্ষা—কোন্ রন্ধ্রে ফুঁ দিলে চাঁদ ওঠে, কোন্ রন্ধ্রে ফুঁ দিলে যমুনা উজান বয়, কোন্ রন্ধ্রে ফুঁ দিলে আমরা (গোপীরা) আসি…আমায় শিখিয়ে দাও।…কৃষ্ণ বললেন—তা তো পৃথক থেকে হবে না—আমার সঙ্গে জড়ি মিলিয়ে ত্রিভঙ্গ হও, এক হও, তাহলে শিখতে পারবে। তুমি গান শিখতে শিক্ষকের গলায় গলা মেলাবে না?—আর একজনকে তন্ন করে নিতে হবে—সঙ্গীত-গুরু ভাল গাইতে পারেন, এটা ধরে নিতেই হবে। গুরু আমার রক্ষা করবেন বা করতে পারেন এটা বিশ্বাস না থাকলে এসেছ কেন? দ্রৌপদীকে কেউ রক্ষা করে নি? দ্রৌপদীকে কে রক্ষা করল?—এ দেখেও কি বিশ্বাস হয় না কে রক্ষা করবে?…গোবিন্দের জীবনে জীবন না মেলালে কি করে সৃষ্টির রকম শিখবে?… উপনিষদ্ হাজারবার লিখেছেন বই পড়ে হয় না—গুরুর জীবনে জীবন মেলাতে হবে।…তোমরা যে যার নিজের সাফাই গাইবে—আমার দোষ নাই প্রমাণ করবে, এর নাম কাজ?…আমার জীবন থেকে শিখতে পার—আমি তাদের মা গঙ্গা পায় না এমন কাজ করি না। নিত্যগোপাল শতবার্ষিকীর সময় প্রথম সভার খাতাপত্রের নামই ওঠে না—সব বড় বড় লোক শিষ্য—আমি ৫০টাকা দিলাম।… নবদ্বীপে সভা হবে না স্থির হয়—কেননা টাকা নাই… আমার সামনে দিয়ে কাজ নষ্ট হবে? আমি সে মানুষ নই। তোমরা নিজের দোষ সাফাই কর, কাজ তো গেল। প্রাণ যতক্ষণ আছে কাজ হওয়ার ব্যবস্থা করব—শত-বার্ষিকীতে আমার থেকে বেশী টাকা কোন গুরুভাইও দেন নি।…ত্রিবাঙ্কুর কংগ্রেসে আমার কি দরকার ছিল আমার স্ত্রীর গহনা দেওয়ার? আমার কি এতই টাকা? …নয়, তবু কাজ হতে হবে…। কর্মীর রাগ থাকলে চলে না, বিরক্ত হলে চলে না, দোষ যায় বা জ্ঞান বা যত্নই, কিন্তু কাজটা তো পণ্ড হল? কিন্তু আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ এতটুকু কাজ নষ্ট করতে দেব না। মা তো ভাগের নয়—নিত্যগোপাল আমার ষোল আনা। তাই আমি আমার প্রাণপণ করেছি—কত টাকা নিজে দিয়েছি—কত টাকা রেণু চাঁদা তুলে দিয়েছে… 'আমি' থাকলে কর্ম হয় না—কত কষ্ট সারা জীবন করেছি—তাই কত কাজ করতে পেরেছি—আমার ছেলেমেয়েরা কত কষ্ট করেছে—ছেঁড়া কাপড় পরা, না খাওয়া যে তাদের কত গিয়েছে… উষাঙ্গিনীর হাতের বালা থাকতে সতীশ দাসের ঘরে চাল থাকবে না? উষাঙ্গিনীও তা হতে দেয় নি।…এমন সংসারে কে দেয়? সতীশ দাস আমাকে লিখেছিল এমন হয়েছে…আমি লিখলাম, মা দিয়েছে মেয়েকে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।…আমার সামনে দিয়ে কাজ নষ্ট হয়ে যাবে এ আমি কখনও হতে দেই নি।…কর্ম করবে যদি, তবে খেয়াল রেখো না…কর্ম তো তোমাদের জীবনে বড় নয়—তোমাদের ভাল লাগা মন্দ লাগাটাই বড়…। যেখানে কর্তুম্ অকর্তুম্ অন্যথাকর্তুম—এ যে পারে সে পুরুষোত্তম-কর্মী নয়।…পুরুষোত্তমের সংসারের এতটুকু দ্রব্য অপচয় কেন আমি করব।…এইভাবে জ্ঞান হয়, এইভাবে কর্ম হয়।…রক্ষিষ্যতি ইতি বিশ্বাসঃ—বিশ্বাস কর তিনি রক্ষা করবেন—কিন্তু রক্ষাকর্তা হিসেবে তাঁকে বরণ করে তো নিতে হবে? বলতে তো হবে যে, হ্যাঁ, তোমাকেই রক্ষা-কর্তা হিসাবে আমি বরণ করে নিলাম।…তোমার ভার তুমি বইবে? বও…। জীবনে জীবন মিলিয়ে জীবন লাভ করতে হয়—জীবন লাভ করতে হলে তাঁতে লগ্ন হয়ে থাকতে হবে, সেই বংশী শিক্ষা—।

ক্রমশঃ

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় জন্যই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে, দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেইজন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়-নির্দ্দেশিত 'সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

দ্বাদশ সিদ্ধান্ত

আছে যাহা তাহা অনুভব করা যায়। অনুভব করা যায় যাহা তাহা সত্তা। মিথ্যা অনুভূত হইবার নহে। আমি আপনাকে অনুভব করি। আমি আছি অনুভব দ্বারা জানি। আমি যদি না থাকিতাম, তাহা হইলে আমি আছিও বোধ করিতাম না। অনুভূতিদ্বারা ব্রহ্ম-বোধও হয়। আমি সত্য স্বীকৃত হইলে আমার কার্যও সত্য স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে আমার কার্য অসত্য বলিতে পার না। ১

আমার মধ্যে এক প্রকার নিরাকার নহে। আমি-জীবাত্মা এক প্রকার নিরাকার, আমার প্রত্যেক মনোবৃত্তিও এক এক প্রকার নিরাকার। আমার মধ্যে সকল প্রকার নিরাকারই সক্রিয়। আমি-নিরাকারও সক্রিয়। আমার মধ্যে রাগ-নিরাকার যখন প্রকাশিত হয়, তখন তাহা কার্য-সমন্বিত হইয়াই প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক নিরাকার মনোবৃত্তিই কার্য্য-সমন্বিত হইয়া প্রকাশিত হয়। আমি আছি বোধও কার্য্যাত্মক। তবে নিজের মধ্যে ব্রহ্মানুভূতিই বা কি প্রকারে অকার্য্যাত্মক হইবে? ২

আকার অবলম্বনে প্রত্যেক মনোবৃত্তির কার্য ব্যক্ত হইয়া থাকে। আকার অবলম্বনে আমি এবং আমার কার্য সকল ব্যক্ত হইয়া থাকে। ৩

ত্রয়োদশ সিদ্ধান্ত

মায়াও ব্রহ্মের অধীন, জীবও ব্রহ্মের অধীন। জীব যে মায়াধীন হয়, তাহাও ব্রহ্ম-প্রভাবে, কিন্তু মায়া-প্রভাবে নয়। মায়া-প্রভাবে জীব মায়াধীন হয় স্বীকৃত হইলে মায়াও ব্রহ্মাধীন নহেন স্বীকার করা হয়। মায়াও সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বীকার করা হয়। ব্রহ্ম অপেক্ষা মায়ার কর্তৃত্ব ও আধিপত্য ইহাও স্বীকার করা হয়। কারণ সর্ব্ব জীবের উপরই

মায়ার প্রভাব বিস্তৃত দেখিতেছি। আমাদের মতে সর্ব্ব জীবের উপর যে মায়া প্রভাব বিস্তৃত দেখিতেছি, তাহাও ব্রহ্মের নিয়োগানুসারে। মায়া ব্রহ্মের যন্ত্র-স্বরূপ, ব্রহ্ম যন্ত্রী। ব্রহ্ম মায়াধীন নহেন, ব্রহ্ম মায়াধীশ। মায়াই ব্রহ্মের অধীন। অন্য কোন প্রাণী যদি ব্রহ্ম হইত, তুমি যদি ব্রহ্ম হইতে, তাহা হইলে অন্য কোন প্রাণীই মায়াধীন হইত না, তাহা হইলে তুমিও মায়াধীন হইতে না। আমাদের মতে কোন দেহস্থ জীবাত্মাই পূর্ণ ব্রহ্ম নহেন। কারণ পূর্ণ ব্রহ্ম কোন প্রকার বিকার বিশিষ্টই নহেন। তাঁহার একেবারেই ভ্রান্তি এবং বিস্মৃতি নাই। তিনি কখন সবিকার এবং কখন নির্বিকার নহেন। তিনি কখন পরিবর্ত্তনীয় এবং কখন অপরিবর্ত্তনীয় নহেন। তিনি কখন নিরঞ্জন এবং কখন অনিরঞ্জন নহেন। তিনি যে নিত্য নির্বিকার, তিনি যে নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়, তিনি যে নিত্য-নিরঞ্জন, তিনি যে নিত্য সত্য, তিনি যে নিত্য অভ্রান্ত, তিনি যে নিত্য অবিস্মৃত, তিনি যে নিত্য শুদ্ধ, তিনি যে নিত্য পবিত্র, তিনি যে নিত্য জ্ঞানী, তিনি যে নিত্য প্রেমিক।

চতুর্দ্দশ সিদ্ধান্ত

ব্রহ্ম যখন নির্গুণ নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকেন, তখনও তাঁহাতে অব্যক্তভাবে ইচ্ছা-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি ও জ্ঞান-শক্তি থাকে। ব্রহ্ম যেমন নিত্য সত্য, তদ্রূপ তাঁহাতে যে ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছা-শক্তি ও জ্ঞান-শক্তি আছে, তাহারাও নিত্য। ব্রহ্মও সত্য, তাহারাও সত্য। ব্রহ্মের অস্তিত্ব বোধিনী-শক্তি যে ব্রহ্মে আছে, তাহাও নিত্য, তাহাও সত্য। যিনি ব্রহ্মের জ্ঞান নিত্য স্বীকার করেন, তিনি ব্রহ্মের ইচ্ছা ও ক্রিয়া-শক্তিও নিত্য স্বীকার করেন না কেন? বেদান্ত মতে ব্রহ্ম ব্যতীত যাহা, তাহাই তো অসত্য। ব্রহ্ম আর ব্রহ্মজ্ঞান এক নহে। কারণ জ্ঞান আর জ্ঞাতা এক নহে, এ কথা কে না জানে। তুমি আর তোমার জ্ঞান কি এক পদার্থ? তাই বলি, জ্ঞান ব্রহ্ম নহে। জ্ঞান ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছু। জ্ঞান ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছু হইলেও বেদান্তানুসারে সেই জ্ঞানকে যদি নিত্য সত্য বলিতে হয়, তাহা হইলে সেই ব্রহ্ম ব্যতীত ব্রহ্মের ইচ্ছা ও ক্রিয়া-শক্তিকেই বা নিত্য সত্য বলিবে না কেন? বেদান্ত মতে ব্রহ্মের জ্ঞান-শক্তি যদি নিত্য সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদের মতে ব্রহ্মের ইচ্ছা-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তিও নিত্য সত্য এবং অভ্রান্ত। ১

জ্ঞানের নিত্যত্ব স্বীকৃত হইলে ইচ্ছা ও ক্রিয়ার নিত্যত্বই বা স্বীকৃত হইবে না কেন? আত্মার জ্ঞান যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে আত্মার ইচ্ছা ও আত্মার ক্রিয়াই বা নিত্য স্বীকৃত হইবে না কেন? জ্ঞানও আত্মার, ইচ্ছাও আত্মার, ক্রিয়াও আত্মার। আত্মার জ্ঞান যে কারণে নিত্য, আত্মার ইচ্ছা ও ক্রিয়াও সেই কারণে নিত্য। ২

আত্মা হইতে আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হওয়া যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে সেই আত্মা হইতেই আত্মেচ্ছা ও আত্ম-ক্রিয়ার স্ফুরণই বা অসঙ্গত হইবে কেন? আত্মজ্ঞান যদি আত্মার ন্যায় নিত্য হইতে পারে, তাহা হইলে আত্মার ন্যায় আত্মেচ্ছা ও আত্ম-ক্রিয়াও নিত্য হইতে পারিবে না কেন? ৩

প্রথম ভাগ সমাপ্ত

দ্বিতীয় ভাগ

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য রচিত অপরোক্ষানুভূতি সম্বন্ধে মত

প্রথম সিদ্ধান্ত

পরমহংস শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের আদিতেই দ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়াছেন। মূল শ্লোক এই—

'শ্রীহরিং পরমানন্দস্বরূপেশ্বরমীশ্বরম্।
ব্যাপকং সর্ব্বলোকানাং কারণং তং নমাম্যহম্।'

সেইজন্যই শঙ্করাচার্য্যকে কেবল অদ্বৈতবাদী বলা উচিত নহে। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, তিনি দ্বৈত এবং অদ্বৈতবাদ উভয়ই স্বীকার করিতেন। তবে তাঁহার শেষাবস্থায় অদ্বৈত তত্ত্বের প্রতি অধিক এবং প্রগাঢ় অনুরাগ হইয়াছিল বটে।

ক্রমশঃ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৩—

(৫১)

শ্রীনিত্যগোপাল, এ-পার ও-পারের তুমিই সেতু, তুমি বিবরণ। এ-পার ও-পারের ব্যবধান তোমার শ্রীপাদপদ্মে তিরোহিত; তাই তোমার অভয় পাদপদ্ম আমার শরণ। সর্বসংস্কারবর্জিত তোমার জীবনই আমার সর্বস্ব। ওগো প্রাণ, মহাপ্রাণ, বিশ্বপ্রাণ, তোমার প্রাণ আমার প্রাণ এক হউক, তোমার মন আমার মন এক হউক। সব প্রাণচাঞ্চল্যকে তুমি তোমার মহাপ্রাণের মাঝে সংযত করিয়া রাখিয়াছ, সব চঞ্চলতায় মাঝে তুমিই স্থির।...আমাকে কি এমন পঙ্গু করিয়াই রাখিবে ঠাকুর? তুমি জাগ ঠাকুর, তুমি জাগ।...বেণু গোপা ...পলতা রওয়ানা হয়।...ফেরে সন্ধ্যা ৬।টায়। সেখান হইতে ফুল আনে। প্রতিভা শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দুপুরের পর পড়িয়া শুনায়।.. -র পড়াশুনায় তেমন মনোযোগ নাই। কেমন করিয়া যে মনোযোগ আনা যায়, সে এক সমস্যা। তাহার তো মানুষ না হইলে চলিবে না। টেলিফোনের জন্য বেণু বেহালায় যে পত্র দেয় তাহার কোনও উত্তর না পাইয়া আবার এক চিঠি বেহালায় দেওয়া হয়।...

১১ই জুন

ঠাকুর, আমার জীবনে, পরিবারে, সমাজে, বিশ্বে তুমি জাগো। দুর্নীতি-ঘন অন্ধকার যেমন করিয়া সমাজ-জীবনে ছাইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে একটী প্রেম-প্লাবন প্রয়োজন। ব্যক্তিকে ধরিয়া ধরিয়া সমাজকে বিশুদ্ধ করা যাইবে না। তুমি ছাড়া জড়-অজড় সমস্যা-ঘন প্রেম-প্লাবন কে আনিবে? মানুষ যে আজ নিতান্তই অসহায়। কে আছে তুমি ছাড়া বান্ধব তাহাদের? তুমি তোমার জীবনের আলো ছড়াইয়া দিয়া এই ঘন অন্ধকার দূর কর। তুমি নাকি সত্য যুগে আবার আসিবে? কবে সে সত্য যুগ? এখনকার মানুষ কি করিয়া বাঁচিবে? আমায় বল দেও, বুদ্ধি দেও, সুযোগ দেও, ধন দেও। তোমার সেবার সাধ তো মিটিল না। সকালে আষাঢ়ের সাময়িকী 'প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান' লিখি। বেণু প্রায় ১০টায় ইলেকট্রিক সাপ্লাই হইতে টাকা তুলিয়া কুমারেশ, বাসন্তী কটন ইত্যাদি হইয়া আসে।...সন্ধ্যার সময় বিশুর ঘোষ আসে।...

১২ই জুন

ঠাকুর, তুমি-আমি 'স্বাসুপর্ণাসযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে'। তুমি আমি সহযোগী, বুকে বুক লাগাইয়া একই সংসার-বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া আছি সমপ্রাণ সখা তুমি আর আমি। সোনার পাখওয়ালা তুমি আর আমি। কখনও হৃদয়াকাশে সোনার পাখা ছড়াইয়া পাখায় পাখা মিলাইয়া উড়িয়া চলিয়াছি। জীবনে তোমার সহযোগিতা ছিল বলিয়াই এই দুর্গম পথে চলিয়া আসিয়াছি, পথের ধারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া থাকি নাই। আরও নিবিড় ভাবে তোমাকে পাইতে চাই। তুমি আর আমি কি এই সংসারটাকে অনন্ত সমস্যার মাঝে আটকাইয়া যাওয়া হইতে রক্ষা করিতে পারিব না?...মন দিলে সবই পারিত, মনই যে দেয় না! অথচ ঘাবড়াইলে তো চলিবে না। পুরুষোত্তম-দর্শনে সর্বদাই 'পথ' আছে প্রত্যক্ষই তাহার সম্বল। 'আছে যত নিয়া বিচারে' অতীতের উপর দোষ চাপাইয়া বর্তমানে শুধু পড়িয়া মার খাইবার দর্শন পুরুষোত্তম-দর্শন নয়। অন্য দর্শনে বর্তমান প্রারব্ধ বলিয়া finished হয়। কিন্তু পুরুষোত্তম দর্শনে বর্তমান flexible, অনন্ত সম্ভাবনাময়। বর্তমানের বুকেই অনন্ত মুক্তির খোঁজ মিলিবে। ঠাকুর তাই প্রত্যক্ষের মহিমা প্রচার করিয়াছেন। ভক্তিতে প্রারব্ধ কাটে

এই যায় এই দেহে সকল প্রারব্ধ পলাইয়া গিয়া ভগবান প্রাপ্তির বরই শ্রীনিত্যগোপাল দিয়া গিয়াছেন। প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ লইয়া যাত্রা করিতে হইবে, আমার যতই অতীতের দুষ্কৃতি থাকুক না। হারাইবার কিছু নাই। বর্তমান জীবনের সঙ্গেও ভগবানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। বর্তমানের সবটুকু তাঁহার সেবায় লাগাইলেই আমি সার্থক হইব, কোনও অতীত আমাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না।...

১৩ই জুন

ঠাকুর, প্রত্যক্ষ অপেক্ষা আনুমানিক যুক্তির উপর তোমার আস্থা ছিল না, বর্তমান জীবনের মূল্য তুমিই প্রবর্তন করিয়া গিয়াছ, সমগ্র প্রত্যক্ষের বিশ্লেষণ করিলে যে তাহার ভিতরে অনন্ত অতীত ও অনন্ত সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের খোঁজ পাওয়া যাইবে, শুধু খোঁজ পাওয়াই নয়, তাহাদের সামঞ্জস্যের ধারাও মিলিবে, বর্তমানেই যে মুক্তি সম্ভব, প্রত্যক্ষের বুকেই মুক্তি সম্ভব, প্রত্যক্ষের বা প্রারব্ধের জন্য যে প্রত্যক্ষের সাধনাতেই সম্ভব, প্রত্যক্ষের স্পর্শ এড়াইয়া আনুমানিক ক্ষেত্র গোলোক বৈকুণ্ঠে গেলেও যে প্রত্যক্ষের টান থাকিয়াই যায়, কালক্রমে সেই টানই যে জন্ম বিজয়কে পর্যন্ত টানিয়া প্রত্যক্ষের বুকে আবার নিয়া আসে, তখন প্রত্যক্ষকে লইয়া বোঝাপড়া করাই যে বুদ্ধিমানের কার্য, তাহাই না তুমি স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া গিয়াছ? তোমার জয় হউক। মুক্তি বর্তমান জীবনের মধ্যে—'অহম্ ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি'—সবই তো বর্তমান জীবন। প্রত্যক্ষেই আমি ব্রহ্ম।...৪॥০টায় পাঠ আরম্ভ হয়। সত্যবাদিকী (জ্যৈষ্ঠ মাস) পড়া হয়। আজ সুরেশ চট্টোপাধ্যায় আসে।...Old physics-এর universe এমন dead block যে এখানে কোন 'free man' থাকিতে পারে না, কাজেই পরাশক্তির পৃথক কল্পনা করা হয়। পরা প্রকৃতির মধ্যে এই জীব জগতের অনুরূপ লীলার আরোপ করা হয়, যাহার স্মরণ মনন করিয়া মানুষ এই অপরা প্রকৃতির সংস্রব এড়াইতে পারে। সমস্যাকে এড়াইয়া চলিলেই সমস্যা যায় না। বৈকুণ্ঠেও সেই সমস্যাও যেমন তেমন আত্মপ্রকাশ করে। সমস্যা যদি এড়ানোই না যায়, তবে পলাইয়া গিয়া শ্রম ও সময় কেন বেশী করিয়া খরচ করিব? পরাপ্রকৃতির আদর্শকে সামনে রাখিয়া এই অপরা প্রকৃতিকে গড়িয়া তুলিবার সাধনা লইলেই তো কল্পনা-লাঘব হয়। বিশ্ব আছে, তাহার ছন্দ আছে—ইহা মানিলে কল্পনা-গৌরব দোষ আর থাকে না। ছন্দ সিদ্ধির জন্য পরাশক্তি মানিবার প্রয়োজন হয়। পরাশক্তি অপরা শক্তিরই ছন্দের নাম। অপরা হইতে উহা একান্ত পৃথক নয়।...

১৪ই জুন

ঠাকুর, তোমার নাম লইয়াই একদিন পথে বাহির হইয়াছিলাম, আজও পথ বহিয়া চলিয়াছি। সংসার ছাড়িতে চাহিয়াছিলাম, তুমি বলিয়াছিলে, 'কাজ আছে, সংসারে যাও'। কি কাজ আমার? তোমার জীবন ও দর্শন নিজ জীবনে আস্বাদন করিয়া বিশ্বে তাহা ছড়াইয়া দিব—ভাবিয়াছিলাম ইহাই আমার কাজ। কিন্তু সে কাজে কি আগাইয়া যাইতে পারিলাম? আমার যে তাহাই কাজ, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেও। আমায় সুযোগ করিয়া দেও। তোমার সেবা তো করিতে পারিলাম না। জীবনে এই দুঃখ রহিল। যে দর্শনের কথা আমি বলিতেছি তাহা কি আমার কল্পনা? কেমন করিয়া উহা আমার কাছে আসিল? আসিল যদি তবে কেমন করিয়া উহা মানুষের কাছে উপস্থিত করিব? ভাবিয়া কূল পাইতেছি না। আমায় পথ দেখাও।...আজ সকালে ৮টার পর অতীন্দ্র চক্রবর্তী একতলায় আসেন। উহার সঙ্গে ২ ঘণ্টারও বেশী কথা হয়। বিশ্বরূপ দর্শন সম্বন্ধে। ছাদের উপর গীতা পাঠের প্রসঙ্গও তুলি। একটা তাড়না যে আমায় পাইয়াছে যাহার জন্য আমার জনসমুদ্রের মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িতে ইচ্ছা হয় তাহার কি উপায় করিব? চুপচাপ থাকিতে তো দেয় না—'খাইতে সোয়াস্তি নাই, নিদ নাই চোখে' ইহা আমি বুঝি।...

১৫ই জুন

ঠাকুর, এ-দেশের ও-দেশের সকল সাধক সিদ্ধ, সকল সাধারণ মানুষ চলিয়াছে প্রকৃতির স্পর্শ এড়াইয়া প্রকৃতির

ওপারে ভগবানকে পাইতে—আমি তো তাহাদের কেউ নই। আমি চলিয়াছি ভিন্ন পথে—প্রকৃতির সকল মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া প্রকৃতিরই বুকে প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার পথে। এই পথে কেহ আমার সাথী নাই তুমি ছাড়া। সব আলো আজ আমার সামনে নিভিয়া গিয়াছে। সকল পথ আজ আমার সামনে বিলুপ্ত। এই অমানিশার অন্ধকারে শুধু কালীর ব্রহ্মজ্যোতি আমার সামনে। আজ আমি শ্মশানে শিবসাধনায় নিযুক্ত। এই পথে আমি একা—ইহা আমার গর্ব। একদিন এই পথে মানুষ আসিবে, ইহাকে উন্নততর করিয়া গড়িবে। তবুও আমিই প্রথম এই পথে চলিলাম। ইহা একারেই বিজয় অপেক্ষাও কঠিন। সেই অসাধ্য সাধন শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ কৃপায় আমি করিয়াছি। এই পথের জীবন আরও পরে পরিস্ফুট হইবে অনেকের মধ্যে, তবুও আমি এই পথের প্রবর্ত্তক। ইহাই আমার সার্থকতা।...মঠের সম্বন্ধে কিতীশের সঙ্গে আলোচনা হয়। মঠ সম্বন্ধে তাহারা নিরাশ। কাজ করিবার কাহারও কোনও উৎসাহ নাই। বাহিরে যাহারা মঠ করিয়াছেন তাহারা তাহা লইয়াই ব্যস্ত। মামুলী পথ ধরিয়া, চলিয়াছে, ভবিষ্যৎ বলিয়া ইহাদের কিছু নাই। কোম্পানির কাগজ বিক্রী করিয়া যেনা শোধ হইয়াছে। দোকানঘরগুলির আয়দ্বারা এখন মঠ একরূপ ভালভাবে চলে। সুশীলা এই মঠের সেবাকাজের জন্য ২০০০৲ টাকা ও পানিহাটির জন্য ১০০০৲ টাকা দিয়াছে। ঠাকুর মন্দির মেরামতের চেষ্টা চলিতেছে। শতবার্ষিকীর কোনও সাড়া শব্দ নাই। জনরঞ্জনবাবু নীরব।... ১৬ই জুন

ঠাকুর, তোমার কৃপায়ই তোমার চরণ আশ্রয় পাইয়াছি, তাহাতে কি কম দায়িত্ব বর্ত্তাইয়াছে? তুমি যে জীবন ও দর্শন লইয়া আসিয়াছিলে, তাহাকে সমাজ-শরীরে ছড়াইয়া দিবার নৈতিক দায়িত্বও কি তোমার আশ্রিতদের প্রত্যেকেরই উপর নয়? তোমার mission কি ভাবে চলিবে যদি না একটী সুপরিকল্পিত দর্শন তোমার জনদের ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠে? শতবার্ষিকী মঠে গিয়া তোমার সেবকদের মুখে শুনি—'মঠের ভবিষ্যৎ অন্ধকার'। উহা কি অশেষের ঠাকুর-বাড়ী হইবে? তোমার জীবন ও দর্শনের আলোচনা কোথায়? কে তোমার 'শতবার্ষিকী' করিবে? উহা আজিকার দিনের একটা রেওয়াজ হইলেও উহার একটা সার্থকতা তো আছে। একশতটী বৎসর গেল তোমার আসার পর, তোমার কথা কেহ তেমন করিয়া জানিল না, ভাবিতে বড় ব্যথা হয়! হাজার হাজার শিষ্য হইলেই কি তোমার আদর্শ দাঁড়াইবে, প্রাণ বাঁধিবে? তোমার জীবন তখনই দাঁড়াইবে, যখন তাহার বিপ্লব গাঢ়ে মানিয়া সমাজ নূতন রূপে গড়িয়া উঠিবে। কত দূরে সে দিন ঠাকুর? আমি যে বড় ব্যাকুল। আমাকে সার্থক কর, আমি তোমারই। রেণু প্রুফ দেখে।...রেণু কলিকাতা হইয়া চটার ফেরে।

১৭ই জুন

ঠাকুর, যখন সর্ব্বত্র পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে ঘন অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে, তখন তুমিই আমার সামনে একমাত্র আলো, যাহার দিকে চাহিয়া চলিতে পারি। তুমি সমন্বয়-মূর্ত্তি; তোমার আলো সমন্বয়ের আলো—জড়-অজড়, এ-দেশ ও-দেশ সমন্বয়ের আলো। আমি আজ একা হইয়া পড়িয়াছি, সকলেই প্রায় আমায় ছাড়িয়াছে। তুমিও একা, আমিও একা। এই দুই একা এক হইয়া আমরা নবীন সৃষ্টি করিব—এই আশায় বুক বাঁধিয়াই তো পথে নামিয়াছিলাম। তুমি-আমি এক অদ্বৈত। তোমার আমার নিবিড় অদ্বৈত-মিলনের মাঝে নবীন বিশ্ব গড়িয়া উঠুক। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী হইতে 'Philosophy of Radhakrishnan' বইখানি রেণু নিয়া আসে। প্রতিভা শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ পড়িয়া শুনায়।...

১৮ই জুন

ঠাকুর, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ বলিয়াই সারা জীবন ঝড় ঠেলিয়া চলিয়া আসিতে পারিলাম; পথের বাঁকে বাঁকে তুমি দাঁড়াইয়া ছিলে। সামনে যেখানে অন্ধকার, পথ ছিল না, তুমি সেখানে হাত ধরিয়া আগাইয়া দিয়াছ। জীবনভর ইহাই তো দেখিলাম। আজ যে অন্ধকারের ভিতর দিয়া চলিয়াছি, তাহারও কূল পাইব

নিশ্চয়। যেসময় যে প্রতিষ্ঠা আমার জন্ম একদিন গড়িয়া তুলিয়াছিলে, আবার কি তাহা আসিবে না? ঐরূপ প্রতিষ্ঠা না আসিলে কাজ হয় না। মানুষের হৃদয়ে আমার একটু স্থান সঞ্চিত আছে, সেইটুকুকে কি তুমি প্রসারিত করিয়া দিবে না? তোমার জীবন ও দর্শনের একটি প্রবেশ আনিবার জন্ম আমার প্রাণ যে ব্যাকুল, তুমি কি সেই ব্যাকুলতা সার্থক করিবে না?…

১৯শে জুন

রাধারাণী, তুমিই এই বিশ্ব-ব্যবস্থার 'last term'। তোমার জীবনের দিকে চাহিয়াই অতীতের সব নায়িকার চরিত্র বুঝিতে হইবে। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষিত মনোবৃত্তির যে রূপ প্রাকৃত নায়িকাদের জীবনে সাহিত্যিক কবিগণ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা কি পার্থিব নায়িকাদের জীবনে সম্ভব? যে 'soaring imagination' লইয়া তাঁহারা এই ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা flexible দেহ মন না হইলে হয় না। তুমিই সেই বিশ্লবময়ী নমনশীলা ছবি, যাহার জীবনে সব কিছু ভাব সম্ভব হইয়াছে। অতীতের সব নায়িকা আজ তোমাতে বাস্তব। সকল কবির কবি-কল্পনা রক্তমাংসময় তোমার দেহে বাস্তব। তুমি তাই মহাভাবস্বরূপিণী। তুমি আমার জীবনে ঐতিহাসিক সত্য। তোমাকে কল্পনার সামনে রাখিয়াই কবিগণ প্রেমলীলার সাহিত্য লিখিয়াছেন। তুমিই বিশ্বপ্রকৃতির চরম সার্থকতা।…বিকালে বেলা হইতে যীশুর বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক আসেন তত্ত্বালোচনা করিবার জন্ম। আপনার হইলে অর্থ ও পরমার্থ দুই-ই মিলে। ভগবানের আসন হইতে হইলে ভক্তের আসন হইতে হয়। সব তাই প্রয়োজন। আসিতে বলিলাম।

২০শে জুন

ঠাকুর, তুমিই বিশ্বের সামনে প্রাণের পথের উন্মোচনের বার্তা সর্বপ্রথমে ঘোষণা করিয়া গেলে। আমি এই পথ ধরিয়া চলিয়াছি। আর কি যাত্রী নাই? তুমিই আদি যাত্রী, সর্বপ্রথম পথ প্রদর্শক। যেখানে আছি সেখানে আমার ভাষা কেহ বোঝে না, কাহারও ভাষা আমি বুঝি না। প্রাণের পথ চলিয়াছে দুই কূলের মাঝ দিয়া—I am between Scylla & Charybdis। আসক্তি অনাসক্তির মাঝ পথ দিয়া চলিয়াছি। নিজ সন্তানদের সঙ্গের সম্পর্ক প্রায় প্রাক্তিহাসিক সত্তার মত হইয়াছে। মনু আমার সঙ্গে সঙ্গে শিরোমণিপুর, খুলনা কত জায়গায় গিয়াছে। আর আজ? সে যেন 'কেউ নয়' মত হইয়াছে। আমি কাহাকেও ছাড়ি নাই, আমাকেই সবাই ছাড়িয়াছে। আমার তো সকলকেই প্রয়োজন ছিল। আমার নিত্যগোপালকে সামনে রাখিয়া সকল সম্পর্ক নির্ধারণ করিতে হইবে।…

২১শে জুন

ঠাকুর, তোমার আমার পৃথক ভাব ঘুচিয়া যাউক, তুমি-আমি এক হই। আমি তোমার নয়নে তোমাকে দেখিব, আমাকে দেখিব, বিশ্বকে দেখিব; তোমার মনে মনন করিব। আমি নির্বিকল্প হইব। তুমি-আমি এক-ভত্ত, এক-প্রাণ, এক-মন, এক-বিজ্ঞান ও একানন্দ হইব। তোমার রাতুল চরণময় হইয়া আমি চলিব। তোমার দর্শন ও জীবন লইয়া সমাজের মধ্যে ঝড় বহাইব, সমাজের সব অশুচি দূর করিব—ইহাই ছিল আমার কাম্য। তাহা কি পূরণ হইবে না? 'আমি-তুমি-তিনি'র যে ভাবে তুমি অদ্বৈততত্ত্ব স্থাপন করিয়াছ তাহা অতি মধুর। আমাকে এত রকম করিয়া দেখিতে পারিলে 'আমি'র আমিত্ব উপাধি ঘোর কাটিয়া যায়। আমি ব্যবহার ক্ষেত্রেই আত্মজ্ঞান লাভ করি, আমি-আত্মা এক হইয়া যাই। Descartes-এর cogito ergo sum তখন আর নিঃসন্দিগ্ধ proposition থাকে না। ত্রিকোণ-এর এক প্রান্তে আমি যেমন সত্য, তুমি-তিনি ঐ অপর কোণদ্বয়ও সত্য। তোমার দর্শনের জয় হউক।…

২২শে জুন

নিত্যগোপাল, জীবনের ধ্রুবতারা আমার, সকল পরিণামকে পরিপাক করিয়া ওগো অপরিণামী আমার, তরঙ্গায়িত এই সংসার-সমুদ্র ভেদ করিয়া আজও চলিয়াছি, বিচলিত হইয়া যে পড়ি নাই, সে শুধু তোমারই অনিমেষ চাহনির ফলে। তুমি আছ আমার সঙ্গে, তাই ডুবিয়া যাই

নাই, তলাইয়া যাই নাই। সকল জটিলতাকে স্বীকার করিয়াই তো চলিয়াছি, অথচ জটিলতা আমাকে গ্রাস করিতে পারে নাই। প্রাণের পথের খোঁজ আমি পাইয়াছি। সেই পথ ধরিয়াই তো চলিব। পথের এধারে ওধারে উঁকিঝুঁকি দাও যেন কখনও জাগ্রত না হয়। আসক্তি অনাসক্তির মধ্য পথে থাকিয়া চলিব। তোমার সেহদৃষ্টি অক্ষয়যুক্ত হউক।···

২৩শে জুন

ঠাকুর, জগন্নাথ আমার···তোমার জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে আমি তোমার সহযোগিনী হইব, তোমার বিশ্বকর্মের ভোক্তা হইব, তুমি আমি এক হইব; তোমার কিঙ্কর মহানির্বাণ লাভ করিয়া, তোমার যাবতীয় প্রচেষ্টার লীলায় আমি-তুমি একতনু হইয়া চলিব—ইহাই ছিল এবং আছিও আছে আমার লোভ। আমি যেভাবে তোমাকে চাই, তুমি তো তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলে। আমাকে কি তোমার সঙ্গে এক করিয়া দিবে না? আমার তো ইহা ছাড়া আর কাম্য নাই। যে বার্তা লইয়া তুমি আসিয়াছ, সেই বার্তা বহন করিয়া বিশ্বের বুকে ছড়াইয়া দিবার উপযোগী শক্তি কি আমাকে দিবে না? আমি তোমার শক্তিতে অনন্ত শক্তিধর হইব। আমাকে বল দেও, বুদ্ধি দেও ধনজন দেও তোমার সেবার জন্য।···শ্যামাপ্রসাদের মৃতদেহ এখানে পৌঁছে ১১·টার পর। বাজারের ওধার হইতে শীতলাতলা পর্যন্ত শুধু নরমুণ্ড। যেন দেখিতে। অনেক দিন এমন দেখি নাই। আমার প্রথমবার জেলে যাইবার সময় ঐরূপ দৃশ্য হইয়াছিল।···বীরেন সুবোধ (বীরেন চৌধুরী, সুবোধ চট্টোপাধ্যায়) বৃষ্টিতে ভিজিয়া আসিয়াছে। কে ইহারা? এমন বান্ধব সংসারে কয়জন আছে যে যাহারা অযাচিত ভাবে আমার অজ্ঞাতসারে হাসপাতালে seat ঠিক করিয়া আসে?

২৪শে জুন

ঠাকুর আমার, তোমার দর্শন ছাড়া বর্তমান যুগ আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইবে কি করিয়া? তাহার পক্ষে জড় বা অজড় কোনও দিকেই তো ঝুঁকিয়া পড়া চলিবে না। উভয় দিকই তো পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে। কোনও এক দিকই জীবনের সকল ঘটনার মীমাংসা দিতে পারে না। কিন্তু এই পথের খবর তো পৌঁছানো গেল না, কলিকাতা মহানগরীর এক কোণায় বসিয়া টিং টিং করিয়া চলিয়াছি। ইহার নাম কি চলা? ঝড়ের মত ছুটিতে পারিতাম, তবে সাধ মিটিত, কাজও হইত। কিন্তু কেমন করিয়া ঝড় বহাইব? ঝড় ছাড়া এত ব্যাপক অবসন্নতা, দুর্নীতি কি দূর করা সম্ভব? ওগো আমার ঝড়ের ঠাকুর, ঝড় নিয়া আইস, আমি ঝড় মাথায় করিয়া চলিব। তোমার অবতরণ সার্থক হউক।···

২৫শে জুন

ঠাকুর, সপ্তরথী পরিবেষ্টিত অভিমন্যুর মত আজ আমি ঘটনার চাপে জর্জরিত। তুমি একদিন নবদ্বীপ ঘাটে শুনাইয়াছিলে, 'ভয় কি? টেনে তুলব'। আমি তোমার চরণের কাছে পড়িয়া রহিলাম। আমার সকল আবেষ্টন পরিপাক করিয়া আবার আমাকে দাঁড়াইতে দেও, ছুটিতে দেও। আমি তো তোমার নাম লইয়াই বাহির হইয়াছি, তোমার দর্শন আমার বহিয়া চলিয়াছে। আমায় বল দেও, বুদ্ধি দেও, শক্তি দেও। আমি তোমার, আমি তোমার। ···গোপার জন্যই নূতন করিয়া স্নান করা। আর সে আসিয়া পড়িয়াছে, আমরা আনি নাই। তাহার আসার জন্য আমরা দায়ী নই। এখন তাহার 'আসা'কে সার্থক করা কর্তব্য। বৃষ্টির মধ্যে সুবোধ আমার ছাতা নিয়া যায়। তাহার দেওয়া ছাতাটি মেয়ামতের জন্য রাখিয়া যায়। একটা ছাতা দিলে হয় না? আমারটাই দিয়া দিব মনে হইতেছে।···

২৬শে জুন

ঠাকুর, তুমি যে-পথ ধরিয়া চলিয়া গিয়াছ, ওগো তথাগত আমার, আমিও সেই পথ ধরিয়া চলিব—সে পথ সংসারীদের একান্ত আসক্তির পথও নয়, অসংসারীদের একান্ত অনাসক্তির পথও নয়। আমি 'দিশন্ত অনবলোকয়ন্' কোনও দিকে না চাহিয়া শুধু তোমার শ্রীচরণ অনুসরণ করিয়া চলিব। সেই পথে চলিতে চলিতে যত বাধা, যত

প্রতিকূলতা আসুক, তোমায় আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া চলিব। ভাবিয়া অবাক হইতে হয় আমার কল্পনা কেমন করিয়া একটির পর একটি জানিয়াছে, আর সেই জানের ব্যাপদেশে তুমি হাত ধরিয়া আগাইয়া নিয়া আসিয়াছ। বি, এ ফেল করা, দোকান দেওয়া, দোকান ছাড়িয়া বৃন্দাবন যাওয়া, ৩ মাস পর কলিকাতা আসা, ঠাকুরের নির্দেশে কাঁকুরগাছি যাওয়া, ব্রজমোহনের চাকুরী, ৮ বৎসর পর তাহা ত্যাগ, কলিকাতা আসা, বেহালের জমি লেখা, কংগ্রেসে যোগদান, কংগ্রেস ছাড়িয়া স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ গঠন, কলিকাতায় গৌরাঙ্গগোষ্ঠী গঠন, আবার সন্ন্যাস লইয়া বৃন্দাবন যাত্রা, ২৪০ বৎসর পর লবণ আইন অমান্যের জন্য বাঙ্গলায় আসা, বরিশাল ছাড়িয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া কলিকাতা আসা, নরনারায়ণ আশ্রম, আবার এখান হইতে বাহির হইয়া টালিগঞ্জ, আবার ৮-এতে ইহাদের মধ্যে থাকা, থাকিয়াও নীচে প্রতিজনের সঙ্গে যাওয়া। আমার সব কল্পনা-জল্প হইয়াছে। তোমার জয় হউক, আমার অগ্রগমন, আমার মুক্ত গুরুমুক্ত হউক। ১২টার বাকি উজ্জলভারত দিয়া যায়।...বেহালা হইতে সেই ভদ্রলোক আসেন যিনি গত শনিবারও আসিয়াছিলেন। কাহারও সঙ্গে কথা বলিয়া তৃপ্ত হয় না। তাহাদের সঙ্গে কোথায়ও মিল নাই। এমনই এক চিন্তাধারা লইয়া পড়িয়াছি।

২৭শে জুন

ঠাকুর, জীবনের চারিদিকে যেরূপ ঘটনাসমূহ জড়াইয়া ফেলিতে চাহিতেছে, তাহাতে তোমার রাতুল চরণ বুকে লইয়া পড়িয়া থাকা ছাড়া আর উপায় আছে কি? এই ঝড়ের মধ্যে তুমিই আমার নঙ্গর। তোমার সঙ্গেই জীবন গাঁথিয়া রাখিব। ঝড়ের আঘাত বার বার লাগিলেও তাহা প্রতিহত হইবে। তুমিই সকল ঘটনার ব্যাখ্যান মূর্ত্তি। আমার জীবনের সকল ঘটনার ব্যাখ্যা হউক। আমি আগাইয়া যাই তোমার জীবন ও দর্শন লইয়া। যাহা-কিছু সামান্য অর্থ আসিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ হইল; লোক নাই, কেহ আগাইয়া আসে না, বরং বাধাই দেয়। অথচ তোমার পথ ধরিয়া চলিতে তো হইবে। তোমার স্নেহ আদর আমার জীবনে সার্থক হউক। খুব ভোরে ৪টায় রেণু প্রতিভা ধীরেনের ওখানে যাব ...৩।০টার পর পাঠ হবে আষাঢ় মাসের 'শতবার্ষিকীর স্মৃতি পূজার প্রস্তুতি'।...

২৮শে জুন

ঠাকুর, আমার সারা জীবনের সঙ্গী, জীবনের সকল পরিণামের ভিতর তুমি অপরিণামী, তুমি বিশ্বের balance রক্ষা করিয়া চলিয়াছ। তুমি পরিণামময়ী এই বিশ্বের স্থিতি। তোমার জীবনে জীবন মিলাইয়া আমিও চাহিব আমার জীবনের স্থিতি, যাহা আজ সকল ঝড় ঠেলিয়া চলিতেছে। তোমার সঙ্গে যুক্ত থাকিলে সব কিছু পরিণাম বিকার পরিপাক প্রাপ্ত হইবে।... রেণু বলিতেছিল, 'আপনার সব তো নিঃশেষ হইল। আপনার অসুখ হইলে কি করিবেন?' আমি বলিলাম, 'গোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধ যিনি গলায় ধরা বাঁধিয়া করিয়াছিলেন, তিনিই করিবেন। তিনি আমার পুত্র বন্ধু'। আলোচনা করিতে করিতে প্রাণটা ভিজিয়া গেল। ...রেণু সোহাগিসে বাকী উজ্জলভারত দিয়া ব্যাঙ্ক, অগদীশ প্রেস, হিন্দুস্থান, বাসন্তী বাইণ্ডিং হইয়া আসে ৩ টার পর। সন্ধ্যার পূর্বে সত্যব্রত আসে। জুলাদীর জ্বর কাল ১০৪ হইয়াছিল। আজ ১০১। রেণু সত্যব্রতকে নিয়া সুবোধ ডাক্তারের ওখানে যায়... বৈকালে অতীন বাবু আসেন। ...তাহার সঙ্গে পুরুষোত্তম দর্শন, মাটির দর্শন আলোচনা হয়।

২৯শে জুন

ঠাকুর, কতদিন হয় চলিয়া গিয়াছে, আমি একা পথ বহিয়া চলিয়াছি। আর কি আসিবে না? আজও তোমার প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া আছি। তোমার জীবন ও দর্শন বুকে লইয়া চলিব। ঠাকুর, বড় বেদনা আমার বুকে। তোমার প্রতিষ্ঠার জন্য ছুটাছুটি করিলাম। কৈ, কিছুই তো করিতে পারিলাম না। সবাই আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। আজ আমি একা, একেবারে একা। আমি সবাইকে মুক্তি দিয়াছি, সবাই আমাকে মুক্তি দিয়াছে। আমার হৃদয় কেহ বুঝিল না। ...এর সঙ্গে তাহার আমাকে চিঠি না দিয়া

ও পীপ্তির বাবার কাছে চিঠি দিয়া আসার প্রসঙ্গ তুলিয়া প্রাণ সরল করার উপদেশ দেই। দিনপঞ্জী লিখিতে লিখিতেই সত্যব্রত ধীরেন ডাক্তারসহ এখানে পৌঁছে।... ধীরেনকে টাকা দিতে চেষ্টা করি, সে নেয় না।...

৩০শে জুন

ঠাকুর, তোমারই চরণতলে আমি স্থির হইয়া বসিব, তুমিই আমার স্থিতি-ভূমি। এই উত্তাল তরঙ্গায়িত ঘটনার সমুদ্রে আমি তোমার চরণ বুকে লইয়া স্থির হইয়া থাকিব। সমস্ত ঘটনাকে—তাহা যতই প্রতিকূল বলিয়া প্রতিভাত হউক না কেন—আমারই জীবনের অপরার্দ্ধ বলিয়া উপলব্ধি করিয়া পরিপাক করিব, সকল কাল-পরিণাম গায়ে মাখিয়া আমি চলিব। আমি তোমাকে বিশ্বাস করিব, তোমার উপর নির্ভর করিব, তোমার বিশ্বকে বিশ্বাস করিব। তুমি আমার জীবনের আলো—চিৎ-জ্যোতি, প্রেমঘন জ্যোতি। সকল চন্দ্র তারকা সূর্য যখন নিভিয়া যাইবে, সেই মহা অন্ধকারের মাঝে তুমিই আমার উজ্জ্বল দীপশিখা, ওগো আলো, আমার জীবনের আলো। সত্যব্রত ১১টায় পর আসিয়া কৃষ্ণগোপালকে নিয়া যায়। রেণু না খাইয়া বাহির হইয়া ব্যাঙ্ক, রাইটার্স বিল্ডিং প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া ১ টায় ফেরে। ৬২ টাকা স্কুলে পত্রিকা পাঠাইবার সম্মতি পাওয়া গিয়াছে। রেণুর জন্ম-দিবসের জন্য ঠাকুরের মালা আনে। সন্ধ্যার পর ৭টি শিশুকে নীচে...খাইবার বন্দোবস্ত করা হয়। রেণু আজই রেশান অফিসে গিয়া কুসুমের কার্ড করাইয়া নিয়া আসে। রেণু অনেক কিছু পারিবে যদি সে তাহার সামান্য সামান্য ত্রুটিগুলি শোধরাইয়া লয়। আজ এ সম্বন্ধে অনেক কথা সকালে হয়।... যে ৩০ টাকা দিবে বলিয়াছিল তাহা আজও দিল না। ত্রিশ টাকার মধ্যে কিছু নাই, কিন্তু মনোবৃত্তির জন্য আজও দুঃখ পাই...। আজ ১৭ই আষাঢ় রেণুর জন্মদিন।

১লা জুলাই

ঠাকুর, তোমার শ্রীচরণতলে বসিয়া সেই ভীকাই লাভ করিয়াছি যাহার ফলে জীবনের অগ্রগতির পথের সাধনের বাধা প্রতিবন্ধকগুলি পরিপাক করিয়া অগ্রসর হইতে পারি। একদিন ছিল বাধা হজম না করিয়া পিছনে সরিয়া আসার সাধনাই। ইহাই 'উজান পথ', অর্জুন এই পথ ধরিয়া চলিতে চাহিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম যেন নাই। ভীষ্ম দ্রোণের প্রতি যে শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল, তাহাও তো ছিল পুরুষোত্তম নিহিত পথে চলিবার পক্ষে বাধা। অর্জুন তাহা অতিক্রম করিতে না চাহিয়া চাহিয়াছিলেন retro-gressive পথে চলিতে। আমি আগাইয়া চলিব, শক্তি দেও। তোমার এই নূতন পথের খবর দিয়া যাইতে পারিলাম না—ইহাই দুঃখ। 'নিত্যগোপাল ইন্‌স্টিটিউট অব কালচার'-এর মাধ্যমে এই 'পথে'র খোঁজ কি দিয়া যাইতে পারি না? দিন যে গেল ঠাকুর। আজ আমার নিত্যব্রতর জন্য রাত্রে'...রেণু...বাহির হয়, ফেরে ১২ টার পর। আবার বাহির হয় ৬ টার পর ছাওড়া কুষ্ঠ কুটীরের বিজ্ঞাপনের জন্য—এক মাস অন্তর যেয়।...

২রা জুলাই

ঠাকুর, তুমি নিজ শ্রীমুখে বলিয়াছ, 'অহং, তুমি যখন যেখানে আছ আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি'—ইহাই আমার শান্তি—দুর্গম এই পথে চলিবার মন্ত্র। তুমি সঙ্গে সঙ্গে আছ, তাই আমি নিশ্চিন্ত থাকিব, আমার জীবনের প্রতিটী ঘটনাকে মূল্য দিয়া তাহার ভাগবত রূপ বিধান করিয়া তুমি চলিয়াছ—ইহা তো সারা জীবন ভরিয়াই দেখিলাম। আমার যাহা কিছু ভুল তাহাও তো কৌশলী তোমার হস্তস্পর্শে শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, জীবনপথে অগ্রসর হইবার সহায়তা করিয়াছে। তুমি আমার জীবনে, জীবনের সকল কর্মে জ্ঞানে আনন্দে অন্তর্যুক্ত হও। সন্ধ্যার পর ধীরেন ব্যানার্জী আসেন এক ভদ্রলোকসহ। মহাভারতের কথা হয়। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি একটি শ্লোক লিখিয়া দেন, 'ক্ষণমেতৎ প্রযুঞ্জং মে নাশিসর্পতি হৃদয়াৎ' ইত্যাদি। নীলুর এক চিঠি আসে। ইহাদের জন্য আমার প্রাণটা কেমন করে। কাছে কাছে থাকিত! আজ সরকারী স্কুলগুলির উজ্জ্বলতারত তাকে দেওয়া হইল।

৪র্থা জুলাই

জ্যাঠামণি আমার, তুমি জাতির বন্ধন, কুলের বন্ধন, ছিঁড়িয়া, সর্বোপাধি বিনির্মুক্ত হইয়া জাতি

কুল শীলের উর্দ্ধে উঠিয়া একটী মুক্ত জীবন প্রবাহরূপে ছুটিয়া চলিয়াছ, তাই তুমি জাতি কুল শীলকে পুরুষোত্তমঘাটে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছ। উর্দ্ধে না উঠিলে তো সৃষ্টি করিতে পারে না। সামাজিক বিধি তাহাদের সমাজ বাহিরের সকলের সঙ্গে এক স্তরে রাখে না, নীচে ঠেলিয়া দেয়। তাই উর্দ্ধে উঠিতে হয়। তবুও সমাজ প্রথমে তাহাকে কলঙ্কিনী বলে, কিন্তু শেষে তাহাকে পূজা করিতেও বাধ্য হয়। আমি 'হিন্দি' জানিয়াছি, জীবনের স্তরেও উঠিয়াছি এবং সেই স্তরে উঠিবার জন্য সকলকে আকর্ষণও করিতেছি। ট্রামের নিম্ন শ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আজ হরতাল। ইহার মধ্যে শঙ্কর ঘোষ-লেন হইয়া পায়ে হাঁটিয়া পাবনার ক্ষিতীশ বিশ্বাস মহাশয় আমার সঙ্গেই দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। খুব ভাল লাগিল, বুকে জড়াইয়া ধরিলাম। ইহাদের সঙ্গে একটা অকৃত্রিম ভালবাসার সম্বন্ধ।··· নিত্যব্রতের জ্বর কেন হয়, ইহা তো স্থির হইতেছে না। কি করিব? রাত্রি ১২টায় পর ঘুম ভাঙিয়া গেলে অনেকক্ষণ বারান্দায় পায়চারি করি।···

৪ঠা জুলাই

রাধারাণী, বিশ্বপ্রকৃতির চরম ও পরম সফলতা বলিয়াই তুমি পরাপ্রকৃতি। তোমার জীবনে বিশ্বের প্রতিটি কণা তাহার সবটুকু লইয়া সার্থক। তুমি সকলের সব প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির স্বরূপমূল্য দিয়া সকলকে সম্বন্ধযুক্ত করিয়া রাখিতে চাহিতেছ। তাই তুমি জাতি-কুল-শীল ছাড়া। তোমাকে তো পাইলাম তোমার অযাচিত করুণায়। কিন্তু তোমার প্রতিষ্ঠান তো গড়িয়া তুলিতে পারিলাম না বিশ্বের বুকে। আমার বুকের ধন তোমাকে বিশ্বের সকল প্রকৃতির মাঝে দেখিতে চাহিয়াছিলাম। দেখা দেও, দেখা দেও।···সন্ধ্যার পর অতীনবাবু আসেন···বিশ্বরূপ সম্বন্ধে কি করা যায় তাহার আলোচনার জন্য। কমিটী করার পক্ষে আমি মত দেই না, একবার তো করা হইয়াছিল, কাজ কিছু হয় নাই। যার কাজ সে করিলে হয়। তার হইলে পর অত নাচিতে আসে যায়।···

৫ই জুলাই

ঠাকুর, আমার ইহ পরকালের সম্বল, আমার এই দুর্গম পথে একা চলার সাথী, আমার সকল স্নেহ প্রাণ মন লইয়া তোমাকেই জড়াইয়া রহিব। আমার সকল তোমাতে নিহিত থাকুক, তুমি আমার জীবনে প্রকাশিত হও। তুমিই আমার আমি। আমার আমি তোমার আমিতে গড়িয়া উঠুক। আমাকে কি এই প্রতিকূল আবেষ্টন এই ভাবে ঠেলিয়াই চলিতে হইবে? আর যেন পারিতেছি না। ঠাকুর, আমাকে হাত ধরিয়া আগাইয়া নিয়া চল।··· খুব ভোরে আমি ও স্নেহ সুবোধের বাসায় (হাজরা রোডে) যাই, তখন টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। কাল রাত্রিতে আটটায় নিত্যব্রতের জ্বর হয় ১০১°৪।···স্নেহ ১টায় বাহির হইয়া···ফেরে ৫টার পর।···উষাজিদী তাহাদের বাজার করে নিত্যব্রত অসুস্থ হইবার পর হইতে।···

৬ই জুলাই

ঠাকুর,···যখন কেহ আমার কাছে থাকিতে চায় না তখন এইমাত্র সান্ত্বনা যে তুমি কত আমাদিগকে কাছে কাছে রাখিতে চাহিয়াছ, ১দিন যদিন করিয়া এ ছুতা ও ছুতা করিয়া আসিতে দেও নাই! তোমার আদর-করুণায় আর্দ্র নয়ন, হাসিভরা মুখ, স্নেহপূর্ণ আবাহন জীবনের মণি কোঠায় পুরিয়া রাখিয়াই তো চলিয়াছি। কেউ জানে না, কেউ জানিতেও চায় না যে উহাই আমার জীবনের একমাত্র সম্বল। আমার যাহা কিছু আরিজুরি, সবই তো তোমাকে লইয়া। তুমি আমার জীবনে ওতপ্রোত হও। ৯৷১০টার পর সুবোধ ও ধীরেন আসে। নিত্যব্রতের জ্বরের কারণ ঠিক বুঝিতেছে না।···

৭ই জুলাই

ঠাকুর, তোমার পতাকা বহন করিয়া চলিব, তেনসিংএর মত দুর্জয় একারেই খুঁজে উহা প্রোথিত করিব—ইহাই ছিল সারা জীবনের কামনা। হয়ত ভাবের ক্ষেত্রে তাহা করিয়াছি। কিন্তু বাস্তবের দেশে সেই পতাকা কি প্রোথিত করিতে পারিলাম?

ক্রমশঃ

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

॥ শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

সত্তা রূপের সঙ্গে এক করিয়াছেন, তিনিই সত্য। যিনি স্থিতি গতির সমন্বিত সত্যবস্তু, তিনিই বাস্তব (real) পর সত্তা, অব্যভিচারী সত্য, প্রকৃতি-পুরুষ সমন্বিত পুরুষোত্তম 'পর সত্য'] জ্ঞানম্ [অববোধস্বরূপ-অববোধরূপ ; যে জ্ঞানে জ্ঞাতৃ—জ্ঞান—জ্ঞেয় এই তিনটী অনন্ত ব্যবধান লুপ্ত, সে জ্ঞান জ্ঞানই নহে ; যে জ্ঞানে ঐ তিনটীর প্রত্যেকটী গলিয়া গিয়া পরস্পরের রূপে রূপান্বিত হইয়া অন্যোন্য-মিথুন ভাবে অবস্থিতি করেন, সেই জ্ঞানই জ্ঞান, ব্রহ্ম] অনন্তম্ [আপেক্ষিক সব দেশ-কাল-বস্তুকে যত দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা সম্ভব, সেই সব দৃষ্টিকোণ হইতে যত দর্শন সম্ভব, সব দর্শনকে যথাযথ অব্যাহত রাখিয়া যিনি সর্ব্বদর্শনের সমন্বয় বিধান করিয়াছেন, তিনিই দেশ-কাল-বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন অনন্ত বস্তু ; অনন্তে ব্রহ্মও অনন্ত ; মায়াও অনন্ত ; ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যতের সব 'অন্তে'র অন্তরে 'ন' রূপে লুকাইয়া থাকিয়া, প্রতি অন্তটীকে অনন্তায়িত করিয়া, প্রতি অনন্ত অন্তটীকে অন্য সব অনন্ত পূর্ণ অন্তের মাঝে জুড়িয়া যিনি পূর্ণ অন্তসমূহের যাসচক্র রচনা করিয়াছেন, তিনিই অনন্ত,] ব্রহ্ম [ব্রহ্মকে] যঃ [যিনি] বেদ [জানেন] নিহিতং [স্বরূপে স্থিত] গুহায়াম্ [দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির গোপনতম নিভৃত গুহা-প্রদেশে, বিশেষতঃ বুদ্ধিরূপ গুহাতে] পরমে ব্যোমন্ [হৃৎপুণ্ডরীকাকাশে] সঃ [তিনি] অশ্নুতে [ভোগ করেন] সর্ব্বান্ কামান্ [সর্ব্ব কাম যাহা বিচ্ছিন্নতার ওপারে ছিল নাগালের বাহির] সহ ব্রহ্মণা [ব্রহ্মের সাথে] বিপশ্চিতা [সর্ব্বজ্ঞ। সমান বৃক্ষে সমপ্রাণ সখ্যাসনে আলিঙ্গিত, দুইটী সুপর্ণ পক্ষী যাহাদের মধ্যে একজন একদিন অপরকে 'অনশ্নন্' অভুক্ত রাখিয়া নিজেই ভোগ করিতে-ছেন, যাহার ফলে সে 'অনীশ' হইয়া চরম হীনতাকে পাইয়াছিল, আজ সেই দুইটী পক্ষীই যুগল মিলনে সম-ভোগ করিয়া নিজে 'অনশ্নন্' থাকিয়া অন্যকে খাওয়াইয়া সকলের অন্তর্নিহিত সব ভোগাকাঙ্ক্ষার চরম সার্থকতারূপ নব্য ভোজন করিতেছেন] ইতি [মন্ত্রের পরিসমাপ্তি সূচক] ('ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি পরম্'—সমস্ত বল্লীর সূত্রস্থানীয় এই ব্রাহ্মণ বাক্য সূত্রিত ও পরবর্ত্তী মন্ত্রে সংক্ষেপে লক্ষিত বিষয়টির বিচার করা হইতেছে) তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ [উক্ত এই] আত্মনঃ [গতি-স্থিতি সমন্বিত বাস্তব ব্রহ্মবস্তু হইতে] আকাশঃ সম্ভূতঃ [আকাশ উৎপন্ন হইল] আকাশাৎ [আকাশ হইতে] বায়ুঃ [বায়ু] বায়োঃ [বায়ু হইতে] অগ্নিঃ। অগ্নেঃ [অগ্নি হইতে] আপঃ [জল] অদ্ভ্যঃ [জল হইতে] পৃথিবী [মৃত্তিকা] পৃথিব্যাঃ [পৃথিবী হইতে] ওষধয়ঃ [ওষধি সকল] ওষধিভ্যঃ [ওষধি সকল হইতে] অন্নম্। অন্নাৎ [অন্ন হইতে] পুরুষঃ [দেহধারী পুরুষ] সঃ বৈ এষ পুরুষঃ [উক্ত এই পুরুষ] অন্নরসময়ঃ [অন্নাট বাঁধা অন্নরস] তস্য [সেই পক্ষিসদৃশ পুরুষের] ইদম্ এব শিরঃ [ধড়োপরি স্থিত এই শিরই, মস্তক] অয়ম্ [ইহা, দক্ষিণ হস্ত] দক্ষিণঃ পক্ষঃ [ডান পাখা] অয়ম্ [এই, বাম হস্ত] উত্তরঃ পক্ষঃ [বাম পাখা] অয়ম্ [দেহমধ্য] আত্মা [দেহমধ্যভাগ] ইদম্ [নাভির অধোভাগ] পুচ্ছম্ প্রতিষ্ঠা [স্থিতিগতি সমন্বয়-সম্পাদক পুচ্ছ ; নৌকার হালের মত স্থিতি কিম্বা এদিক-ওদিক পরিচালক যন্ত্র] তৎ অপি [উক্ত বিষয়েই] এষঃ শ্লোকঃ ভবতি [এই শ্লোক আছে]

যিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনি 'পর'কে প্রাপ্ত হন। উক্ত বিষয়ে এই শুভ মন্ত্র আয়াত হইয়াছে—সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ব্রহ্মকে

যিনি পরম ব্রহ্ম পুণ্ডরীকাকাশের গুহাতে নিহিত বলিয়া জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সঙ্গে সর্বকাম ভোগ করেন। উক্ত এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি সমূহ, ওষধিসমূহ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইল। উক্ত এই পুরুষ অন্নরসময়। এই পুরুষের ইহাই মস্তক। এই দক্ষিণ হস্তই দক্ষিণ পাখা, এই বাম হস্তই বাম পাখা। এই দেহ স্বয়ই দেহ মধ্যভাগ। এই নাভির অধোভাগই স্থিতি-গতি সম্পাদক পুচ্ছ। উক্ত বিষয়ে এই একটী শ্লোক আছে। ২।১।৩

দ্বিতীয় অনুবাক্

অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ।
অথো অন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ।
অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে।
সর্বং বৈ তেঽন্নমাপ্নুবন্তি। যেঽন্নং ব্রহ্মোপাসতে।
অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে।
অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে। জাতান্যন্নেন বর্ধন্তে।
অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি। তস্মাদন্নং তদুচ্যতে ইতি। ২।২।১

অন্নাৎ বৈ [রসরূপে পরিণত অন্ন হইতেই] প্রজাঃ [জীব সমূহ] প্রজায়ন্তে [জাত হয়] যাঃ কাঃ চ [যত কিছু] পৃথিবীং শ্রিতাঃ [পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া আছে] অথো [অপি চ] অন্নেন এব [অন্নদ্বারাই] জীবন্তি [জীবন ধারণ করে ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়] অথ [অনন্তর] এনৎ [অন্নেই] অপি যন্তি [লীন হয়] অন্ততঃ [অন্তকালে] অন্নং হি [কেননা অন্নই] ভূতানাং [ভূত সমূহের] জ্যেষ্ঠম্ [অগ্রজ] তস্মাৎ [সেইজন্যই] সর্বৌষধম্ [সকলের ঔষধ, সকল দেহের গ্লানি-নিবারক] উচ্যতে [বলা হয়] সর্বং বৈ অন্নং [সর্ববিধ অন্নই] তে [তাহারা] আপ্নুবন্তি [প্রাপ্ত হন্] যে [যাহারা] অন্নম্ [অন্নকে] ব্রহ্ম [ব্রহ্মরূপে] অন্ন অন্নের সঙ্গে চিৎ রস-ঘন পুরুষের সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে ওতপ্রোত অন্ন-ব্রহ্ম-রূপে] উপাসতে [উপাসনা করেন, অন্ন-ব্রহ্মের তাদাত্ম্য আস্বাদন করেন। সর্বান্নপ্রাপ্তির কারণ এই যে—] অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে।] অন্নাৎ [অন্ন হইতেই] ভূতানি জায়ন্তে [ভূতসকল জন্মে] জাতানি [জাত হইয়া] অন্নেন [অন্নদ্বারা] বর্দ্ধন্তে [বর্দ্ধিত হয়] অদ্যতে [ভক্ষিত হয়] চ অত্তি ভূতানি [এবং নিজেই ভূত সমূহকে ভক্ষণ করে] তস্মাৎ [সেই জন্য] তৎ [উহা] অন্নম্ উচ্যতে [অন্ন নামে উক্ত হয় [ইতি [অন্নময় কোশের পরিসমাপ্তি সূচক]

যা-কিছু পৃথিবীর আশ্রিত, সব জীবই অন্ন হইতে জন্মে, অন্নের দ্বারা জীবিত থাকে, অন্তকালে অন্নেই লীন হয়। কেননা অন্নই ভূতসমূহের অগ্রজাত। এই কারণেই অন্নকে সর্বৌষধি বলা হয়। যাহারা অন্নকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে, উপাসনা করেন, তাহারা সমগ্র অন্ন প্রাপ্ত হন্। অন্ন-ভূতসমূহের অগ্রজ বলিয়াই ইহাকে সকলের ঔষধ বলা হয়। অন্ন হইতেই ভূতগণ জাত হয়। জাত হইয়া অন্নের দ্বারাই বাড়ে। উহা ভক্ষিত হয় এবং ভক্ষণ করে বলিয়াই অন্ন নামে পরিচিত।

তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষ-বিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোক ভবতি॥ ২।২

ইতি ব্রহ্মবল্লাধ্যায়ে দ্বিতীয় অনুবাকঃ।

তস্মাৎ বা এতস্মাৎ [মন্ত্রে ও ব্রাহ্মণে উক্ত এই] অন্নরসময়াৎ [পুরুষোত্তম-সম্পর্কিত অন্নপ্রচুর, অন্নরস-ঘন পিণ্ড হইতে] অন্যঃ [পর] অন্তরঃ [অন্তরে বাহিরে সূক্ষ্মরূপে, অন্নরসময়ের সঙ্গে তাদাত্ম্যভাবে] আত্মা [অন্নরস-ময়কে ব্যাপিয়া স্থিত] প্রাণময়ঃ [প্রাণপ্রচুর] তেন [সেই প্রাণময় আত্মাদ্বারা] এষঃ [অন্নরসময় দেহ] পূর্ণঃ [অন্নময় কোশের অন্তরে বাহিরে পরিপূর্ণ, তথা-কথিত নীচের কোশকে পূর্ণ করিয়া স্বয়ংমর্যাদা দিয়া এবং তদতিরিক্ত থাকিয়াই, উপরের কোশ নিচের কোশের পক্ষ, অন্তর; বিকাশের ক্ষেত্র ঐ অন্নক্ষেত্রকে

পূর্ণ (complete in itself) করিয়া, সব হিসাবকে রসের ভারে পূর্ণ স্বরূপমূল্য দিয়া তিনি তদতীত প্রাণময়-রূপে বিরাজিত। অন্নরসময়ের নিংড়ান স্বকশক্তি ছাড়ানো সার প্রাণময় নয়। অন্নরসময়কে পরিপূর্ণাকারে বাঁচাইয়াই প্রাণময় পূর্ণ। পূর্ণের দেশে প্রতি পরমাণুও পূর্ণ]। সঃ বৈ এষঃ [সেই এই প্রাণময় আত্মাও] পুরুষবিধ এব [পুরুষেরই মত] তস্য [অন্নরসময়ের] পুরুষবিধতাম্ অন্বয় [পুরুষাকারের অনুযায়ী, অন্নরসময় পুরুষাকারের ছাঁচে গড়া] অয়ং [এই প্রাণময় কোশ] পুরুষবিধঃ [পুরুষাকার; অন্নময়ের 'অন্বয়' পশ্চাৎ চলিয়াই প্রাণময়কে 'রূপ'বান হইতে হইয়াছে। এক হিসাবে অন্নময় প্রাণময়ের 'অন্বয়', অন্যদিকে প্রাণময় ও অন্নময়ের 'অন্বয়'—দুই যখন দুইয়ের 'অন্বয়', তখনই দুই পূর্ণ। দুই তখন পুরুষোত্তমেরই দুইটী আস্বাদন।] তস্য [প্রাণময়ের] প্রাণ এব [প্রাণই, মুখনাসিকার নির্গমনকারী বায়ুবিশেষ] শিরঃ [মস্তক] ব্যানঃ [ব্যান বায়ু] দক্ষিণঃ পক্ষ [ডান পাখা] অপানঃ [অপান বায়ু] উত্তরঃ পক্ষঃ [বাম পাখা] আকাশঃ [আকাশস্থ সমানাখ্য বায়ু] আত্মা [দেহ মধ্যভাগ] পৃথিবী [পৃথিবী অর্থাৎ শরীরস্থ প্রাণের ধারণকারিণী দেবশক্তি] পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা [স্থিতি গতি সমন্বয় সম্পাদক পুচ্ছস্বরূপ] তৎ অপি [সেই বিষয়েও] এষঃ শ্লোকঃ ভবতি [এই শ্লোক আছে]।

পূর্ব্বোক্ত অন্নরসপ্রচুর শিও হইতে অন্য এবং অভ্যন্তরে প্রাণময় আত্মা আছে। তাহাদ্বারা অন্নময় পূর্ণ। সেই প্রাণময় আত্মাও পুরুষাকার। অন্ন-রসময়ের পুরুষাকারের অনুযায়ী এই প্রাণময়ও পুরুষাকার। সেই প্রাণময়ের প্রাণ-বায়ুই মস্তক, ব্যান বায়ু ডান পাখা, অপান বায়ু বাম পাখা, আকাশ অর্থাৎ সমান বায়ু দেহ মধ্য ভাগ। পৃথিবী স্থিতি গতি সমন্বয় সম্পাদক পুচ্ছস্বরূপ। ২।২

তৃতীয় অনুবাক

প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি। মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যতে।
সর্বমেব ত আয়ুর্যন্তি যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যতে॥

ইতি।

প্রাণম্ অনু [প্রাণক্রিয়া শক্তিমান্ বায়ুর অনুগমন করিয়া, তাহার আত্মভূত হইয়া] দেবাঃ [অগ্নিবায়ু সব প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ] (natural forces) (ইন্দ্রিয়গণ) প্রাণন্তি [প্রাণক্রিয়াযুক্ত হন্] চ [এবং] মনুষ্যাঃ পশবঃ যে [যে সব মনুষ্য, পশু] প্রাণঃ হি [যেহেতু প্রাণই] ভূতানাম্ [ভূতবর্গের] আয়ুঃ [জীবন] তস্মাৎ [সেই হেতু] সর্বায়ুষম্ [সকলের আয়ু বলিয়া] উচ্যতে [কথিত হয়] সর্বম্ এব আয়ুঃ [সকল আয়ুই, পূর্ণ আয়ুই] তে [তাহারা] যন্তি [প্রাপ্ত হন্] যে [যাহারা] প্রাণং [প্রাণকে] ব্রহ্ম [সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্মরূপে] উপাসতে [উপাসনা করেন]।

মুখ্য প্রাণের অনুগমন করিয়াই দেবগণ, ইন্দ্রিয়গণ ক্রিয়াশীল হয়। যে সব মানুষ, পশু আছে তাহারাও প্রাণেরই অনুগমন করিয়া ক্রিয়াশীল। কারণ প্রাণই ভূত সমূহের আয়ু। সেইহেতু প্রাণকে সকলের আয়ু বলা হয়। যাহারা প্রাণকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তাঁহারা পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হন্। কারণ, প্রাণই ভূতগণের আয়ু বলিয়া তাহাকে সর্বায়ু বলা হয়।

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ। অন্যোঽন্তরঃ আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষ-বিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব শিরঃ। ঋগ্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সামোত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা। অথর্বাঙ্গি-রসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি। ৩।৩

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যাখ্যায়ে তৃতীয়োঽনুবাকঃ॥

তস্য [সেই] পূর্বস্য [পূর্বোক্ত অন্ন রসময়ের] এষঃ এব [ইহাই] শারীরঃ [দেহাধিষ্ঠিত দেহবান্] আত্মা যঃ [যেই প্রাণময় কোশ] তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ [সেই এই প্রাণময় হইতেই] অন্য [পর] অন্তরঃ [প্রাণময়ের সঙ্গে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত] আত্মা [ব্যাপক] মনোময়ঃ [পুরুষোত্তম

মন-সম্পর্কিত মনোময় কোশ] তেন [মনোময়ের দ্বারা] এষঃ [প্রাণময়] পূর্ণ [পূর্ণ, প্রাণময়কে তাহার প্রতি স্পন্দনে পূর্ণ করিয়া, প্রাণময়কে পিষিয়া টিপিয়া না মারিয়া ফেলিয়া, মিথ্যা সাবাস না করিয়া স্বাংগুলা দিয়া যিনি প্রাণময়ের সব, অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত, তিনিই পূর্ণ] সঃ বৈ এষঃ [সেই এই মনোময় কোশ] পুরুষবিধ এব [পুরুষাকারই] তস্য [সেই প্রাণময় কোশের] পুরুষবিধতাম্ অনু [পুরুষাকারের ছাঁচে ঢালা] অয়ং [মনোময় কোশ] পুরুষবিধঃ [পুরুষাকার] তস্য [তাহার] যজুঃ এব [যজুর্বেদই] শিরঃ ঋক্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ [ঋক্‌বেদ ডান পাখা] সাম উত্তরঃ পক্ষঃ [সামবেদ বাম পাখা] আদেশ [বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ] আত্মা [দেহ মধ্য ভাগ] অথর্বাঙ্গিরসঃ [অথর্বা ও অঙ্গিরা কর্তৃক দৃষ্ট, উপলব্ধ যে সব মন্ত্রসহায়ে শান্তি ও স্বস্ত্যয়নাদি সম্পন্ন হয়] পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা [স্থিতিগতি সমন্বয় সম্পাদক পুচ্ছস্থানীয়] তদপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি

এই যে প্রাণময়, ইহাই পূর্বোক্ত অন্নময়ের দেহাভ্যন্তরস্থিত আত্মা। উক্ত এই প্রাণময় হইতে 'পর' এবং অন্তর বাহিরে অবস্থিত মনোময় আত্মা আছেন। এই মনোময়ের দ্বারা প্রাণময় পূর্ণ। উক্ত মনোময়ও পুরুষাকার। প্রাণময়ের আকারের ছাঁচে ঢালা ইহার পুরুষাকার। যজুর্বেদ ইহার মস্তক, ঋক্ ডান পাখা, সাম বাম পাখা। ব্রাহ্মণ ভাগ দেহ মধ্য ভাগ। অথর্ববেদ স্থিতি-গতি সম্পাদক পুচ্ছ। ঐ বিষয়ে একটি শ্লোক আছে। ২।৩

চতুর্থ অনুবাক

যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচন ॥ ইতি।

যতঃ [যে মনোময় কোশ হইতে] বাচঃ [বাক্যসমূহ] নিবর্তন্তে [নিবৃত্ত হয়] অপ্রাপ্য [না পাইয়া] মনসা সহ [মনের সঙ্গে]; মন নিজেকেই নিজে পায় না, মন নিজেই নিজের অতীত—এই সব অভিজ্ঞতা সম্ভব হয় যদি মনকে আমরা যে স্তরে দেখিতেছি, মন সেই স্তরের না হইয়া কোনও উচ্চতম, পর স্তরের সম্পদ্ হয়। বাস্তবিকই সব কোশের পরম অর্থ ফুটিয়া উঠে পুরুষোত্তমস্তরে। পুরুষোত্তম স্তরে কেহই নিজকে পাইয়া ফুরাইয়া ফেলিতে পারে নাই, প্রত্যেকেই নিজের কাছে রহে দুর্জ্ঞেয়, অজ্ঞেয়। নিজকে নিজে পূর্ণ ভাবে পাইয়া, পূর্ণভাবে না-পাইয়াই 'পাওয়া'র পথে অগ্রসর হইতেছে। "প্রাণবুদ্ধিমনঃ খাদ্যদারাপত্যাদয়ঃ। যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়াস্তাসন্ ততোঽন্যঃ কঃ পরঃ প্রিয়ঃ"—যাহার সম্পর্কে প্রাণ, বুদ্ধি, মন, নিজের দার, অপত্য ধনাদি প্রিয় হইয়া আছে, তাহা হইতে কে প্রিয়? মন মনের কাছে প্রিয়, যখন মন কৃষ্ণ-সম্পর্কে সম্পর্কিত। কৃষ্ণ-সম্পর্কহীন মন নিজের মধ্যেই দীন হীন কাঙ্গাল, কাম-তাড়নায় ক্লীব; মন অনন্ত বেদের স্তরে অনন্ত।] আনন্দং ব্রহ্মণঃ [ব্রহ্মের আনন্দকে, আনন্দঘন ব্রহ্মকে] বিদ্বান্ [জানিয়া] কদাচন [কখনও। মনোময়ে পুরুষোত্তম-মন প্রচুরভাবে রহিয়াছে। "রন্তুম্ মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ"—ভগবান যোগমায়ার উপাশ্রিত হইয়া রমণের মন করিলেন। সর্ব্ব কামের ঘন রূপ মন; মনোময় যিনি, তিনিই আনন্দঘন ব্রহ্ম। মনোময়ের স্তরে দাঁড়াইয়া আনন্দঘন পুরুষোত্তম রাসক্রীড়াক্ষেত্রে রমণের জন্য 'মন' করিয়াছিলেন। মনের ক্ষেত্রই পুরুষোত্তম-ভাবে পুরুষোত্তম-রসে রাসক্ষেত্রে গড়িয়া উঠে]।

মন মনোময়কে না পাইয়া, নিজেকে নিজে না পাইয়া বাক্যের সহ ফিরিয়া আসে। ব্রহ্মানন্দ জানিলে কখনও ভয় হয় না।

তৈত্তির এবং শারীর আত্মা যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষঃ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রদ্ধৈব শিরঃ। ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ। যোগ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকঃ ভবতি ॥ ২।৪

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যাখ্যায়ে চতুর্থোঽনুবাকঃ।

ক্রমশঃ

সাময়িকী

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-জন্মতিথি

বিশ্বগ্রন্থনিত্রয়ের অবধূত ভাষ্যকার, উজ্জলতারক ও নরনারায়ণ আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৮৩ তম জন্মতিথি উপলক্ষে বিগত ১৩ই নভেম্বর শনিবার ১৯৬৫—কার্ত্তিকী কৃষ্ণা পঞ্চমী ২৭শে কার্ত্তিক ১৩৭২— তাঁহার সমাধি প্রাঙ্গণ নর-নারায়ণ আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রম-দেবতা শ্রীনিতাগোপালের প্রার্থনা-গান-পূজা-অঞ্জলি ও ভোগ অন্তে আশ্রমের ইস্কুলের ছেলেমেয়েসহ প্রায় চারিশত ছোট ছেলেমেয়ে প্রসাদ পায়। ইহার পর বিকাল ৪টায় এক জনসভায় শ্রীনিতাগোপালের প্রতিষ্ঠিত জড় অজড় সমন্বয়বাদের পুরুষোত্তম-দর্শন কিভাবে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে প্রস্ফুটিত হইয়াছে এবং তাঁহার লিখিত দার্শনিক চিন্তাধারাই বা কি সেইসব আলোচিত হয়। শ্রীশিবপদ বসু ১৯৩২-এ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের সঙ্গে যেমন রাজনীতির মধ্যদিয়া সম্পর্কিত ছিলেন, তেমনি তাঁহার দার্শনিক চিন্তাধারার সহিতও পরিচিত ছিলেন। তবে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। উৎসবের দিন অকস্মাৎ আসা ঘটিয়াছিল—তাই শিবপদ বাবু পুরুষোত্তমা-নন্দ ও তাঁহার দর্শনের সহিত তাঁহার পরিচয় আলোচনা করেন। অতঃপরে শ্রীজ্ঞানরঞ্জন সেনও তাঁহার অত্যন্ত ছোটবেলায় কেমন শ্রীমৎ স্বামিজীর অভিনব বক্তৃতা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল সেই অভিজ্ঞতা দিয়া আরম্ভ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলেন। স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক রমণীমোহন সরকার শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সম্বন্ধে একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। সভাপতিসহ অন্যান্যদের আলোচনা বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। সভান্তে সন্ধ্যারতি হয়। ইহার পর সর্বশ্রী নিখিল চট্টোপাধ্যায়, অরুণ দে, নবকুমার দাস, বরুণ তালুকদার, কমল চক্রবর্তী ও বিমল মহলানবীশ ভজন ও রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

এই দিন শ্রীপ্রতিভা রায় লিখিত শ্রীমৎ পুরুষোত্তমা-নন্দের একখানি জীবনী নরনারায়ণ আশ্রম হইতে প্রকাশিত হয়। শ্রীমৎ স্বামিজীর ধারাবাহিক জীবনী এই প্রথম। বইখানি প্রকাশ করিতে শ্রীমৎ স্বামিজীকে যাহারা শ্রদ্ধা ভক্তি করেন, তাঁহাদের দানই আমাদের প্রধান পাথেয়। তাঁহারা যে যাহা দিয়াছেন তাহা এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল।

১।	সুষমা রায়	১০০৲
২।	জনৈক বন্ধু	৬০৲
৩।	নরেন্দ্রকৃষ্ণ পাল	৫০৲
৪।	পার্ব্বতীনাথ বিশ্বাস	৫০৲
৫।	রাধেশ্যাম মজুমদার	৩০৲
৬।	মৃণালিনী বিশ্বাস	৩০৲
৭।	নকুলেশ্বর চ্যাটার্জি	২৫৲
৮।	জ্ঞানরঞ্জন সেন (তিন মাসে)	১৫৲
	(ইনি এক বছর মাসে ৫৲ করিয়া দিবেন)	
৯।	সুবোধ মুখার্জি	২০৲
১০।	অমা ব্যানার্জি	২০৲
১১।	সীমা মজুমদার	২০৲
১২।	ডাঃ যোগেশচন্দ্র মুখার্জি	১৫৲
১৩।	রাধারাণী দত্ত	১৫৲
১৪।	রাজেন দাস	২০৲
১৫।	উমা ভট্টাচার্য্য	১০৲
১৬।	শিবানী সরকার	১০৲
১৭।	নলিনী দাশগুপ্ত	১০৲
১৮।	মীরা রায়	১০৲
১৯।	নারায়ণী চাকী	১০৲
২০।	রেখা আচার্য্য	১০৲
২১।	সেবা দাস	১০৲
২২।	নির্ম্মল গুপ্ত	১০৲
২৩।	সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষক	১০৲
২৪।	কালীপদ সরকার	১০৲
২৫।	মীনাক্ষী দাস	১০৲
২৬।	ধীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি	১০৲

২৭।	নারায়ণ রায়	১০৲	
২৮।	পুণ্যপ্রভা কাংকুন	১০৲	
২৯।	সুবলচন্দ্র দাস	১০৲	
৩০।	রত্না চক্রবর্তী	১০৲	
৩১।	নয়নারায়ণ আশ্রমের সেলাই বিভাগ হইতে	২৲	
৩২।	গীতা চৌধুরী	১০৲	
৩৩।	কালিপদ দাস	২৲	
৩৪।	গীতা সেন	১০৲	
৩৫।	ডাঃ ধীরেন্দ্র চৌধুরী	৬৲	
৩৬।	কল্যাণী গাঙ্গুলী	৫৲	
৩৭।	কমলা ঘোষ	৫৲	
৩৮	মৃদুল বিশ্বাস	৫৲	
৩৯।	মায়া নন্দী	৫৲	
৪০।	রাধা	৫৲	
৪১।	শেফালী গাঙ্গুলী	৫৲	
৪২।	নীলেশ সরকার	৫৲	
৪৩।	বিমলা মিত্র	৫৲	
৪৪।	বিরজা মজুমদার	৫৲	
৪৫।	উপেন্দ্রমোহন ধর	৫৲	
৪৬।	যতীশচন্দ্র বসু	৫৲	
৪৭।	তারাপদ সাউ	১০৲	
৪৮।	অজিত দাস	৫৲	
৪৯।	গোপালদাস অধিকারী	৫৲	
৫০।	পরিমল মুখার্জি	৫৲	
৫১।	কমলা রায়	৫৲	
৫২।	পুষ্পরাণী দেওাট	৫৲	
৫৩।	সুধীর দাস্তাল	৫৲	
৫৪।	বিভাবতী চক্রবর্তী	৫৲	
৫৫।	পরিমল প্রভা সরকার	৫৲	
১৬।	ছবি চক্রবর্তী	৫৲	
৫৭।	উমা মুখার্জি	৫৲	
৫৮।	নূপুর চ্যাটার্জি	৫৲	
৫৯।	গোপাল ভট্টাচার্য্য	৫৲	
৬০।	দিলীপ দাস্তাল	৭৲	
৬১।	বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য	৪৲	
৬২।	হাসলী লাহিড়ী	৪৲	
৬৩।	মায়ারাণী রায়চৌধুরী	৪৲	
৬৪।	কল্পনা চ্যাটার্জি	২৲	
৬৫।	আরতি ব্যানার্জি	২৲	
৬৬।	শোভা গোস্বামী	২	
৬৭।	অমলা গাঙ্গুলী	২৲	
৬৮।	শক্তি সাস্তাল	২৲	
৬৯।	বরদাকান্ত দাস ১৩. ১১. ৬৫ পর্যন্ত	২৲	
		৮৮৮·০০	
	এ পর্যন্ত বই বিক্রী বাবদ : ১৯. ১১. পর্যন্ত	৯৭·০০	
		৯৮৫·০০	
	এদিকে খরচ নিম্নরূপ হইয়াছে—		
	ছাপান (ষষ্ঠ কভার)	৭৫৪·০০	
	কাগজ (ষষ্ঠ)	৭১৮·৭৫	
	বাইণ্ডার	৪০০·০০	
	কভারের কাগজ	২২·০০	
	ব্লক কভার	১৭·৬০	
	পুরুষোত্তমানন্দের ছবি	৬·৫০	
	যাতায়াত	২৬·৫০	
	পোষ্টকার্ড	৩·০০	
		১২৪৮·৩৫	

বর্তমান জমা ও খরচে আমাদের টাকা ৯৬৩·৩৫ পয়সা হাওলাত রহিয়াছে। হাওলাত করিয়া কাজটা কোনমতে চালাইয়া লওয়া হইয়াছে, এখন আমাদের বন্ধু বান্ধবদের প্রতি আমাদের বিশেষ আবেদন এই যে তাঁহারা বইটি কিনিয়া লইয়া এবং সম্ভব হইলে আরও কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া এ দায় হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করুন। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের কর্ম ও চিন্তাধারাকে গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করেন, তাঁহার রাজনৈতিক বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্মরণ রাখিয়া তৃপ্তি পান এমন বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি এই বাঙ্গালা দেশে আছেন। আমরা প্রত্যেকের নিকট সনির্বন্ধ এই আবেদন জানাইতেছি যে তাঁহারা যেন [illegible] মিত্রীয় কাজের এই দায়টুকু বহন করেন।

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নয়নারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাওইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া, ৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

উদ্বুদ্ধভারত

পৌষ, ১৮৮৭ শকাব্দ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ ১৮শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৬০)

যে লিখতে জানে, তার লেখা দেখে তার হাত ধরে লিখে লেখা শিখতে হবে···। নিজের শিক্ষার ভার নিজে নিয়ো না। বিচ্ছিন্ন থেকে লাভ নেই—বিচ্ছিন্ন থেকে কিছু করা যাবে না।···ক, খ, শিখতেও গুরু লাগে, হাঁটা শিখতেও গুরু লাগে—আর জীবনের শিক্ষায় গুরুর দরকার নেই? গুরুর জীবনে জীবন মিলাও···। হারমোনিয়াম অর্গ সুর-সামঞ্জস্য; সুর-সামঞ্জস্য করে চললেই পথ পাবে···গুরু ছাড়া শেখা হবে না। ভুল করো না—আমি লোভের বশবর্তী হয়ে তোমাদের একান্ত হতে বলছি না···বিশ্বাস কর—এইটাই সত্যিকারের বড় হবার সত্যিকারের পথ বলে বলছি।···শ্রীনিত্যগোপালের আশীর্বাদে তাঁর সঙ্গে যেটুকু একাত্ম হয়েছি, সেইটুকুই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি।···ঠাকুর, তুমি আমায় রক্ষা করছ···তোমার মত আমায় করে নাও। তোমার চক্ষুদ্বারা তোমার দেহদ্বারা আমায় জাগিত কর। বিশ্বরূপ, তোমার অনন্ত বাহু, অনন্ত পদ···আমার এ পা দুখানি নিয়ে আমি বিশ্বে বিচরণ করব কেমন করে? আমাকে বিশ্বরূপময় কর···। তোমার জয় হউক আমার জীবনে—আমার আমিত্ব লয় করে দাও··· আমি যেমন করে চললে তোমার কাজ হয় তাই কর··· লাভ অলাভ, জয় পরাজয় বোধ রেখে সেবা হয় না··· একলা সব সেবা পারবে না—মিলিত হও। কেউ যাও তা আমি ইচ্ছা করি না, তবু গেলে কি করব? নিত্য-গোপালের কাছে এসে ফিরে যাবে? ভাবতে আমার দুঃখ হয়।··· সেবা নিতে ইচ্ছা করে না—কখন তোমাদের কি রকম মেজাজ হবে—সেবা ভুল হয়ে যাবে—তাই ইচ্ছা করে না।···তোমাদের সকল কর্ম শুদ্ধ হোক, মিলেমিশে আনন্দ নিয়ে কর্ম কর···চাঁদের হাট বসাব বলে ডেকেছিলাম—কিন্তু মানুষকে তো সেবক করে গড়ে তুলতে পারছি না···আমি হৃদয় চেয়েছিলাম···। নিজের প্রশ্ন ভুলে আমি কোনদিন কর্মকে গ্লান করি নি··· চোখের জলে বা মন খারাপ নিয়ে যা কিছু করবে—তা আর সেবা হবে না।···ছোট সংসার করতে তোমাদের ডাকি নি···বিশ্বরূপের সংসার করতে ডেকেছি।

৩০. ১০. ৪৬। চণ্ডীদাস একজন সিদ্ধ পুরুষ—তিনি লিখছেন, 'সামান্য বিশেষে একত্র রতি'·····সামান্য ও বিশেষে যখন একত্র হয়, তখনই কলমানে রতি।···মানুষ বিশেষ মানুষও বটে, সামান্য মানুষও বটে—সামান্য মানুষ মরে না, বিশেষ মানুষ মরে। সামান্য মানুষ ও বিশেষ মানুষের মিল হলেই মুক্তি। নরনারায়ণ আশ্রমকে এটা বিশেষ ভাবে বুঝতে হবে। প্রত্যেক বিশেষ যতক্ষণ না বুঝবে যে বিশেষ হয় না যদি সে সামান্য না হয়, ততক্ষণ সে বিশেষ সার্থক নয়। মুক্তি তখনই যখন তুমি বুঝবে যে তুমি বিশেষ মানুষ হয়েও সামান্য মানুষ, তুমি বিশেষ মেয়ে হয়েও সামান্য মেয়ে। সামান্য মানুষের গ্লানি তোমায় বুঝতে হবে যদি তোমার বিশেষ মানুষ-জন্ম সার্থক করতে হয়—সামান্য মেয়ের

মানি তোমায় বুঝতে হবে যদি তোমার বিশেষ নারী-জন্ম সার্থক করতে হয়। ...সকলে যেখানে মানুষ সেখানে সামান্য মানুষ—ব্রাহ্মণও মানুষ, চণ্ডালও মানুষ...আবার বিশেষ মানুষও মানুষ...। তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তি—যে বস্তু যাহা তাহাকে তাহা বলিয়া বোঝাই মুক্তি···। যেই বললাম আমি মানুষ তখন বুঝায় আমি সামান্য মানুষ···। আমি সমান মানুষ (নারী বা পুরুষ) হিসাবেও সত্য, আমি বাষ্টি মানুষ (নারী বা পুরুষ) হিসাবেও সত্য। দুটোই তোমার মধ্যে আছে, কিন্তু নাই শুধু এ দুয়ের মধ্যেও নিত্য সম্বন্ধের বোধটুকু। সমগ্র মানুষ জাতির লাঞ্ছনাকে নিজের লাঞ্ছনা বলে বোধ না যে মানুষ, সমগ্র নারী-জাতির লাঞ্ছনাকে নিজের লাঞ্ছনা বলে বোধ না যে নারী, বিশ্বের ক্ষুধাকে যে নিজের ক্ষুধা বলে জানল না—সে বদ্ধ জীব।·· সমান মানুষের ধারণাকে বিশেষ মানুষের মধ্যে অনুভব করতে হবে···মানুষরূপ-রূপ সামান্যের মধ্যে বিশেষ মানুষের যে মিলন—সেইখানে গোবিন্দ নেমে আসেন··· ব্যক্তি জাতি সমস্তই গোবিন্দের কথা। নিত্যসম্বন্ধই সমন্বয়। নরনারায়ণের আশ্রম এই জ্ঞান নিত্যগোপাল-প্রসাদে পাইয়া বিশ্বের দুয়ারে বন্টন করিতে ...পরিবার বা আশ্রম একটা গোটা জিনিষ—আমার ভাষায় একটা সমগ্র বস্তু।···দল-জনের স্বার্থ যেখানে সমান সেইখানে নিত্যগোপাল.. । প্রত্যেক মানুষকে বুঝতে হবে আমি মানুষ জাতি ও বিশেষ মানুষ—তাহলেই আমি বিশ্ব মানুষ। আমি এশিয়ার মানুষ —আমি ভারতবর্ষের মানুষ—আমি বাঙ্গলার মানুষ—আমি পশ্চিম বঙ্গের মানুষ—আমি বাগুইআটির মানুষ—মানুষের এতগুলি বিশেষত্ব—এই এতখানি বিশেষত্ব। এই এত-খানি থাকার মধ্যে মানুষ যেদিন থাকতে পারল—সেদিন তার মুক্তি। এত বড় মুক্তির কথা কোথায় আলোচনা হয়—আমি জানি না—নরনারায়ণের আশ্রম এই ছোট জায়গায় বসে এই এত বড় মুক্তির কথাই বলছে।···আমি বাগুইআটির হইয়াও বাগুইআটির বড়—আমি বাঙ্গলার হইয়াও বাংলার অতীত...প্রত্যেক মুহূর্তে ভাব আমি কত বড় বিরাট...এত বড় ধ্যান প্রতিদিন কর...। এই ব্রহ্ম-মানুষের খবরই নিত্যগোপাল দিয়েছেন।···আমরা যেন বুঝি আমার বাষ্টির প্রতি যেমন আমার দায়িত্ব আছে, আমার সামান্য সত্তার প্রতিও তেমনই আমার দায়িত্ব আছে—তাই···কাঁথির প্রবন শুনে বুক কেঁদে ওঠে— রাজনীতি করে পরিব্রাজক হয়ে কত যে ভ্রমণ করেছি। নিজের ক্ষেত্রটাকে বড় করে নিতে হবে... নিত্যগোপাল সেইজন্য ডাক দিয়েছেন...তাঁরই কথা ধরার ধূলি হোক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্মমানুষ।··· নারীত্বের সামান্য রূপই শ্রীরাধা, সেই সামান্য রূপেরই অপর এক রূপ শ্রীদুর্গা।...

৩১. ১০. ৫৬ নদী তখনই নিজ অস্তিত্বকে রক্ষা করতে পারে ··যখন সে নিজ নামরূপ পরিত্যাগ করে সাগরে ডুবে যায়, জীবের সত্তা চৈতন্য আনন্দকে বজায় রাখতে হলে তাকে ব্রহ্ম-সাগরে ডুবতে হবে।···

১. ১১. ৫৬। ওঁ নমো···। আজ কালীপূজা—এই দিন আমার পূজনীয় পিতৃদেব ইহলোক ত্যাগ করেন এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হন। তন্ত্র কালীপূজার ফল সম্বন্ধে বলছেন 'যত্রাস্তি ভোগঃ ন চ তত্র মোক্ষঃ

যত্রাস্তি মোক্ষঃ ন চ তত্র ভোগঃ

শ্রীসুন্দরীপূজনতৎপরাণাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব॥ শ্রীসুন্দরী মানে কালী; যদি ফল দেখে বিচার করা যায় তবে কালী কি তা বুঝা যাবে—ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ—ভোগ এবং মোক্ষ উভয়ই যার করতলগত। সপ্তমীর দিনে এই মহাকালী পূজা—এই কালী মহা-নির্বাণ—যে মহানির্বাণের কথা নিত্যগোপাল বলেছেন— তিনিই মহানির্বাণের কারণ।···মন কালীতে ডুবতে ভগবানে মগ্ন হলে মনের লয় হয়—তারপর সেখানে যে মন থাকে সেটা ভগবানের মন। ··ভগবান এত বড় বিরাট সংসারী হয়েও সন্ন্যাসী—ত্যাগ আর ভোগ মেলে না পরিচ্ছিন্ন মনেতে—কালী পূজায় এই মন বলি দিতে হয়···ত্যাগ করবার মতন করে ভোগ করতে হয়··· কৃষ্ণভক্তিরস-ভাবিতা।···বস্তুকে ভোগ করতে গেলে সে-ও তোমাকে ভোগ করবে।...ত্যাগ করে ভোগ করতে এই কালীপূজার দিন শিখতে হবে—শব না হলে শিব হওয়া যায় না···। মন থাকতে জীব—মন লয় করলেই

শিব...। মায়েকে যে পর্যন্ত মুক্ত না দিচ্ছ—মন যতক্ষণ না মাকে দিচ্ছ ততক্ষণ ধরাতল পাবার সম্ভাবনা নাই। মা মরণময়ী...বাঁচতে চেয়েই রাবণকংস প্রভৃতি অসুরেরা মরে···মরণই ত্যাগ—কৃষ্ণ ধরতে গিয়ে বেঁচে রইলেন। ···গোবিন্দকে যা দিলে তা-ই থাকবে ····

এই কালীপূজার দিনে আমার বাবা নিত্যগোপাল বল হরি বল ধ্বনির মধ্যে এই সংসার থেকে চলে গেলেন। পিতা নীলকমল ঘোষ...জীবনে পরের চাকুরী করেন নি ...করাও করেন নি···ধান-চাল-বাগান-গরু ছিল—গ্রামে থেকে আনন্দ করে জীবন কাটিয়েছেন। বাইচ খেলার আনন্দ করা তাঁর একটা বিশেষ সখ ছিল। খেলার শেষে সকলকে মুড়িচিড়া খাওয়ানতেও ছিল তাঁর আনন্দ ... তালপাতের ঘর, আরি গানের ঘর নিয়ে ঘোড়দৌড়ি করে গ্রামে থাকতেন। তাঁর বুড়ো বয়সে গ্রামে থিয়েটার হত—রিহার্সেলের সময় বাবাকে থাকতেই হতো ... থিয়েটারের লোকেরা প্রথম থিয়েটারের দিন আমাদের ঘরে সকলে খেতো। ···মাছ ধরতে যেতেন আড়ম্বর করে। ছেলেমেয়েদের তিনি বড় লোকের ঘরে বিয়ে দিয়েছেন। ···সাধনভজন খুব পছন্দ করতেন না বলে আমার দীক্ষার সময় তাঁকে বলি নি।···বাবা সেই দলের লোক যাঁরা কৃষ্ণকেই ভগবান বলেন, গৌরাঙ্গকেও নয়—অথচ নিত্যগোপালকে আমি ভগবান বলি।...এই বাবারই শেষ সময়ে কি হয়েছিল?...বুড়ো মানুষ মশারীর ভিতর বসে থেকে বলতেন, 'কেটা রে, কে যায় রে? নিত্যগোপাল নাকি? নিত্যগোপাল যা, বাবারে খা।' আরও বলতেন, 'নিত্যগোপাল বড় প্রত্যক্ষ দেবতা—সেই নিত্য-গোপাল, সেই কালাচাঁদ,' (আমাদের বাড়ীতে কালাচাঁদ বিগ্রহ ছিল) তোমরা নিত্যগোপালকে না দিয়ে কিছু খেয়ো না'...। হরেকৃষ্ণ, কালী করুণাময়ী ও নিত্য-গোপাল নাম জপ করে তিনি খেতেন। ঠাকুরকে বাবা-মায়ের কথা বলেছিলাম—তিনি বলেছিলেন তোমার বাবামায়ের উপর আমার দৃষ্টি রইল। আমার বাবা খানিকটা বিষয়ীই ছিলেন—কুটুম্বইনসম্পন্ন বিষয়ী না হলেও বিষয় আশয় নিয়েই তাঁর দিন কাটত। সেই বাবাকে কেমন করে তিনি আপন করে নিলেন ভাবলে অবাক লাগে।...একদিন রাত্রি ৯টা থেকে ভোর ৬টে পর্যন্ত খাওয়া আর তাঁর হল না, তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে নিত্যগোপাল নিত্যগোপাল করে কাটালেন।... যোগীরও এ গতি হয় না—আমি তো পারি না এতক্ষণ এক অবস্থায় বসে নাম করে যেতে।···একদিন বাবা বলেছিলেন 'আমি আশ্রমে আছি'।···আজ তাঁর মৃত্যু দিনে তাঁকে মনে করি···উপনিষদের কথা মনে করি—ন বা অরে সর্বস্য কামায় পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব প্রিয়ং ভবতি...। পিতা, তুমি বিষয়ী ছিলে, কিন্তু শেষে তুমি ব্রহ্মানন্দ পেয়ে গেছ।···আশীর্বাদ কর, তুমি সারা জীবন আনন্দে কাটিয়েছ, আমি যেন বাকি দিন কয়টা আনন্দে কাটাতে পারি। পিতা, পিতা, সুন্দর তুমি—আমাকে সুন্দর কর। মুক্তকেশী, মা, বড় কষ্ট—এত বড় সম্পদ নিত্যগোপাল নাম নিয়ে সারা বাঙলা মুল্লুকে কেউ তো নিল না! এরা কি ক্ষুদ্র সুখ নিয়ে থাকতে চায়—তুচ্ছ সুখ বলে দিয়ে! মাগো, বাবাগো সার্থক যেন হই—মাগো, গ্রামের লোক তোমাকে লক্ষ্মী বলত।···বাবা দিয়ে গেছেন সন্ন্যাস, নিত্যগোপাল দিয়েছেন সংসার।···আজ তোমার এই তিরোভাবের দিনে তুমি আমার চোখের জলের সেবা গ্রহণ কর। অভিযোগ নিয়েই সংসার থেকে গেলাম।...আমরা দু ভাই ছোটকাল থেকেই একটু 'দাওরালিয়া' গোছের—তাই আমাদের নিয়ে বিয়ে-সংসার হবে না বলে জ্যেঠাত ভাইদের নিয়ে বাবা থাকতেন।...এই বিষয় তিনি সারাজীবন সার্থক ভাবে ভোগ করেও, অন্তরে অপ্রবাসী হয়েও শেষকালে মহাযোগীর গতি লাভ করেন। নিত্যগোপালকে নিয়েই তো শেষকালে পড়ে ছিলেন, তাঁর সাথেই কথা বলতেন। ...(গান করেন)—

ক্রমশঃ

মহাকাব্যের কবি শেক্‌স্‌পীয়র

॥ শ্রীপ্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

নাটককে সাহিত্যের একটি শাখা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু নাটককে সাহিত্যের একটি শাখা বললে নাটকের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। বরঞ্চ এই ধারণার দ্বারা নাটকের প্রকৃতিকে খণ্ডিত করে দেখা হয়। বস্তুতঃ নাটকে সাহিত্যের সর্ববিধ শাখার আবেদন ও সর্বপ্রকার রসবৈচিত্র্যের প্রকাশ হতে পারে। উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি সমস্ত কিছুর স্বতন্ত্র নিজস্ব স্বাদ ও বৈশিষ্ট্য আছে। উপন্যাসে কাহিনী, চরিত্র-চিত্রন, জীবনের গভীরতর তলদেশের সংবাদ থাকে। গল্পে জীবনের খণ্ডাংশের একটি মুহূর্তের অনুভব; কবিতায় কবির জীবন-দর্শন, সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা এবং প্রবন্ধে যুক্তি তথ্যের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত। আর, একটি নাটকে এই সমস্ত গুণাবলীর নিপুণ সমাবেশ হওয়া সম্ভব। সাহিত্য এমন একটি শিল্প যা কথার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু নাটক শুধু মাত্র কথা-সর্বস্ব নয়—নাটকে আছে কথার মালা দিয়ে গাঁথা কাহিনী, চরিত্র চিত্রন, কোন নায়কের যুক্তি-নির্ভর তথ্যবহুল বক্তব্য, আছে নৃত্য-গীত-বাদ্য, আছে অভিনেতার অভিনয়-কৌশল এবং প্রযোজকের অদৃশ্য নিপুণ হাতের কারসাজি। সর্বোপরি নাটকে আছে জীবন-দ্বন্দ্ব, জীবন উল্লাস, নৈরাশ্য-পীড়িত জীবনের আর্তনাদ। একটা সমগ্র যুগ, একটা সমগ্র জাতি নাটকের মধ্যে শরীরী রূপ নিয়ে কথা বলে। এই দিক থেকে নাটকের সঙ্গে মহাকাব্যের যত মিল এমন মিল সাহিত্যের আর কোন শাখার সঙ্গে নয়। তার কারণ আয়তন-রূপের দিক থেকে নাটক ও মহাকাব্য সমধর্মী। বস্তুতঃ মহাকাব্য নাটক ছাড়া আর কি? মহা-কাব্যের ঘটনাগুলি, চরিত্রগুলির দৃপ্ত পদবিক্ষেপ ছবির মত একটার পর একটা জেগে ওঠে। মহাকাব্যে মানুষের যে বহু উদার ও বিচিত্র জটিলতা, জীবন-মন্থন-জাত যে বিষামৃতের পরিচয় আছে নাটকের মধ্যে জীবনের সেই সম্পূর্ণ চিত্রটি প্রকাশিত। এবং এ কথা শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক সম্বন্ধে সর্বৈব সত্য। তাই শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক মহাকাব্য ধর্মী এবং শেক্‌স্‌পীয়র মহাকাব্যের কবি।

নাটকের পরিসর মহাকাব্যের তুলনায় অল্প—নির্দিষ্ট সময় ও সীমার মধ্যে নাটকের গণ্ডী সীমাবদ্ধ। তাই মহাকাব্যে যে ঘটনার ব্যাপকতা থাকে, অসংখ্য চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং একটা বিরাট জাতির সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ধ্বনিত হয়, নাটকের স্বল্প আয়তনের মধ্যে হয়ত এই মহাকাব্যসুলভ গুণের সম্পূর্ণ পরিচয় থাকে না; তথাপি নাটকের মধ্যে মহাকাব্য-মহীরুহের বীজ সম্ভাবনা আকারে লুকিয়ে থাকে। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক-গুলি যে ষোড়শ শতাব্দীর ইংলণ্ডের জগৎ ও জীবনকে মহাকাব্যোচিত দুর্লভ মর্যাদা দান করেছে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়। কিন্তু শুধু একটা বিচ্ছিন্ন যুগের অভিব্যক্তি হয়েই তা নিঃশেষ হয়ে যায় নি। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে এমন চিরন্তন মানুষের কথা আছে যা তাকে কালোত্তীর্ণ যুগোত্তীর্ণ করে তুলেছে।

শেক্‌স্‌পীয়রের মিলনান্ত অপেক্ষা বিয়োগান্ত নাটক-গুলি অধিকতর জনপ্রিয় ও বহু-আলোচিত। প্রকৃতপক্ষে শেক্‌স্‌পীয়রের নাট্যপ্রতিভা বিয়োগান্ত নাটকগুলিতেই সমধিক পরিস্ফুট। কাব্যের জগতে মিলন অপেক্ষা বিরহ, সুখ অপেক্ষা দুঃখ অধিকতর আকর্ষণীয়। আমাদের মহা-কাব্যগুলিও মূলতঃ বিয়োগান্ত। যদিও বাল্মীকি রামায়ণ সীতার অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনে মিলনাত্মক সমাপ্তি লাভ করেছে তবুও প্রক্ষিপ্ত অংশটুকু বিচ্ছেদে শেষ হওয়ায় আরও বেশী রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে দিয়ে একটা অপ্রান্ত বেদনার নির্ঝর, না-পাওয়ার দীর্ঘশ্বাস, বিক্ষুব্ধ চিত্তের অশান্ত ক্রন্দন-ধ্বনি প্রবাহিত হয়েছে। শেক্‌স্‌পীয়রের বিয়োগান্ত নাটকেও ঠিক তাই।

শেক্‌স্‌পীয়রের ট্রাজেডিগুলি কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত। চরিত্র চিত্রনে তাঁর দক্ষতা অবিসংবাদিত। কতকগুলি চরিত্র আছে যেগুলি হৃদয়ের ঔদার্যে, জ্ঞানে গুণে, বুদ্ধিমত্তায়, শৌর্যে-বীর্যে মহৎ; কিন্তু ক্ষণিকের বিভ্রান্তিতে, চরিত্রের কোথায়ও একটু দুর্বলতায় ঘটনার আবর্তে এই চরিত্রগুলি স্বীয় পতনকে নিমন্ত্রণ করে এনেছে। হ্যামলেট নাটকে আছে হত্যা, আত্মহত্যা, উন্মাদতা—কিন্তু এসো যাক—চরিত্রের নিখুঁত বিশ্লেষণে হ্যামলেট এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ওথেলো আর একটি শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডি। মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়রের ট্রাজেডির অর্থ মানবাত্মার পতন বা রূপান্তর, আত্মার আহুতি বা মুক্তি। সৌর্যবীর্যের আধার, সৎ, উদার, বীর ওথেলো প্রেমে অন্ধ। বুক ভরে আছে সীমাহীন ভালবাসার নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে। কিন্তু সামান্য একটু সন্দেহের ইঙ্গিতে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে ওঠে। উন্মাদ ওথেলো ডেসডিমনাকে হত্যা করে। তবু ওথেলোর প্রতি আমরা শ্রদ্ধা হারাই না; অসীম করুণায় আমাদের অন্তর ভরে ওঠে। কী মহৎ ব্যক্তিত্বের কী নির্মম পতন! ওথেলোর নৈরাশ্য, অনুশোচনা, তার ট্রাজেডি কী গভীর মর্মস্পর্শী। আর এ নাটকের ট্রাজিক্ আবেদন আরও ফুটে উঠেছে কপট ইয়াগোর সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকায়। 'কিং লিয়র' নাটকের ট্রাজেডি বহির্জগতের আঘাত থেকে সৃষ্ট হয়েছে। প্রকৃতি ও সমাজের নিষ্ঠুর পেষণে রাজা লিয়র নিষ্পেষিত। নির্মম পৃথিবী, নিষ্ঠুর মানুষ—শ্রদ্ধা নেই, প্রীতি নেই, হৃদয় নেই; তবু আছে কর্ডেলিয়া, আছে তার অন্তর ভরা। একদিকে আছে হৃদয়হীনতা, নির্মমতা, চূড়ান্ত অবিশ্বাস, অপরদিকে আছে ন্যায়ধর্ম, বিচারবুদ্ধি এবং দরদী কর্ডেলিয়ার প্রীতি নির্ভর। ম্যাকবেথের ট্রাজেডি আবার অন্য রূপ। ব্রাডলে বলেছেন, 'It is a tragedy of the twilight and the setting-in of the thick darkness upon a human soul.' শৌর্যের অহঙ্কার, দুরাকাঙ্ক্ষা বীর ম্যাকবেথকে রক্তাক্ত-বিক্ষুব্ধ জীবন-সমুদ্রে নোঙর ছেঁড়া নৌকার মত অকূলে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তবু শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর ট্রাজেডিগুলিতে শেষ পর্যন্ত মানুষের মহত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন—এখানেই শেক্‌স্‌পীয়রের প্রতিভার বিরাটত্ব 'A Shakespearean tragedy is never, like some miscalled tragedies depressing' (ব্রাডলে)। শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর নাটকে মানুষের নীচতা হীনতার পরিচয় দিলেও তার চূড়ান্ত ব্যর্থতার অনিবার্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছেন যে, 'Villainy never remains victorious and prosperous at the last' (ব্রাডলে)। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের জগৎ সারা পৃথিবী এবং তার নায়ক-চরিত্রের ক্রিয়াকর্মের ওপর শুধু তার নিজের ভাগ্যই নির্ভর করে না সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাতির ভাগ্যও প্রভাবিত হয়। 'Upon his action depends not only his own fate, but that of an entire nation.···Shakespeare portrays the whole world in which his hero moves.' (Ifor Evans) এইখানেই শেক্‌স্‌পীয়রের মহাকবিত্ব।

মহাকাশের পথে

॥ শ্রীদ্বারিকানাথ শেঠ ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সারা পৃথিবীতে বেশ একটা প্রকাণ্ড রকমের আন্দোলন লেগেই রয়েছে। এই আন্দোলনের আগমনে পরাধীন জাতিগুলি কারোরই অধীনতা স্বীকার করে থাকতে চায় না এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে ও স্বাধীনতা অর্জন করতে সুরু করেছে। বলা বাহুল্য যে এই বিংশ শতাব্দীতে ২০ বছরের মধ্যে (১৯৪৫-১৯৬৫ সাল) অন্ততঃ ৭৫টা ছোট বড় যুদ্ধ হয়ে গেছে যার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিসমূহ বিভিন্ন সংখ্যায় পরিণত হয়েছে—যেমন ৬৮ থেকে ১২৭ বিভিন্ন জাতি তৈরি হয়েছে। এই ছোট ছোট অনুন্নত জাতিগুলি নিজ নিজ আত্মগরিমা বজায় রাখার জন্য এবং নিজস্ব সিদ্ধান্তের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বেশ অগ্রগতিতে চলেছে। অপর দিকে বড় বড় জাতিসমূহ পরস্পরের মধ্যে আত্মগরিমার প্রকাশ করার জন্য বেশ একটা প্রতিযোগিতার পথে এগিয়ে আসছে। যেমন ধরা যায়—পৃথিবীর মহাশক্তি সম্পন্ন জাতি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া। বিশ্বশক্তি জয় করার জন্য এই দুইয়ের পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আলো যেভাবে প্রজ্জ্বলিত হতে সুরু করেছে তা পৃথিবীর কল্যাণার্থে কতখানি সুফল প্রদান করতে পারবে তার প্রমাণ ইতিহাস ছাড়া আর কেউ বলতে সাহস পাবে না। মহাশক্তিসম্পন্ন এই দুই জাতি বাস্তব জগতে কেউ দ্বিতীয় স্থানে থাকতে চায় না, এমনকি প্রাকৃতিক জ্ঞানে ও অনুসন্ধানে, যুদ্ধ-কৌশলে ও কার্য কলাপে এমন রাজনীতিতেও। এই আত্মগরিমা ও নিজস্ব মর্যাদা বজায় রাখার জন্য উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত যে আরম্ভ হয়েছে তারই অনুসন্ধানে আমরা কিছুটা আলোচনায় আসবো।

যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া উভয়েই একান্ত ভাবে অনুসন্ধানে ব্যস্ত যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ও মহাকাশের পথে প্রাকৃতিক তত্ত্ব বা পদার্থ যা বিদ্যমান রয়েছে তা মানুষের জ্ঞানের মধ্যে আনতে হবে। এই অজানাকে বাহিরে যাওয়া যে সম্ভব হতে পারে তা কেউই একদিন কল্পনাতেও আনতে পারেনি। দুই জাতি এই অনুসন্ধানে দৃঢ়-সংকল্প যে, মানবজাতির কাছে বাস্তব-জগতের বা মহাকাশের পথে যে অজানা গূঢ় তত্ত্ব আছে তা মানুষের জ্ঞানের আয়ত্তে নিয়ে আসতে হবেই। এই অজানাকে জানার মধ্যে আনবার বা বোঝবার যে প্রচেষ্টা উভয়েই আগ্রহ সহকারে করে চলেছে তা তাহলে সাধারণ লোকের কাছে একটা কৌতূহল ছাড়া অন্য কিছু অনুমান করা শক্ত। জ্ঞান-অর্জনের শেষ পর নেই, যেমন বলা চলে এই দুই জাতির কাছে মহাকাশের তত্ত্ব আবিষ্কার একটা বিশেষ জ্ঞানের পরিচয়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চারিধারে যে কতকগুলি ছোট বড় গ্রহ নক্ষত্র বিরাজ করছে তারা মূলতঃ কি পদার্থ এবং পৃথিবীর সহিত তাদের কতখানি পার্থক্য তা জানার আগ্রহে এই দুই জাতি ঐকান্তিক চেষ্টা করতে কাতর হচ্ছে না। এই তত্ত্বগুলি জানতে পারলে চন্দ্রলোকে যাবার পথ আবিষ্কার করতে পারবে এবং অন্য গ্রহগুলি যারা যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর চারিধারের আবেষ্টনে রয়েছে তাদের প্রকৃত রূপ বা প্রাকৃতিক বিবরণী কি হতে পারে তা মানুষের জ্ঞানের মধ্যে আসবে। এখন আমরা ভাবতে নিশ্চিন্ত হব না যে মানুষের জ্ঞানের বাহিরে মহাকাশের পথে অজানার আর কিছুই থাকবে না। যখন মানুষ আবিষ্কার করতে পারবে যে মহাকাশের পথেও একটা শেষ সীমানা পাওয়া যায়।

আমরা আর একটু আলোচনা করলে জানতে পারবো এই মহাকাশের গূঢ় তত্ত্ব জানতে গিয়ে এত কোটি কোটি টাকা ব্যয় করার তাৎপর্য কী? একথা পৃথিবীর

প্রদক্ষিণে একটি space-craft-কে চালাতে হলে কত কোটি টাকা ব্যয় হয় তা সাধারণ মানুষের জ্ঞানের বাইরে। তবে কি আমরা ভাবতে পারি যে এই গবেষণার মধ্যে মূলতঃ কোন উদ্দেশ্য নেই কেবল মাত্র জ্ঞানতত্ত্বের পরিচয়া ছাড়া? বাস্তব জগতের ইতিহাস বলে যে মানুষ স্বার্থ ছাড়া কোন কাজে অগ্রসর হয় না, তাহলে এই গূঢ় তত্ত্বের পিছনে মহাশক্তিসম্পন্ন দুই জাতিই নিশ্চয় কিছু স্বার্থ অনুসন্ধানে ব্রতী। তা যদি না হত একেবারে এ অজানার পথের সন্ধানে এত উদ্যম ও আগ্রহ থাকত বলে বলা যায় না।

যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া উভয়ে মহাকাশের পথে বেতারে গবেষণার প্রতিযোগিতা চালিয়েছে তা একটু বিশ্লেষণ করা দরকার। যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা ১১ বার মানুষ সমেত space-crft মহাকাশে পাঠিয়েছে যেখানে সোভিয়েট রাশিয়া আটবার মাত্র সমাপন করেছে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ১,৯৪২ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট কাল মানুষ-সমেত উড্ডীয়মান space-craft রেখেছিল যেখানে সোভিয়েট রাশিয়া ৪০৭ ঘণ্টা ১৬ মিনিটের বেশী এখনও করে উঠতে পারেনি। আবার আমেরিকা এক সাথে একই space-craft ২০৬ বার পৃথিবীর চারিধারে প্রদক্ষিণ করেছে যেখানে রাশিয়া ৮১ বারের বেশী করতে সক্ষম হয় নি। এখানে বলা বাহুল্য যে দুই দলই তাদের নিজ নিজ space-craft থেকে মানুষকে সুস্থে কয়েক মিনিটের জন্য নামিয়েছে কিন্তু রাশিয়া বেশ কিছুটা উচ্চতর স্থানে মানুষকে মুক্ত করেছিল যা আমেরিকার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আবার যেস্থানে সোভিয়েট রাশিয়া তিন জন cosmo-nauts একই space-craft-তে মহাকাশের পথে উড়িয়েছে এখনও পর্যন্ত আমেরিকা দুজনের বেশী astronauts এক সাথে পাঠাতে পারেনি। এখানে বলা দরকার যে যুক্তরাষ্ট্র দুটী space-craft মহাকাশের পথে ২০ ঘণ্টা ২২ মিনিট সময় পর্যন্ত পাশাপাশি চালিয়েছিল এবং দুটি space-craft এর দূরত্বটাকে ৬—১০ ফিটের আয়ত্তের মধ্যে এনেছিল যার ফলে astronautরা পরস্পরের কথাবার্তার আলাপ করতে পেরেছিল যদিও উভয়ের space-craft এর গতি ১৭,৫০০ মাইল প্রতি ঘণ্টার হিসাবে সমমান ছিল। সোভিয়েট রাশিয়াও দুটী space-craft পাশাপাশি মহাকাশের পথে চার মাইলের দূরত্বে রাখতে পেরেছিল কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় রাশিয়া এতখানি সফলতা লাভ করতে কৃতকার্য্য হয়নি। আবার যেখানে আমেরিকা এক বছরের সময়ের মধ্যে (১৯৬৪ সালের মধ্যে) দশজন মানুষকে মহাকাশের পথে পাঠাতে পেরেছে, রাশিয়া এক বছরে (১৯৬৪ সালে) সাতজন মানুষকে পাঠিয়েছিল। এরপর আমাদের তুলনে চলবে না রাশিয়াই সর্ব্ব প্রথমে ১২ই এপ্রিল ১৯৬১ সালে মানুষ সমেত space-craft মহাকাশের পথে উড়িয়েছিল. যাহোক আমেরিকা শেষ পর্য্যন্ত একই space-craft এ সোয়াকুটি ভূমণ্ডলের চারিধারে ৪,১২৯,৪০০ মাইল পথ অতিক্রম করে একটী অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের পরিচয় স্থাপন করেছে। তাহলে আমরা দেখতে পারছি যে তীব্রগতিতে এই দুই জাতিই manued spaced flight নিয়ে যেভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে আসছে তাতে সূক্ষ্ম-বিচারে সোভিয়েট রাশিয়া কিছুটা বেশী এগিয়েছে।

আরও একটু সবর বিস্তারিত ভাবে বলা দরকার। সোভিয়েট রাশিয়ার মহাকাশের পথের গবেষণা এবং তার কার্য্য-কলাপ একেবারে সামরিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা সীমাবদ্ধ ও সমষ্টিভাবে তাদের দ্বারাই পরিচালিত ও অধিকৃত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার এই গবেষণা অসামরিক বৈজ্ঞানিকদ্বারা পরিকল্পিত ও পরিপুষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রে বৈজ্ঞানিকদের মূলতঃ উদ্দেশ্য চন্দ্রলোকে অবতীর্ণ হওয়া ও অন্যান্য গ্রহগুলি যা এতদিন যাবৎ পৃথিবীর চারিধারে পরিবেষ্টিত হয়ে আছে তাদের আকৃতিও ও প্রকৃতির রূপ বর্ণনার আবিষ্কারে উদ্যত। এই ভূমণ্ডলের চারিপাশে নয়টী মাত্র উল্লেখযোগ্য গ্রহের বর্ণনা ও কাহিনী পাওয়া যায় তার মধ্যে পৃথিবী আকারে পঞ্চম স্থান অধিকার করে আছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে কয়েক বছরের মধ্যেই একটী বড় আকৃতিতে Manned Orbiting Laboratory মহাকাশের পথে

বেশ কিছুদিনের জন্য তালমান করে রাখতে হবে। এই Laboratory র প্রধান উদ্দেশ্য থাকবে—বহির্জগতের তথ্য সংগ্রহ করা এবং তথ্যগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আয়ত্তে আনা ও রূপায়িত করে বাস্তব জগতের গবেষণার কাজে মূলধৃষ্টি করা। এই কাজের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী মহলের অভিমত যে সামরিক কর্তৃপক্ষেরা এই গবেষণার জটিলতার ব্যাপারে উদ্যোগী হবে এবং তারা নিজস্ব ভাবে এ কাজের দায়িত্ব বহন করতে থাকবে।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকরা আর একটী মতামত প্রকাশ করে থাকে যে সোভিয়েট রাশিয়া missile প্রতিযোগিতায় বেশ পিছনে পড়ে আছে সুতরাং তাঁদের কার্যকলাপের একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি মহাকাশকে অন্তর্ভুক্ত করা ও মহাকাশের সমস্তকে আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসা। এই সব চিন্তাধারার দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক মহলে, উচ্চপদস্থ সরকারী মহলে ও সামরিক কর্তৃপক্ষের মহলে অনেক প্রকার আলোচনা এই গবেষণার সম্বন্ধে গুরুত্ব দিতে সুরু করেছে—যেমন আজ যদি সোভিয়েট রাশিয়া পৃথিবীর বহিঃস্থিত বায়ুমণ্ডলের চারিধারে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে আরম্ভ করে এবং সেখান থেকে যুদ্ধ করার পথ আবিষ্কার করতে পারে তা হলে যুক্তরাষ্ট্র কি ভাবে যুদ্ধের পথ থেকে নিষ্কৃতি পাবার ব্যবস্থাতে আসবে ও বাস্তবজগতের ক্ষতি পূরণের কতখানি কৃতকার্যতা লাভে অগ্রসর হতে পারবে কেবল মাত্র এইটুকু চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিৎ হবে না বরং পৃথিবীর বহিঃস্থিত বায়ুমণ্ডলের চারিপাশে ১০০ থেকে ৬০০ মাইলের অন্তর্ভুক্তস্থানে সোভিয়েট রাশিয়াকে কোন প্রকার আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টাকে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করার পথে এগুতে হবে। আমাদের এতদিন জানা ছিল যে মানুষ যুদ্ধ বা লড়াই করে এসেছে পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তারের বাসনায়। এই মহাকাশের তত্ত্ব আবিষ্কার ও তার আধিপত্য আয়ত্তের মধ্যে রাখা একটী নূতন চিন্তাধারা এবং সব কিছু গূঢ় তত্ত্ব আয়ত্তে আনতে পারলে তার ফলাফল কিভাবে পরিপূর্ণ হবে এই বাস্তব জগতের কল্যাণার্থে, এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার দিন এখন এসেছে।

ভুবন ভরিয়া রহিয়াছ তুমি

॥ শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ, বি, এ, ॥

তব চরণের নূপুরের ধ্বনি দিকে দিকে ঐ ভাসে,
তোমার মোহন মুরলীর সুর কখন না কানে আসে,
তোমার পায়ের চিহ্ন লইয়া পদ্মদল মেলি দল,
তব অঙ্গের লাবণিতে নভঃ সিন্ধু সমুজ্জ্বল।

তব অধরের হাসি ফুটিতেছে কলায় কলায় চাঁদে,
পাঞ্চজন্যের বম্বু-নিনাদ শুনি যে বজ্রনাদে,
পুঞ্জিত মেঘে হেরি যে তোমার চারু চিকুরের শোভা,
প্রভাত রবির স্বর্ণ কিরণ পীতধড়া মনোলোভা।

ভুবন ভরিয়া রহিয়াছ তুমি ভুবন মোহন বেশে;
হৃদি বৃন্দাবনে দেখা দাও হরি চিরেক মধুর হেসে।

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্ব'প্রবৃত্তি)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় জন্যই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে, দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেইজন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়-নির্দ্দেশিত 'সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

তাঁহার ভক্তিভাবের অভাব ছিল না তাহাও তাঁহার জীবন-চরিত্র এবং তাঁহার নানা গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়। তিনি তাঁহার বিবেক-চূড়ামণি নামক গ্রন্থে নিজেই বলিয়াছেন, 'মোক্ষকারণ সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী'। মহাত্মা আনন্দগিরি-কৃত শঙ্কর-দিগ্বিজয়ম্ নামক গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের চণ্ডালরূপী বিশ্বেশ্বরের প্রতি ভক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের মতে ভক্ত আর জ্ঞানী একই শ্রেণি। আমাদের মতে ভক্ত আর জ্ঞানী অভেদ: যাঁহার জ্ঞান আছে, তাঁহারই ভক্তি আছে: যাঁহার ভক্তি আছে, তাঁহারই জ্ঞান আছে। আমাদের মতে ভক্ত অজ্ঞানী নহেন, জ্ঞানীও অভক্ত নহেন। তোমার পিতার প্রতি তোমার ভক্তি আছে, তুমি কি তোমার সেই পিতাকে জান না? তুমি অবশ্যই তোমার পিতাকে জান। ঐ প্রকার, যাহার পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি আছে, তিনি সেই পরমেশ্বরকে জানেনও বটে। যিনি পরমেশ্বরকে জানেন, তাঁহারও পরমেশ্বরের প্রতি অভক্তি আছে বলা যাইতে পারে না। ভক্ত পরমেশ্বরকে যে কারণে বা যে সকল কারণে ভক্তি করেন, তাহা পরমেশ্বর জ্ঞানীর অবশ্যই অগোচর নহে। সুতরাং তাহা জানিয়াও সেই ভক্তের পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি নাই বলা যাইতে পারে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভক্তের যে সকল লক্ষণ আছে, জ্ঞান-প্রতিপাদক প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে জ্ঞানীরও সেই সকল লক্ষণ আছে। চন্দ্রে শীতলতা, সূর্যে অশীতলতা বা উষ্ণতা—শীতলতার বিপরীত, অশীতলতা দূর করিবার ক্ষমতা আছে। তোমার মতানুসারে ভক্তি এবং জ্ঞান পরস্পর বিপরীত স্বীকার করিলেও বলিতে হইবে জ্ঞান এবং ভক্তি উভয়ই অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করিতে পারেন।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত

অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের অষ্টাদশ শ্লোকে আত্মাকে নিষ্কামক বলা হইয়াছে—'আত্মা নিষ্কামকশ্চান্ত যেহো নিষ্কম্য বাহুকঃ', অতএব আত্মা সগুণ সক্রিয় নহেন কি প্রকারে? আত্মা নিষ্কামক বলিলে আত্মা কখন সগুণ সক্রিয় এবং কখন নির্গুণ নিষ্ক্রিয় বুঝিবার কোন কারণই নাই। শঙ্করাচার্য্য আত্মাকে নিষ্কামক বলায় আত্মা কেবলমাত্র সগুণ সক্রিয়ই বুঝিবার কারণ হইতেপারে।

তৃতীয় অধ্যায়

যেমন দয়া এবং দয়াময় এক নহে, তদ্রূপ জ্ঞান এবং জ্ঞানময় এক নহে। শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের একোনবিংশতি শ্লোক অনুসারে, 'আত্মজ্ঞানময়ঃ পূর্ণো দেহোঽয়ং দময়ো যতিঃ' ঐ মতানুসারে আত্মাকে জ্ঞানময় বলা হইয়াছে বলিয়া আত্মাকে জ্ঞান বলা যায় না। সুতরাং জ্ঞান আত্মার এক নামও হইতে পারে না। শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে আত্মা জ্ঞানময় বলিয়া এবং আত্মা জ্ঞান নয় বলিয়া জ্ঞানও অসৎ। নানা অদ্বৈত মতে এক আত্মা ব্যতীত অপর যাহা কিছু তাহাই অসৎ। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ প্রভৃতি মতে আত্মা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। সেই জন্য জ্ঞানকে আত্মার মতনও বলা যায় না। তবে শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে জ্ঞানকে কি বলা যাইতে পারে? তাঁহারই মতানুসারে জ্ঞানকে অসৎ বা অসতী অবিদ্যাই বলা যাইতে পারে। কারণ পূর্বেই তো শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে বলা হইয়াছে জ্ঞান আত্মা নহে। জ্ঞান আত্মা না হইলে নিশ্চয়ই জ্ঞান অনাত্মা। অনাত্মা যাহা তাহাই তো অসৎ। অনাত্মা যাহা তাহাই তো অবিদ্যা। অবিদ্যা যাহা, কোন কোন অদ্বৈতমত-প্রতিপাদক গ্রন্থ মতে তাহাই তো অজ্ঞান। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে জ্ঞান এবং অজ্ঞান উভয়ই সমান বলিতে হয়। সুতরাং আত্মার জ্ঞান এবং অজ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন নাই ও বলা যাইতে পারে। কারণ শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে জ্ঞানাজ্ঞান উভয়ই অনাত্মা বলিয়া উভয়ই বিকার। সুতরাং অবিকৃত বা নির্বিকার নিরঞ্জন আত্মার আত্মজ্ঞানেও প্রয়োজন নাই। সুতরাং শ্রুতি-নির্দেশিত নির্বিকার নিরঞ্জন আত্মা জ্ঞানাতীত। তিনি কেবল অবাঙ্মনস-গোচর। তিনি জ্ঞান-বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণেরও অগোচর। তিনি অজ্ঞানাতীতও বটেন।

চতুর্থ সিদ্ধান্ত

অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের বিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে, 'আত্মপ্রকাশকঃ স্বচ্ছো দেহস্থোঽপি উচ্যতে'—প্রকাশক যাহা, তাহা কিছুকে নিশ্চয়ই প্রকাশ করে। যিনি প্রকাশ করেন, তিনি নিশ্চয়ই সগুণ সক্রিয়। সূর্য্য অথবা চন্দ্রে প্রকাশকতা আছে, তাঁহারা কি সগুণ সক্রিয় নহেন? শঙ্করাচার্য্যের মতে আত্মারও প্রকাশকতা আছে, সেইজন্য আত্মাকেও সগুণ সক্রিয় বলা যায়।

পঞ্চম সিদ্ধান্ত

শঙ্করাচার্য্যও হরি স্বীকার করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থে প্রমাণ আছে। তিনি প্রথমেই শ্রীহরিকে প্রণাম জানাইয়া ঐ গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদে প্রণাম করা প্রয়োজনই হয় না। দ্বৈতবাদেই কোন ভক্তিভাজনকে ভক্তির সহিত প্রণাম করা হইয়া থাকে। শঙ্করাচার্য্য ঐ গ্রন্থের প্রথমেই হরিকে প্রণাম করিয়াছেন। সেই জন্যই তাঁহার হরির প্রতি ভক্তি ছিল না বলা যায় না।

ক্রমশঃ

হিন্দুধর্ম-সমীক্ষা

।। শ্রীরুহিদাস সাহা ।।

ভারতীয় সংবিধানে ভারতবর্ষ ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই ধর্ম-নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে গিয়ে আমাদের নেতৃবৃন্দ হিন্দুধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েছেন। সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানী বেতারকেন্দ্র এমন সমস্ত উক্তি করেছে যা হিন্দুধর্মের প্রতি অবমাননাকর। অথচ তার কোন প্রতিবাদ নেই ভারতের পক্ষ থেকে। তা হ'লে কি আমাদের নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িক হয়ে যাবেন! এই যুদ্ধে যে সকল বীর সৈনিক মাতৃভূমির অখণ্ডতা রক্ষায় আত্মাহুতি দিয়েছেন তারা আমাদের প্রণম্য। কিন্তু ভারতীয় বেতার কেন্দ্র ও নেতৃবৃন্দের জাগ্রত সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়ের উদ্দেশে সম্মান প্রদর্শন করেছে অধিক। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সব সরকারী অফিসে মসজিদ বর্তমান, মন্দিরের নামগন্ধ নেই সেখানে। সরকারী কর্মচারীদের ছুটির তালিকায় সংখ্যালঘুদের জন্যে রয়েছে বিশেষ সুবিধা। হিন্দুধর্মাবলম্বীদের পক্ষে একাধিক বিবাহ আইনতঃ দণ্ডনীয়, কিন্তু এই দণ্ডাদেশ নেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর। আমাদের নেতৃবৃন্দ মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের স্বপ্ন দেখেন, আকুল আবেদন জানান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে।

সংখ্যালঘুদের প্রতি এতটা উদারতা সত্ত্বেও পৃথিবীর চোখে ভারতের স্থান আজ কোথায়, সাম্প্রতিক যুদ্ধে তা সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বৃটেন এ যুদ্ধকে হিন্দু বনাম মুসলমানের যুদ্ধ বলে আখ্যাত করতে একটুও ইতস্ততঃ করে নি। ভারতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার স্বপ্ন দেখলেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল। যে ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছে সেই ইন্দোনেশিয়া ভারত-আক্রমণকারী পাকিস্তানকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেছে পরম আহ্লাদে। সেই অশুভ মিতালিতে যোগ দিয়েছে ইরাক, ইরান, জর্ডন প্রভৃতি মুসলীম দেশ। এরা ধর্মকেই প্রাধান্য দেয়, তার অন্যায়ের প্রশ্ন সেখানে গৌণ।

পৃথিবীতে হিন্দুধর্মাবলম্বী দেশ যদি আরও থাকত তবে ভারতবর্ষকে সমীহ করে চলত সকল দেশ। ঐশ্বর্যশালী রাষ্ট্রগুলোও পাকিস্তানের সাহায্যে এগিয়ে যাবার সাহস পেত না এতটা নগ্নভাবে।

সুপ্রাচীন হিন্দুধর্মের আজ এমন করুণ রূপ কেন? হিন্দুধর্ম কেন আজ শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ? এ ধর্মের জয়যাত্রা হয় নি কেন পৃথিবীর দিকে দিকে? যে সকল ধর্মের জন্ম হিন্দুধর্মের বহু পরে তারাও লাভ করল পৃথিবীজয়ের গৌরব, আর হিন্দুধর্ম পড়ে রইল এককোণে। অথচ সকল ধর্মে যা আছে হিন্দুধর্মেও তা রয়েছে, কিন্তু হিন্দুধর্মে যা আছে অন্যান্য ধর্মে তা নেই। এ ধর্মে যেমনি আছে সাকারবাদ তেমনি রয়েছে নিরাকারবাদ। কিন্তু সাকার-নিরাকারে কোন বিরোধ নেই এখানে। এ ধর্ম একদিকে যেমন প্রকাশ করেছে 'ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়', অন্যদিকে বলেছে সমস্ত জীব ঈশ্বরের প্রতিভূ। যে ধর্ম এতটা মহান তার এমন সীমাবদ্ধতা কেন? কেন এ ধর্ম পৃথিবীর জনসমষ্টির এক ক্ষুদ্র অংশের? আমাদের ধর্মগুরুগণ অস্ত্রের সাহায্যে ঘৃণার কথা প্রেমের সাহায্যেও ধর্ম-প্রচারের চেষ্টা করেন নি কোনদিন। ধর্ম প্রচারের কল্পনাও আসে নি তাঁদের চিন্তাধারায়। অপর ধর্মাবলম্বীকে এ ধর্মে দীক্ষিত করার প্রবৃত্তিও ছিল না তাঁদের। ফলে তপোবনের শান্ত সুন্দর ভাব-গম্ভীর পরিবেশে ঋষিকুলের কণ্ঠ থেকে যে সামাবাণী উচ্চারিত হয়েছিল তা ভারতেই আবদ্ধ হয়ে রইল, জগৎবাসীর পারমার্থিক কল্যাণে পৃথিবীর ধর্ম-সভায় আর প্রেরিত হল না সে বাণী।

ভারতের অভ্যন্তরেও হিন্দুধর্মের যে চিত্র তা-ও

তো সুখকর নয়। প্রাক-স্বাধীন ভারতে লোক-সংখ্যার তুলনামূলক বিচারে দেখা গেছে সমগ্র জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ অন্য ধর্মাবলম্বী। ভারতের অন্যান্যরের হিন্দুধর্মের এতটা অধঃপতন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে অতীতের দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে, ভবিষ্যতের শিক্ষার জন্যেই অতীতের মর্মান্তিক চিত্রগুলো রাখতে হবে আমাদের সম্মুখে। অতীতে আমরা যাঁদের উপর ধর্মের সমস্ত কর্তৃত্ব তুলে দিয়েছিলাম তাঁদের অমানুষিক আচরণেই হিন্দুধর্মের এতটা দুর্গতি। তাঁদের বেদনাদায়ক কার্যাবলীতে হিন্দুধর্মের রূপান্তর ঘটেছিল দুঃস্বপ্নে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—'আমাদের ধর্ম এখন রান্নাঘরে'। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—ইহা যে-ধর্মের মর্মকথা সে-ধর্মের একটা বিরাট অংশ অস্পৃশ্যতার নাগপাশে হয়ে পড়েছিল পঙ্কলিপ্ত, ঘৃণ্য, অপাংক্তেয়। মানবতার এত বড় অপমান বুঝি আর কোন ধর্মে দেখা যায় নি। 'যত্র জীব তত্র শিব' মন্ত্রে যে ধর্ম মানবতায় সমুজ্জ্বল, সে-ধর্মে মানবতার একি অপমান! গীতার প্রদত্ত আশ্বাস বাণীকে সার্থক রূপ দিতে যদিও যুগে যুগে আবির্ভাব ঘটেছে শ্রীভগবানের পতিতপাবনরূপে, তবুও সেই নিগৃহীত সমাজের এক বিরাট অংশ আত্মরক্ষার উপায় স্বরূপ অবলম্বন করেছিলেন অন্যধর্মকে। তারাই আজ মুসলমান, খৃষ্টান। এই মুসলমানের পৃথক রাষ্ট্রের দাবীতেই অখণ্ড ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে হিন্দুবিদ্বেষের মধ্যে জন্ম নিয়েছে পাকিস্তান।

হিন্দুধর্মের সমাজদেহে এই দুই ক্ষতটি আজও বর্তমান। অস্পৃশ্যতার নিষ্পেষণে হিন্দু সমাজের এক বিরাট অংশ আজও লাঞ্ছিত অপমানিত। এক শ্রেণীর হিন্দুর স্পর্শে আজও এক শ্রেণীর হিন্দুকে স্নান করে শুচি হতে হয়। তথাকথিত উচ্চ বর্ণের হায় রে এ কি কুকর্ম! এরাই না আবার নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয়! হায় ভগবান, অতীতে আমরা এ ধর্মের যে সর্বনাশ করেছিলাম আজও সেই বিপথেই পা দিয়ে চলেছি, নতুন পাকিস্তানের ভিৎ-প্রস্তর স্থাপনে ব্রতী হয়েছি!

সমস্ত সম্প্রদায়ের আচার্যদের উদ্দেশে আজ আকুল আবেদন জানাই। বলি, আপনারা আমাদের একবার মন্ত্রে দীক্ষা দিন। সমস্ত বিভেদের প্রাচীর তুলে হিন্দু-ভারতকে করুন এমন স্বর্গ যা হবে অস্পৃশ্যতা-কলুষমুক্ত, যেখানে থাকবে না কোন উচ্চনীচের ভেদাভেদ, যেখানে মানুষের অপমানে ভগবান হবেন না অপমানিত।

আরও এগিয়ে যেতে হবে হিন্দু সমাজকে। স্বেচ্ছায় বা ছলে-বলে-কৌশলে যারা একদিন হয়েছিল ধর্মান্তরিত তারা যদি হিন্দু ধর্মের কোলে আশ্রয় নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে হিন্দু ধর্মের দ্বার খুলে দিতে হবে ওদের কাছে। তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বলতে হবে—এসো তোমরা, স্বাগত জানাই তোমাদের, তোমাদের আমাদের মিলনে হিন্দুধর্ম হয়ে উঠুক মহীয়ান।

হিন্দুধর্মের দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে সর্বক্ষণ। আমরণ জানাবো সবাইকে। যিনি আসবেন তাঁকে নিরাশ করলে চলবে না। তা হবে অপরাধ। অপরাধের পুনরাবৃত্তি আমরা আর করব না। তবেই হিন্দুধর্ম হয়ে উঠবে উদারতার সমুজ্জ্বল। তখন হিন্দুধর্ম প্লাবন আনবে জগতে।

হিন্দুদের মধ্যে বিভেদের সুযোগে একদিন মুসলমান ও ইংরেজের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল আমাদের উপর দুঃশাসনের বোঝা চাপিয়ে রাখার। আমরা যদি বিভেদ-মুক্ত সমাজের পথ গ্রহণ না করি, আবার আমরা পর-শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'ব। প্রদেশে প্রদেশে প্রভেদ থাকতে পারে, কিন্তু সেই প্রভেদ যেন বিদ্বেষ হয়ে না দেখা দেয়—দৃষ্টি দিতে হবে সে দিকে। হিন্দু ধর্মকে করতে হবে সকল বিদ্বেষমুক্ত।

আচার-সর্বস্বতা থেকেও হিন্দুধর্মকে মুক্তি দিতে হবে। অত্যধিক আচার অনাচার ডেকে আনে। সেই অনাচার জাতির মৃত্যুর সূচনা করে। আমাদের সমাজে আচারের মধ্যেও কত না বিভেদ। কাউকে অশৌচ পালন করতে হয় এগার দিন, কাউকে বা এক মাস। এক একাদশী-ব্রতই দু সম্প্রদায় পালন করে দু'দিনে। সকল আচার অনুষ্ঠানকে আমরা যদি একীকরণ করতে না পারি তবে আরও প্রভেদ সৃষ্টি হবে। প্রভেদের সঙ্গে সঙ্গে আসতে পারে বিভেদ, বিভেদের পরে বিদ্বেষ। সেই অভিশাপকে আর স্বাগত জানাতে পারি না।

আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক উন্নতিরও প্রয়োজন। এদিকে আমাদের পর-প্রদর্শক দৈহিক অধিকাংশ।

যৌগিক ব্যায়ামে বলিষ্ঠ দেহের সঙ্গে ধর্মও আমাদের বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে। বলিষ্ঠ দেহমন নিয়ে শত্রুর সম্মুখীন হতে হবে আমাদের। দেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষাও আমাদের ধর্ম। এই পবিত্র কাজ থেকে দূরে থাকলে অধর্ম হবে। সেই শিক্ষাই দিয়েছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। যুদ্ধকালে আমরা এক একজন ক্ষত্রিয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম।

পারমার্থিক উন্নতি আমাদের কাম্য হলেও অর্থকে আমরা অবজ্ঞা করতে পারি না। একটা জাতির পক্ষে দরিদ্রতা অভিশাপ। সেই দরিদ্রতামুক্ত সমাজ গঠনে আমাদের ব্রতী হতে হবে। দরিদ্রতার নিষ্পেষণে জর্জরিত যারা, যারা অর্ধভুক্ত, অভুক্ত তাদের মুখে সুধার অন্ন তুলে দেবার শপথ নিতে হবে আমাদের: তবেই মানবতার পূজা হবে সম্পূর্ণ, প্রকৃত ধর্মের হবে উদ্বোধন।

আমাদের ধর্মের উন্নতি ও প্রচার আমরা চাই। কিন্তু অপর ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা আমাদের নেই, হিন্দুধর্ম অপর ধর্মকে অবজ্ঞা করতে শেখায় নি। যিশুকে আমরা ভক্তি করি, হজরত মহম্মদকে শ্রদ্ধা জানাতে ভুল করি না। সকল ধর্মের মিলিতরূপ হিন্দুধর্মের পক্ষেই সম্ভব এতটা উদার দৃষ্টিভঙ্গী।

একখানি পত্র

॥ শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় ॥

[বিগত শ্রাবণ ১৮৮৭ মাসের 'উদ্বোধনে' পত্রিকায় ডাঃ জীব গোস্বামী লিখিত 'চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস' নামে একখানি লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। লেখাটি সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উদ্বোধনের সম্পাদিকাকে যে বেদনাপূর্ণ পত্রখানি লিখিয়াছেন তাহা এইখানে প্রকাশ করিলাম। পত্রখানির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। জীবন অনন্ত রহস্যময়—বুদ্ধির বিচারের মধ্যে তাহার সবখানি ধরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে যাওয়া সমীচীন নয় একথাটা আজিকার মানুষের ভুলিলে চলিবে না। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ বলিয়াছেন '...The whole, the Absolute, which is the highest concrete, is so rich that its wealth of content refuses to be forced into the fixed forms of intellect. The life of spirit is so overflowing that it bursts all barriers. It is vastly richer than human thought can compass. It breaks through every conceptual form and and makes all intellectual determination impossible. While intellect has access to it, it can never exhaust its fullness'। এ অবস্থাটা যখন জীবনের মধ্যে সত্য তখন বুদ্ধি দিয়া বিচার শেষ করিয়া ফেলিতে চাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবন বুদ্ধি দিয়া শেষ করিয়া ফেলিবার জীবন নয়। সেই কথাটা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। সেই কথাটা মনে করাইয়া দিবে বলিয়াই এ পত্রটি প্রকাশ করিলাম।]

পরমকল্যাণীয়া,

এবারের উদ্বোধনে ডাঃ শ্রীজীব গোস্বামী রচিত 'চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস' পড়ে খুবই ব্যথিত ও মর্মাহত হলাম। আমার ন্যায় ভক্তিহীন ও শ্রদ্ধাহীন

লোকেরও এই প্রবন্ধ পড়ে দুঃখিত হতে হয়েছে। আর যাঁরা প্রকৃত ভক্তিমান পরম বৈষ্ণব আছেন, তাঁরা যদি এই প্রবন্ধ পড়েন, তাহলে সত্যই খুবই ব্যথিত হবেন, এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এখনও বাংলা দেশে প্রকৃত বৈষ্ণব সামান্য হ'লেও কিছু সংখ্যক আছেন, নিশ্চয়ই। যাঁরা প্রকৃত সাধক ও বৈষ্ণব, তাঁরাই কেবল মহাপ্রভুর লীলার রহস্য সবই বুঝতে পারেন, তা ছাড়া অপর কাহারও পক্ষে তা সম্ভবের নয়। পাণ্ডিত্য থাকলেই হয় না। প্রকৃত সাধক হওয়া চাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথায় ফুলের পুঁটলীর সাগরে গিয়ে নবন আনার মত, আজকাল তথাকথিত পণ্ডিতগণের মহাপ্রভুর লীলার ব্যাখ্যা করতে যাওয়ার চেষ্টা করা....তাঁর গোস্বামী মহাপ্রভুর চরিত্রের প্রতি যে কুৎসিত ইঙ্গিত করেছেন, তার জন্যেই আমার এই লেখা। যিনি স্বয়ং ভগবান, যিনি তাঁর প্রকাশকালে দেশাচার, লোকাচার, ধর্ম পূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে পালন করে গিয়েছেন, তাঁর সম্বন্ধে এই জঘন্য মনোভাব বড়ই দুঃখের বিষয়। তাঁর গায়ে কিছু কাদা মাখালে তাঁর কিছুই হবে না। কিন্তু যিনি করলেন, তাঁর পরিণতি ভেবে আমি শিউরে উঠছি। গোস্বামী প্রভু (শ্রীশ্রীবিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী) যখন শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন, তখন একজন বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী তাঁর নিন্দা করেছিলেন, এইজন্য তিন দিনের মধ্যে ঐ বৈষ্ণব মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তুমি সম্পাদিকা। তোমারও একটা দায়িত্ব আছে। তুমি ধর্মপথে আছ। তোমার পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হওয়াতে তাঁর অনিষ্টের জন্যে তুমিও নিমিত্তের ভাগী হ'লে। যদি প্রকৃত চোখ ও কান থাকত তা হলে তিনি বুঝতে পারতেন কত বড় অন্যায় তিনি করেছেন। 'অন্যাপিও লীলা করে গৌর রায়, কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়'। তিনি শুধু কথার ক্ষমার প্রত্যাশী হ'য়েছেন। কিন্তু তিনি জানেন না যে তিনি তাঁর নিজের ও দলের কতখানি অপকার করেছেন। বাইবেলের কথায় 'they know not what they do'। তিনি দেখে এখনও যাঁরা প্রকৃত বৈষ্ণব আছেন, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারতেন এই প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বে।...অত্যাচারের মাত্রা আরও যত বেশী হবে, ততই অবতারের আগমন সুগম হবে। কথায় আছে, মৃত্যুর পরে ভগবানের কাছে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করবেন কি করে এলে; কি পড়ে এলে, এ কথা জিজ্ঞেস করবেন না। শ্রীল বৃন্দাবন দাসের জন্মকথা নিয়ে এই জঘন্য ইঙ্গিত সত্যই পরিতাপের বিষয়। আমার চিঠিটা একটু বড় হ'য়ে গেল। তুমি বলেই এত কথা লিখলাম। আশা করি ভাল আছ। আমার আশীর্বাদ নিও।

ইতি

শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়।

"বৈষ্ণব ভক্ত দার্শনিকগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণবল্লভ, পরাণবঁধু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এখানে প্রাণ যে অর্থে লওয়া হইয়াছে, আমার প্রাণ শব্দে সে অর্থ তো আছেই, বরং প্রাণ বলিতে যদি প্রজ্ঞা ছাড়া প্রাণ বুঝায়, তাহারই নিষেধ করিবার জন্য ঈশোপনিষদের ভাষ্যে প্রাণবল্লভ ও প্রজ্ঞাঘন বিশেষণ দুইটী পুরুষোত্তমের পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। 'যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বৈ প্রজ্ঞা সঃ প্রাণঃ'—কৌষীতকী উপনিষৎ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষিগণ ঊর্দ্ধশ্বাস পানের জন্য যে 'প্রাণে'র শরণ লইয়াছিলেন 'ঘরে বাইরে'র প্রাণও সেই অর্থেই দেওয়া হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বাক্ চক্ষু শ্রোত্র মন ও প্রাণের মাঝে ক্রম উত্থাপন করিয়া যে প্রাণের মাঝে সকল ক্রমের অবসান ঘটাইয়াছেন, সেই প্রাণই আমাদের লক্ষ্য।... নামের স্তর হইতে ব্যাপকতরভাবে বাক্, মন সঙ্কল্প, চিত্ত, ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, অন্ন, অপ্, তেজঃ, আকাশ, স্মর আশার উল্লেখ করিয়া পরে প্রাণের স্তরের খোঁজ দিয়াছেন; এই প্রাণের স্তরের পরই হইতেছেন আত্মা। এই আত্মাই পুরুষোত্তম এবং এই পুরুষোত্তম আত্মাই প্রাণবল্লভ। প্রাণ বলিতে নাম হইতে আশা পর্যন্ত সব স্তরের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া অথচ প্রতি স্তরের সঙ্গে অপর স্তরগুলির interpenetration ও permeation রহিয়াছে। সর্ব স্তরের এই interpenetration ও permeation যে প্রাণে সম্ভবপর, সেই প্রাণেরই বল্লভ পুরুষোত্তম।..."

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৩—

(৫২)

যে পতাকা সকল লোকে দেখিবে, যাহার সামনে সকল লোক মাথা নোয়াইবে, অভিবাদন করিবে, তাহার চাঁদায় নিজ জীবন জুড়াইবে? ঠাকুর, তাই কর···তুমি আমি এক অদ্বৈত। সকালে সুবোধ আসিয়া নিত্যব্রতর রক্ত নেয়। বেণু প্রথমে প্রস্রাব দিয়া আসে, পরে রক্ত সুবোধের ভিনসেনসারীতে দিয়া আসে।···উষারিণীর জ্বর হয়।··· সুহৃদ উপরে গিয়া নিত্যব্রতর সেবা করে, নন্দরাণীর খাবার দেয়···। সন্ধ্যার পর প্রথমে কনক (বিরজার মেয়ে)··· আসে। পরে সুহৃৎবাবুও আসেন।

৮ই জুলাই

ঠাকুর, বড় বড় ঠেলিয়া চলিয়াছি, পরিপাক করিবার শক্তি দেও। তোমার 'পথ' বিশ্বের সামনে প্রকট করিয়া যাইব, বিশ্বমানব সেই পথে চলিয়া সর্ব সমস্যার সমাধান করিবে, ইহাই ছিল কামনা। পারিলাম না তো। জীবন কি এইখানেই স্তব্ধ হইয়া যাইবে? সারা বিশ্ব যে অন্তরে অন্তরে তোমাকেই চায়—Between scylla and charybdis হইতেছে তোমার পথ। কি দুষ্কর! অথচ এই পথে চলিতেও হইবে। যদি আমি কিছুই করিতে পারিব না, তবে কেন এ পথে টানিয়া আনিলে? শক্তি দেও, বুদ্ধি দেও, সুযোগ দেও।···সেবানন্দ···আমাকে মঠে পাঠ করিবার জন্য সকলের অনুরোধ জানায়। আমার শরীর ভাল নয়, তদুপরি মঠের কেহ আমার পাঠে আসে না। বাজার লোক ধরিয়াই তাহারা কাজ সারুন।

৯ই জুলাই

রাধারাণী, বিশ্বের অনন্ত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বাস্তব সকল রূপ তুমি, তুমি হইবার জন্যই বিশ্বের যাবতীয় প্রাণীর কি ব্যাকুলতাই না জাগিয়া আছে? 'তুমি' বলিয়া না যাওয়া পর্যন্ত কাহারও স্বস্তি নাই। সে উন্মাদের মত ছুটিয়াছে উন্মাদিনী তোমার জীবনে জীবন মিলাইবার জন্য। তুমি একটি মুক্ত জীবন-প্রবাহ চলিয়াছ অনাদি অনন্তে, দুকূল স্পর্শ করিয়া, দুকূল ব্যাপিয়া, দুকূল প্লাবিয়া। তুমি সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত, তাই তুমি চির-কলঙ্কিনী। তোমার কলঙ্কিনী রূপ মুক্তের পক্ষেই না আদরের বস্তু। আমার জীবনে তুমি অন্তর্মুক্ত হও।···কুমারেশের রাধারমণ-বাবু কাল বৈকাল ৪টায় এখানে আসিবেন চিঠি দিয়াছেন।···

১০ই জুলাই

ঠাকুর, তুমি পুরুষোত্তম রূপে পুরুষেরই মত প্রকৃতির স্বয়ংমূলা বিধান করিয়াছ, প্রকৃতির বুকে নিবৃত্তির ঘনরূপ আস্বাদন করিয়াছ, সব ছোটদের মান বাড়াইয়াছ, বড়ত্বের চাপে, ব্রহ্মত্বের চাপে ছোটদের নিষ্পেষিত হইতে দেও নাই। তুমি আমার জীবনে অন্তর্মুক্ত হও। আমি যে আর তোমাকে লইয়া এই সংসারের বুকে আগাইতে পারিতেছি না। পথ কি blocked হইবে? বাধা দিতেছে যাহা তাহাকে কি আমি হজম করিতে পারিব না? গোপার জীবনে আমি তোমার প্রতিষ্ঠা গড়িবার জন্য কতই না আকুল! সে কি মানুষ হইবে না? তাহাকে মানুষ করিও।···সকালে মহেন্দ্র ঘড়ি আসিয়াছিল। 'শীতাতবনে' হেমন্তবাবু অসুস্থ বলিয়া গত রবিবার হইতে পাঠ বন্ধ। আমাকে পাঠ করিবার জন্য বলে। প্রথমে স্বীকার করি নাই, পরে রাজী হইলাম। রবিবারে ৪।০টায় যাইব···।

১১ই জুলাই

ঠাকুর, সেই কবে পথে বাহির হইয়াছি, আজও পথ বাহিয়া চলিয়াছি একা, অসহায় অবস্থায় তোমার জীবন ও দর্শন সকল করিয়া। আবেষ্টন প্রতিকূল; ঘর নাই, জন

নাই। আগেকার সাধনা হইলে এই আবেষ্টন সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া, আবেষ্টন এড়াইয়া ইহার ঊর্ধ্বে উঠিতে চাহিতাম। কিন্তু পুরুষোত্তম দর্শনে তো এড়াইয়া গা বাঁচাইবার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। চাই আবেষ্টনকে গড়িয়া তুলিয়া psychological line of development ধরা মরণকে অজর অমরের ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার সাধনা আজ আসিয়াছে। ঠাকুর, আমাকে প্রকৃতির বুকে অজর অমর নিশ্চল ব্রহ্মজ্ঞানকে construction method-এ আবাহন করিতে দেও ···হাং-টায় এখানে পাঠ হয়। হাং-টায় গীতাভবনে যাই ··· গীতার preliminary আলোচনা গীতাভবনে হয়। মহেন্দ্র বিদ্যার নিয়া যায়। শ্রীধরবাবু পর বিদ্যায় আসি। 'ভগবন্ এতৎ প্রপদ্যে মে' শ্লোকটী বলিয়া ব্যাখ্যা করি। ওটী ভগবান। কুমারেশের রাধারমণ মিত্র আসেন ছুটীর, গাড়ীটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন আমার জন্য। আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য ২৫ টাকা দিয়া যান। মাসিক বন্দোবস্ত করার কথা বলিয়া যান ····

১২ই জুলাই

রথযাত্রা

জগন্নাথদেব শ্রীনিতাগোপাল আমার, আজ তুমি পথের মাঝে লক্ষ লক্ষ অসহায় নিপীড়িত শোষিত জনগণের মাঝে সকলের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছ, পথ বহিয়া চলিয়াছ। আজ তোমাকে সকলে দেখিবে, ছুঁইবে; আজ তুমি সকলের, সকলে আজ তোমার। তুমি আজ আর মন্দিরের ঠাকুর নও, পূজারীর হাতে বন্দী নও। তুমি আজ মুক্ত আকাশ তলে বিরাট ধরণীর বুকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ। জগৎ+নাথ=জগন্নাথ। যোগমায়া শক্তি মাঝখানে থাকিয়া জগতের কথা নাথের কানে কানে এবং নাথের বাণী জগতের কানে কানে শুনাইতেছে। তোমার রথযাত্রা সফল হউক। ধরার ধূলি হউক ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম-মানুষ। মাখনবাবু সকালে আসে,···,··· এ বিষয় অনেক আলোচনা হয়। অনেক কিছু সংসারে সহ্য করিতে হয়, পাশ কাটাইয়া যাইতে হয়, সবটা resist করা চলে না; নিজের জীবনকে সামনে এমন ভাবে রাখিতে হয় যাহাতে ঠেলিয়া কেহ নিজের খেয়াল চালাইতে না পারে।

১৩ই জুলাই

আমার দেহ-রথের সারথি ওগো জগন্নাথ শ্রীনিতাগোপাল, আমার রথ বোধ হয় আটকাইয়াই যাইবে যদি তুমি শক্ত করিয়া আমার জনরূপ প্রগ্রহকে ধারণ না কর, আমার 'আমি'কে আত্মসাৎ করিয়া না লও। কি এক শক্ত 'পারা'র মধ্যেই না আমার চারিদিকে যাহারা আছেন, তাহাদিগকে ফেলিয়াছি। প্রকৃতির বদল করিতে হইবে, পরা প্রকৃতি হইতে হইবে। প্রকৃতির পরিবর্তন না হইলে বিদ্যা তপ প্রাণনিরোধ মৈত্রী তীর্থাভিষেক ব্রত দান জপ-দ্বারা তো অন্তরে শুদ্ধি হইবে না। যতক্ষণ না অনন্ত ভগবান তুমি ফুটিয়া উঠ, সব সাধনা আজ ব্যর্থ। প্রকৃতির পরিবর্তন করার সাধনাই আজ গ্রহণ করিতে হইবে। সেই জন্যই পরা প্রকৃতি রাধার ধ্যানের কথা বার বার বলি, বিদ্যা অপরা প্রকৃতি কিছুই অনন্তের সাধনা নয়, উহারা সবই অন্তকে আশ্রয় করিয়া স্ফুরিত হয়। ঠাকুর, ঠাকুর, তোমার স্পর্শে আমার অপরা প্রকৃতি পরা হউক ····রেণু ব্যাঙ হইয়া···অনিল ঘোষকে···। ২টার পর হুমুমকে নিয়া চশমার দোকানে যাই···।

১৪ই জুলাই

ঠাকুর, তুমিই আমার আত্মা, আমি অনাত্মা; তুমিই আমার 'অহম্', আমি 'অনহম্', তুমিই কায়া, আমি ছায়া। আমি তোমার প্রেম-সাগরে গা ভাসাইয়া কলার ভেলার মত চলিব। 'সাগর জলে জাহাজ চলে, জাহাজ যত তুফানে ডোবে, কলার ভেলা ডোবে কবে'। সেই ভরসার চুড়ায় বসে ভেলা ব্রহ্ম-হিলোল দোলে'। আমি আর বেড়া দিয়া আমার ছোট আমিকে রক্ষা করিতে চাহিব না। বেড়া দিয়াও তো বাহিরের বিশ্বকে ঠেকাইতে পারিব না। বেড়া আর দিব না। বাহির হইয়া পড়িব বিরাট বিশ্বের বুকে। জগন্নাথ, তোমার জগৎ লইয়া চলিব; সকলের সমস্যার সঙ্গে ব্যক্তিগত সমস্যা জড়াইয়া তাহার সমাধান করিতে প্রয়াস পাইব। আমি একা তো আমি নই, বিশ্ব

নিয়াই আমি আমি। তুমিই আমার পরম আমি।··· ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আজ 'হরতাল' হয়। ইহার মধ্যে অনেকেই ভয়ে বাহির হয় নাই। Sauer section ইহা পছন্দ করে না, পথে বাহিরও হয় না। একটা হিংস্র আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে কমুনিষ্টগণ, যাহারা ভেলেজোনার আন্দোলন করিয়া শ্লাঘা বোধ করে। এই ভাবে কি কোনও অধিকার আদায় করা সম্ভব? তাহা হইলে মহাত্মাজী আর অহিংস আন্দোলন প্রবর্তন করিতেন না। এই পথে কোনও গভর্ণমেণ্টকে দখল করা যায় না।

১৪ই জুলাই

ঠাকুর, আমার জীবনের চারিপাশে যে সকল সমস্যা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার সমাধান শুধু তোমার আমার অদ্বৈত একতনু একপ্রাণ একমন হওয়ায়। যে ভাবে তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হইয়াছ, সে ভাবে ভাবিবার তো কেহ সঙ্গে নাই। তোমার আঁকা পথে আমি একাই চলিব। ঠাকুর, সখী আমার, সঙ্গে সঙ্গে থাকিও, এক হইয়া থাকিও। রেণু ১২টায় বাহির হয়···, মিষ্ট খাবার জন্য কাতর হইয়া পড়িয়াছে, যাহার জন্য সে এখান হইতে এরূপ যাইতে প্রস্তুত। এই ভাবুকতা লইয়া সে কি করিয়া চলিবে? তাহার দেবরেরা কি ইহা পছন্দ করিবে? -র উপর তাহার বিশ্বাস নাই, - - এর উপর নাই। সে কি সব সামলাইতে পারিবে? মা যদি বাবা না হয়, তবে মেয়েরা কি করিয়া সন্তান রক্ষা করিবে? নারী যদি নারীত্বের উর্দ্ধে উঠিয়া পুরুষত্বকে আয়ত্ত করিতে না পারে, তাহা হইলে বিধবা হওয়ার পরে সহমরণ যাওয়াই উচিত। ঘরের ও বাহিরের কাজ যে মেয়ে করিতে পারিবে, সে-ই বিধবা হইয়াও পুত্রকন্যাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। এই সব কথা আজ আলোচনা হয়। আজ প্রতিজ্ঞা ও নিত্যব্রতের ইনভেকেসন হয় রাত্রি ১টার পর। আমার প্রস্রাবের অবস্থা তেমন সুবিধা না। রাত্রিতে তবার উঠিতে হয়।

১৬ই জুলাই

ঠাকুর, তুমি আমার স্থিতিভূমি। ঝড় আসে, ঝড় যায়, তুমি স্থির আছ। তোমাকে আঁকড়াইয়া থাকিতে পারিলে ঝড় আছাড় খাইয়া খাইয়া আপনা আপনিই নিবৃত্ত হয়। উহা যে 'মায়া'। শ্মশানে হরিশ্চন্দ্র চণ্ডাল, রাজরাণী শৈব্যা দাসীরূপে যখন সর্পাঘাতে মৃত পুত্রকে দাহ করাইবার জন্য শ্মশানে উপস্থিত, অথচ পয়সা দিতে না পারায় জন্য শ্মশান-চণ্ডাল দাহ করিতে না, শৈব্যা উচ্চৈঃস্বরে হরিশ্চন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তখন পট পরিবর্ত্তন হইল, মায়া কাটিয়া গেল। জীবনে অনেক ডাকিনী যোগিনী আসে ঝড় লইয়া, শ্রীশ্রীকালী-চরণপরায়ণগত সাধকের কাছে তাহারা কিছুই করিতে পারে না। তোমার জয় হউক আমার জীবনে। রেণু ১২টায় বাহির হইয়া হাওড়া ব্রীজ প্রভৃতি আবহার ঘুরিয়া ৪টার মধ্যে আসে।···রাস্তার সব আলো নিভাইয়া দেয় যুবকগণ। রাস্তা block করিয়া দেয়। পুলিশ আসিলে ইটপাটকেল ছুঁড়িবে। সব বাড়ীর দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া দিতে বলে। ১০টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে। পুলিশ আসে না। তখন চলিয়া যায়। ১১টার পর পুলিশ আসিয়াছিল। দুরভিসন্ধি কি ভাবে অপব্যবহৃত হইতেছে। ভাবিতে বেদনা হয়। এই ভাবে কি কোন সরকারকে আয়ত্তে আনা সম্ভব? এ পথ পথ নয়। অসন্তোষকে বাড়াইয়া তুলিলে উহা মরণ আনয়ন করে। মহাত্মাজীই পারিয়াছিলেন বিষকে অমৃত করিয়া দেশের সেবায় লাগাইতে।

১৭ই জুলাই

ঠাকুর, আমাকে স্বীকার কর, অস্বীকার কর, আত্মসাৎ কর। তুমি আমি এক হইয়া যাই। তোমার যে আমার হউক, আমার দেহ তোমার হউক, আমার প্রাণ মন তোমার হউক, তোমার প্রাণ মন আমার হউক তোমার বিশ্ব আমার হউক, আমার ছোট বিশ্ব তোমার হউক। তুমি আমি এক অদ্বৈত হইয়া একই বিশ্ব গড়িয়া তুলিব। হিংসা-বিদ্বেষে যে ভাবে আকাশ বাতাস দূষিত হইয়াছে, তুমি ছাড়া কে এখানে প্রেমের অদ্বৈত আনয়ন করিবে? উত্তেজনা কি করিয়া উপশম হইবে উত্তেজনার পথে? কে এই তীব্র অসন্তোষ উত্তেজনাকে মথন করিয়া অমৃতে পরিণত করিয়া দেশকে বাঁচাইবে

ঠাকুর, তুমি এস। ধীরেন চৌধুরী আসে···। বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কি নিষ্ঠুর স্বার্থের ঝগড়াই না ইহারা করিতেছে। না পারিলে শেষে গায়ে থুথু দিবার মত করিতেছে। মহাত্মাজী শিখাইয়া গিয়াছিলেন এক তরফা ঝগড়ার কৌশল, আর আজ চলিতেছে tit for tat, তার কি নিদারুণ। ইহার মধ্যে সাধারণ decency-ও নাই। বুক খুলিয়া বন্ধুকের সামনে দাঁড়াইবার কথাই তিনি শুনাইয়াছেন।...আজ প্রস্রাব বন্ধবার হয়। সারাদিনে ২০বার তো হইবেই। রাত্রিতে ১২টা, ২টা, ৪টায় উঠি। কাল রবিবার গীতাভবনে যাইবার কথা বলিতে মহেন্দ্র দত্ত আসে।...

১৮ই জুলাই

ঠাকুর, তুমিই আমার আত্মা, তুমিই পুরুষ। সকলের পূর্বে তুমি বর্তমান যুগের পাপ অর্থাৎ ধ্বংসাপ 'ঔরং', তাই তুমি পুরুষ। আমি তোমার শরণাগত হইব, তোমার এই যোগ্যতা লাভ করিব, তোমার অনুসরণ করিয়া চলিব; বর্তমান যুগে যে পাপ সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা পুড়াইয়া তোমারই সেবা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিব। দিন যে গেল। আর বুঝি পারিলাম না তোমার জীবন ও দর্শন জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে। বল দেও, বুদ্ধি দেও। তুমিই আমার 'আমি'; তুমি আমি এক তত্ত্ব, এক প্রাণ, এক মন। আমার মন তোমার মন এক হউক। ৪॥০টায় পর গীতা পাঠ হয়—'বাসাংসি জীর্ণানি' শ্লোক।...মহেন্দ্র দত্ত আসে। বিস্তার গীতাভবন বাই...। 'মন্মনাঃ অপনিঃ', বংশীশিক্ষা—ভগবানের আলোকে জগৎ দেখা, একই রথে নরনারায়ণ আরূঢ়—ইত্যাদি আলোচনা হয়।...

১৯শে জুলাই

ঠাকুর, ঘটনাসমূহ আমার চতুর্দিকে যেমনভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, তুমি ছাড়া আমার তো কেহ এমন নাই যে ইহার সমাধান করিতে পারে। আমি তোমার, আমার সর্ববিধ দায়িত্ব তুমি বহন করিয়া আসিয়াছ। যাহাদের লইয়া পথে দাঁড়াইয়াছিলাম তোমারই নাম করিয়া, তুমি তো তাহাদের ভাসিয়া যাইতে দেও নাই। কিন্তু পথ পাইয়াও তো তাহারা কিছু করিতে পারিতেছে না, পারিল না। আজ সব ভার তো একরূপ আমার উপর বর্তাইতেছে। আমি যে বাঁচিয়া আছি। নিত্যব্রত যদি সত্যই টি, বি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে, কে তাহার ভার বহিবে? সত্যব্রতও তো কিছু করিতে পারিল না। তুমি তাহার বুদ্ধি দেও। এখনও যদি ফিরিয়া আমার কাছে আসে, পথ হইতে পারে। কিন্তু সে দিকে বুদ্ধি কোথায়? তুমি বুদ্ধি দাও। ধীরেন সকালে আসে। নিত্যব্রতকে ২বার টিবিজাইড খাইবার কথা বলিয়া যায়। ইহার পর X-Ray করিতে হইবে। তাহার পর স্থির হইবে এ্যাপেনডিসাইটিস সম্বন্ধে কি করণীয়। আজ ২১-তম ইন্‌জেক্‌সান (স্ট্রেপটোমাইসিন) নিত্যব্রতকে দেওয়া হইল। বেলু প্রেস হইয়া বাবগেটে যাই, ব্লক লইয়া আবার প্রেসে যাই, ফেরে ৫টার পর। ট্রাম চলে নাই, কোনও সাড়াশব্দ মিলিতেছে না। মিত্তর মাইরেক্টে ১২৲ টাকা দেওয়া হয়। আমার প্রস্রাবের উদ্বেগ বেশ আছে। রাত্রিতে ৩বার উঠিয়াছি। কয়েক-দিন হইতে বৈকালে বার্লী খাই। পেটার পেটটাও ভাল নয়। সব রোগী নিয়া আমি আছি। এমন তো কাহাকেও দেখি না। সবই অদ্ভুত আমার! অথচ সকলের দায়িত্বই আমার উপর। বাহিরে দাঁড়াইবার স্থান আমার নাই। ঠাকুর আছেন, এই মাত্র ভরসা। সারা জীবন তিনি রক্ষা করিয়াছেন; আজও করিবেন। সমাধানের এক অর্ধ রহিয়াছে বিশ্বের হাতে। তাঁহাকে সঙ্গে নিয়া চলিতে চাহিব। বিচলিত হইলে তো আর চলিবে না। দুঃখকে ভয় করিলে বা এড়াইতে চাহিলে দুঃখ হয় অনন্ত।···

২০শে জুলাই

ঊর্ধ্বোরথ

শ্রীনিত্যগোপাল, নাথ আমার, জগন্নাথদেব আমার, তুমি আমার দেহের স্বামী, মনের স্বামী, প্রাণের স্বামী, বিজ্ঞানের স্বামী, আনন্দের স্বামী, আত্মার স্বামী, আমার দেহ-প্রাণ-মন তোমার ক্রীড়ার সামগ্রী হউক, রমণের বস্তু হউক। তোমার বিশ্বে আমি আলোর পথ খুঁজিয়া

লইব, তোমার চরণতলে আমার স্থান হউক। তুমি আজ মন্দির ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়াছ। আমি তোমার সঙ্গে পথে দাঁড়াইব। ওগো পথচারী, আমাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিও।…

২১শে জুলাই

ঠাকুর, তোমাকে বিশ্বাস করিতে দেও, নির্ভর করিতে দেও। আমি আমার সকল বোঝা, সকল দায়িত্ব তোমার শ্রীচরণতলে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইব। আমি ভার না দিলে তুমি কি করিয়া আমার ভার বহিবে? 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্,—ভার বহিবার কথাই তো শুনাইয়া গিয়াছ। আমি অনন্ত হইয়া তোমার চিন্তা করিব, তোমার পূর্ণ উপাসনা করিব, নিত্য অভিযুক্ত হইব। আমাকে আত্মসাৎ কর, অঙ্গীকার কর। আমি তোমার হইয়া যাই—ইহাই ছিল জীবনের কাম্য। তোমার কর্ম আমার কর্ম হইবে। তোমার দর্শন তো কিছুতেই ছড়াইয়া দিতে পারিলাম না। তুমি কি আজও চুপ করিয়াই থাকিবে?…বৈকালে বীরেন চৌধুরী আসে।…সন্ধ্যার পর সুরেশ গুপ্ত আসে। ২ ঘণ্টার উপর থাকে। পাকিস্থানের কথা, এখানের বর্তমান ট্রাম-এর আন্দোলনের কথা হয়।…কুসুমের সঙ্গে আমার জীবনের পথ-চলা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ভাবাদ্বৈত, ক্রিয়াদ্বৈত, দ্রব্যাদ্বৈত সাধনার কথা বলি। ভিখারীর মেয়ের রাজার সঙ্গে বিবাহ হইলে রাজার বিত্তারের সঙ্গে তাহারও বিত্তার হয়—'অহম্ ব্রহ্মাস্মি'-র অর্থও ইহাই। আমার আমি যখন পরম আমির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হয়, তখন আমার আমি বিশ্বজোড়া হয়। মধুর ভাবে এই অদ্বৈত আস্বাদন সহজ।

২২শে জুলাই

শ্রীনিত্যগোপাল, বন্ধু আমার, তোমার বন্ধনে আমি বদ্ধ, আমার বন্ধনে তুমি বদ্ধ—'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি'। তোমার চরণে আমি বাঁধা হইয়া পড়িয়া রহিব। যাইবার স্থান আমার কোথায়? আমার সকল সমস্যার মধ্যে তুমিই স্থিতিভূমি। সকল দেহপ্রাণ লইয়া তোমাকে আঁকড়াইয়া থাকিব। বড় ঝড় ঠেলিয়া চলিয়াছি, ঠাকুর। তুমি বলিয়া গিয়াছ, 'ভয় কি? টেনে তুলব'। আমি তো বলিতে পারি নাই, আমি আছি, তোমার কাজ ভাসিয়া যাইতে দিব না।' তুমি থামিয়া গিয়াছ, বড় দায়িত্ব বোধ করিতেছি—তোমার দর্শন সম্বন্ধে। আগাইতে দেও ঋড়ের মতন। আমি যে বড় অধীর হইয়া পড়িলাম—বল দেও, বুদ্ধি দেও, শক্তি দেও, ধনজন দেও—তোমার সেবা করিব। সকালে -বাবু আসেন, তখনও আমি নীচে নামি নাই। -বাবু যদি এখানের দর্শন বুঝিতেন, তবে কাজ করিতে পারিতেন। প্রকৃতির হাত হইতে রক্ষা তাহার নাই; অথচ নিবৃত্তির সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্যের জন্য কোন উদ্বেগও তাহার নাই। সারাজীবন কষ্ট পাইবেন।…

২৩শে জুলাই

রাধারাণী, পরাণপুতলী আমার, তোমার যে-ছবি আমার দেহ প্রাণ মনে অঙ্কিত হইয়া আছে, তাহাকে ধরার মাটিতে রূপ দান করিবার জন্য, নারী জাতির প্রতীক হিসাবে মর্যাদা দিবার জন্য সারা জীবন কি আকুলি-বিকুলিই না করিয়াছি! তুমি কি প্রকটিত হইবে না আমার দেহ-প্রাণ-মন নিংড়াইয়া? তোমার প্রতীক্ষায় জীবন কাটাইলাম। প্রকৃতির সার্থক রূপ তুমি। তোমার প্রকাশে বিশ্ব প্রকাশিত না হইলে বিশ্ব যে পারস্পরিক সংঘর্ষে চূর্ণবিচূর্ণ হইবে। আজ সমস্যা-জর্জরিত বিশ্ব তোমাকেই প্রাণে প্রাণে চাহিতেছে।…১০টার পর হাওড়া হইতে অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য তাহার স্ত্রী ও শিশুপুত্রসহ তাহার নিজের ছোট ছিপে আসে।…আমি অনাথবন্ধুকে একটি রসগোল্লা খাওয়াইয়া দেই।…গোপাকে কিছুতেই তাহার জিদ রক্ষা করিয়া চলিতে দেওয়া যাইতে পারে না। 'বিনীত' তাহাকে হইতেই হইবে। নচেৎ তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আর বেশী সময় তো নাই।

২৪শে জুলাই

রাধারাণী আমার, তুমি আসিয়াছিলে, কিন্তু তোমাকে এই 'আসা'কে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলাম না। তুমি যে আমার কি এবং কতখানি তাহা কেমন করিয়া বলিব। শত ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও সান্ত্বনা আমার তুমি। বিশ্বের মধ্যে সব চেয়ে যা উৎকৃষ্ট ধন, সেই তোমাকে যখন বর্তমান

যুগের উপযোগীরূপে পাইয়াছি, পাইবার আমার আর কি বাকি আছে? সেজন্য দুঃখ নাই। দুঃখ শুধু এই যে তোমাকে পাইয়াও নিখুঁত জীবনে তাহা আস্বাদন করিতে পারিলাম কৈ? আসিয়াছ যখন, তখন নিশ্চয়ই তোমার প্রতিষ্ঠা গড়িয়া উঠিবে। সে দিন কতদূরে? তাহার মধ্যে আমার কোন স্থান থাকিবে কি? - মানুষ এখানের কাছ হইতে যাহা পাইয়াছে, তাহা প্রাণ খুলিয়া স্বীকার করে না, অথচ যাহা পায় নাই তাহা মনে করিয়া কত বলে।...

২৫শে জুলাই

শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা

শ্রীনিতাগোপাল, জগদ্‌গুরু, আমার সকল দেহপ্রাণমনের পূজা গ্রহণ কর। আমার জীবনের সঙ্গে যাহারা যুক্ত তাহাদের লইয়া আমি তোমার শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিতেছি। ছিলাম পথের ধূলি, তোমার রাতুল চরণে স্থান দিয়াছ, ধন্য করিয়াছ, মর্যাদা দিয়াছ। আমি কি ছিলাম তাহা আমি জানি, আর আজ কোথায় রাখিয়াছ তাহাও জানি। তুমি ধন্য। সারা জগৎ তোমার শ্রীচরণতলে 'এক জগৎ' রূপে গড়িয়া উঠিবার জন্য আকুলি বিকুলি করিতেছে। তুমি নিত্য অনিত্য সমন্বয়, জড় অজড় সমন্বয়। তুমি সকলের সব দাবীর মূলা দান করিয়া সকলকে এক করিতে আসিয়াছ। তোমাকে নমস্কার। গুরুব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবঃ মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

...৮টায় প্রথমে ঊষাদিদি, পরে প্রতিভা, সুষমা, রেণু, দিনু, কমলা, গোপা, গঙ্গু, বুলু প্রভৃতি আমার দেহ আশ্রয়েই ঠাকুরেরই পূজা করে। পূজান্তে বলি, আমি ঠাকুরের সঙ্গে একাত্ম হইতে প্রাণপণ চাহিয়াছি। ঠাকুরের সঙ্গে একাত্ম আমি তোমাদিগকে ডাকিয়া ছিলাম তাঁহারই সেবা করিতে। আমি তাঁহার সঙ্গে এক হইয়া আশীর্বাদ (যদি আমার অধিকার হইয়া থাকে) করি, তোমরা তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হও। তিনিই আছেন, আমি নাই।... মঠে যাই। সেখানে একটী ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে আলোচনা করি যে, শঙ্কর-বুদ্ধ সমন্বয়ই নিত্যগোপাল।...৪॥ টার পর মহেন্দ্র দত্ত আসে। তাহার সঙ্গে গীতাভবনে যাই। গীতার 'ঊর্দ্ধমূলঃ অবাক্‌শাখ' বাক্যটীর ব্যাখ্যা করি।...

২৬শে জুলাই

ঠাকুর, 'তোমারেই প্রাণের আশা কহিব। সুখে দুঃখে শোকে আঁধারে আলোকে চরণে চাহিয়া রহিব।' তোমার কোন্ প্রয়োজনে আমাকে বৃন্দাবন হইতে পাঠাইলে, কি সেবা তোমার করিবার জন্য তুমি সংসারে আসিতে বলিয়াছিলে? বলিয়াছিলে, 'সংসারে যাও, কাজ আছে। কি কাজ তুমিই তাহা জান। তোমার কাছ হইতে তোমার আমিতে 'আমি' গলাইয়া দিয়া সেই প্রয়োজন আমি বুঝিয়া লইব। 'তোমারই কার্য্য যা সাধিব'। আমার কি আর সার্থকতা থাকিতে পারে? তুমি জগন্নাথ, জগৎ জুড়িয়া তোমার কাজ। আমি তোমার সঙ্গে 'এক' হইয়া সেই ভার বহিব। আমাকে তোমার করিয়া লও, যোগ্য করিয়া লও।...কি তাহার বাধা করিতে পারে? বাধা প্রত্যেক দিন ঠাকুরের কাছে তাহার বুদ্ধি পরিবর্ত্তনের জন্য প্রার্থনা করে। অনুশত না হইলে কাহারও জন্য যে কিছুই করা যায় না। সাধিয়া কল্যাণ করিতে গেলে ফল উল্‌টা হইবে। কতবার জানাইয়াছি, বাধা পাইয়াছি বারবার। বৈকালে গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরীর পুত্র আসে তাহার কবিতা ছাপা হইবে কিনা জানিবার জন্য। ছাপা হইবে বলিয়া দিলাম। 'কাহিনী কীর্ত্তন' নিত্যানন্দ পাইতে না—নিত্যানন্দ জন-সাধারণের মধ্যে বাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাদের মত হইয়া ইত্যাদি কথা বলে।

২৭শে জুলাই

ঠাকুর, আমাকে তোমার ছাঁচে গড়িয়া তোল, তোমার মত করিয়া লও, তোমার অঙ্গীভূত করিয়া রাখ, তবেই তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকা সম্ভব হইবে। আমার সঙ্গী তুমি, তোমার সঙ্গী আমি। দিব্য মৈথুন যোগে তোমার আমার সঙ্গ হউক, তুমি আমি একই। তোমার জীবন ও দর্শন এমনিই ভাসিয়া যাইবে আমি কি কিছুই

তাহার করিতে পারিব না? আমি যে ছটফট করিতেছি। আমায় সুযোগ দেও তোমার পথে বিশ্বকে আকর্ষণ করিয়া আনিবার মত। তোমাকে ধারণ না করিলে এই বিশ্ব কি করিয়া বাঁচিবে? আমাকে শক্তি দেও '... 'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'শ্রীরাধা' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে থাকি।... প্রস্রাবের অবস্থা ভাল নয়...। প্রকৃতির পরিবর্তনই এখানের সাধনা—প্রকৃতির মধ্যে বিপ্লব না আনিয়া বিদ্যা তপ প্রাণনিরোধ মৈত্রী তীর্থাভিষেক ব্রত ধ্যান জপে তো অন্তরাত্মশুদ্ধি আসিবে না। রাধাপ্রকৃতির ধ্যান করিতে করিতে প্রকৃতির বিপ্লব আসে।...

২৮শে জুলাই

ঠাকুর, আমার ছোট জীবনের ছোট সুখদুঃখেরও সাক্ষী তুমি; তুমি শুধু জগন্নাথই নহ। 'জগন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ'। শ্রীনিত্যগোপালই আমার শ্রীরাধারাণী। সকল করুণতার ঘনীভূত মূর্তি তুমি, বিশ্বের সকল বেদনার মর্মঘন তুমি। তোমার জীবনে বিশ্বের কান্না ঘন হইয়া উঠিয়াছে। জীব জগতের কি কান্না অনন্তের লাগিয়া! তোমার জীবনে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে সেই কান্না। তোমাকে পাইয়া বিশ্ব নিজেকেই পাইবে। তুমিই বিশ্বের চরম সার্থকতা, পরিপূর্ণ সার্থকতা। আমি তোমাকেই চাই, তুমি বলিয়া যাইতে চাই। 'তব মুখ সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে'। তোমার স্মৃতি আমার জীবনে কি এক বেদনা, কি এক উন্মাদনা আনিয়া দেয়। আমি আমাকে ভুলিয়া যাই। রেণু ১২টায় বাহির হইয়া... ফেরে ৩।৩০ টার পর। তাহার লেখা 'সর্বাদৈবিধের প্রতিরূপশীল' প্রবন্ধ পড়িয়া শুনায়।...ঠাকুরের দর্শন কি করিয়া ছড়াইয়া দিব, এই এক দুশ্চিন্তা আমাকে অহোরাত্র পীড়া দিতেছে। রেণু আজ রাধারমণ বাবুর সঙ্গে দেখা করে। রাধারমণ বাবু শান্তিপুরে কিছু জায়গা দান করিতে চায়, জিয়াটেও কিছু দিতে পারে। সে একদিন আসিবে। রেণুকে মেয়েদের সঙ্ঘ করিতে রাধারমণবাবু নারাজ। মেয়েদের সম্বন্ধে সাধারণতঃ মানুষ নিরাশ হইয়াছে। তাহারা ৫জন মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে, এ বিশ্বাস কোন পুরুষেরই নাই। সন্তোষিণী দেবীও একদিন এইরূপ কথা আমাকে বলিয়াছিলেন—'ভাই, বারটি মেয়ে থাকিলে অন্ততঃ তেরটি হাঁড়ি থাকিত'। মেয়েদের কি এমনই দুরবস্থা? তবে সাধ্য জীবন কাহাদের পিছনে কাহাদের প্রতিষ্ঠার জন্য ছুটিলাম! 'রাষ্ট্র ভাষা প্রতিষ্ঠা' কি শুধুই আমার কল্পনা? আমাকে পথ দেও, আলো দেও। তেমন মেয়ে গড়িয়া তোল যাহারা সঙ্ঘ গড়িয়া প্রমাণিত করিবার জন্য ব্যাকুল যে তাহাদিগও সঙ্ঘ গড়িতে পারে।

২৯শে জুলাই

ঠাকুর, তুমি আমার জীবনের সব কিছু স্পর্শ করিয়া আছ, সকল দিকে আবরণ করিয়া রহিয়াছ। তাই আমি এত বড় ঝড়ের মাঝেও নিরাপদে চলিতে পারিয়াছি। কামিনী কাঞ্চনের ভিতর দিয়া চলিয়াছি, জড়াইয়া তো পড়ি নাই, আটকাইয়া তো যাই নাই। তুমি বিশ্বরূপ আছ সামনে, তাই যখন তখন যা কিছু লইয়া মাতিয়া উঠিতে পারি না। ব্যক্তিগত জীবন লইয়া যদি চলিতাম তবে উহারা আমাকে বাঁধিতে পারিত। কিন্তু বাঁধা পড়িলে আমার বিশ্বরূপের কি হইবে, আমার অগ্রগতি নিরুদ্ধ হইবে, তাই কাহাকেও নিয়া মাতামাতি আর করা সম্ভব নয়। তুমি আমাকে রক্ষা করিয়াছ। বিশ্বরূপ তুমি, মদনমোহন তুমি, আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিও তাহা হইলে সর্বরূপ, সর্বরসের ক্ষেত্রেও আমি নিরাপদ থাকিব। 'মেয়ে হিজরা পুরুষ খোজা' তবে হয় কর্তাভজা' 'না দো রমণ না হাম রমণী'—আজ সকালে প্রতিভা কুসুমের কাছে ব্যাখ্যা করা হয়। রেণু ৮টার পর বাহির হইয়া...।

৩০শে জুলাই

ঠাকুর, তোমার আমার চারি চক্ষুর মিলন না হইলে কেমন করিয়া তোমাকে চিনিব, আমাকে চিনিব, এই বিশ্বকে চিনিব? তুমিও তো এই বিশ্বকে আমার চোখে লও গো চিনে' বলিলে আমিই বা তোমার চোখে না দেখিলে তোমাকে আমাকে এই বিশ্বকে চিনিব কি করিয়া? স্বামীর চোখেও সংসার চেনা যায় না, একান্ত স্ত্রীর চোখেও নয়। স্বামী স্ত্রীর যখন চারি চোখের মিলন হয়, তখনই সংসার

দেখা বাস্তব দেখা। পুরুষের দেখাও অবাস্তব, স্ত্রীর দেখাও অবাস্তব! নারী অন্ধ, বৃন্দাবনেই শুধু নারীর চোখ ফুটাইবার ব্যবস্থা আছে। চক্ষুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। সারা জীবন প্রকৃতির চোখ ফুটাইবার জন্য, নিজের যা কিছু দেখিয়া চিনিয়া নিবার জন্য প্রেরণা দিয়াছি। কি ফল ফলিয়াছে ঠাকুর জানেন। প্রকৃতির চক্ষুদান করাই ছিল জীবনের ব্রত। পুরুষোত্তম বিশ্বে এই ব্রত লইয়াই আসিয়াছিলেন। ঋষিরাও চাহিয়াছিলেন প্রকৃতিকে 'অন্ধ' রাখিতে। পুরুষোত্তম অমুক্ত হইল। চটায় শ্রীশ দাসগুপ্ত খবর দেয় যে মহেন্দ্র দত্তর স্ত্রী মারা গিয়াছে। তাহাদের বাসায় যাই কিছু পরেই চলিয়া আসি। আসিয়া দেখি ধীরেন ডাক্তার বসিয়া আছে। আর বাহিরে বালুঘাটের রসিকলাল গুহ ও তাহার ভাগিনেয় দ্বিজেন দাঁড়াইয়া আছে...। আমার দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয় ... মঠ হইতে কে একজন খবর দিয়া যায় শতবার্ষিকীর সমিতির সভায় যোগদানের জন্য।...

৩০শে জুলাই

ঠাকুর, আমাকে সহজ করিয়া দেও, আমাকে যে অনন্ত পথ চলিতে হইবে তোমার সঙ্গে সঙ্গে। এত দীর্ঘ পথ এত বোঝা নিয়া—এত সংকল্প বিকল্প লইয়া আমি কি করিয়া চলিব? আমিও তোমার মত অবধূত হইব—সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত হইব, সর্বোপাধি পরিপাক করিব, নির্বিকল্প হইব। ওগো জীবন, মুক্ত জীবন, আমি তোমার বুকে গা ভাসাইয়া বহিয়া যাইব। এত সংস্কার লইয়া কি আগানো যায়? নিত্য নূতন জীবনের নিত্য নূতন সংস্কার সব পরিপাক করিয়া চলিব, জীবনের বাহিরে কিছু রাখিব না—যেমন নিত্য নূতন খাদ্য পরিপাক পাইয়া জীবনকে পুষ্ট করে, বাড়াইয়া তোলে। আমার সহজ জীবনে সর্ব উপাধি পরিপাক প্রাপ্ত হউক। তোমার জয় হউক। আমার কাছে যাহারা আসে, সবই কি একরকম (দরিদ্র)?

১লা আগস্ট

রাধারাণী, যে সমাজ-ব্যবস্থায় তুমি কলঙ্কিনী, যে কুলকে তুমি ত্যাগ করিয়া কুলত্যাগিনী বলিয়া নিন্দিত সেই কুল ও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আমি থাকিব কেমন করিয়া? আমি তোমার সঙ্গিনী হইয়া কলঙ্কিনী হইব, কুলত্যাগিনী হইব। চাহিয়াছিলাম তোমার আসন রচনা করিবার জন্য এই সমাজের বুকে, এই কুলের মধ্যে; কিন্তু পারিলাম কই? কেউ তো তোমাকে চায় না। তাহারা বেশ আছে। যখনই কেহ আসিত ভাবিতাম তোমার জন্যই বা কেহ বুঝি আসিয়াছে। কই, কেহ তোমার প্রতিষ্ঠার জন্য লাগিয়া থাকিল না। আমি যে আজ একা, বড় একা। হয় আমাকে তোমার প্রতিষ্ঠার সুযোগ করিয়া দেও, নইলে কাছে টানিয়া লও। আমি যে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত—দেখা যাও, দেখা দাও দিন যে যায়।...গীতাভবনে 'স্থিতপ্রজ্ঞ' সম্বন্ধে আলোচনা হয়—'রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু' শ্লোকটী মুখ্যতঃ আলোচিত হয়।

২রা আগস্ট

ঠাকুর, 'তুমি আছ আমার'—ইহাই আমি বুঝিয়াছি। আর সকলেই আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া সরিয়া দাঁড়াইতে পারে দাঁড়াইবেও। তুমি তো সঙ্গে সঙ্গেই আছ। তুমি এক পাও ঘুরে যাও নি। 'কেবল' একটী মানুষও যদি সঙ্গে আসিত, পাশে আসিয়া না দাঁড়ায়, কেমন করিয়া কাজ করিব? 'কেবলে' 'কেবলে' মিলিয়া সঙ্ঘ না হইলে কি কাজ করা যায়? বিশ্বের প্রতিটি অণু যেমন অন্য নিরপেক্ষ, তেমনি অন্যোন্যাপেক্ষও বটে ইহাই যে বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু জীবনে তাহার সার্থক আস্বাদন হইল কৈ? ঠাকুর, এমন ভাঙ্গা বুক লইয়া আর কতদিন চলিব? বেণু ১টার পর ব্যাঙ্কে গিয়া...কলিকাতা যায়,... সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার...ইউনিভার্সিটিতে 'গোরা' জমা দেয়, তাহার পর ফেরে।...রেণুর সঙ্গে গোপার সম্বন্ধে তাহার কিভাবে চলা উচিত, তাহারদীর্ঘ আলোচনা হয়। মানুষের সব ত্রুটির উপর এক সময়ে চাপ পড়িলে মানুষ বিদ্রোহ করে।

ক্রমশঃ

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

॥ শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

তস্য [সেই] পূর্বস্য [পূর্বোক্ত প্রাণময় কোশের] এষঃ এব [ইহাই] শারীর [শরীরাধিষ্ঠিত, দেহবান] আত্মা [ব্যাপক] যঃ [যেটী মনোময় কোশ] তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ মনোময়াৎ [সেই এই মনোময় হইতেই] অন্যঃ অন্তরঃ [অপর ও অন্তর] আত্মা [ব্যাপক] বিজ্ঞানময়ঃ [মোক্ষবিষয়িনী ধী ও শিল্প শাস্ত্রবিষয়ক লৌকিক বিজ্ঞানের সমন্বিত বিজ্ঞানপ্রচুর কোশ] তেন [বিজ্ঞানময় কোশ দ্বারা] এষঃ [মনোময় কোশ] পূর্ণঃ [পূর্ণ; মনোময়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, মনোগত জ্ঞান-বিজ্ঞান নাশন ভয়ের প্রতি স্পন্দনের ফাঁকে ফাঁকে যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানসহিত গুরুতম জ্ঞান মূর্ত্তিতে ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া থাকিয়া মনোময়কে পরিপূর্ণ করিয়া মনোময়ের "পর" এবং মনোময়ের অন্তর অর্থাৎ খুব নিকটে এবং খুব দূরে] স বৈ এষঃ [সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মাও] পুরুষবিধ এব [পুরুষাকারই] তস্য [মনোময়ের] পুরুষবিধতাম্ অনু [পুরুষাকার ছাঁচে গলাইয়া] অয়ং [এই বিজ্ঞানময় কোশ] পুরুষবিধঃ [পুরুষাকার] তস্য [বিজ্ঞানময়ের] শ্রদ্ধা এব [শ্রদ্ধাই ; বিশ্বের সব কিছুকে জীবের ভোগ্যবুদ্ধির নাগালের বাহিরে স্ব-মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, তাহাদিগের সত্য 'পর' (Transcendental) রূপকে ধারণ করিবার যোগ্য আত্ম-সমর্পণময়ী বৃত্তিই শ্রদ্ধা] তস্য শিরঃ] তাহার মস্তক] ঋতম্ ['সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য মনেতে করিয়া ঐক্য'—প্রতিষ্ঠার দ্বারা লব্ধ সর্ব্বরকমে যাচাই করা যথার্থ জ্ঞান] দক্ষিণঃ পক্ষঃ [জ্ঞান পাখা] সত্যম্ [বিশ্বকল্যাণঘন যথার্থ বাক্য ও আচরণ] উত্তরঃ পক্ষঃ [বাম পাখা] যোগঃ [পুরুষোত্তম যোগ] আত্মা [দেহ-মধ্যভাগ] মহঃ [প্রথমোৎপন্ন মহত্তত্ত্ব] পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা [স্থিতি গতিসমন্বয় সম্পাদক পুচ্ছস্থানীয়] তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ।

এই যে মনোময় ইহাই পূর্ব্বোক্ত প্রাণময়ের শরীরী আত্মা। উক্ত এই মনোময় হইতে 'পর' এবং অন্তরে বিজ্ঞানময় আত্মা বিরাজিত। সেই বিজ্ঞানময়ের দ্বারা মনোময় পূর্ণ, সেই বিজ্ঞানময়ও পুরুষাকার। সেই বিজ্ঞানময়ের পুরুষাকৃতিও মনোময়ের পুরুষাকারের ছাঁচে গড়া। শ্রদ্ধাই তাহার মস্তক, ঋত অর্থাৎ সর্ব্ব রকমে যাচাই করা যথার্থ জ্ঞান ডান পাখা, কল্যাণময় যথার্থ বচন ও আচরণ বামপক্ষ, পুরুষোত্তম-যোগ দেহমধ্যভাগ, মহত্তত্ত্বই স্থিতিগতি সমন্বয়সম্পাদক পুচ্ছস্বরূপ। উক্ত বিষয়ে এই শ্লোক আছে।

সপ্তম অনুবাক

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে। কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ।
বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্বে। ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে।
বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ। তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি।
শরীরে পাপ্মনো হিত্বা। সর্বান্ কামান্ সমশ্নুতে ॥

ইতি।

বিজ্ঞানং [মোক্ষজ্ঞান ও শিল্পশাস্ত্র-বিষয় বিজ্ঞানের সমন্বিত বিজ্ঞান] যজ্ঞং [অর্থাৎ সর্ব্ব দেব প্রাণ মন বুদ্ধির সমর্পণরূপ আহুতি] তনুতে [ছড়াইয়া দেয়] কর্ম্মাণি চ [পুরুষোত্তমার্পিত বিশ্বসেবামূলক বিশ্বকর্ম্ম, ভজনকর্ম্মসমূহ] তনুতে অপি [পুরুষোত্তম-রূপ প্রদানে বিশ্বময় বিস্তার করেন] বিজ্ঞানম্ [এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত বিজ্ঞানকে] দেবাঃ সর্বে [বাগাদি ও অগ্ন্যাদি সকল দেবতা] ব্রহ্ম

[ব্রহ্মরূপে] জ্যেষ্ঠম্ [অগ্রজ বলিয়া ; যাহার প্রেরণায় সকলের সবকিছু পুরুষোত্তমযোগে গড়িয়া উঠে] উপাসতে [উপাসনা করে, নিজেরা তদ্ভাবভাবিত হয়, তদ্গুণের রূপে পরিণত হয়] বিজ্ঞানং ব্রহ্ম [বিজ্ঞানরূপ ব্রহ্মকে] চেৎ [যদি] বেদ [জানেন] তস্মাৎ [সেই বিজ্ঞান-ব্রহ্মের উপাসনা হইতে] চেৎ [যদি] ন প্রমাদ্যতি [প্রমাদযুক্ত হইয়া ভ্রষ্ট না হন্] (তবে) শরীরে [এই দেহেই ; কেননা বিজ্ঞান সব কিছুকে পুরুষোত্তমসংস্থতা প্রাপ্ত করাইয়াছে] পাপ্মনো হিত্বা [পাপ ত্যাগ করিয়া ; জ্ঞান-বিজ্ঞাননাশন পাপ-মদনকে মদনমোহনে গড়িয়া] সর্ব্বান্ কামান্ [সর্ব্বকাম] অশ্নুতে [ভোগ করেন, বিজ্ঞানময় কোশের স্তরে অন্নময়-প্রাণময়-মনোময় সব সমন্বিত ; অন্নময় কোশ নিছক ব্যক্তিগত জীবনের স্তর ; প্রাণময় কোশ পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রের স্তর ; মনোময় কোশ বিশ্বমানবের স্তর ; বিজ্ঞানময় কোশ সব চেতন প্রাণীর স্তর—পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ দেবমানবের স্তর ; আনন্দময় কোশ একেবারে জড় ব্রহ্মের স্তর যাহার ভিতর আবার সর্ব্বকোশ সমন্বিত। কোশের অর্থ cell, জীবকোশ ; শুধু তলোয়ারের খাপ নয় ; জড়-চৈতন্যের ভেদ প্রতিপন্ন করার অভিসন্ধি লইয়াই কোশের অন্যান্য অর্থগুলিকে পরিহার করিয়া শুধু তলোয়ারের খাপ অর্থটাই নেওয়া হইয়াছে। বিজ্ঞানময় কোশে দাঁড়াইয়াই পুরুষোত্তম সর্ব্ববিজ্ঞান ঘন দেবতা রাসবিহারী, গোষ্ঠবিহারী, বনচারী, যমুনাহ্রদ-বিহারী, সব কিছু চৈতন্যের ঘন বিগ্রহ]

বিজ্ঞানই আত্মসমর্পণময় যজ্ঞের বিস্তার করে, কর্ম্ম সকলকেও পুরুষোত্তম-রূপ প্রদান করিয়া ছড়াইয়া দেয়। সর্ব্বদেবগণ বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম ও জ্যেষ্ঠ বলিয়া উপাসনা করেন। কেহ যদি বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে জানেন, তাহা হইতে প্রমাদবশতঃ ভ্রষ্ট না হন, তিনি এই দেহেই পাপসমূহ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বকাম ভোগ করেন।

৯.

তস্যৈব এষ শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধঃ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদঃ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি। ২৫

ইতি ব্রহ্ম-বল্লাধ্যায়ে পঞ্চমোঽনুবাকঃ।

তস্য [সেই] পূর্ব্বস্য [পূর্ব্বোক্ত মনোময় কোশের] এষ এব [ইহাই] শারীর [শরীরবান্] আত্মা [ব্যাপক আত্মা] যঃ [যিনি বিজ্ঞানময় কোশ] তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ বিজ্ঞানময়াৎ [এই সেই বিজ্ঞানময় হইতেই] অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা আনন্দময়ঃ [পর, অন্তরতম, আনন্দময় আত্মা বিরাজিত] তেন [সেই আনন্দময়দ্বারা] এষঃ [বিজ্ঞানময়] পূর্ণঃ [সব বিশেষ জানার রসকে রসকে যিনি রস ভরিয়া দিতেছেন, সব ক্ষণিক বিজ্ঞানকে পূর্ণ-নিত্য-অনন্ত বিজ্ঞানে গড়িয়া তুলিয়া যিনি ক্ষণদা রাত্রির বুকে ক্ষণ অর্থাৎ উৎসব, রাসোৎসব সম্পন্ন করিতেছেন] স বৈ এষঃ [সেই এই আনন্দময়ও] পুরুষবিধ [পুরুষাকার আনন্দাকার] তস্য [বিজ্ঞান ময়ের] পুরুষবিধতাম্ অনু] বিজ্ঞানাকার পুরুষোত্তমের ছাঁচে ঢালিয়া] অন্বয়ং [এই আনন্দময়] পুরুষবিধঃ [পুরুষাকার] তস্য [আনন্দময়ের] প্রিয়ম্ এব [প্রিয়ই ; যাহার যাহা প্রিয় সেই সব কিছুর প্রেয়ত্ব যাবিয়া প্রিয়ত্বের কথা, সেই প্রিয়ঘনই সত্য বাস্তব প্রিয়] শিরঃ [মস্তক] মোদঃ [ইষ্টলাভ জনিত সকলের সব ইষ্টের মূর্ত্তি, যাহার প্রভাবে সব ইন্দ্রিয় যেন ঘুরিয়া আসিতে চায়] দক্ষিণঃ পক্ষঃ [ডান পাখা] প্রমোদঃ [ইষ্ট দর্শন, স্পর্শন প্রভৃতি জনিত দেহ মন প্রাণের যে জমাটবাঁধা হর্ষ, যাহার প্রাবল্যে সব প্রকাশ যেন মহা আনন্দ সাগরের মাঝে হারাইয়া ফেলিতে ব্যাকুল হয় তাহাই প্রমোদ ; এই প্রমোদ শ্রীরাধা জীবনে স্থিত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি 'প্রমোদিনী' বলিয়া পূজিত] আনন্দঃ [সকল বিষ-অমৃতের, সুখ দুঃখের বিষ-অমৃতের নিংড়ানো রসই আনন্দ] আত্মা [স্বরূপ] ব্রহ্ম [দ্বৈত অদ্বৈত বিবর্জ্জিত, দ্বৈত অদ্বৈত সমন্বিত পুরুষোত্তমই ব্রহ্ম] পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা [সব স্থিতি ও সব গতির সমন্বয় সম্পাদক পুচ্ছস্থানীয়] তদপি [সেই বিষয়ে] এষঃ শ্লোকঃ ভবতি [এই শ্লোক আছে]।

এই বিজ্ঞানময় পূর্ব্বোক্ত মনোময়ের শারীর আত্মা। উক্ত এই বিজ্ঞানময় হইতে অন্য, অন্তর আনন্দময় আত্মা বিরাজিত। এই আনন্দময়ের দ্বারা এই বিজ্ঞানময় পূর্ণ। আনন্দময়ও পুরুষাকার। বিজ্ঞানময়ের পুরুষাকৃতির অনুযায়ীই ইহার পুরুষাকৃতি। প্রিয়ই ইহার শির, মোদ ডান পাখা, প্রমোদ বাম পাখা, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্মই স্থিতি-গতি সমন্বয় সম্পাদক পুচ্ছপ্রতিষ্ঠা।

ব্রহ্ম বলিয়া] চেৎ বেদ [যদি জানেন] সন্তম্ [আছেন বলিয়া] তাৎকর্ষে এবং [ইহাকে] ততঃ [ঐ 'অস্তিত্বকে ব্রহ্ম বলিয়া জানার পর] বিদুঃ [জানেন]

না থাকার মতই সে হইয়া যায়, যদি কেহ না থাকাটাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। 'অস্তি' কে ব্রহ্ম বলিয়া যদি কেহ জানেন, তাহা হইলে ইহাকে 'সৎ' বলিয়াই জানেন।

ষষ্ঠ অনুবাক

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি।

আনন্দময়ের উপাসনায় সাধকের সর্ব্বশেষ মূলীভূত জড়-চেতনের ভেদবুদ্ধি গলিয়া যায়; তখন সব জড় চৈতন্যঘনরূপে ফুটিয়া উঠে। তখন সাধক ভক্তিতে গদগদ হইয়া আত্মসমর্পণময়ী মূর্ত্তিতে বিরাজ করেন। সাধারণ দৃষ্টিতে জড় অসৎ, চৈতন্য সৎ; আনন্দময় পুরুষ জড়-চৈতন্যসমন্বয়, অসৎ-সৎসমন্বয়। তাই শ্রুতি 'অসৎ'-এর আরাধনায় এবং সৎ-এর আরাধনার ফল পৃথক্ করিয়া দেখাইতেছেন] অসদ্ এব [না থাকার মতই রসরূপে, কেননা ভক্ত তখন নিজকে আনন্দরসের মাঝে হারাইয়া ফেলিয়াছেন; তখন ভক্ত জড়-এর রসঘন সত্তা পরমার্থ অসৎরূপ আস্বাদনে ধন্য হইয়া 'অসৎ' হন্, জড় হন্; ভক্তের লক্ষণ 'জড়োন্মত্ত পিশাচবৎ'—ভাগবত; শ্রীধাম বৃন্দাবনে রজঃই ব্রহ্ম; ধরার ধূলির ব্রহ্মরসরূপে আস্বাদনই আস্বাদনের পরাকাষ্ঠা। 'ধূলির' এই আস্বাদনের মধ্যে রহিয়াছে সর্ব্বকোশ—অন্নরসময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময় কোশের—পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণোদ্ভূত নীলারসাস্বাদন। চৈতন্যের ঘনীভূত আত্মসমর্পণ-ময়ী রসঘন জড়াবস্থাই 'অসৎ' পদবাচ্য] স ভবতি [তিনি হন্] অসৎ ব্রহ্ম ইতি [অসৎ অর্থাৎ নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া কেবলাকেই ব্রহ্মবুদ্ধিতে; জড়ই ব্রহ্ম বলিয়া] বেদ চেৎ [যদি কেহ জানেন, ও জীবন সার্থক করেন] অস্তি ব্রহ্ম ইতি [সকল 'অস্তিকে' তাহাকে

তস্মৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য। অথাতোঽনুপ্রশ্নাঃ উতাবিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য কঞ্চন গচ্ছতী ত আহো বিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কিঞ্চিৎ সমনুতে ত উ?

তস্য পূর্ব্বস্য [পূর্ব্বোক্ত সেই বিজ্ঞানময়ের] এষ এব [ইহাই] শারীর আত্মা [শরীরবান্ আত্মা] যঃ [যিনি আনন্দময়] অথ [অনন্তর; ব্রহ্ম-বস্তুকে সৎ-অসৎ সমন্বয়, জড়-অজড় সমন্বয় মূর্ত্তিতে জানার পর] অতঃ [এই হেতুতেই] অনুপ্রশ্নাঃ [শ্রীগুরুর আলোচনার অনুসরণ করিতে করিতে পরবর্ত্তী গুহ্যের উপযোগী প্রশ্নসমূহ যাহা সহজ ভাবেই শিষ্যের মনে উদিত হয়] অবিদ্বান্ [অসৎ—বিদ্বান্ পুরুষ, অসৎকে ব্রহ্ম বলিয়া জানা পুরুষ] অমুং লোকং [ঐ লোক, ব্রহ্মলোক] প্রেত্য [দেহাবসানে; যথা প্রকৃষ্টপথে গমন করিয়া] কঞ্চন [কোনও] উত গচ্ছন্তি [গমন করেন কি? অর্থাৎ ব্রহ্ম কি অসৎ, অসৎ-ব্রহ্মের উপাসক কি ব্রহ্ম পান?] ('ত' টী পূর্ব্বের সূচক) আহো [অথবা] বিদ্বান্ 'সৎ'কে ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞানী পুরুষ] অমুং লোকং [ব্রহ্মলোক] প্রেত্য [দেহাবসানে, অথবা প্রকৃষ্টপথে গমন করিয়া] কিঞ্চিৎ [কোনও] উত সমনুতে [লাভ করেন কি?]

এই আনন্দময়ই পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানময়ের শরীরবান্ আত্মা। ব্রহ্মসম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হওয়ায় অনন্তর গুরুর আলোচনার অনুসরণ করিয়া প্রশ্ন-সমূহ উত্থাপিত হইতেছে। অসৎ-জ্ঞানী দেহাবসানে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন্? অথবা সৎ-বিজ্ঞানই কি দেহান্তে ব্রহ্মত্ব লাভ করেন?

সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽ

তপাত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।

[সৎ-অসৎ সমন্বিত পুরুষোত্তমের উপাখ্যানরূপ জ্ঞানসহায়ে বিশ্বসৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটিত করিতেছেন] সঃ আনন্দময় সর্বৈশ্বর্যান্ পুরুষোত্তম ঈক্ষণমোহন] অকাময়ত [কাম প্রকাশ করিলেন, কামনা করিলেন] বহু স্যাম্ [বহু হইব] প্রজায়েয় [অন্য অসতী প্রকৃতির সঙ্গে রমণ করিয়া উৎপন্ন হইব] ইতি [এই রহস্য কথা] সঃ [তিনি] তপঃ অতপ্যত [সৃজ্যমানে বিশ্বের রচনা কৌশলের সন্ধানে পাইবার জন্য অন্য প্রকৃতির তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন ; "যোগমায়ায়ে উপাশ্রয়ঃ"—যোগ মায়ার উপাশ্রয় লাভ ব্যতীত রস সৃষ্টি রহস্য জ্ঞান যায় না ; রস সৃষ্টিকে বাস্তব রূপ দিতে হইলে চাই বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে পুরুষের তপঃপূর্ণ ভোগ করা, প্রকৃতির মাঝে 'অসৎ' 'ন' হইয়া যাওয়া] সঃ [তিনি] তপঃ তপ্ত্বা [সৃষ্টি কৌশল সহায় করিয়া] ইদং সর্বম্ [এই সব] অসৃজত [সৃজন করিলেন] যৎ ইদম্ কিঞ্চ [এই যাহা কিছু] তৎ সৃষ্ট্বা [সেই সমস্ত সৃষ্টি করিয়া] তৎ এব [তাহারই] অনু [পিছনে পিছনে] প্রাবিশৎ [প্রবেশ করিলেন, অসতী অজা প্রকৃতির মাঝে 'অসৎ' হইলেন, হারাইয়া গেলেন, 'ন' হইলেন ; ব্রহ্মের ইদং সর্বম্ এর মাঝে আত্মগোপনের ফলে এই সব ব্রহ্মের সত্তা-চৈতন্য-আনন্দরূপে ফুটিয়া উঠিল]

সেই পরমাত্মস্থ এই কাম প্রকাশ করিলেন "আমি বহু হইব", "উৎপন্ন হইব"। তিনি সৃষ্টিকৌশলের জন্য পরা প্রকৃতির তপস্যা করিলেন। তিনি সেই কৌশলের সহায়ে এই যাহা কিছু সব সৃষ্টি করিলেন। সেই সব সৃষ্টি করিয়া তাহার অনুপ্রবিষ্ট হইলেন।

তদনু প্রবিশ্য। সচ্চত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তং চানিরুক্তম্। নিলয়নঞ্চানিলয়নম্। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানম্ চ সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥২।৬

ইতি ব্রহ্ম বল্লীভাষ্যে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ।

ব্রহ্মবল্লীর প্রথম লক্ষণ 'সত্যম্'—'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'। এই সত্য যে দ্বিত্বহীন এক নয়, দুই-একের সমন্বয় অথচ দুই-একেরও অতীতই, এই জীবন্ত (organic) এক, প্রতি বিন্দুতে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া তাহাই দেখাইতেছেন, বাস্তব দ্বৈতসৃষ্টি আজ পুরুষোত্তমে রমমান দ্বৈত থাকিয়াও তাদাত্ম্য অদ্বৈত তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত সব সত্য] তৎ [সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম] অনুপ্রবিশ্য [যোগমায়া, অজা, অসতী, পরা প্রকৃতির 'অন্ত' পিছনে পিছনে, প্রতি স্পন্দনে স্পন্দনে অনুস্যূত থাকিয়া] সৎ চ [যা কিছু চোখের সামনে প্রত্যক্ষ মূলরূপে আছে যত সব 'ইং'] ত্যৎ চ [যাহা কিছু অপ্রত্যক্ষ, চোখের আড়ালে যাহা কিছু 'ন' পদবাচ্য] অভবৎ হইলেন ; সৎ যদি এক মাত্র পারমার্থিক হন, তবে তাৎ-সৃষ্টি মিথ্যা, আরোপ ছাড়া কিছুই নহে বাস্তব পুরুষোত্তমের সৎ সৃষ্টিও পারমার্থিক, তৎ-সৃষ্টিও পারমার্থিক] নিরুক্তং চ [নিশ্চিত রূপে নির্দেশে যাহা উক্ত হইতেছে, বৈশ্বসৃষ্টিগম্য আপেক্ষিক দেশ-কালাদি যাহার পরিচ্ছেদ (line of demarcation) টানিয়া দিয়াছে। অথচ বাস্তব পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাহা নাই] অনিরুক্তং চ [যাহার সম্বন্ধে দেশ-কালাদি কিছুই নিশ্চয় করিয়া নির্দেশে বলিতে পারে নাই] নিলয়নং চ [সমস্ত স্থিতি ক্ষেত্র, নিশ্চিত আশ্রয় স্থল] অনিলয়নং চ [সমস্ত গতি ক্ষেত্রে, যেখানে চঞ্চলতাতেই ব্রহ্মের নিত্য স্থিতি ; নিত্যে দাঁড়াইয়া এবং বিশ্বকে দাঁড় করাইয়া কোন কিছু জানিবার যেমনই নিলয়, আর যেখানে অনন্ত গতির মাঝে দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন, ভাবচক্রের ঘূর্ণি পাকের মধ্যে ছুটিতে ছুটিতে পরস্পরকে জানিবার সুযোগ পাইবে সেই যেমনই অনিলয়ন] বিজ্ঞানং চ [স্থিতি বিজ্ঞান] অবিজ্ঞানং চ [গতিবিজ্ঞান, যেখানে জানিতে জানিতে সব-জানা প্রতি মুহূর্তে না জানায় পর্যবসিত হয়, জানায় চেয়েও না জানার বিকটাকে, রসের বিকটাকে আস্বাদন করাই অবিজ্ঞান। জানার মধ্যে আছে স্থিতি ও ভাব, না জানার মধ্যে মিলে গতি ও রস] সত্যং চ [অপরিণামী সত্য] অনৃতং চ [এবং পরিণামী সত্য

অনন্তঃ

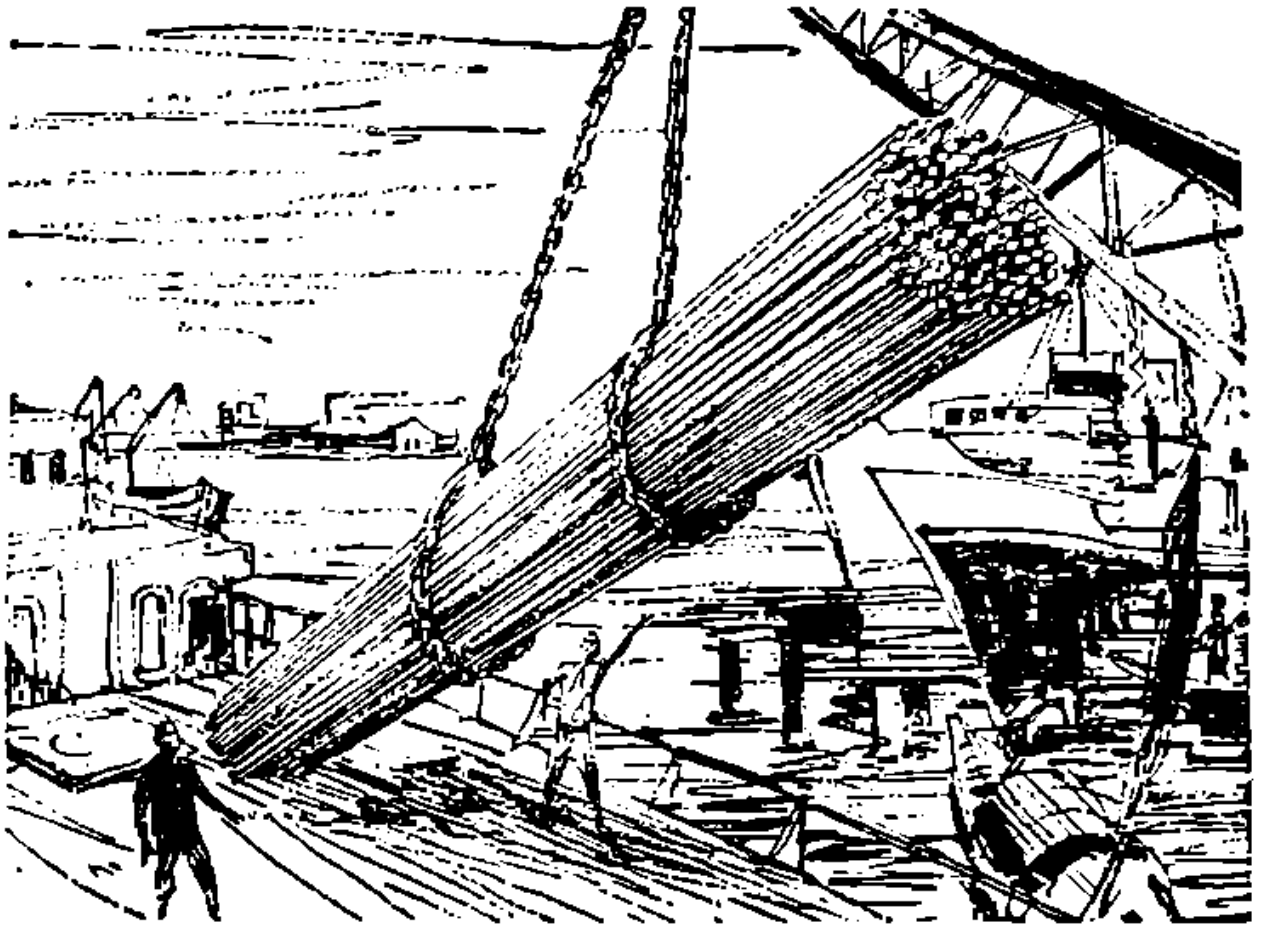

বিদেশে টাটার ইস্পাত

জামশেদপুরে তৈরি ইস্পাতের এ্যাঙ্গল ও চ্যানেল, বার ও ক্লয়েস্ট ইত্যাদি কয়েক মাস অন্তর অন্তর কোলকাতা থেকে জাহাজে ক'রে পূর্ব আফ্রিকা, মধ্য ও দূর প্রাচ্যে চালান যায়। এই সব দেশে শিল্প ও কলকারখানা গড়ে তুলতে ইস্পাতের ভয়ানক দরকার।

গত দুবছরে টাটা প্রতিষ্ঠানের সরকার-অনুমোদিত রপ্তানী ফার্ম কমার্শিয়াল অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপোর্টস লিমিটেড (সিয়েল) মারফৎ টাটা স্টীল ৩০,০০০ টনের বেশী ইস্পাতের মাল চালান দিয়ে প্রায় সওয়া কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা রোজগার করেছেন। সুখের বিষয়, রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়ছে। দেশের পরিকল্পিত শিল্পোন্নয়নে বৈদেশিক মুদ্রার এখন সবচেয়ে দরকার।

বিদেশে ইস্পাত রপ্তানী ক'রে গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন মেটাতে সাধ্যমত চেষ্টা ক'রে টাটা স্টীল দেশের প্রতি তাঁদের কর্তব্য পালন করছেন।

টাটা স্টীল

The Tata Iron and Steel Company Limited

খাদ্য সংরক্ষণই খাদ্য সঞ্চয়

আপনিও সব্জি সংরক্ষণ করুন

কি ক'রে সব্জি সংরক্ষণ করবেন ?

আপনার অঞ্চলের বি. ডি. ও অথবা নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করে এই সম্পর্কে পুস্তিকা সংগ্রহ করুন।

খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবসায়ী অথবা উৎসাহী জনসাধারণের পরামর্শও সাদরে আহ্বান করা হচ্ছে।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন

যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (বিপণন)

মহাকরণ, কলিকাতা

ফোন : ২২-১৬৮১, এক্সটেনসন—৩৭০

ডব্লিউ. বি. (আই অ্যান্ড পি. আর) এফ. পি. সি ৫৩৫(৭) ৬৬

আমি বৈষ্ণব নহি কারণ তাহাতে তিলক কেটে ভেক নিতে হয়, আমি বৈষ্ণবের দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। দাড়ী আছে বটে কিন্তু কাজি মৌলবির নিকট বলমা পরে মুসলমান হই নাই, মুসলমান দলের মুসলমান কেবল মুখে বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। ব্যাপটাইজড না হইলে খৃষ্টান দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না, বাহ্যিক জপতপ পূজার্চ্চনাও নাই, গুরুকর কাছে কাণে ফোঁকা মন্ত্রও লইতে চাহি না—ইহাতে সাধারণ হিন্দুরা আমাকে নাস্তিক বলিবেন। বাহ্যিক পূজা অর্চনা জপই আস্তিকের কার্য তাঁহারা বলেন। এখন কোন দলে ত আমাকে লইবে না, আমিও দল চাই না। দল গেড়ে বোবাতেই, পচিল পঙ্ক পরিপূর্ণ পূতিগন্ধযুক্ত পল্বলেই হইয়া থাকে; স্বচ্ছ সরোবরে, প্রবাহিনী স্রোতস্বিনী নদীতে হয় না। তবে আমি কি? আমি সকল দলের ভিখারী। ভিখারীর জন্য সকল দ্বারই উন্মুক্ত। আমাকে প্রেম ভক্তি ভিক্ষা সকল দলের সাধুরাই দিয়া থাকেন। আমি সকল দলের ভিক্ষা পাই। সেইজন্য আমার সকল দল মধ্যে এক অখণ্ড দল।'

—শ্রীনিত্যগোপাল

…যে ভীষণ চক্র চলিয়াছে যাহার ঘূর্ণনে জীববৃন্দের নাক কান হাত পা কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইতেছে, সে চক্রকে কি রোধ করিবার জন্য কেহ পথের বাহির হইবে না? এই ভীষণ কালচক্রের গতিরোধ করিবার জন্যই ত পুরুষোত্তম মতবাদের প্রয়োজন। শুধু ব্যক্তিগত শান্তি লাভ ইহার মুখ্য প্রয়োজন নয়। তাই তো বেদনায় বুক ভরিয়া উঠিয়াছে। চতুর্দ্দিকে ঝড়…চতুর্দ্দিকে প্রকৃতির রুদ্রাণী রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য ইহার ভিতর রহিয়াছে অঙ্কুরন্ত করুণা সামনে আগাইয়া যাইবার যোগ-সূত্র। সমস্ত বাধার অর্থ সামনে আগাইবার জন্য আহ্বান। যেমন দৌড়ের সামনে বেড়া থাকিলে তাহা লাফাইয়া ডিঙ্গাইতে হয়, তেমনি আমাদের দৌড়ের সামনে যে বেড়া দেখা দিয়াছে তাহা পুরুষোত্তম-তত্ত্বে লাফ দিয়া ডিঙ্গাইতে হইবে। ভয় নাই। মা-ই ত প্রকৃতি। মায়ের শ্রীচরণ তলে বস, সব ভীষণতা করুণায় গলিয়া যম হইবে। করুণ ও ভীষণের সমন্বয়ই পুরুষোত্তম। করুণাকে চাহিলে ভীষণকেও চাহিতে হইবে। শরণ অর্থ আশ্রয়, আতঙ্ক। ভয় নাই…। তবে যে পুরুষোত্তম ছড়াইয়া পড়িবেন তাহাই ভাবিতেছি। তিনি ছাড়া যে বর্ত্তমান যুগের গতি নাই। সবই যে মরিতে বসিয়াছে।

—শ্রীশ্রী পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

১।	ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)	
	১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	১৷৷৩
	২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্য্যন্ত)	৮৲
	৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত)	৬৲
২।	ঈশোপনিষৎ	২৲
৩।	কেনোপনিষৎ	২৲
৪।	কঠোপনিষৎ	৩৲
৫।	প্রশ্নোপনিষৎ	১৷৷০
৬।	ঐতরেয়োপনিষৎ	১৷৷০
	মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	
৭।	শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ	২৷৷০
৮।	শ্রীনিতাগোপাল জীবনে ও দর্শনে.	১৷৷০
৯।	স্বরাজের পূর্ণরূপ	৷৷০
১০।	গীতাস্বরূপী	৵০
১১।	উদ্ধবগীতা (পুস্তিকা)	৷৷০
১২।	মৃত্তিকোপনিষৎ	
১৩।	মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে	
	পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা	৲
	(গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)	

পাণ্ডুলিপি

১।	বৃহদারণ্যক উপনিষৎ	
২।	ছান্দোগ্য উপনিষৎ	
৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	
৪।	দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী ইত্যাদি	

শ্রীযতী প্রতিভা রায়ের

১।	নারী-প্রগতির ভক্তকথা	১৷৷০
২।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ও শিশু নিত্যগোপাল ও শিশু বুধার কথা	৷৷৮৵৹
৩।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	৫৲

শ্রীযতী রেণু মিত্রের

১।	সংস্মরণমূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল	৷৷৵০
২।	রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে	২৲
৩।	শরৎচন্দ্রের দেবপ্রয়াগ	৩৲
৪।	রবীন্দ্র-স্মরণ	৫৲
৫।	প্রাথমিক শিক্ষা	৯৲

নরনারায়ণ আশ্রম

ফোন নম্বর ৫৭-২৫৪০

গ্রাম : বাগুইআটি পো: অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা